সূচীপত্র।

৮ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা।

কলিযুগের উপাসনা।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য বচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ *

দেবের বাঞ্ছিত শচীর সংসার। রাজ্য-লক্ষ্মী সম সুখ পারাবার।
পরম দয়াল গোরা গুণনিধি। বেদের বচন আজ্ঞা [illegible] বিধি।
পালন করিতে ত্যজিয়া হেলায়। সন্ন্যাসী [illegible] করুণা আধার।
আপন দয়িতা ভকতির তরে। মায়া-মৃগী পাছে ধায় [illegible]॥
ভক্তি সম আর নাহি কোন তত্ত্ব। জগতে স্থাপিলা ভক্তির মহত্ত্ব।
জীবগণে সুধামাখা হরিনাম। দিয়া নিস্তারিলা তার পরিণাম॥
সে মহাপুরুষ চরণ-কমল। বন্দনা করিলে পাই প্রেম ফল॥

---

* এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে। মহারাজ নিমি নব যোগেন্দ্র ঋষির নিকট কতকগুলি ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সেই প্রশ্ন গুলির মধ্যে কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে, এবং তাঁহাকে কোন্ মন্ত্রে উপাসনা করিতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন নামক যোগেন্দ্র উপাস্য দেব [illegible] কথা বলিয়া, শেষে এইটী কলিযুগের উপাসনা মন্ত্র ইহাই ব্যক্ত করিলেন। [illegible] যাদি এই শ্লোকের শ্রীরাম পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌরাঙ্গ পক্ষে ইহার অর্থ করিয়াছেন। উপরের পদ্যটী সেই [illegible] অনুসরণে লিখিত।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হোরিকা।

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর ফেলি ফাগু মারে গোরা গায়।
চন্দন পিচকা লয়া কেহ কেহ ধায়॥
নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সবে করয়ে বিলাস॥
হরি বলি ভুজ তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করল প্রকাশ॥ ৫৫॥

অভিষেক।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচান্দের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্য-থালী।
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সভে গায় গীত॥
গোরাচান্দের মুখ সব করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে॥ ৫৬॥

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখি গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥ ৫৭॥

অগুরু চন্দন লেপিয়া গোরাগায়।
প্রিয় পারিষদগণ চামর ঢুলায়॥
আনি চন্দ্রে ছেদো শীত নিজ করে।
মনের হরিষে ঢালে গৌরাঙ্গ উপরে॥
চাঁদ জিনিয়া মুখ অধিক করি সাজে।
মালতি ফুলের মালা গোরা অঙ্গে সাজে॥
অরুণ বসন শোভে নানা আভরণে।
বাসুদেব ওই রূপ করে নিরীক্ষণে॥ ৭৮॥

তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহ আরতি করিলা।
নির্মঞ্ছন করি শিরে ধান দূর্ব্বা দিলা॥
ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে।
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥ ৭৯॥

পাশাক্রীড়া।

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব পড়িল।
পাশা সারি লয়ে গোরা খেলিতে বসিল॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি।
খেলিতে লাগিল দান হারি জিনি করি॥
দুই চারি দান খেলে প্রিয় গদাধর।
পঞ্চ তিন পাঁচ ডাকে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
দুজনে মগন ভেল নব পাশা রসে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে॥ ৮০॥

জলকেলি।

জলকেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি বোলাবুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তঁহি গোরা গুণ গায়॥ ৬১॥

নৌকা খণ্ড।

না জানিয়ে গোরাচান্দের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িলা গোরা প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হঞা বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সভে হরি হরি বলে।
পুরুষ সোঙরি কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥ ৬২॥

দানলীলা।

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
কয়ের বা দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥

কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান॥ ৬৩॥

গোষ্ঠলীলা।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ রব দিয়া ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥ ৬৪॥

বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনী।
আবা আবা রবে ডাকে গোরা গুণমণি॥
ভাবিছেন গোরাচাঁদ সেই ভাবাবেশে।
বৃন্দাবনের ভাবে গোরা হইল আবেশে॥
সাথী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে।
বিপিনে যাইবে গোরা গোঠ করিবারে॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী ধাইয়া চলিল।
বাসুদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল॥ ৬৫॥

অভিরাম ডাকে দ্বারেতে, আরে রে গৌর যাবি খেলাতে।
গৌরব করে বসে আছ শচীমায়ের কোলেতে॥
ব্রজের খেলা গোচারণ, নদের খেলা সংকীর্ত্তন, যাতে মত্ত শিশুগণ;
হারে রে রে জানা যাবে, যেয়ে সুরধুনীর তীরেতে॥
সময়ে অসময় হলো, গোঠে যাওয়ার সময় গেলো, গৌর যাবি কিবা বল;
অভিমানে বসে আছ শচী মায়ের কোলেতে॥

শুনে অভিরামের কথা, কহিতেছেন শচীমাতা, তোরা যাবি‍ে কোথা ;
গোঠে যাবে গোরাচাঁদ, বাসু যায় নিয়ে ছাতা॥ ৬৬॥

সুবলমিলন।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব পড়য়।
সুরধুনীর তীরে গিয়া রাধা গুণ গায়॥
রাধার মহিমা গুণ করয়ে কীর্ত্তন।
গৌরীদাসের বদন হেরি করয়ে রোদন॥
গৌরীদাস বলে প্রভু কেন অচেতন।
তব অঙ্গে আছে রাধা কর দরশন॥
এতেক শুনিয়া প্রভু হইলা চেতন।
বাসুদেব ঘোষ কহে ধৈর্য্য ধর মন॥ ৬৭॥

আরে মোর আরে মোর গোরা গুণমণি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায়ে ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
গৌরীদাস কোলে রহে কভু মুরছায়॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা নাহি হও উতরোল॥ ৬৮॥

ঝুলন।

ঝুলতো গোরাচাঁদ সুন্দর রঙ্গিয়া।
প্রেমভরে হয়ে ডগমগিয়া॥
রাধার ভাবেতে ধরা বয়ানেতে ভাসে।
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে॥
মুরলী বলিয়া চাহে বদন হেরিয়া।
বাসুঘোষ গায় গোরা গুণ সঙরিয়া॥ ৬৯॥

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী।

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিবিধ অবধি, রূপ নিরুপম, কষিল কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত, ভকতবৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেঢ়িয়া।
আনন্দে সঘনে, জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া॥
নটন কমল, মুখ নিরমল, শারদ চান্দ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় এক মুখ, হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া॥
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচান্দ বিনে, আন নাহি মনে, বাসুঘোষ কহে জানিয়া॥ ৭১॥

রাসলীলা।

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমানে।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমানে॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচান্দ করিলা প্রকাশ॥ ৭২॥

সোঙরি পুরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইলা॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিল গোরাচান্দ।
অঙ্গুলী নাচাঞা করে সুললিত-গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবন মোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বর্ণিতে পারে॥ ৭৩॥

পাগলিনী রাই।

১

কেনবা সাঁঝের বেলা,
করিতে সলিল খেলা,
গিয়াছিনু যমুনা বেলায়,
কি খেনে তথায় গেনু,
পাগল হইয়া এনু,
একি জ্বালা ঘটিল আমায়!

২

দেখিনু কদম্ব তলে,
বনমালা দিয়া গলে,
দাঁড়াইয়া নন্দের দুলাল গো!
রমণী বধের তরে,
কতই যতন করে,
পাতিয়াছে স্বরূপের জাল গো!

৩

হাস্য ছটা আটা তায়,
কটাক্ষ অঙ্কুশ ঘায়,
রমণী বা কেমনে এড়ায়?
প্রাণ পাখী লো আমার,
পড়িল জালেতে তার,
কি করিব না পাই উপায়!

৪

আপনার মাথা খেয়ে,
কেন বা গেছিনু ধেয়ে,
ভরা সাঁঝে যমুনা বেলায়,
কি জানি সাঁঝের বেলা,
কোন দেও করে খেলা,
কার দিঠি লাগল আমায়!

৫

বিনা সে কালিয়া ধন,
যায় বুঝি এ জীবন,
কেমনে বা পাইব তাহায়?
রাজার কুমার কালা,
হাম আহিরিণী বালা,
সে কেন বা চাহিবে আমায়!

৬

বামন হইয়া হেন,
শশী পেতে সাধ কেন,
লাজে মরি স্মরি নিজ কাজ গো,
কে জানে বিহির সাধ,
জীবনে সাধিল বাদ,
দূর হ'ল কুলশীল লাজ গো!

৭

সখি তোর পায়ে ধরি,
পাঁচ পঞ্চ গুণ করি
তথি হ'তে ঘুচাইয়া বাণ,
ত্বরাগতি আনি দাও,
নতু মোর মাথা খাও
তাহা ভখি' জুড়াব পরাণ।

৮

এতই বলিয়া কাঁদে,
সঙরিয়া কালাচাঁদে,
বালা ভাবে মিলন উপায়,
বালা কবে একাসনে,
নেহারিবে দুই জনে,
ভাবে তাই আকুল হিয়ায়।

[illegible] প্রতি [illegible]।

১

কি তত [illegible] পথি কথং [illegible],
[illegible]তে না পারি [illegible] দিয়া মোর পিপাসিত,
[illegible] পরাণ [illegible] আমার।
[illegible] বাশিয়া বাঁশী, পরাণে পরাণে [illegible]
[illegible] তবু [illegible] সেই প্রায়।

২

ধীরে ধীরে [illegible] মিলিয়া পবনে,
কাঁপাইয়া চরাচর, উঠিল যবে সে স্বর,
তড়িত বহিয়া গেল পরাণে পরাণে।
স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকি, [illegible] পাতের পাখী।
[illegible] এ [illegible] দেখিনু নয়নে।

৩

হেন [illegible] এ জীবনে [illegible] নাহি আর,
[illegible] স্বর, [illegible] প্রাণে শুধু স্বর,
[illegible] যায় অবনায়।
[illegible] বাজে হেন, [illegible] না [illegible] কেন,
তা হ'লে না [illegible] হ'তে যায়।

৪

এখন কি [illegible] রাখা তায়,
[illegible] বাশরী বাজে,
[illegible]
[illegible] না পাই [illegible]
[illegible] ভাক।

৫

[illegible] হিয়ায়,
[illegible] করেছে বাস,
[illegible] যায়,
[illegible] দাও।
[illegible] উপায়।

গৌর পূর্ণিমা।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত তাবত লীলা প্রামাণিক আর কোন অবতারের কথা এইরূপ লিখিত নাই। গৌরাঙ্গ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে জন্মলীলা করায় ঐ তিথির 'গৌর পূর্ণিমা' নাম হইয়াছে। গৌর-পূর্ণিমা তিথির আরাধনা করা বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ বিষয় এই শ্রীপত্রিকায় বহুতর লেখালেখির পর স্থির হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর ন্যায় শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পূজা করিবে। এ বৎসর (সন ১৩০৪ বাং) ২৫ শে ফাল্গুন মঙ্গলবার গৌর-পূর্ণিমা, তদুপলক্ষে গৌরহরির জন্ম অব্দাদির শাস্ত্রীয় প্রমাণ শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হউক, বাসনা হইতেছে। অথচ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্ম বা মরণে॥

অপিচ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা শ্চৈতন্য চরিতামৃতং॥

গৌরপ্রভুর আবির্ভাব অব্দাদির প্রমাণ যথা—

বৈবস্বত মনোরষ্টাবিংশতি যুগ সম্ভবে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে॥
ফাল্গুনে মাসি সংপ্রাপ্তে ত্রয়োবিংশতি বাসরে
দণ্ডাষ্টবিংশতেঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ পলগে ক্ষণে॥
পূর্ণেন্দৌ রাহুণা গ্রস্তে সন্ধ্যায়াং সিংহলগ্নকে।
নক্ষত্রে পূর্ব্বফল্গুন্যাং রাশৌ চ পঞ্চরাজকে॥
সর্ব্বসল্লক্ষণৈঃ পূর্ণে সপ্তমে বাসরে তথা।
মিশ্রপত্নী শচীগর্ত্তাদুদিতো ভগবান্ হরিঃ॥
কলাভিরেব সর্ব্বাভিঃ ক্ষীরোদাদিব চন্দ্রমাঃ।
গৌর জন্মতিথিং পুণ্যাং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনীং॥
প্রত্যব্দং পূজয়েদ্ভক্ত্যা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং যথা।
যে কুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা গৌরজন্মব্রতংপরং॥

তে গচ্ছন্তি পরং ধাম সদানন্দময়ং হরেঃ।
না হ্বয়ে ন্নাস্তিকান্ কৌলান্ গৌরজন্ম ব্রতে ব্রতী॥
(শ্রীবংশীলীলামৃত।)

উদ্ধৃত প্রমাণ গুলি সরল সংস্কৃত সহজে বুঝা যাইতেছে। সুতরাং অনুবাদ দেওয়া গেল না।

কি আনন্দ! আমাদের গৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাব কাল সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত আছে!! গৌরাঙ্গলীলার কোন অংশও মানবের অবিশ্বাস করা উচিত নহে। তুমি বুঝিতে পার না, বুঝিবার চেষ্টা কর। না বুঝিয়া অহঙ্কার ভরে, কল্পিত কি অতিরঞ্জিত বলিয়া গৌরলীলার মাহাত্ম্য উড়াইয়া দিবার বা খর্ব্ব করিবার যত্ন করিও না। তোমার প্রয়াস সফল হইবে না—তোমার মন্দই হইবে। বহুযোনি ঘুরিয়া মানব-জন্ম লাভ হয়। ধর্ম্ম-সাধন একমাত্র মনুষ্য জন্মেরই কার্য্য।

পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হইল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত পাণি,
সে জনমি কেন নাহি মৈল॥—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের উচ্ছাস পূর্ণ দুটী পদ নীচে দিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিতেছি:—

(১)

রাহু-কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু, কলিমর্দ্দন বাজে বানা।
পঁহু ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ, জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশল, দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে, বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্যঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু, বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥

(২)

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর, নয়নে হেরই না পার।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম, উপমা নাহিক বিচার॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী মণ্ডল, চৌদিগে শুনিএ উল্লাস।

এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি, গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর, দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ মণ্ডল, আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য, উঠয়ে জয় জয় নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত, কোই হৈলা হরিষে বিষাদ॥
চারি বেদ শির, মুকুট চৈতন্য, পামর মূঢ় না জানে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই, বড় ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস গানে॥

জীবাধম শ্রীরাজীবলোচন দাস।—শ্রীহট্ট।

গৌরভক্ত গদাধর।

আজ আমরা একটী ভক্তের কথা শ্রীপত্রিকার পাঠক পাঠিকাগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি, ভরসা করি ভক্তচরিত পাঠে সকলেই প্রেমানন্দ অনুভব করিবেন।

এই গদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত বা গদাধর দাস নহেন, ইনি মহাভারত লেখক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গদাধর ১০৫০ সনে স্কন্দপুরাণোক্ত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থকে জগতমঙ্গল নামে অভিহিত করিয়াছেন। গদাধর গ্রন্থের প্রারম্ভে বিস্তৃত রূপে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

ভাগীরথী তটে বাড়ী ইন্দ্রাইনি নাম।*
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণিসিংহ গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥

---

* এই পদের উল্লেখ করিয়া আমাকে কোন ভক্তমহাত্মা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঐ মালাচন্দন সহ কি গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?—যদি হন, তবে মনুষ্য বালকরূপে অবতীর্ণ হইলেন না। আর এ সময় গৌরাঙ্গের বক্ষে চন্দন লেপন-মালা দোলন মনুষ্যের দ্বারা হইলে, তাহা কি অস্বাভাবিক নয়?—লেখক।

ইহার পরেই তাঁহার বংশের পরিচয় এইরূপ। শাণ্ডিল্য গোত্র দৈত্যারি দেবের ভুবরাজ ও শুভরাজ এই দুই পুত্র। এই ভুবরাজের পুত্র মীনকেতন, তাঁহার পুত্র ধনঞ্জয়, এই ধনঞ্জয়ের রঘুপতি, ধনপতি ও নরপতি নামক তিন পুত্র। রঘুপতির প্রিয়ঙ্কর, সুরেশ্বর, কেশব, শ্রীমুখ বা শ্রীশুক ও শ্রীধর এই পাঁচ পুত্র। প্রিয়ঙ্করেরও পাঁচ পুত্র—যদু, সুধাকর, মধু, বামন ও রাঘব। শ্রীমন্ত, কমলাকান্ত এবং চণ্ডীদাস এই তিনটী প্রিয়ঙ্করের পুত্র? কমলাকান্তের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরাম এবং কনিষ্ঠ গদাধর।

কমলাকান্তের হয় এ তিন কোঙার।
প্রথমেতে কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
দ্বিতীয়েতে কাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥

গদাধরের পিতা কমলাকান্ত শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করণাভিলাষে উড়িষ্যাদেশে গমন করেন, তিনি তত্রস্থ শ্রীভগবদ্দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভোজন-সুখ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই স্থানেই বাস করেন।

কমলাকান্ত তেজিয়া আইলা নিবাস
জগন্নাথ দরশনে উড়িষ্যা কৈলা বাস॥

গদাধর যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন নরসিংহদেব নামক উড়িষ্যায় রাজা ছিলেন। গদাধর কটক জেলার অন্তর্গত মাখনপুর নামক গ্রামে বসিয়া উক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জগতমঙ্গলেই লিখিত হইয়াছে।

এই মহাত্মার শ্রীগৌরাঙ্গে অটল বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি জগতকে বিশ্বাস করাইবার জন্য জগতমঙ্গলের প্রথমেই গৌর অবতারের পৌরাণিক প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার অনুবাদ করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন। সেই প্রমাণ নানা পুরাণ হইতে সংগৃহীত হয় নাই, কেবল মাত্র বায়ু পুরাণ অবলম্বন করিয়াই একটী অধ্যায় লিখিয়াছেন। পাঠকগণের গোচরার্থ অনুবাদের সারাংশ এই স্থানে যথাযথ প্রকটিত হইল। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন, গৌতম মুনির পুত্র শতানন্দ কলিজীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

অবধান মহাশয় আমার মিনতি।
কলিকালে লোকের হইবে কোন গতি॥

অল্প বুদ্ধি অল্প আয়ু অনেক অনীত।
বৈষ্ণবে অভক্ত সদা ব্রাহ্মণে নিন্দিত॥

গৌতম শতানন্দের এই কথা শুনিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! আমি ব্রহ্মা ও অমরবৃন্দসহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া যাহা শ্রবণ করিয়াছি অদ্য তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে কহিতেছি, তুমি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মনঃ সংযোগ করিয়া শ্রবণ কর :—

বসুমতী এক দিন গেলা ব্রহ্মলোকে।
ব্রহ্মা আগে নিবেদিলা গদগদ ভাকে॥
অবধান প্রজাপতি মোর নিবেদন।
না সহিতে পারি ভার কম্পয়ে জীবন॥
কলিকালে লোক সব মহাপাপ-কারী।
মহা অপকীর্ত্তি ভার সহিতে না পারি॥

পৃথিবী এই প্রকার অনেক কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি অমরগণসহ ব্রহ্মা হংসারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। সেখানে শ্রীবিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক অনেক প্রকার স্তুতি করিয়া পরিশেষে বলিলেনঃ—

পৃথিবীর আপদ পড়য়ে বারেবার।
হইলে তোমার কৃপা হয় প্রতিকার॥
কলি অপকীর্ত্তি ভার না পারি সহিতে।
নিবেদন করে ক্ষিতি প্রভুর সাক্ষাতে॥

ভগবান্ ব্রহ্মার করুণ বাক্য এবং পৃথ্বীর গদগদ স্বর-যুক্ত রোদন শ্রবণ করিয়া

সুধা বরিষণ বাক্যে করিলা আশ্বাস। না কর ক্রন্দন না করিও গদ ভাষ॥
না কর বিষাদ কিছু স্থির কর চিত। করিব সভার রক্ষা নহিব অহিত॥
আজ্ঞা লয়্যা অবনীতে চলহ অমর। ভক্ত হয়্যা অবনীতে ধর দেহ নর॥
আমিহ হইব জন্ম আরম্ভে কীর্ত্তন। ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম শচীর নন্দন॥
সুরনদী তীরে নবদ্বীপ জনালয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পূর্ণ প্রেমময়॥
ভক্তিযোগ শিখাইব লোক অনুগ্রহে। যাহার শ্রবণে মহা মহা পাপ দহে॥

ইহার পরে সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। তাহার শেষ অংশটুকু মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল—

কীর্ত্তন প্রেম রসে মজে যার মন। পিতৃগণ তাহার করয়ে আস্ফালন॥

আনন্দে বিভোল উর্দ্ধ বাহে নৃত্য করে। সাধু পুত্র জন্মি বংশ সহিত উদ্ধারে॥
অভক্তাদি ষড় গুণ যে বেদাস্তি ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণভক্ত রূপের সে না হয় তুলন॥
কীর্ত্তন মহিমা যে বলিতে নারে বেদে। কীর্ত্তন সমান প্রাপ্তি নহে বহু খেদে॥
হেনই কীর্ত্তনারম্ভে জনম আমার। লোক নিস্তারিব সংহারিব ক্ষিতিভার॥
পৃথিবী হইব নারী দ্বিজ দেহ ধরি। থাকিব আমার সঙ্গে সেবক ভক্তি করি॥
লক্ষ্মী হব দ্বিজ-রূপ নাম গদাধর। আমার ভক্তির রসে চরণে কিঙ্কর॥
বলরাম জ্যেষ্ঠ অংশে সহ যে আমার। নিত্যানন্দরূপে হব বিখ্যাত সংসার॥
প্রকাশ করিব ভক্তি ·াগ পরায়ণ। হইব লোকের গতি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
তুমি ব্রহ্মা জন্ম হবে নাম হরিদাস। মম পদে সেবি কর ভক্তির প্রকাশ।
শ্রীনিবাস হইব নারদ অবতার। তুম্বুর হইব রামানন্দ মহীপাল॥
বাসব হইব অবনীতে মহীপাল। নামেতে প্রতাপরুদ্র ভকতি অচল॥
হইব রুদ্রের রূপে শ্রীঅদ্বৈত নাম। নির্ম্মল ভকত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব প্রধান॥
আজ্ঞা পায়্যা ব্রহ্মা আদি আনন্দিত হৈয়া। নিজপুরে গেল সব হৃষ্ট মন হৈয়া।
শ্রীচৈতন্য অবতার কথা পুরাতন। ভক্তিভাব করি ইহা শুনে যেই জন॥
কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে। অভক্ত যত ত তারা নিকটে না রহে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে দেন প্রেমদান। তুলনা নাহিক দিতে তাঁহার সমান॥
সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহ। ভবসিন্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ॥
বায়ুপুরাণের কথা শুনহ শ্রবণে। চৈতন্য চরিত দীন গদাধর ভণে॥

যাঁহারা বায়ুপুরাণে শ্রীচৈতন্যাবতারের কথা নাই বলিয়া আপত্তি করেন, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হউন। সার্দ্ধ দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বেও বায়ুপুরাণের এ কথা প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীঃ—

বিধবার সুখ।

(১)

ভারতের বিধবার মলিন বদন। রাত্রি দিন যাপিতেছে করিয়া রোদন॥
আভরণ শূন্য দেহে মলিন বসন। সুখ নাই, আশা নাই, সুধুই বেদন॥
সুন্দর ফুলটী মোর গিয়াছে শুকিয়ে। শোভা নাই, আভা নাই, দেখরে চাহিয়ে॥
ক্ষণকাল অদর্শনে হইত কাতরা। আর না হেরিবে সেই সুহৃদ্ ভ্রমরা॥
আর না শুনিবে সেই মধুর গুঞ্জন চিরদিন তরে আশা দি.ছ বিসর্জ্জন॥

(২)

উঠ গো ললনে চাও মুখ তুলি। আশ্বস্ত করিব দুটি কথা বলি॥
নশ্বর জগত চিরস্থায়ী নয়। কখন মিলন কখন হারায়॥
যে রমণী আছে পতি ল'য়ে সুখে। কাল হারাইয়ে ভাসে চির দুঃখে॥
যদি পতি হ'ত চিরন্তর ধন। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হ'ত না কখন॥
কিন্তু হায়! দেখ চোখের উপর। কত শত যায় ফিরেনাক আর॥

(৩)

ছাড় মিছে মায়া মোর কথা শুন। কেন আর মিছে করহ ক্রন্দন
পর ফুলমালা কর বেশ ভূষা। আবার তোমরা কর পতি আশা॥
নশ্বর পার্থিব পতি পেয়েছিলে। কেবল দু দিন তাই ভুলে ছিলে॥
মায়ার ছলনে ভুলান তোমায়। তাও কি মনেতে হয় না উদয়?

(৪)

দেখ ব্রজগোপী ছাড়ি নিজ পতি। ছাড়ি গৃহ-ধন সন্তান সন্ততি॥
শুনিয়া শ্যামের বাঁশরীর গান। ধাইল সকলে নিকুঞ্জ কানন।
কালাচাঁদ বলে কেন চাও মোরে। আছে তোমাদের পতি যাও ফিরে॥
তখন রমণী করিছে উত্তর। বল নাথ! পতি তু বিনে কে আর?
নিত্য সুখ দাতা কে আছে জগতে। নিত্য প্রেম দিয়া কে পারে রাখিতে॥

(৫)

বৃন্দাবন ধামে ভারত রমণী। বিধবা হইলে জুড়ায় পরাণী।
দেখিলাম কত পতি বিরহিণী। সুখে বাস করে আছে একাকিনী॥
হা প্রাণবল্লভ! হা গোবিন্দ বলি। বেড়ায় আনন্দে প্রাণ-মন-খুলি॥
হারায়ে গেয়েছে কালাচাঁদ পতি। তাই ল'য়ে তারা করিছে বসতি॥
বেশ ভূষা মালা অলকা তিলকা। কেমন লাবণ্য কেমন পুলকা॥

(৬)

পরাণ গোবিন্দ পরাণ রতন। প্রাণপণে তাঁর করিছে সেবন।
ব্রজের বিধবা ঘাঘরী পরিয়ে। কেমন বেড়ায় হেলিয়ে দুলিয়ে॥
পুছিলে তাহারে বলে হায় প্রীতি। "ড়াঁড় কোন্ হ্যায়" শ্রীগোবিন্দ পতি।
বেলফুল মালা লয়ে থরে থরে। পরাইছে সবে গোবিন্দ পতিরে॥
কেহ প্রাণ খুলে গাইতেছে গান। মিলাইয়ে প্রেম মধুকর তান॥
ভাসিছে নয়নে প্রেমের তরঙ্গ। বাহুতুলি করে কত রঙ্গ ভঙ্গ

(৭)

এস গো অবলে দেখ একবার। কেমন এ পতি ব্রজগোপিকার ॥
এ যে চিরকাল থাকিবে হৃদয়ে। নিত্য সুখ পাবে এ পতি লইয়ে ॥
ছাড় মিছে দুঃখ করহ চিন্তন। পাবে নিত্য পতি কালাচাঁদ ধন ॥
পেয়েছ সুযোগ অনিত্য ত্যজিয়ে। কর নিত্য সুখ নিত্যধন লয়ে ॥
পড় সবে পড় "কালাচাঁদ গীতা।" দেখিবে কেমন সখীর বারতা ॥
কেমন সরল কেমন মধুর। পড়িলে ভাসিবে সুখের সাগর ॥

শ্রীমুকুন্দলাল সরকার।

পঞ্চমাধব।

৪র্থ মাধব

মাধব আচার্য্য।—ইনি অদ্বৈত প্রভুর শাখার মাধব পণ্ডিত, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তত ভাই। ইহাঁর পিতার নাম কালিদাস। দীপিকায় ইহাঁর স্বরূপ মাধবী সখী, ইনি কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা। ইনি ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গোক্ত মাধবত্রয়ের অন্যতম। কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব পরাশরের পুত্র এবং তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন না। তাহারা আরও বলেন ঃ—

"যদি অদ্বৈত-শিষ্য মাধব কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা হইতেন, তবে বন্দনা প্রকরণে কোন না কোন এক স্থানে শ্রীঅদ্বৈতের পাদপদ্ম একবারও স্মরণ করিতেন, শ্রীঅদ্বৈতের পাদপদ্ম বন্দনা করা অবশ্যই অদ্বৈত-শিষ্যের কর্ত্তব্য ছিল। তিনি স্বীয় গ্রন্থে "শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দ অভিরাম" এই রূপ বন্দনা করিয়াছেন। যখন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়াছেন, তখন স্বীয় গুরুদেব শ্রীঅদ্বৈতের পাদপদ্ম বন্দনা করা কি সম্ভবপর ছিল না? তাহা না করায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব কখনই অদ্বৈত-শিষ্য ছিলেন না।"

মাধব কৃষ্ণমঙ্গলের বন্দনা প্রকরণ রচনা করেন নাই। যদি তিনি বন্দনা প্রকরণ লিখিতেন, তাহা হইলে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি সকলেরই বন্দনা তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতেন, কেবল চৈতন্য ও

নিত্যানন্দের বন্দনা লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। এই বন্দনা প্রকরণে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বন্দনা আছে, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের বন্দনা নাই। তবে কি অদ্বৈতাদিকে অবজ্ঞা করার জন্যই বন্দনার সৃষ্টি? পাঠক, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন, এই বন্দনা প্রকরণ আধুনিক অশিক্ষিতের রচিত।

পাঠক! দেখিবেন, মাধবরচিত কৃষ্ণমঙ্গলের একটা বন্দনা প্রকরণই নাই। হুগলী বদনগঞ্জের শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, বনবিষ্ণুপুর রাজবাটী, শ্রীহট্টের অচ্যুত বাবুর নিকট, ঢাকা লোহজঙ্গের পাল বাবুদের বাড়ীতে এবং আমার নিকট যে হস্তলিখিত কৃষ্ণমঙ্গল আছে, তাহাতেও বন্দনা প্রকরণ নাই। বটতলার ২৪৫ নং বাটির ৵ ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত তাঁহার হস্ত লিখিত কৃষ্ণমঙ্গল দ্বারা ১২৭৮ সনে যে কৃষ্ণমঙ্গল ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতেও বন্দনা প্রকরণ নাই। এই সকল পুস্তকের কোন স্থানেই "পরাশর পুত্র মাধব" এইরূপ বর্ণিত নাই। যখন মাধবের কৃষ্ণমঙ্গলের একটা প্রকরণই নাই, তখন

"পরাশর নামে দ্বিজ কুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥"

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দ অভিরাম।"

ইত্যাদি যে থাকিবে না, তাহাতে আর কথা কি?

মাধব বালকাবস্থায় মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভুর মুখ হইতে উদ্গীর্ণ হরিনাম শ্রবণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃষ্ণলীলা বর্ণনেচ্ছাও বলবতী হইয়াছিল। পরে তিনি ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী মহাপ্রভুর কৃপায় অধ্যয়ন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পাণ্ডিত্য লাভ করেন, তাঁহার উপাধি আচার্য্য হয়। তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া "দশম স্কন্ধকে" গীতে বর্ণনা করেন। তাহার নাম "কৃষ্ণমঙ্গল।" তিনি কৃষ্ণমঙ্গলের বন্দনা প্রকরণ লিখেন নাই। এবং কৃষ্ণমঙ্গলে কাহারও বন্দনা করেন নাই। কেবল প্রায় গানের অন্তেই মহাপ্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

আমি তাহার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি;

মুদ্রিত কৃষ্ণমঙ্গল ২য় পৃষ্ঠায়—"চৈতন্য চরণে দ্বিজমাধব রচিত।"

৩পৃ—"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজমাধব রচিত।"

৬পৃ—"চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥"
"কলিযুগে শ্রীচৈতন্য করিলা প্রকাশ। দ্বিজমাধব কহে তাঁর দাসের দাস॥"

১০পৃ—কলিযুগে শ্রীচৈতন্য হৈলা অবতার।
দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাঁহার॥"

৩০পৃ—"কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
দ্বিজমাধব রসভাষে।"

৪০পৃ—"কলিযুগে শ্রীচৈতন্য সেই অবতার।
তিরোভাব করিলে নিস্তার নাহি তার॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে পর মাধব 'কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন, তাহার আভাস কৃষ্ণমঙ্গলেই আছে। যথা—

২৮৩পৃ—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী বিহার।
যাঁর অবতারে লোক পায় ত নিস্তার॥

মাধব কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়া এই গীতগ্রন্থ বোধ করি শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। মহাপ্রভু এই কৃষ্ণলীলাগ্রন্থ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দকে এই পুস্তক দেখাইলেন। পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন, এবং 'কৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে মহাপ্রভু মাধবের প্রতি বিশেষ করুণা বিস্তার করিয়া অদ্বৈতকে আদেশ করিলেন, 'আমি ইহার কৃষ্ণমঙ্গল দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি; আপনি ইহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করুন।" অদ্বৈত বলিলেন, "আমি ইহার কৃষ্ণমঙ্গল দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতেছি, আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতেছি," এই বলিয়া মাধবকে তিনি যথাসময়ে দীক্ষা প্রদান করিলেন। যথা, প্রেমবিলাসের ১৯ বিলাসে—

"যেই দিন শ্রীচৈতন্য নিজ হরিনামে।
উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ কৈলা ভক্তগণে॥
সেই দিন সেই স্থানে ছিলেন মাধব।
কর্ণে প্রবেশিল তাঁর মহামন্ত্র রব।
নাম শুনিয়া তার প্রেমোদয় হইল।
চৈতন্য চরণে দণ্ডবৎ প্রণমিল॥

শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁরে অনুগ্রহ করি।
চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক উপরি।
মাধব নামের নীতি প্রভুরে পুছিলা।
সংখ্যা করি লৈতে নাম প্রভু আজ্ঞা কৈলা॥
সংখ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে।
সেই হইতে হইল তার সংসার বিরাগে॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
গীতে বর্ণিলা তিহোঁ করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে সমর্পণ কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈলা অনুগ্রহ।
সব ভক্তগণ তারে করিলেন স্নেহ॥
মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করিলা আদেশ।
দীক্ষা মন্ত্র মাধবেরে কর উপদেশ।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞা মতে।
মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে।
আগে হরিনাম কহে অর্থের সহিতে।
রাধা-কৃষ্ণ-মন্ত্র পরে কহিলা কর্ণেতে॥

পাঠক! দেখিবেন, "কৃষ্ণমঙ্গল" রচনার পরেই মাধব অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য হইয়াছিলেন, কাজেই স্বীয় গুরুর চরণ বন্দনা করেন নাই। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, মাধব মহাপ্রভুর নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের সময় হরি-নাম গ্রহণ করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন শুনিলে চৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ব্যবহারানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চমকিত হইবেন। কিন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ীরা বুঝিবেন, যাহাদের মুখের এইরূপ প্রশ্ন তাহারা বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের কেহই নহেন।

চৈতন্য সম্প্রদায়ীরা শৈশবাদি অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে একবার হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক বার হরিনাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষার প্রাক্কালে পুনরায় হরিনাম গ্রহণ করার কারণ কি? কারণ, ব্যব-হার ও শাস্ত্র। ব্যবহার আছে, দীক্ষার প্রাক্কালে অর্থের সহিত হরি-

নাম উপদেশ করিয়া মন্ত্র প্রদান করিবে। ইহার প্রতি শাস্ত্র এই,—

'হরিনাম বিনা দেবি দীক্ষায়া বিফলা ভবেৎ।'

মাধব রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের আদ্যন্ত দুইটী গানের কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

প্রবল রাজা কংশাসুর, নিবসে মথুরাপুর,
যার ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন।
সুরাসুর পরিবার, করে বড় দুরাচার,
বাধক নাহিক এক জন॥ ইত্যাদি ১ ম গান।
যাইব নন্দের বাসে, বিশেষে রব সে আশে,
যমুনার তীরে বৃন্দাবন।
নিজ অংশে দেবাদেবী, সত্বরে জন্মাহ ভুবি,
দ্বিজ শ্রীমাধব বিরচন॥ ইত্যন্ত।
পূর্ব্বে যত স্বর্গে ছিলা অপ্সরার নারী।
পৃথিবী জন্মিতে তারে ব্রহ্মা আজ্ঞা করি॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তবে যত নারীগণ।
পৃথিবী জন্মিতে তারা করিলা গমন॥ ইত্যাদি শেষ গান।
গুণগাথা গাইতে হয় হরিপদে মতি।
শুনিতে শুনিতে হয় মনের পিরীতি॥
দ্বিজ মাধব কহে শুন ভক্তজন।
কৃষ্ণ কথা শুনিলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥ ইত্যন্ত।

চতুর্থ মাধবের কথা এই খানেই পরিসমাপ্তি করা হইল, ইহার পরে পঞ্চম মাধবের কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীনন্দকুমার গোস্বামী।

মনের মানুষ।

বহু দিনের পরে একটা গানের কথা মনে পড়িল। এই মাঘ মাসের বৈকাল বেলা দুইটী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। সম্মুখে গঙ্গা—সূর্য্য ডুবু ডুবু—গঙ্গায় জোয়ার লাগিয়াছে—সেই ভরা গঙ্গার পূর্ণ বক্ষে সায়াহ্ন রবির ঝকমকি দুলিয়া দুলিয়া খেলাইতেছিল।

আমার চক্ষু সেই দিকে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ বন্ধু বড় ভাবুক—বড় রসিক—বড় প্রেমিক। তাঁহার মন বাহিরে বাহিরে বড় বেড়ায় না। নয়ন তাঁহার মনের অধীন। মন আবার রসরাজের সুধারসে একবারেই সিক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নয়ন বাহিরে আসিলেও লতায় পাতায় এখানে সেখানে রসময়ের রসলীলাই প্রত্যক্ষ করে। কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, "মনের মানুষ! আহা, কথাটি কি সুন্দর, বাস্তবিক মনের মানুষ! তিনি সকলেরই মনের মত!! এই কথা হইতে না হইতেই আমার সেই পুরাণ গানটী বহু দিনের পরে পুরাণ স্বপ্নের মত—সহসা মনে পড়িয়া গেল। গানটীর কেবল প্রথম দুই চরণ মনে আছে, আর মনে নাই। যথা,—

একটি মনের মানুষ দেখে এলেম কপ্‌নী পরা।
রাধা রাধা রাধা বলে তার দুনয়নে বহে ধারা॥

গানটির বাকী অংশ মনে পড়িল না, কিন্তু উপরের লিখিত দুই চরণেই মনের মানুষটির মূর্ত্তিখানি ষোল আনা মনে পড়িল। আমার মনের মানুষটির কৌপীন পরা—নয়নের জল আর শুখায় না—'রা, বলিতেই ধারা বাহিয়া বুক ভাসিয়া যায়, 'ধা, বলিতেই অচেতন! কে জানে, কি ভাবে, কিসের অভাবে, মনের মানুষটীর এখন আবার এ ভাব হইল। কে জানে, কাহার মন রাখিতে, মনের মানুষটি সজল নয়নে কাঙ্গাল বেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগৎ কাঁদাইলেন? রাজরাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যিনি সমস্ত রাজন্যবর্গের পূজ্য ও পূজিত, ভীষ্মের সেই মনের মানুষটীর আজ এ দশা কেন? কুরুক্ষেত্রের রণরঙ্গের রুদ্র ভালে এক সময়ে যিনি যাবতীয় বীরবুদ্ধির শির্ষে পদাঘাত করিয়া অমিত তেজে প্রতিভাত হইতেছিলেন—যিনি বীরগণের "মনের মানুষ" সাজিয়া ছিলেন, আজ তিনি ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? রাজনীতির কূট বুদ্ধিতে যিনি আধুনিক বিষমার্কেরও "মনের মানুষ," তিনি আজ দীন হীন কাঙ্গালের মত, কোমল প্রাণ শিশুর মত, সরল, ব্যাকুল অন্তরে রাধা রাধা বলিয়া কান্দিয়া আকুল কেন? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহাকে মনের মানুষ মনে করিয়া যাঁহার ধ্যানে নিয়ত নিমগ্ন, আজ কিসের অভাবে তাঁহার নয়ন-ধারায় বুক ভিজিয়া যাইতেছে? মাতা যশোমতীর মনোমত ছেলেটীর আজ এ ভাব কেন? পিতা নন্দের সাধের ছেলেটীর আজ এ ভাব কেন? গোপীগণের মনের

মানুষটীর আজ আবার এ ভাব কেন? শ্রীরাধিকার মনের মানুষটী আজ কিসের দায়ে সজল নয়ন-সন্ন্যাসী সাজিলেন, তোমরা বলিতে পার কি? সেই ব্রজবিলাস আর এই সন্ন্যাস,—তোমরা বলিতে পার কি, কেন এমন হইল? সেই মথুরার রাজা আর এই নদীয়ার ভিখারী,—তোমরা বলিতে পার কি, কেন এমন হইল? সেই রাজনীতি বিশারদ রণক্ষেত্রের পণ্ডিত আর এই সাদাসিধা সজল নয়ন প্রেমিক ভিখারি—তোমরা বলিতে পার কি কেন এমন হইল? বিপরীত পরিবর্ত্তন! নন্দদুলাল আজ পথের কাঙ্গাল কেন? গোকুলের রাখাল এক দিন মথুরার ভূপাল হইলেন—পা ধরা নাগর এক দিন রাজাধিরাজ হইলেন—ইহাই উন্নতি। কিন্তু আজ আবার পথের কাঙ্গাল কেন? মনের মানুষটির এ দশা হইল কেন বলিতে পার কি?

উত্তর বড় কঠিন নয়। মানুষটি প্রকৃতই মনের মানুষ। আমার মনের মানুষ তোমার মনের মানুষ, রাজার মনের মানুষ, বীরের মনের মানুষ, ধীরের মনের মানুষ—যোগীর মনের মানুষ, ভোগীর মনের মানুষ—ব্রহ্মচারীর মনের মানুষ, আবার বিলাসীর মনের মানুষ—ধনীর মনের মানুষ আবার দীনাতিদীন কাঙ্গালের মনের মানুষ। চোর লম্পট ডাকাইত আর সাধু শান্ত সন্ন্যাসী, দীনহীন কাঙ্গাল আর বীর ধীর রাজাধিরাজেন্দ্র—বালিকা যুবতী বৃদ্ধা, শিশু যুবক বৃদ্ধ—কি ভূপাল কি রাখাল—ইনি মনের মানুষ সকলেরই। গাভীগণ যাঁহার বাঁশীর রবে নবতৃণ ত্যাগ করে, যমুনা যাঁহার বেণুর কাবলীতে উজানে বহে, গোবর্দ্ধন যাঁহার করাঙ্গুলীর নিকট কার্পাস কণা হইতেও লঘুতর হয়, তিনি মনের মানুষ নহেন কাহার? এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি পদার্থের মন রাখা যাহার কার্য্য তাঁহাকে অনন্ত কোটি ভাব ধারণ করিতে হইবে, অনন্ত পদার্থের মনের মত হইয়াই তাঁহাকে বিচরণ করিতে হইবে। সেই জন্য ব্রজের রাখাল মথুরার ভূপাল, আবার মথুরার ভূপালই নদীয়ার কাঙ্গাল। শ্রীরাধার পা ধরা নাগর মন রাখিতে, মান রাখিতে, প্রেম বুঝিতে, প্রেম বুঝাইতে, শ্রীমদাচার্য্য প্রভুর গভীর আহ্বানে আজ আবার কলির জীবের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেম প্রবাহ ঢালিয়া দিতে, ব্রহ্মার দুর্লভ ধন মহাপাপীর হাতে বিলাইতে, ঠিক্ আমাদের মনের মানুষটী সাজিয়া নদীয়ায় দেখা দিলেন। ভুবনমোহন রূপ, অগাধ পাণ্ডিত্য

অমানুষিক বিনয়, শিশুর মত সরলতা, হিমাচলের ন্যায় আশু গাম্ভীর্য্য, ইহার পরে আবার সজল নয়ন, তার পর আবার রা বলিতেই নয়ন ধারায় শ্রীরাধা প্রেম প্রবাহ—সেই কুঞ্জরসের প্রবল প্রবাহ! হরি, হরি, মনের মানুসটি প্রকৃতই অপার গম্ভীর অনন্ত বৈচিত্রের মনোমুগ্ধকর প্রতিচ্ছবি। যে ভাবে দেখ সেই ভাবেই মনের মানুষ। লীলায় লীলায় অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, লীলায় লীলায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মন প্রাণ নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া মনের মানুষটি ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালায় কত খেলাই খেলিতেছেন! অজ্ঞান আমরা, তাই বুঝি না—অরসিক আমরা, তাই মন মানুষের সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়াই না। মনের ব্যথা, প্রাণের কথা, মনের মানুষের চরণ পাশে খুলিয়া বলিয়া মনের জ্বালা জুড়াই না।

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ মানুষের সহিত মিশিতে ভালবাসে। কিন্তু সকলের সহিত মন মিলে না, প্রাণ খেলে না, এই জন্য মনের মানুষ। যদি মনের মানুষ পাই, তবে মন খুলিয়া আলাপ করি। ইহাই মানুষের প্রকৃতি। কিন্তু মনের মানুষ খুজিয়া না লইলে সহসা পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণ জগতে ষোল আনা মনের মানুষ মিলে না। এ মিলনে সৃষ্টিগত অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কোন না কোন বিষয়ে মানুষের সহিত মানুষের ষোল আনা মিলন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীভগবানের জীবের প্রতি আবার এমনি দয়া যে, এই অসম্পূর্ণ তিনি তাঁহার প্রিয়জনের ষোল আনা মনের মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন—তাঁহাকে লাভ করিলে মানুষ ঠিক মনের মানুষ পায়, পার্থিব অসম্পূর্ণতা বিস্মৃত হয়, মরজগতে বৈকুণ্ঠ বৈভবের সুখ শান্তি ভোগ করে, তাহার হাসিমাখা মুখ খানি, প্রেমমাখা চাহনি খানি দেখিলেই মানুষ তাহার মনের মানুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে, পৃথিবীর সুখ দুঃখ আর তখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সংসারে থাকিয়াও সে তখন গোলকের সুখ সম্পত্তির অধিকারী।

বহুদিনের পরে আবার "মনের মানুষের" কথা মনে পড়িল। যিনি গোলক ছাড়িয়া কাঙ্গালের মনের মানুষ হইলেন—কাঙ্গালের জন্য গোলকের ভাণ্ডার লুঠিয়া আনিলেন—কাঙ্গালের ঘরে আসিলেন কাঙ্গালের দুঃখে কাঙ্গালের সহিত কাঙ্গালের ন্যায় কাঁদিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া

প্রেমে, বিলাইলেন সেই কাঙ্গালের ঠাকুর—মনের মানুষটির কথা আবার বহুদিনের পরে মনে পড়িল। আমি দেখা করিতে যাই না, মনের মানুষ আপনি আসিয়া আমাকে দেখা দেন, আদর করেন, ভালবাসেন। দয়া তাঁহার কত। হৃদয়টা দারুণ পাষাণ না হইলে কি এমন প্রাণের বন্ধু মনের মানুষটিকে ভুলিতে পারে।

অনেক দিন যায় এক দিন বৈকাল বেলায় শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত পড়িতেছিলাম। এ পাষাণের নয়নও তখন ঝর্‌ঝর্ ঝরিতেছিল—গ্রন্থ পাঠ আর হইল না—চক্ষের জল আর থামিল না। সন্ধ্যা হয় হয়, সূর্য্য তখনও একবারে অস্ত যায় নাই; অনেকক্ষণ এই মনের মানুষটিকে ভাবিতেছিলাম। তখন বুঝিলাম ইনি পাষণ্ডের প্রভু, ভাবুকের সুহৃদ, কাঙ্গালের সখা, আর প্রেমিক-ভক্তের সাক্ষাৎ রসরাজ। তখন বোধ হইল ইনি আপনার হইতেও আপন—প্রাণেরও প্রিয়তম। কিন্তু আমি কি অধম—এমন যে মনের মানুষ, প্রাণের সখা, কাঙ্গালের ঠাকুর, তাঁহাকে ভ্রমেও মনে করি না! মনে বড় কষ্ট হইল, অনুতাপ হইল—তখন মনের মানুষটিকে সম্বোধন করিয়া লিখিলাম :—

গৌর!

আমি, পাপেতে মলিন, ভজন বিহীন,
দীনহীন দুরাচার।
প্রভো! তুমি দয়াময়, করুণ হৃদয়,
প্রেমময় অবতার॥
তুমি, তরাইতে মোরে, ঝুলি ধ'রে করে,
পরিলে কৌপীন-বাস।
তুমি, ছাড়ি সুখ রাশি, সাজিলে সন্ন্যাসী,
রাখিলে না কিছু আশ॥
গৌর, আমি নিরদয়, পাষাণ হৃদয়,
তোমারে বাহির করি।
এবে, সুখে আছি ঘরে, তিলেকের তরে,
তোমারে নাহিক স্মরি॥
তুমি, যাচিয়ে যাচিয়ে, হরিনাম দিয়ে,
ফিরিছ আমার দ্বারে।

আমি, বিরায় শয়নে, ঘুমে জাগরণে,
তোমার বিলাস দ্বারে॥
এবে, নিজ-মনে করি, যদি কেশে ধরি,
তোল গৌর-হরি মোরে।
তবে, পতিত-পাবন, অগতি তারণ,
এ দীন তরিতে পারে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ আমার মনের মানুষ। তাই প্রাণের কথা তাঁহার শ্রীপদে নিবেদন করিলাম। অপরাধীর প্রাণের ভার অনেক কমিয়া গেল। মনের মানুষ পাইলে প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলা যায়, তাহাতে বাস্তবিকই মনের ভার কমে। কিন্তু সব কথা বলিতে পারি না—বলিবার অবসরও হয় না—ভাবিতেও সব কথা ফোটে না। কিন্তু আমার মনের মানুষ মনের ভাব বুঝেন—বুঝিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া যান। যাউক—এ কথার এই পর্য্যন্তই ভাল। আমার কথা থাকুক।

আবার সেই মনের মানুষটীর কথাই বলিতেছি। কংস মথুরার রাজা। বিরাট আয়োজনে রাজসভা বসিয়া গিয়াছে। সেখানে রাজা প্রজা বীর ধীর গুণী জ্ঞানী যোগী ভোগী সকল শ্রেণীর লোকই সমবেত। অন্তরালে ললনাকুলেরও সমাগম হইয়াছে। এমন সময় ধীরে ধীরে যখন সেই সভাস্থলে আমাদের "মনের মানুষটি উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে কে কি ভাবে দেখিলেন, নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় সেই কথাটি বলা যাইতেছে। যথা :—

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনো ঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্ব পিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজ পতে র্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥

ইনি সর্ব্ব দেহের আত্মা। সুতরাং সকলেরই মনের মানুষ। যাহার যাহার চিত্ত যে ভাবে ভাবিত, ইনিও সেখানে সেই রূপেই প্রকাশিত হইয়া পড়েন। শ্রীভগবদ্গীতায় নিজেই বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।

ভাষায় বলে, "কৃষ্ণ কেমন—যার মন যেমন। যদি মনের মানুষ চাও, তবে ইনিই সেই—মনের মানুষ।

সেবকাধম সেবারাম রসিকমোহন।

ম্লেচ্ছের দ্বিজেন্দ্রত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিশুদ্ধ ভক্তেন্দু বুধাই, হরিনামামৃত বর্ষণ করিয়া, বহুল পাষণ্ড হৃদয়-মরুভূমিতে ভক্তি-কল্পলতার বীজ আরোপণ করিতে লাগিলেন। সাধু-গণের জগন্নিস্তারক ধর্ম্ম স্বভাব-সিদ্ধ। শাস্ত্র বলেন—

"প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্ত্ততে।"

এই প্রমাণের সার্থকতা সাংসারিক জীবে, সাধুজন সম্বন্ধে নয়।

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ॥"—শ্রীভাগবত।

স্থূলার্থঃ।—দীনচিত্ত গৃহীর গৃহে যে সাধুর সমাগম উহা সেই গৃহীর মঙ্গলার্থ মাত্র, তদ্ভিন্ন সাধুগণের স্বার্থ তদর্থ কল্পিত হয় না। বিশেষতঃ নিঃস্বার্থ পরোপকারে সাধুগণের, আজীবন সংকল্প। ইহার পূর্ব্বতন প্রমাণস্থল, মহর্ষি দধীচি। তিনি জগজ্জনের উপকারার্থে, ভগবদ্ভজনোপযোগী কলেবর নখাগ্রবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা দেবরাজ, অসুরগণের সংহার পূর্ব্বক ত্রিলোক নিরাপদ করিয়াছেন। তাতার বর্ত্তমানযুগে. শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু দেখাইয়াছেন। যৎকালে মাধাই কলসীর কাণা প্রভুর মস্তকে নিক্ষেপ করে, তখন দরদর ধারায় রুধির স্রোতে নিত্যানন্দের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, পরম কারুণিক জীব-বৎসল প্রভু, তদ্বিষয়ে দৃকপাত না করিয়া, ভাবী ইহাদের কি গতি হইবে বলিয়া ব্যাকুলিতান্তঃকরণে কহিলেন,—বাবা! মারিলি মারিলি একবার হরি বল। সাধুমণ্ডলী, জগচ্চিত্তের মহা চমৎকারিণী অবস্থা সন্দর্শনে মুক্তকণ্ঠে করুণস্বরে কহিলেন,—ধন্য প্রভু নিত্যানন্দ! তোমার অচিন্ত্য মহিমা ধন্য, তোমার জীবোপকারে জীবন সম্বল। সত্য সত্যই তুমি চিন্ময়ী দয়ার প্রতিমা। বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবানের ন্যায় সময়ে সময়ে সাধুগণ প্রকট হইয়া জগতের অসীম মঙ্গল বিধান করেন।

অনন্তর ভক্তরাজ বুধাই, মনে মনে আলোচনা করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের আবির্ভাব স্থান নিত্য-সিদ্ধ চিন্ময় ভূমি। তন্মধ্যে তিনিই নিত্য লীলারস আস্বাদন করেন। কোটি জন্মের সুকৃতিতেও ঐ লীলা জীবের

গোচরীভূত হয় না। কেবল নিত্য সিদ্ধ-ভক্ত-বেদ্য। এবং বিশেষ ভাগ্যোদয়ে, সাধু বৈষ্ণবের কৃপায়, যাঁহারা ভক্তি-চক্ষু লাভ করেন, তাঁহাদের অগ্রে ঐ লীলা ক্ষণপ্রভার ন্যায় স্ফুরিত হয়। ভক্তগণ ইহাঁদিগকে, সাধন সিদ্ধ বলেন। এবং স্বয়ং ভগবানের কৃপায় স্বাতন্ত্র্যত্ব প্রযুক্ত, যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-নেত্র-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ লীলা দর্শনে অধিকারী। ইহাঁরাই কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। প্রাকৃত জীবের পক্ষে, সেই বিশুদ্ধ প্রেম সুধাময়ী লীলা দর্শন দূরে থাকুক, শ্রীধাম নবদ্বীপের রজঃ স্পর্শই শ্রেয়স্কর। সাধুবর, এবম্বিধ মনে করিয়া, বক্ষ্যমাণ পদ গাইতে গাইতে শ্রীধামে শুভযাত্রা করিলেন। পদ যথা—

"জয় জয় গৌর ইন্দু ভক্ত প্রাণবন্ধু।
দয়া করি দেখা দাও হে শুদ্ধ প্রেমসিন্ধু॥"

ক্রমে সাধু, গঙ্গা সহচরী পদ্মাবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালে ঘটনাক্রমে বর্ত্তমান মহকুমা কুষ্টিয়ার সন্নিকর্ষে চণ্ডালপাড়ায় এক দস্যু গৃহে সমুপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ সাধুর সুলাবণ্য দর্শনে মনে মনে বিবেচনা করিল, এ ব্যক্তি অর্থশালী, বোধহয় বহুমূল্য ধন লইয়া দীনবেশে যাইতেছে। এই বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও সমাদর করিতে লাগিল। গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণবদিগের কিছুই অগোচর নাই। সাধু তাহাদের ভাবগতি দেখিয়া খলপ্রকৃতি দস্যু বলিয়া স্থির করিয়াও খলতা সংস্কারের জন্য জীবন পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া, সেইস্থানেই অবস্থান করিলেন। সাধুবরের সঙ্গাকর্ষণে বহু২ বালকাবলি তথায় উপস্থিত হইল। সাধু সেই বালকদিগকে বলিলেন,—শিশুগণ! বল দেখি, শ্রীতুলসীবৃক্ষ কোথায়। শিশুগণ—আমাদের গ্রামসম্বন্ধে ঐ গাছ দেখা যায় না, কেবল নদীতীরে শ্মশানে একটি গাছ দেখিয়াছি। সাধু—কি আশ্চর্য্য! আর্য্য-জাতির গৃহে তুলসীর অভাব। তুলসীহীন গৃহই শ্মশান। যথা পদ্মপুরাণে,— "নধাত্রী সফলা যত্র নবিষ্ণু স্তুলসী বনং। তৎশ্মশান সমং স্থানং সন্তিযত্র নবৈষ্ণবাঃ।" চুম্বকার্থঃ। যে স্থানে ফলবান্ আমলকী বৃক্ষ নাই, এবং বিষ্ণুপ্রতিমা তুলসীবন নাই, ও বৈষ্ণবের সমাগম নাই, সে স্থান প্রকৃত প্রেতভূমি। অত্যন্ত অস্পৃশ্য ভূমিতে তুলসী বিরাজিতা হইলে, সেস্থল পরম শান্তিনিকেতন বৈকুণ্ঠতুল্য, স্বয়ং হরি সে স্থানে নিত্য বিরাজিত।

শাস্ত্র বলেন,—'তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানিচ। পুরাণপঠনং

যত্র তত্রসন্নিহিতোহরিঃ।" অনন্তর সাধু বহু প্রয়াসে তুলসীদেবীকে দস্যু গৃহে সংস্থাপনপূর্ব্বক নামব্রহ্মের অরাত্রিক করিতে লাগিলেন

তদ্দর্শনে বালকগণ অতীব কৌতুহলান্বিত হইয়া সাধুকে বেষ্টন করতঃ উপবেশন করিল। তৎপর সাধুবর

'দিন গেল হরিবল হরিবল ভাই।
হরিবিনে অন্তকালে আর বন্ধু নাই॥"

এই পদ গাইতে লাগিলেন; সাধু-অঙ্গ দ্রবব্রহ্মের হিল্লোলে বালকগণের তাপত্রয় দুরীভূত হইল, হৃদয় শান্তিরসে অভিষিক্ত হইল। সেই হৃদ্দর্পণে প্রেমের ছায়া পতিত হওয়াতে গন্ধর্ব্ব-কিন্নর তিরস্কৃত রসতানসংস্পৃষ্ট সুমধুর সমস্বরে সাধুর সহিত তাহারা গান করিতে লাগিল। অহো! শ্রীচৈতন্যের কৃপাই ইহার মূলীভূত কারণ। ক্রমে সাধুবর প্রেমবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বালক-বৃন্দও মহানন্দে সাধুকে ঘিরিয়া ঊর্দ্ধবাহু হওত মনোহর নৃত্য করিতে লাগিল। আহা! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, বোধহয় যেন সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাভাগবত প্রহ্লাদ বহুল কায়ব্যূহ ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংকীর্ত্তন সুধাসিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তৎকল্লোল উদ্বেলিত হইয়া দস্যুনগরী আপ্লাবিত হইল। সাধু-কৃপাচন্দ্রমা দস্যু হৃদ্গগনে নামামৃতের মাধুর্য্য সঞ্চার করিল। দেখিতে দেখিতে নব চৈতন্য-সূর্য্য সমুদিত হইল। তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানতমোরাশি দূরে পলায়ন করিল। অমনি ভক্তিনলিনী প্রস্ফুরণোন্মুখী হইল। তদীয় দিব্য-সৌরভে আর কি জীবের চিত্তভৃঙ্গ স্থির থাকিতে পারে? দস্যুরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সাধুর চরণপদ্মে পতিত হইলেন। সাধুবর বলিলেন,—বাবা! একি, উঠ উঠ. আমি ম্লেচ্ছাধম ঘৃণাস্পদ, মঙ্গল চাও ত সুমঙ্গলময় শ্রীগৌরগোবিন্দের পদাশ্রয় কর। দস্যুরাজ বলিলেন,—প্রভো! আপনিই মঙ্গলময় পরমদেবতা, বোধহয় মায়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এ অস্পৃশ্য ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছেন। আমি মহাপাপী, ভয়ানক নির্দ্দয়দস্যু, আপনাকে বিনাশের জন্য স্থির সংকল্প করিয়াছিলাম। আপনি যেন কি অভূতপূর্ব্ব সুধাবর্ষণ দ্বারা আমার পাষাণাপেক্ষা সুকঠিন হৃদয়কে দ্রব করিলেন। ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার। জানিলাম, আপনিই আমার গুরুরূপী মহেশ্বর, আমার মস্তকে সহস্র পদাঘাত করিয়া মহান্ অপরাধ হইতে পরিমুক্ত করতঃ স্বর্গীয় সোপান দেখাইয়া

দিউন। আর দিন নাই, অসৎসঙ্গে বহুল অমূল্যসময় নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ভবদীয় শ্রীচরণ মাত্র ভরসাস্থল। অহো! ধন্য, শ্রীচৈতন্যদাসের অহৈতুকী দয়ার ধন্য ধন্য। সাধুবর কহিলেন,—বৎস! আর ভয় নাই। দয়ার মহাসাগর শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হও, তদীয় কৃপাকটাক্ষ-রুদ্রাগ্নিদ্বারা মহাপাপপুঞ্জ ক্ষণকালের পূর্ব্বেই ভস্মসাৎ হইবে। দস্যুরাজ বলিলেন,—চৈতন্য কে? সাধু বলিলেন,—সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিপুরুষের অধীশ্বর এবং যিনি হেতুরহিতা বিশুদ্ধ দয়ার ভাণ্ডার; যিনি সুনির্ম্মল প্রেম প্রতিমা; যাঁহার ঈষৎ প্রেমলবের সদাগন্ধাকর্ষণে তোমাকে সাধুবর্ত্মে প্রেরণা করিয়াছেন; যাঁহার পাদপদ্ম প্রাপ্তিলালসায় অনন্তজগতের জীববৃন্দ সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমন করিতেছে। দস্যুরাজ,—প্রভো! সেই অমূল্যনিধি প্রাপ্তির সদুপায় কি? সাধু বলিলেন,—তদাকর্ষণী মন্ত্রসুধা পান করাই তৎপ্রাপ্তির মুখ্য উপকরণ। দস্যুরাজ বলিলেন,—প্রভো! সেই মহাবস্তু আমাকে সত্বরে প্রদান করুন্! ক্ষণভঙ্গুরদেহের চিরঅস্তিত্ব জ্ঞান অজ্ঞানান্ধ জীবের সম্বন্ধে। সাধু তদ্বাক্য শ্রবণে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া যেমন চন্দনসদ্গন্ধ বায়ুকণা বৃক্ষান্তরে সঞ্চারিত হয়, তাদৃশ দস্যুহৃদয়ে স্বীয় বিশুদ্ধপ্রেম-ভাব সঞ্চারপূর্ব্বক জগচ্চৈতন্য-কারী শ্রীচৈতন্যমন্ত্র তদীয় কর্ণযুগলে প্রদান করিলেন। দস্যুরাজ,—দেব সুদুর্ল্লভা ভবমোচিকা মন্ত্ররূপামৃত-সঞ্জীবনী মহৌষধি পান করিয়া, নব-জীবন ধারণ করিলেন। তদীয় ইন্দ্রিয় সকল উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী বৃত্তি অব-লম্বন করিল। মানস-দর্পণ ভক্তিরসে মার্জ্জিত হওয়াতে, নব নবদ্বীপ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অমনি তাহাতে গৌরচন্দ্রের সুনির্ম্মল, সুশীতল, সদাস্বযুক্ত প্রতিবিম্ব স্ফুরিত হইতে লাগিল। দস্যুরাজের মায়া-বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। তৎক্ষণাৎ দস্যুরাজ সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া, শুদ্ধপ্রেমরূপ ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক কহিলেন,—গুরুদেব! আমি গোলোকে কি ভূলোকে কিছুই স্থির করিতে পারি না, অন্য সুখ দূরে থাকুক ব্রহ্মানন্দ সুখও তৃণতুল্য অনুভূত হইতেছে। সাধু বলিলেন,—বৎস! তুমি কোটি ভাগ্যে সর্ব্বানন্দ সিন্ধুর অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া দেবদুর্ল্লভ প্রেমামৃত পয়োধি, নিমজ্জিত হইয়াছ। আর তোমাকে জগন্মোহিনী মায়ায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৎস! ঐ দিব্যকর্ণে শ্রবণ কর, অপ্রাকৃত নবদ্বীপে তোমার দিব্য সৌভাগ্য-ঘণ্টা মুহুর্মুহুঃ বাজিতেছে। নিখিল ভীতি তদ্দর্শনে ভগ্ন প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তকালের জন্য অন্তর্হিতা হইয়া-

ছেন। আইস, একবার চিন্ময় গৌরাঙ্গনাম কীর্ত্তন করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। এই বলিয়া মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে—

'হা চৈতন্য সনাতন ধর্ম্ম চৈতন্যকারি।

জীবোদ্ধারিণী লীলার মুক্তি যাও বলিহারী।"

এই পদ গাইতে গাইতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দস্যুরাজও প্রেমেপুলকিত হওত উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে করিতে, স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকী ভাব প্রাপ্ত হইল। আহা! সৎসঙ্গের কি অচিন্ত্য মহামহত্ত্ব। দস্যু সপরিবারে বৈষ্ণব হইল। সাধুবর নিশিশেষে, স্থান ত্যাগান্তর, কাঁহা নবদ্বীপ বলিয়া ধাবিত হইলেন। ক্রমে সুরধুনীর পূর্ব্বতটে সমুপস্থিত হইয়া দ্রবব্রহ্ম গঙ্গার স্তুতিপাঠপূর্ব্বক শত অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তৎপর গঙ্গাবগাহন করত তত্রস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন,—শ্রীধাম নবদ্বীপ কতদূরে? সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিল,—ঐ যে পশ্চিম পারে অট্টালিকা সকল দেখা যায়। তদ্দর্শনে সাধুবর স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন,—হা গৌরাঙ্গ! একি আশ্চর্য্য, চিরপ্রসিদ্ধ গঙ্গা পূর্ব্বতটে নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ। আমার ভাগ্যগুণে এ যে বিপরীত দৃশ্য।

এই বলিয়া সাধু প্রেমবৈচিত্রে হা প্রেমপীযূষসিন্ধু! হা অচিন্ত্য শক্তি-মহাশক্তির অধীশ্বর! একবার তোমার নবীনাবিলাস মুরারীর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কি করিতে হয় না? হা প্রাণবন্ধু! বলিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ আর কি ভক্তক্লেশ সহ্য করিতে পারেন? বোধহয় তিনিই বৃদ্ধ-বৈষ্ণবরূপে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধবৈষ্ণব সাধুকে কহিলেন,—তুমি কে? কি জন্য এই জনশূন্য প্রান্তরে চিৎকার করিতেছ। সাধু বলিলেন,—আমি ম্লেচ্ছাধম, গঙ্গাতটের প্রান্তর-ভূমিও মহাপবিত্র এবং দেবতারও তিলক স্বরূপ। আপনি কে? বৃদ্ধ—বৈষ্ণব আমি এক জন বৈষ্ণব। সাধু,—কতকাল যাবৎ এ স্থানে আছেন? বৃদ্ধ,—আমার জন্মভূমিই এই। সাধু,—তবেত আপনি সকলই জানেন। বৃদ্ধ,—তোমার জিজ্ঞাস্য কি? সাধু,—ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল, তবে নবদ্বীপ পশ্চিমতটে কেন? বৃদ্ধ বলিলেন—, গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তটেরই নবদ্বীপ সংজ্ঞা, কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্মভূমি পূর্ব্বতটেই ছিল। ঐ স্থান ভগ্ন হওয়াতে লোক সমস্ত পশ্চিম

পারে গিয়াছে, গতিকেই পূর্ব্বতটের নবদ্বীপ নাম একরূপ তিরোহিত হইয়াছে। সাধু—হায় হায়-মহাপ্রভুর জন্মভূমি লোপ হইয়াছে, বৃদ্ধ—না, পুনরায় গঙ্গাগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। সাধু,—ঐ মহাযোগপীঠ চিন্ময় স্থল কতদূরে? বৃদ্ধ—ঐ যে, বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় স্থান দেখা যাইতেছে। উহার নাম মায়াপুর। দেখ দেখ প্রভু সীতানাথের সহিত গৌর নিত্যা:-নন্দ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যভাগে সংকীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্যায়মান। সাধুবর তাদৃশ অচিন্ত্য চিন্তামণিধামে অপ্রাকৃতা লীলা দর্শনে বিশুদ্ধ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ অন্তর্দ্ধান। কিয়ংকালান্তে সাধু চেতনা পাইয়া দেখিলেন বৃদ্ধ বৈষ্ণব নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী ভূমিও অদৃশ্য। তখন, হায়! হায়! পাইয়া হারাইলাম, বলিতে বলিতে সাধুর দিব্যোন্মাদ প্রকাশিত হইল। সর্ব্ব গৌরময় দর্শন হওয়াতে স্থাবরাদিকে হা প্রাণনাথ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এবং

"হা গৌরাঙ্গ প্রাণ বন্ধু যাঁহা তোরে পাও।
পাখী হঞা সেই স্থানে মুঞি উড়ি যাও॥"

এই পদ গাইতে গাইতে সাধুবর মায়াপুরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল সচ্চিন্মহাযোগপীঠে সিদ্ধি লাভ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দাসানুদাস শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী। উথলী।

প্রার্থনা।

দীনবন্ধু বলি হরি! জগতের মাঝে হে, তোমার গৌরব সবে গায়।
দীনবন্ধু- নাম হরি! আমার ভরসা হে, দীনবন্ধো! লও রাঙ্গা পায়।
আমার মতন দীন, এ তিন ভুবনে হে, আছে কেহ মনে নাহি হয়।
উচিত উচিত অই, করুণা করিতে হে, ত্রিতাপ করিতে নাথ ক্ষয়।
আমিত অধম পাপী, প্রমত্ত পামর হে, বলিতে সে লাজে ঢাকে মুখ।
বলিতে তোমারে নাথ! 'দয়া কর মোরে' হে, পাপ-স্মৃতি ভেজে দেয় বুক।
আমার উপায় আর, নাই নাই নাই হে, এক দীনবন্ধু নাম বিনে।
দীনবন্ধো! তব কৃপা, হেতু না বিচারে হে, দয়াময়! লও শ্রীচরণে।

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব।

মাঘ মাসের দারুণ শীতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছি। হঠাৎ কোকিলের কুহুস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখি ভোর হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা খুলিলাম। সম্মুখে দেখি, কতকগুলি ঢোল কলমী ফুল বাল-বিধবার ন্যায় অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থায় শুভ্র বসন পরিয়া গাছের আড়াল হইতে লজ্জাবনত মুখে উকিঝুকি মারিতেছে। মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। ঘরে আর মন তিষ্ঠাইল না, দ্রুত গমনে বাহিরে আসিলাম। প্রথমেই একটী প্রকাণ্ড কুন্দ ফুলের গাছ নয়ন-পথে পতিত হইল। ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল গুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, আর হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। তার পর একটী বাতাবী লেবুর গাছ। তলায় যাইতেই মৃদু-মধুর গন্ধে নাসিকা মাতিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি, নব কচি কচি পাতার মধ্যে হইতে সাদা সাদা ফুল গুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে ক্ষণেক দাঁড়াইলাম। সম্মুখে একটী আম্রবৃক্ষ দেখিয়া সেই দিকে গেলাম। দেখি, গাছটী মুকুলে ভরিয়া রহিয়াছে, আর ভ্রমরগণ মাতোয়ারা হইয়া সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখি সকলেই নব নব সাজে সজ্জীভূত। বৃদ্ধ সজুনা হইতে শিশু ভাঁটি পর্য্যন্ত সকলেই শুভ্র বসনভূষণে ভূষিত হইয়াছে, সকলই যেন আনন্দে ডগমগ করিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম, আজ সকলে কেন সাজিতেছে? কেনইবা সকলে উল্লাসিত? তখন হঠাৎ মনে হইল,—বসন্ত কাল আসিতেছে, তাই তাহার সেনাগণ আগেই দেখা দিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল,—এই বসন্ত কালে, বাসন্তী পূর্ণিমায়, আমাদের প্রভু, পতিত জীবের উদ্ধার করিতে, "পতিত-পাবন" নাম লইয়া, এই ধরাধামে প্রকাশ হইয়াছিলেন। সে দিনও,—জীবের ও জগতের সেই সৌভাগ্যের দিনও,—কোকিল এইরূপে পঞ্চমস্বরে তান ধরিয়াছিল, ভ্রমরও এইরূপে ঝঙ্কার করিতেছিল, আম্রবৃক্ষ এইরূপ মুকুলিত হইয়াছিল, বাতাবী প্রভৃতি ফুলের গন্ধে এইরূপ দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল, আর সজুনা, কুন্দ, ভাঁটি, ঢোল কলমী এইরূপে শুভ্র বসনভূষণে ভূষিত হইয়াছিল। ভাবিলাম, ইহারা ত সকলেই আসিয়াছে; আবার সেইরূপ পূর্ণচন্দ্রেরও উদয় হইবে, আবার

সেইরূপ মৃদুমন্দ বাতাসও বহিবে, কিন্তু—হে গৌরাঙ্গসুন্দর! হে শচীরদুলাল! হে বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ! হে কাঙ্গালের বন্ধু! আবার কি তুমি তোমার জীবের মধ্যে উদয় হইবে? আবার কি তুমি প্রিয় ভক্তগণের সঙ্গে সেইরূপ করিয়া নৃত্য করিবে? জীবের ভাগ্যে সে শুভদিন আবার কি আসিবে?

তবে, তুমি ত শত শত বার শ্রীমুখে বলিয়াছ যে, সরল মনে হৃদয় খুলিয়া তোমাকে ডাকিলে তুমি আসিয়া দর্শন দাও। ঠাকুর মহাশয় ও আচার্য্য প্রভু সত্য সত্যই ত সংকীর্ত্তনের মধ্যে তোমাকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা অধম পামর, আমাদের সে সৌভাগ্য কেন হইবে? তবে আমরা আমাদের কার্য্য করি, তোমার কার্য্য কর না কর, তুমি বুঝিবে।

হে গৌরভক্ত প্রিয় পাঠক! সেই মনোহর শুভ দিন আবার আসিতেছে, ঐ দেখ সকলেই সাজসজ্জা করিতেছে। আমরাই কি একা চুপ করিয়া থাকিব? এস, আমরাও নব উৎসাহে, নব অনুরাগে, নব নব সজ্জায় সজ্জীভূত হই,—সেই গৌরপূর্ণিমাতে, সোণার গৌরাঙ্গকে মনঃপ্রাণ ভরিয়া আহ্বান করিবার জন্য আমরাও এখন হইতে জোগাড় করি। কিন্তু আমরা তাঁহার কাঙ্গাল জীব, আমরা আর-কোথায় কি পাইব? তিনিই সব যোগাড় করিয়া দিবেন।

সে পূর্ণিমার রাত্রি, চাঁদের আলোকে জগত আলোকিত হইবে। সুতরাং আলোর জন্য আমাদের আর ভাবিতে হইবে না, সে ভার প্রভু নিজেই চন্দ্রের উপর দিয়াছেন। গৃহ সাজাইতে ও মালা গাঁথিতে ফুলের আবশ্যক হইবে। কিন্তু প্রভু তাহার যোগাড়ও নিজে করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুরই অভাব দেখিতেছি না, তবে আমরা কি করিব?

হে গৌরগতপ্রাণ-প্রিয় ভক্ত! নৈরাশ হইও না, প্রভু তাঁহাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। নাম সংকীর্ত্তন প্রভুর অতি প্রিয়বস্তু, তাই দয়াল প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার জীবকে এই "নাম" দিয়া গিয়াছেন। এস, আমরা এখন হইতে এই নাম কীর্ত্তনের যোগাড় করি।

হে ভাই সকল, তোমরা হিন্দুই হও আর অহিন্দুই হও, শ্রীগৌরাঙ্গের এই জন্মোৎসবে, এই নাম সংকীর্ত্তনে, তোমাদের সকলেরই যোগদান করা উচিত। এমন দয়াল, এমন কাঙ্গালের ঠাকুর, আর পাইবে না। তাঁহার নিকট জাতি বিচার নাই, ছোট বড় নাই; তিনি আচণ্ডালকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, অধম পতিত জীবের প্রতি তাঁহার করুণার সীমা

নাই। লক্ষ লক্ষ লোক যাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, যাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অনেকে যীশু, মহাম্মদ কি বুদ্ধদেব অপেক্ষা কম শক্তিধর পুরুষ ছিলেন না, তিনি অবশ্যই একজন অসাধারণ মহাশক্তিধর মহাপুরুষ। সুতরাং "মহাপুরুষ" বলিয়াও তাঁহার এই জন্মোৎসবে সকলের যোগদান করা উচিত।

সেই বাসন্তী-পূর্ণিমার রাত্রে, সেই বসন্তের হিল্লোলে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, যদি দলে দলে কীর্ত্তনের দল গাহিয়া বেড়ায়, যদি বৃদ্ধ বালক সকলেই ইহাতে যোগদান করিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনামের হিল্লোল উঠাইতে পারেন, তাহা হইলে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের ও দৃশ্যের উদয় হইবে, তাহা হইলে ক্ষণকালের জন্যও আমরা শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া বিমলানন্দে ভাসিতে পারিব, ক্ষণকালের জন্যও আমরা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলি ভুলিয়া সকলে এক মন এক প্রাণ হইব। অতএব হে ভাই সকল, আর চুপ করিয়া থাকা উচিত হয় না, এস, এখন হইতেই আমরা প্রস্তুত হই।

হে গৌরাঙ্গ! তোমার পতিত জীব তোমাকে ভুলিয়া সংসারে ডুবিয়া রহিয়াছে! তোমা ভিন্ন তাহাদের আর কেহ নাই!! তুমি কৃপা করিয়া তাহাদের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর!!!

"প্রভুর পাদোপধান।"

জগদানন্দের মুখে অদ্বৈতের প্রহেলিকা শুনিয়া অবধি প্রভুর কৃষ্ণবিরহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দিবানিশি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল জলিতেছে, দিবানিশিই বিভোর ভাব। দিবাভাগ একরূপে কাটিয়া গেল। বেলা যত অবসান হইতেছে, ততই প্রভু ধৈর্য্যহারা হইতেছেন, শেষে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন স্বরূপ ও রামরায় তাঁহাকে ধরিয়া ভিতর প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে নির্জ্জনে পাইয়া প্রভু হৃদয়ের বেগ উথলিয়া উঠিল। তখন—

রামানন্দের গলাধরি করেন প্রলাপন।
সরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন॥

অতি কাতরস্বরে বলিতেছেন, সখি! আমার সেই নয়নানন্দ কোথায়? কোথায় আমার বৃন্দাবনচন্দ্র গেলেন? আর কি তাঁহার সেই মধুর-মুরতি দেখিতে পাইব? আর কি তাঁহার সেই মুরলীর রব শুনিতে পাইব? আর কি তিনি মৃদু-মধুর হাস্তে আমার পানে চাহিবেন? আর কি তিনি সেইরূপ করিয়া রাসরসে নৃত্য করিবেন? সখি, আমার যে প্রাণ যায়, এখন উপায় কি বল?"

প্রভু কখন বিধিকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, কখন অক্রূরকে গালি দিতেছেন। তখনই আবার বলিতেছেন, 'অক্রূর, তোর্ উপরই বা রাগ করি কেন?

তোয় আমায় সম্পর্ক বিদুর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্র ভাঙ্গিল প্রণয়॥"

আবার বলিতেছেন, "তা কৃষ্ণেরই বা দোষ দিব কি? সেত আমার প্রেমাধীন ছিল, আমার দুর্ভাগ্যই তাহাকে উদাসীন করিয়াছে।" ইহাই বলিতে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন "হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ! আমার যে প্রাণ যায়!" বলিয়া হৃদয় উঘাড়িয়া অতি করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। এদিকে সরূপ ও রামরায় নানারূপ আশ্বাসবাক্য বলিয়া, মঙ্গল গীত গাইয়া, প্রভুর মন কিছু সুস্থির করিলেন। এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি গত হইল। তখন সরূপ প্রভুকে লইয়া গম্ভীরাতে শয়ন করাইলেন, এবং আলো নিবাইয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, তাঁহারা বাহিরে আসিলেন। রামানন্দ নিজ বাড়ী গেলেন, আর সরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শুইলেন। প্রভু প্রেমাবেশে গরগর হইয়া আছেন, তাঁহার নিদ্রা আসিতেছে না। কখন বসিতেছেন, কখন শুইতেছেন, আর কখনও মৃদুস্বরে নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন। ভাবের আবেশে মধ্যে মধ্যে গলার স্বর বাহির হইয়া পড়িতেছে, আর স্বরূপ বাহির হইতে ভর্ৎসনার স্বরে বলিতেছেন, "প্রভু, এখন

শোও নাই? তোমার আর কি? কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, একটু-না ঘুমাইয়া বাঁচি কি করে?" প্রভু কাতরস্বরে বলিলেন, "এই শুইতেছি।" ইহাই বলিয়া চুপ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

সরূপ ও গোবিন্দের ঘুম আসিয়াছে, হঠাৎ তাঁহাদের কাণে গোঁ গোঁ শব্দ গেল। সরূপ তাড়াতাড়ি উঠিলেন ও আলো জ্বালিয়া ঘরে গেলেন। গোবিন্দও উঠিয়া সরূপের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গেলেন। যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। দেখেন, প্রভু এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখ নাক দেয়ালের ঘর্ষণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, আর রক্ত পড়িতেছে। উভয়ে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় আনিয়া শোয়াইলেন। তখন স্বরূপ কতক কষ্টে, কতক ক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি করে করিলে?" প্রভু অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে বলিতে লাগিলেন, "দেখ স্বরূপ, মনের উদ্বেগে ঘরে মন তিষ্ঠাইতেছিল না, তাই উঠিয়া দ্বার খুঁজিতেছিলাম। কিন্তু অন্ধকারে ঘরের দোর ঠিক করিতে পারিলাম না, আর মুখে দেয়ালের ঘর্ষণ লাগিয়াছে।"

সরূপ আর কিছু বলিলেন না। তাঁহার বড় ভাবনার উদয় হইল। প্রভু গম্ভীরার ভিতর একা শুইয়া থাকেন, কাহাকেও কাছে থাকিতে দেন না। কিন্তু কি করিয়া আর তাঁহাকে এ ভাবে রাখা যায়? প্রভু আজ যাহা করিলেন, আর কোন দিনও ত এরূপ করিতে পারেন? কি জানি, যদি দোর খুলিয়া বাহিরেই চলিয়া যান! সরূপ ও গোবিন্দ সে রাত্রে আর নিদ্রা গেলেন না, ভাবনায় চিন্তায় ও প্রভুর সেবাশুশ্রূষায় রাত্রি কাটাইলেন। সকালে উঠিয়া সরূপ ভক্তদিগকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, প্রভুকে সাধ্যসাধনা করিয়া যাহাতে গম্ভীরার মধ্যে একজন থাকিতে পারে তাহার বন্দেজ করা। তখন সকলে যাইয়া প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। গত রাত্রের ঘটনায় প্রভু লজ্জিতও ছিলেন, কাজেই ভক্তদিগের কথা ফেলিতে পারিলেন না, অগত্যা স্বীকার হইলেন। তখন সকলে সাব্যস্ত করিলেন যে, শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর কাছে থাকিবেন।

সেই দিন হইতে শঙ্কর, প্রভুর নিকট রাত্রে থাকিবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু শঙ্কর এমন সুযোগ কেন ছাড়িবেন? শঙ্কর ভাবিতেছেন, "প্রভু যখন আমার প্রতি এতদূর কৃপা করিয়াছেন, তখন যাহাতে তাঁহার পদসেবায় অধিকারী হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব।" শেষে সাহসে ভর

করিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু, আমি কীটানুকীট, অধম পামর, তবে তুমি পতিতপাবন কাঙ্গালের ঠাকুর, সেই আমার ভরসা। যদি তুমি অভয় দাও, তবে আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে একটী নিবেদন করি।" শঙ্কর ইহাই বলিয়া চুপ করিলেন, আর বলিতে সাহস হইল না। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "শঙ্কর, চুপ করিলে কেন? কি বলিতেছিলে বল, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।" তখন শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমার চিরদিনের সাধ একবার প্রাণভরিয়া তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ দুখানি সেবা করিব। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র জীব, তাই সাহস করিয়া এতদিন বলিতে পারি নাই, মনের কথা মনেই ছিল। আজ আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তুমি অভয় দিয়াছ, তাই আজি বলিলাম। এখন কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনাটী রাখিতে হইবে।" ইহাই বলিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন, নয়ন বাহিয়া দরদরিত ধারা পড়িতে লাগিল। ভক্তবৎসল কি করিয়া ভক্তের দুঃখ দেখিবেন? প্রভুর কোমল হৃদয় বিগলিত হইল, চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, প্রভু শঙ্করের কথায় স্বীকার হইলেন।

আজ শঙ্করের আনন্দের সীমা নাই। আজ তিনি প্রাণভরিয়া প্রভুর পাদপদ্ম সেবা করিবেন, এই কথা মনে উদয় হওয়ায় তাঁহার আনন্দ আর ধরিতেছে না। প্রভু শয়ন করিয়াছেন, শঙ্কর প্রভুর পদতলে বসিলেন, আস্তে আস্তে প্রভুর রাঙ্গা পদ দুখানি লইয়া আপন ক্রোড়ে রাখিলেন, আর ধীরে ধীরে কোমল পদতলে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। প্রভু নাম জপ করিতেছিলেন, চুপ করিলেন। শঙ্কর ভাবিলেন প্রভু ঘুমাইয়াছেন। তখন শঙ্কর, পাছে প্রভুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাই ভয়ে ভয়ে, আস্তে আস্তে, প্রভুর চরণ দুখানি ক্রোড়ে রাখিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিলেন, শুইয়াই পাদসেবা করিবেন। কিন্তু তাঁহার তন্দ্রা আসিল, ও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

মাঘ মাসের নিশা। দারুণ শীত। শঙ্কর এই শীতে বস্ত্রহীন গাত্রে শয়ন করিয়া আছেন। কিন্তু তিনি যে সুখসাগরে ভাসিতেছেন, তাহাতে শীতে তাঁহার কি করিবে? কিন্তু যেমন ভক্ত, তেমনি ভগবান; তিনি কি করিয়া তাঁহার এমন ভক্তের দুঃখ সহিবেন? তাই আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া আপনার গায়ের কাঁথাখানি লইয়া শঙ্করের সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিলেন, দিয়া আবার শয়ন করিলেন। হঠাৎ শঙ্করের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, আপন গাত্রে

কাঁথা ও প্রভুকে শুধু গায়ে দেখিয়া সব বুঝিতে পারিলেন। শঙ্কর লজ্জায় মরিয়া গেলেন, ঘৃণায় আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কষ্টে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপার অবধি নাই দেখিয়া হৃদয় ভক্তিরসে ভরিয়া গেল। তখন কাঁথাখানি আস্তে আস্তে আবার প্রভুর গায়ে দিয়া, আবার প্রভুর পা দুখানি ধীরে ধীরে আপন কোলে রাখিয়া, বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। সেই হইতে ভক্তেরা আহ্লাদ করিয়া শঙ্কর পণ্ডিতকে 'প্রভুর পাদোপধান" বলিয়া ডাকিতেন।

হে গৌরসুন্দর! কবে তোমার অধম জীব শঙ্করের ন্যায় ভাগ্য পাইবে, কবে আপনাকে 'প্রভুর পাদোপধান' বলিয়া কৃতার্থ হইবে! এ পতিত জনার ভাগ্যে কি সে শুভদিন উদয় হইবে!!

অলৌকিক ঘটনা।

আমেরিকার মধ্যে কলিফর্ণিয়া নামক একটী প্রদেশ আছে। এই প্রদেশে সানোটা মালিকা গ্রামে এক পর্ণকুটীরে উইলিয়ম গ্রাহাম নামক জনৈক যুবা বাস করে। সংসারে একমাত্র যুবতী স্ত্রী ভিন্ন গ্রাহামের আর কেহই নাই। দম্পতি-যুগল পরমসুখে কালাতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু রসিকশেখরের তাহাদের লইয়া একটু রঙ্গ করিবার ইচ্ছা হইল,—এই সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। কারণ যুবকটীর হঠাৎ কাশরোগের সৃষ্টি হইল, রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং দুই মাসের মধ্যে সে এত পীড়িত হইয়া পড়িল যে, তাহার জীবনের আশা আর রহিল না।

একদিন রোগীর অবস্থা অতি খারাপ হইয়া পড়িল। পতিপ্রাণা রমণী স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছে, আর চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ফুটিয়া কাঁদিতে পারিতেছে না, পাছে স্বামীর কষ্ট হয়। প্রতিবাসীগণ বিমর্ষচিত্তে রোগীর চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। ক্রমে কণ্ঠশ্বাস হইল, নয়নতারা ঊর্দ্ধে উঠিল, দেখিতে দেখিতে রোগী যেন অনন্তকালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িল। রমণী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন সকলে আসিয়া তাহাকে ধরিল, এবং জোর করিয়া অন্য ঘরে

লইয়া গেল। এদিকে মৃতদেহ সমাধি দিবার আয়োজন করা হইতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। রমণী চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। সে বুঝিতেছে যে, এখনই তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্বধনকে কোথায় লইয়া যাইবে, ইহকালে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না। তাই হঠাৎ, "আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও" বলিয়া হৃদ-বিদারক স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সেই মৃতদেহের উপর যাইয়া পতিত হইল; আর, অতি করুণস্বরে, দৃঢ়তার সহিত, স্বামীকে ডাকিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? সুতরাং কেহই আর রমণীকে বাধা দিলেন না, সকলেই সাশ্রুলোচনে নির্ব্বাক হইয়া এই পাষাণবিগলিতকর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। রসিকশেখর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রমণীর ক্রন্দন তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, তিনি সতীকে আশাতীত ফল দিলেন।

হঠাৎ সকলের বোধ হইল, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছে। রমণীও তাহা বেশ অনুভব করিল। তখন সকলে মিলিয়া সেই দেহের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মৃতদেহ সজীব হইল, নড়িয়া উঠিল, চক্ষু মেলিল, এবং শেষে অতি ক্ষীণস্বরে কথা বলিল। যুবক এখন সুন্দর রূপে আরাম হইয়াছে, এবং দম্পতিদ্বয় আবার পরমসুখে সেই পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেছে।

ঘটনাটী অলৌকিক, সুতরাং হঠাৎ বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে। কিন্তু ডাক্তার ওসমান নামক আমেরিকার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক এই ঘটনাটী অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠাইয়াছেন। ওসমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, সেই সময় যাহারা উপস্থিতছিলেন, তাঁহার মধ্যে কৃতবিদ্য লোকও ছিল, এবং তিনি তাঁহাদের মুখেই শুনিয়াছেন যে, তাঁহারা বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যুবকটীর দেহে জীবনের কোন চিহ্নই ছিল না। যুবকটী নিজে পুনর্জীবিত হইয়াই ব্যক্ত করিয়াছিল যে, সে কোন দেশে চলিয়া গিয়াছিল, সে স্থান বর্ণনাতীত, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে সে সেই স্থান। সেখানে সব আনন্দময় দিবানিশি মধুর সঙ্গীত হইতেছে, আর সে স্থানের লোকগুলি জ্যোতির্ম্ময়।

আত্মার পরকায়া প্রবেশ।

দেহ হইতে আত্মা যে একটি পৃথক বস্তু, দেহাত্মবাদী ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু আত্মার অভাবে দেহের প্রতিষ্ঠা কোথায়? দেহাত্মবাদ অতি হেয় ও অগ্রাহ্য।

মৃত্যুই আত্মা ও দেহের স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে, কত যত্ন কত আদর করিতে; যাহাকে দেখিলে, যাহার কথা শুনিলে, প্রাণ পুলকিত হইত; তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। অন্ত্যেষ্টি হয় নাই, সেই সুশোভন দেহ রহিয়াছে, সেই মুখপদ্ম সেই নাসিকা চক্ষুঃ সকলই দেখিতে পাইতেছ, কিন্তু তথাপি তোমার প্রাণে সুখ নাই—শান্তি নাই; কেন না তুমি জানিতেছ, তোমার প্রিয়বস্তু চলিয়া গিয়াছে—তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে শক্তি এই দেহযন্ত্রকে চালাইত, তাহা চলিয়া গিয়াছে। দেহ এখন হিমবৎ শীতল; যাহার প্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উত্তপ্ত-শোণিত বহিত, সে এখন চলিয়া গিয়াছে। জীবন নাই, কিন্তু কায়া আছে; আত্মা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহ রহিয়াছে।

আত্মা দেহ নহে—দেহের পরিচালক ও রক্ষক। দেহ গৃহ—আত্মা গৃহী। গৃহস্বামী গৃহ নহে, কিন্তু দেহেরই প্রকাশক। গীতা বলেন—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ১৩।৩২ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩।৩৩ ॥ (১)

এ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা আদি হইতেই বিদ্যমান; নূতনের প্রতিষ্ঠা সৃষ্টিরাজ্যে নাই। যে পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিতে এই সুবিশাল জগৎ প্রত্যক্ষমান, তাহাও আর নূতন সৃষ্টি হইতেছে না। সৃষ্টিরাজ্যে কিছুরই চিরবিনাশ নাই; জ্ঞানময় স্রষ্টা ছেলেখেলা করেন না, গড়িয়া

---

(১) অর্থাৎ—ঘটে আকাশ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা যেমন ঘট নহে, আকাশ নির্লিপ্ত; দেহাবস্থিত আত্মাও তদ্রূপ দেহ নহে, নির্লিপ্ত ও পৃথক।

সূর্য্য যেমন জগৎ প্রকাশক, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাও সেইরূপ ক্ষেত্রের (দেহের) প্রকাশক।

ভাজেন না। অতএব জড়দেহের রূপান্তর ঘটে মাত্র, নিঃশেষ ধ্বংশ হয় না।

জড় অজড় যাহা আছে, তাহার অভাব কখনও ছিল না। আদি-তেও তাহা ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। যাহা এখন নাই, তাহা কস্মিন্‌কালেও ছিল না, এবং থাকিবেও না। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র একযোগে একথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছে অত-এব দেহ ভিন্ন আত্মার স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে হইবে; এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা ক্ষয়োদয় রহিত। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "অর্জ্জুন! ইহার পূর্ব্বে যে আমি তুমি বা এই রাজন্যগণ ছিলেন না, তাহা নহে; বস্তুতঃ আমরা সকলেই ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতে থাকিব।" (১)

জড়ের রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। আত্মা নিত্য—ক্ষয়োদয় রহিত, আত্মার রূপান্তর নাই। আত্মার নিত্যত্ব গীতায় কথিত হইয়াছে, যথা—

"অবিনাশীতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ২। ১৭॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত॥ ২। ১৮॥" (২)

অতএব মৃত্যু ধ্বংস নহে। কেননা, আত্মা নিত্য; শরীর নাশে ইহার হানি কিছুই নাই। (৩)

এই নিত্য-আত্মা দেহ অবলম্বনে এ জড়জগতে বিচরণ করেন। জড়দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা যথায় গমন ও অবস্থিতি করেন, তাহা-কেই পরলোক বা আধ্যাত্মিক জগৎ (spirit world) বলা হয়। জড়-দেহের মধ্যে যেমন অজড় আত্মা, জড়-জগতের অভ্যন্তরে তেমনি আধ্যাত্মিক জগৎ উহাই সত্য, জড়-জগৎ উহার ছায়া মাত্র। একটি

---

(১) নত্বেবাহং জাতুনাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ গীতা—২। ১২॥

(২) অর্থাৎ যে আত্মা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, কেহই সে অব্যয় আত্মার বিনাশে সমর্থ নহে। সেই আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়, এই অনিত্য দেহ তাহার; তত্ত্বদর্শিগণ ইহাই বলেন।

(৩) অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গীতা—২। ২০।

প্রাণ, অপরটি দেহ। মৃত্যুর পর আত্মা এই পরলোকেই বাস করেন।

মৃত্যু, দেহ পরিবর্ত্তন মাত্র। যেমন দেহী জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নববসন পরিধান করেন, মৃত্যু দ্বারা তদ্রূপই অবস্থান্তর ঘটে।

জলৌকা যেমন এক তৃণ হইতে তৃণান্তর অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে, মৃত্যুকালে জীব তদ্রূপই দেহান্তরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে।

"সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ" এই শ্রুতিবচন অনুসারে জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। কেশাগ্র শতভাগের শতাংশৈক ভাগাপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া (অণুত্বে) পরিকল্পিত হয়। বস্তুতঃ মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহধারী জীব অতি সূক্ষ্ম।

এই লিঙ্গ-শরীরী জীব (আত্মা) ইচ্ছানুসারে এই জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ। যথা :—

"কামতো বিচরিষ্যধ্বং ফলদাঃ সর্ব্বজন্তুষু।" ইতি বরাহ পুরাণ।

মনোময় শরীর স্থূল-দেহের ন্যায় জড়পদার্থ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং লিঙ্গ-শরীরী সর্ব্বত্র স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারেন, সংশয় কি? এই জন্যই বায়ু পুরাণে লিখিত আছে যে, আত্মা পর্ব্বকালে ইচ্ছা পূর্ব্বক এ মর্ত্তলোকে আগমন করিয়া থাকেন। যথাঃ—

"অমাবস্যা দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণানৃণান্॥"—বায়ু পুরাণ।

আত্মা মনোময় শরীর সর্ব্বত্র পরিচালন করিতে পারেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগবলে অনেক মহাত্মাই এরূপ (স্থূল-দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন করা) শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন; অর্থাৎ দেহে জীবিত থাকিয়াও আত্মা অন্যত্র গমনে সমর্থ হয়, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যোগবলে স্ব দেহ হইতে অন্য দেহে গমন ও পুনরাগমন করিয়াছিলেন, এ কথা প্রসিদ্ধ আছে। পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর যোগ প্রসঙ্গ এ বিজ্ঞানালোকিত উনবিংশ শতাব্দির সুধি-বর্গকেও চমকিত করিয়াছে।

নিষ্কামত্বই বাসনাক্ষয়ের এবং বাসনাই আত্মা পরিচালনের হেতু; হিন্দুশাস্ত্র একথা বলেন। বাসনাবিহীন কর্ম্মগ্রন্থিশূন্য আত্মাই মুক্ত। বাসনা ও কর্ম্মই জন্মাদির হেতু। যদি আত্মার এ জগতে বাসনা থাকিয়া যায়, তবে সেই বাসনা পরিপূরণার্থে (জন্ম না হইলেও) আত্মা কখন কখন এ মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু জড়দেহ ব্যতীত জড়-বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না; কাজেই জড়দেহের আশ্রয় না লইলে

(এরূপ স্থলে) আত্মার আগমন ব্যর্থ হইয়া যায় ; এজন্যই আগন্তুক অশরীরী আত্মা জীবন্ত জড়দেহের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে যত্ন করেন। ইহাকেই সাধারণতঃ "ভূতে পাওয়া" বলে।

অশরীরী বা মৃত ব্যক্তির আত্মা ইচ্ছা করিলেই এরূপ জীবদেহ আশ্রয় করিতে পারে না, (এইরূপ মৃত আত্মা অন্য জীবিত আত্মার অধিকৃত গৃহে অর্থাৎ দেহে অনধিকার প্রবেশ করিতে হইলে) ইহাতে শক্তির প্রয়োজন ; দেহস্থিত আত্মাকে পরাভূত না করিতে পারিলে, অশরীরী আত্মা সহজে অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারেন না।

এইরূপে কাহারও দেহে কোন অশরীরী আত্মা প্রবিষ্ট হইলে, দেহস্থিত আত্মা নিষ্প্রভ ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া থাকে ; আগন্তুক আত্মা তখন সেই দেহের সাহায্যে আপনার অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করিয়া লয়।

গৃহে সামান্য মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে ; সেই গৃহে যদি (মৃৎপ্রদীপ থাকা সত্ত্বেও) গ্যাসালোক জ্বালান যায়, তবে সেই পূর্ব্বকার মৃৎপ্রদীপ যেমন নিষ্প্রভ বোধ হয়—সেই মৃৎপ্রদীপ তখন যেমন কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কোন অশরীরী ক্ষমতাপন্ন আত্মা জীবিত দেহে প্রবিষ্ট হইলে সেই দেহাধিকারী আত্মার ঐরূপই অবস্থা ঘটে।

অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর আলোক ভিন্ন পূর্ব্ব প্রজ্জ্বলিত মৃৎপ্রদীপ নিষ্প্রভ হইবে না। নিষ্প্রভ করিতে বা তৎস্থান অধিকার করিতে হইলেই নবনীত-আলোকের পূর্ব্ব প্রদীপকে পরাভূত করা আবশ্যক; শক্তি অধিক থাকা প্রয়োজন। এই জন্যই দেহাধিকারী হইতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আত্মারই আবির্ভাব জীবদেহে ঘটে। (১) একন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাদিগকে 'ভূতে প্রাপ্ত' হইয়াছে, তাহাদিগকে "তুমি কে" জিজ্ঞাসা করিলে; সেই আগন্তুক আত্মা দেহাধিকারীর নাম না বলিয়া অন্য নামে (অর্থাৎ যাহার আত্মা আসিয়াছে সেই নামে) আপন পরিচয়

---

(১) শক্তিশালী না হইলেও জীবদেহে আত্মার আবির্ভাব হইতে পারে, এরূপ স্থলে আত্মার আবির্ভাব উপলব্ধি হয় না, সুতরাং সেরূপ স্থলে আবির্ভাব হওয়া না হওয়া সমান।

সাধন বলে জীবিত ব্যক্তি আপন আত্মা দেহ হইতে পৃথক করিয়া অন্য জীবিত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, এরূপ স্থলেও পূর্ব্ববৎ আগন্তুক আত্মার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। উদাহরণ স্থলে, বিদুরের যুধিষ্ঠির দেহে প্রবেশের কথা বলা যাইতে পারে।

প্রদান করেন। সে আত্মা যতক্ষণ দেহে থাকেন, দেহাধিকারীর আপন বলিতে তখন কিছুই থাকে না।

সাধনবলে এইরূপ অশরীরী আত্মাকে দেহে আনয়ন করা যায়, কখন বা আত্মা আপনা আপনি আসেন। যাহার দেহে আসেন বা আনয়ন করা হয়, তাহাকে "মিডিয়াম" বলে; আর এইরূপ সাধন প্রক্রিয়াকে "স্পিরিচুয়াল সার্কেল" করা বলা হয়। আত্মা আপনা আপনি অপর দেহ অধিকার করিতে হইলে শক্তির আবশ্যক, পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহাদের মানসিক বিরোধ-শক্তি অল্প, তাহারাই বেশী "মিডিয়ম" হন, অর্থাৎ অশরীরী আত্মা তাহাদের দেহে সহজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বা আবির্ভূত হইতে পারেন। স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তি অল্প বলিয়াই তাহাদিগকে "মিডিয়ম" হইতে বা "ভূতে পাইতে" বেশী দেখা যায়। ফরাসী দেশের সুবিখ্যাতা রমণী জোয়ান অব আর্কের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আর একটি দৃষ্টান্ত হেরিসন্ সাহেবের গ্রন্থ (১) হইতে উদ্ধৃত করিব :—

"২নং ভারনন্‌প্লেস, ব্লুমস্‌বেরিতে লুমিস নাম্নী রমণী বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার দেহে কোন আত্মার আবির্ভাব হয় এবং তখন তিনি সমস্ত দেখিতে ও জানিতে পারেন। একদা আমি আত্মা আনয়ন করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি চান?' আমি বলিলাম, 'প্রফেসর গ্রেগরি সাহেবের (২) বিধবা পত্নী লণ্ডনের গ্রীন ষ্ট্রীটের ২১নং বাটীতে বাস করেন। আপনি তাঁহার কাছে গিয়া এরূপ কোন কার্য্য করুন; যাহাতে আপনার গমন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না থাকে।' এই কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি আসিয়াছি, আমি গ্রেগরি পত্নীর হাত মোচড়াইয়া দিয়া আসিয়াছি; তিনি হাতে বেদনা পাইয়া সে কথা তাঁহার বন্ধুকে বলিতেছেন।' আমি ঘড়িতে সময় ঠিক রাখিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রেগরিপত্নীর নিকট গমন করিলে, তিনি হাতে বেদনা পাওয়ার কথা স্বীকার করিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া লুমিসের বৃত্তান্ত তাঁহার কাছে বলিলাম

(১) W. H. Harison সাহেবের "Spirits before our eyes" নামক গ্রন্থ।

(২) Professor Gregory of Edinburgh University. Author of the 'Lord of the Isles."

অপর একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। আমাদের গ্রামে কমল নামে এক ব্যক্তি আছে; ইহার স্ত্রীর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। ৮।৯ মাস পূর্ব্বে কমলের স্ত্রী হিষ্টিরিয়া ব্যাধিতে ভুগিতেছিল। কিছুকাল পরে স্ত্রীলোকটির ব্যাধি হঠাৎ অপসারিত হয়। ব্যাধি দূর হইল বটে, কিন্তু আর একটী উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল; আহার করিতে বসিলেই সে বমি করিয়া ফেলিত। ফলত সেই হইতে আহার পরিত্যাগ করিল। ইহাতে সেই পরিবারবর্গের মনে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হয়, বলা বাহুল্য। স্ত্রীলোকটী অন্নাহার ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু কোথা হইতে দুগ্ধ আসিতে লাগিল, কখন কখন স্ত্রীলোকটি ইহাই মাত্র পান করিত। এই স্ত্রীলোককে কোন ভবিষ্যৎ বিষয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর উত্তর পাওয়া যাইত; সে উত্তরগুলি পরে সফল হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার দেহে কোন আত্মার আগমন হয়, সন্দেহ নাই। 'তুমি কে?" জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে "আমি গন্ধর্ব্ব।" জিজ্ঞাসা করিলেই সে গন্ধর্ব্ব-নারী বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করে। কমলের প্রতি তাহার পতিভাব। এইরূপে ঐ স্ত্রীলোকটি কর্ত্তৃক অতি অদ্ভুত ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি, একদা ইহার শূন্য হস্ত-মুষ্টিতে পানের খিলি ও টাটকা সন্দেস পাওয়া গিয়াছিল। খিলি ও সন্দেশ সম্বন্ধে কৌতুকজনক কথা আছে। তাহা পরে পাঠককে জানাইব।

স্ত্রীলোকটী পাঁচ মাস অন্ন স্পর্শ করে নাই। পাঁচ মাস পরে, অল্প কতক দিবস হইল, অন্নাহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; দুগ্ধও আর পাওয়া যাইতেছে না। তবে এখনও মধ্যে মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকের দেহে অতি অল্প সময়ের জন্য "গন্ধর্ব্ব" বা আত্মার আবির্ভাব ঘটে। আত্মার আবির্ভাব কালে স্ত্রীলোকটি শুইয়া থাকে। শুনিয়াছি, প্রথম প্রথম মূর্চ্ছাগ্রস্তের ন্যায় হইত। ইহাকে অন্য কোন আত্মা আনয়ন করিতে বলিলে সে (গন্ধর্ব্ব) কৃতকার্য্য হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত দর্শকের অনুরোধে এইরূপ কোন রমণীর আত্মাকে আনয়ন করা হয়। দর্শকের এই অভীপ্সিত আত্মা জীবিত দেহে বর্ত্তমান থাকিতে যে স্বরে যে ভঙ্গীতে কথাবার্ত্তা কহিতেন, ঐ সময় কমলের স্ত্রীর মুখে সেই স্বরে সেই রূপই কথা বাহির হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে কমলের স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত রমণীকে জীবিতাবস্থায় দেখে নাই বা কখনও তাঁহার কথা শুনে নাই।

এই যে ঘটনার উল্লেখ করা গেল, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

একথা বস্তুতঃ ভিত্তিবিহীন নহে যে, পরদেহে আত্মার আবির্ভাব ঘটে। পূর্ব্বোক্ত বালিকা-দেহে গন্ধর্ব্বনাম্নীর আবির্ভাব বিষয়ে সংশয় করিবার কারণ নাই। উপযুক্ত দেহ পাইলে দেবগণও নরদেহে আবির্ভূত হইতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুর মধুময় লীলা আলোচনা করিলেও আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। গৌরপার্ষদ মুরারি গুপ্তের দেহে হনুমান আসিলেন, আর মুরারি অনুমাত্র ভীত না হইয়া, জগাই মাধাই—যাহাদের ভয়ে নদীয়া থর থর কাঁপিত, সেই মহাবলশালী দুই ভ্রাতাকে বালকের ন্যায় কক্ষে করিয়া প্রভুর নিকট আনিলেন। এ কথার অর্থ আর কিছু নহে, ইহা এই পরকায়া প্রবেশ প্রক্রিয়ারই সুন্দর উদাহরণ।

ভক্ত পাঠক, শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলাভিনয়ের কথা স্মরণ করুন, দেখিবেন—কৃত্রিমতা ঘুচিয়া গিয়া অভিনয়কারীদের দেহে প্রকৃতই অভীপ্সিত মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

সেই অভিনয় ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ জরতীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; কেবল রূপ ধারণ নহে, সেই স্থলে নিতাইয়ের দেহে প্রকৃতই যোগমায়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ স্থলে পদকর্ত্তা প্রেমদাস লিখিয়াছেন—

> বৃদ্ধাবেশ ধরি সত্য যোগমায়া আইলা।
> নিত্যানন্দ নহে ইহোঁ জরতীর খেলা॥
> ভগবান্ যোগমায়া পাঠাইয়া দিলা।
> যোগমায়া নিত্যানন্দ দেহে প্রবেশিলা॥" ইত্যাদি।

এইরূপে ভক্ত-দেহে ব্রজের পরিকরগণ প্রবেশ করিয়াছেন। বৃন্দাবন লীলা হইতেছে, দর্শকগণ যথার্থই ব্রজপরিকরদিগকে দেখিতে পাইতেছেন; কিন্তু যে নিগূঢ় লীলা সর্ব্বসাধারণের দর্শন যোগ্য নহে, সেই লীলা আরম্ভ হইতেই, যাঁহার দেহে যিনি প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, হঠাৎ তিনি চলিয়া গেলেন। তখন অভিনেতৃগণ আপনাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন; অভিনয় সেই স্থলেই শেষ হইল। যথা প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

> "কোপাবিষ্ট হৈয়া বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়িয়া
> অন্তর্দ্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে লৈয়া॥
> নিজ রূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।

নৃত্য করে সভা মাঝে পাইয়া আনন্দ॥
মৈত্রী বলে দেবীবৃন্দ কোন দিকে গেলা।
নিত্যানন্দ অকস্মাৎ কোথা হৈতে আইলা॥
প্রেমভক্তি বলে যোগমায়ার প্রভাব।
নিত্যানন্দে তিঁহো করি ছিলা আবির্ভাব॥
তিঁহো গেলা এবে নিত্যানন্দ স্বরূপ থাকিলা।
সহজ যে ভাব তাই উদয় করিলা॥
যৈছে জল, সুশীতল স্বভাব তাহার।
অগ্নি তাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার॥
অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ।
এই মত যোগমায়া ছাড়ে নিত্যানন্দ॥
অতএব এই নৃত্য (অর্থাৎ নিতাইর নৃত্য) রহিল এখন।
ঈশ্বরের লীলা এই—নাট (নাটকাভিনয়) নহে যেন॥"

কেবল এই নাট্য বলিয়া নহে, সমস্ত গৌরলীলাই এই আবির্ভাব তত্ত্বের উপর স্থাপিত। বৈষ্ণব গ্রন্থে এই পরদেহ প্রবেশ 'আবেশ" সংজ্ঞায় জ্ঞাপিত হইয়াছে।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ।" শ্রীপ্রভুর নাট্যলীলার কথা বলিয়াছি, ইহার পর প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব এই স্থলেই উপসংহার করা গেল।

এই প্রস্তাবটিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, মৃত্যু হইলেই আত্মার ধ্বংশ হয় না, এবং পরলোকে আত্মা অবস্থিতি করেন। এ জগতে আত্মা কখন বা আপনি ও কখন বা আহ্বান করিলে আগমন করেন। ইহাদ্বারা সুতরাং একথাও হইতেছে যে, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী শ্রাদ্ধাদিতে অভীপ্সিত আত্মা মনোময় শরীরে আগমন করিতে পারেন এবং আত্মার সন্তোষার্থ কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব সেবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা আত্মার পক্ষে সুফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক। শ্রীবৈষ্ণব দাসস্য।

গ্রাহক গণের প্রতি।

যাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার মূল্য বাকি আছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। এ সম্বন্ধে আর যেন তাঁহাদিগকে না লিখিতে হয়।

চরণ-সুধা।

গৌর চরণে, শরণ লইনু, গৌর দয়াল অতি।
জীবনে মরণে, গৌর আমার, সদয় পতিত প্রতি॥
গোরা প্রেম-নদী, তটিনীব মত, নীচ পানে সদা ধায়।
তরঙ্গ তুফানে, প্রেম ছড়াইয়া, জগত ভাসায়ে যায়॥
এ মরুর মাঝে, কৃপা সুধাধার, বহে যদি একবার।
ত্রিতাপের তাপে, পাপের শাসনে, কিসের ভাবনা আর॥
গৌরাঙ্গ বলিয়ে, ডুবিব উঠিব, ভাসিয়া যাইব সুখে।
গৌরাঙ্গ বলিয়ে, হাসিব কাঁদিব, আর কি করিবে দুঃখে॥
শয়নে স্বপনে, গৌরাঙ্গ ভাবিব, গৌরাঙ্গ করিব সার।
ও মধুর রূপ, নয়নে হেরিব, ঘুমঘোরে শতবার॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ বলি, কাঁদিব উঠিলে জাগি।
আকুল পরাণে, পাগলের মত, ধাইব গৌরাঙ্গ লাগি॥
হেন শুভদিন, কবে বা হইবে, মরুতে বহিবে নদী।
সেবারাম কহে, কিবা অসম্ভব, ঘটে তাঁর কৃপা যদি॥

সেবারাম—রসিকমোহন।

শ্রীগৌরাবতারের পূর্ব্বাভাস।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার ভাব-কান্তি লইয়া গৌরবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক কলিযুগে অবতীর্ণ হইবেন, জীবের দুঃখ মোচন করিয়া অনর্পিত-চরী রাধার প্রেম-সম্পত্তি জগতে যাচিয়া দিবেন, ইহার পূর্ব্বাভাস শ্রীবৃন্দাবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। একদিন কথাচ্ছলে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—পুরুষ চঞ্চলচিত্ত, এইজন্য নারীগণের ন্যায় রহস্য-লীলা-জনিত সুখাদি অনুভব করিতে অসমর্থ। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "রাধে! আমি কোন এক মূর্ত্তি দ্বারা তোমার মনোগত ভাব সর্ব্বদাই অনুভব

করিয়া থাকি।" শ্রীরাধা এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "রাধে! আমি সত্যই বলিতেছি, আমা কর্ত্তৃক তুমি যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাক, তাহা আমিও আস্বাদন করিয়া থাকি। তবে তাহা আমার এই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা নহে। যে মূর্ত্তি দ্বারা আমি তোমার রসভাব আস্বাদন করি, তাহা তোমাকে কোন এক দিন দেখাইব।"

ইহার পরে অন্য এক দিন শ্রীমতী রাধিকা নিত্যরাসলীলার অবসান কালে নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, সুখনিশি অবসান প্রায়, শ্রীমতী এই সময়ে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া চকিতের ন্যায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মুখে প্রাণনাথকে দেখিয় বলিতে লাগিলেন—

প্রিয় স্বপ্নে দৃষ্টা সরিদিনসুতে বাত্র পুলিনং
যথা বৃন্দারণ্যে নটন পটব স্তত্র বহবঃ।
মৃদঙ্গাদ্যং বাদ্যং বিবিধমিহ কশ্চিদ্দ্বিজমণিঃ
স বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গঃ ক্ষিপতি জগতীং প্রেম জলধৌ॥

চক্রবর্ত্তিমহাশয় কৃত স্বপ্নবিলাসামৃত।

"হে প্রিয়! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, কোথায় যেন এই যমুনার ন্যায় নদী; অর্থাৎ যমুনা যেমন বৃন্দাবন বেষ্টন করিয়া আছে, সেইরূপ সে স্থানও কোন একটী নদী কর্ত্তৃক বেষ্টিত; এখানে যেমন জলসান্নিধ্যে বালুকাময় ভূমি, সেখানেও এইরূপ বালুকাময় নদীতীর; এখানে যেমন বহুজন নৃত্যপটু, সেখানেও তেমনি বহুজন নৃত্যবিশারদ; এখানে যেমন রাস লীলায় মৃদঙ্গাদি বহুবিধ বাদ্য বাজিয়া থাকে, সেখানেও তেমনি মৃদঙ্গ করতালাদি বহুবিধ বাদ্য বাজিতেছে। এইরূপ শ্রীবৃন্দাবন লীলার সহিত সকলেরই সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ের একতা দেখিতে পাইলাম না। এখানে রাসলীলার বাদ্যাদির মধ্যে নবনটবর শ্যামসুন্দর নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ষোড়শ সহস্র গোপী প্রেমোন্মত্তা হইয়া নৃত্য করিয়াছিল, সেখানে কিন্তু তাহার বিপরীত দর্শন করিলাম; অর্থাৎ সেখানে নৃত্যের নায়ক বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণ একটী পুরুষ, আর কতকগুলি পুরুষই তাহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে, এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডকেই প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিতেছে।

আরও বলিলেন,—

> কদাচিৎ কৃষ্ণেতি প্রলপতিরুদন্ কর্হিচিদসৌ
> কঃ রাধে হা হেতি শ্বসতি পততি প্রোজ্ঝতি ধৃতিন্।
> নটত্যুল্লাসেন কচিদপিগণৈঃ স্বৈপ্রণয়িভি
> স্তৃণাদি ব্রহ্মান্তাং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ॥

"সেই গৌরাঙ্গ-পুরুষটী কখনও রোদনপূর্ব্বক 'হে কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিয়া প্রলাপ, কখনও 'হা হা রাধে তুমি কোথায় আছ' বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে পতিত এবং ধৈর্য্যশূন্য হইতেছে। কখনও বা আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছে, কখনও বা নিজপরিকর-জনগণসহ প্রলাপাদি—দীর্ঘনিশ্বাস, ভূপতন, অচেতন, নৃত্য ও রোদন করিয়া তৃণাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই জগৎকে অতিশয় রূপে রোদন করাইতেছে।"

এই বিষয়ে কতকগুলি মহাজনী পদও গায়ক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা পদকল্পতরুতে সম্পূর্ণ না থাকা প্রযুক্ত অনেকেই ইহা পাঠে বঞ্চিত আছেন। এজন্য আমরা তাহাও নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের পূর্ব্বাভাস যাহা মহাজনগণ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

> প্রিয়ে দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ কুতুকিনি ময়া দর্শিতচরী
> রমেশাদ্যা মূর্ত্তির্ন খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ।
> কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তব কথং
> তথা ভ্রান্তিং ধত্তে সহি ভবতি কো হন্তকিমিদম্॥

"হে প্রিয়ে, হে কুতুকিনি, তুমি ইহার পূর্ব্বে রমেশাদি (বিষ্ণু) মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমার মন মোহিত হয় নাই। কিন্তু এখন কোন বিপ্র কি প্রকারে তোমার সেই অবিচলিত চিত্তকে মোহিত করিল? ইহা শুনিয়া শ্রীরাধা লজ্জিতা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, রাধে! আমি অন্য কোন্ শরীর দ্বারা তোমার ভাবকে আস্বাদন করি। শ্রীরাধার তাহাই অন্তস্মৃতি পথে উদিত হইল। তখন আনন্দসাগর-মগ্না শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, নাথ! আবার সেই গৌরমূর্ত্তি আমাকে একবার দর্শন করাও, আমি স্বপ্নে

গৌরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-বশ্য, সাক্ষাৎ প্রেমময়ী মূর্ত্তি শ্রীরাধার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। তখন স্বীয় কৌস্তুভমণির * জ্যোতি বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট গৌর-মূর্ত্তি শ্রীমতীকে দর্শন করাইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন।

শ্রীরাধা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব গৌররূপ দর্শন করিয়া মনে মনে স্থির করি-লেন যে, গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ কালে নন্দ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

"তোমার পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ আছে, ইদানীং কৃষ্ণবর্ণ।" তাহা আজি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম, ঋষি বাক্য কখনই মিথ্যা নহে

স্বপ্নবিলাস পদাবলী।

(শ্রীরাধা-উক্তি।)

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিগে সখীগণে, শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্নদেখি, কান্দিয়া কহেন বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলুঁ অকস্মাৎ, এক যুব গৌর বরণ।
কিবা তার রূপ ঠাম, জিনি কত কোটি কাম, রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি, ভাব ভূষা নিরবধি, নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি, মন ধায় তাহারে দেখিয়া॥
নব জলধর রূপ, রসময় রসকূপ, ইহা বই না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন হৈল আচম্বিত, কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত, দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন, (এই)গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনি, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি, বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে বেরি বেরি, হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

---

* কৌস্তুভমণি মধ্যে যে ভগবানের স্বীয় জ্যোতি বিরাজমান, তাহা শ্রীভাগব-তের দ্বাদশস্কন্ধে বর্ণিত আছে।

'কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতি বিভর্ত্ত্যজঃ।'

স্বামিকৃত টীকা—কৌস্তুভস্য ব্যপদেশেন স্বরূপেণ স্বাত্মজ্যোতিঃ শুদ্ধং জীবচৈতন্যং কৌস্তুভস্যৈব বিহিতং বিভূতিং ধত্তে।

(শ্রীকৃষ্ণ-উক্তি।)

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময় কান।
আপনক ভাবে, ভাব প্রকাশিত, ধনি অনুমাপি ভেল জ্ঞান॥
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনে, মোহে করাব হেন রূপ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরীমা, কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি কহব না পাইয়ে ওর॥
ভাবিয়া দেখিলুঁ মনে, তুহারি স্বরূপ বিনে, এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব-কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম-গুরু করি, নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা, জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়, না ভজিলুঁ মুঞি নরাধম॥

(শ্রীরাধা-উক্তি।)

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুঁহু ব্রজজীবন, তুয়া বিনু কৈছন, ব্রজপুর বান্ধব থেহা॥
জল বিনু মীন জনু, ফণী মণি বিনু, তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন, ব্রজপুর গাত তুহুঁ জান॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি, পাওবি কোনহিঁ সুখ।
কিয়ে আনজন তুয়া, মরমহি জানব, ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসই, তুহু বর নাগর কান।
অহর্নিশি তোহারি, দরশ বিনু ঝুরব, তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনাতটে, সখা সঙে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম পরকাশবি, না বুঝয়ে বলরাম দাস॥

(শ্রীকৃষ্ণ-উক্তি।)

শুনহুঁ সুন্দরি মঝু অভিলাষ। ব্রজপুর-প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সবজন মেলি। নদীয়া নগর পয়ে করবহুঁ কেলি॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম। অবিরত বদনে বোলব তুয়া নাম॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব। ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
ব্রজপুরভাবে পুরব মনকাম। অনুভবি জানল দাস বলরাম॥

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী, কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য, সেইরূপ দেখিব হে আমি॥

আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে, অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়াধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে, কাল গৌর হইবে কেমনে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে, দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা, তাথ প্রেমময় সব অঙ্গ।
নিধুবনে এই কয়ে, দুহু তনু এক হয়ে, নদীয়াতে হইলা উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে, প্রেমবন্যায় জগত ভাসায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন, ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ, না হেরিলাম সে সুখতরঙ্গে॥

শ্রী—

উৎকল-ভাষায় গৌর-সঙ্গীত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শত নাম।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তপ্তসুবর্ণ বর্ণ, নিমাই আহি বিশ্বম্ভর!
গৌর নটবর, শচীসুত ঈশ্বর, জগন্নাথমিশ্র কুমার,
হে মহাপ্রভু!!

আহি দ্বিভুজ চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ হে দেবরাজ!
হে হরিনাম-মূর্ত্তি, হে বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি, হে লক্ষ্মীকান্ত মহাভুজ,
হে মহাপ্রভু!

হে মাতৃপিতৃভক্ত, নিজনাম আসক্ত, ভক্তভাবাঙ্গীকৃত হরি!
অমায়ী মায়াধর, হয়গ্রীব শ্রীকর, ভক্তবৎসল পাষণ্ডারি,
হে মহাপ্রভু!!

হে গদাধর-প্রাণনাথ, হে দণ্ডকমণ্ডলু হাত,
হে কপট সন্ন্যাসী, আহি করুণারাশি, মায়ামনুষ্য কর্ম্মকৃত,
হে মহাপ্রভু!!

আহি জগত-গুরু, হে বাঞ্ছাকল্পতরু, আহি রাধাভাবাঙ্গীকারী!
আহি নৃসিংহমূর্ত্তি-ধারী, হুঙ্কারকারী, নবদ্বীপনগর-বিহারী,
হে মহাপ্রভু!!

আহি মেঘগম্ভীরনাদ, বাসুদেবামৃত-প্রদ,
শ্রীবাসসুত শব মুখে জ্ঞান প্রকাশ কৃত নিত্যানন্দনান্দদ,
হে মহাপ্রভু!!

হে দিগ্বিজয়িজয়ী, হে সর্ব্ব গুণগ্রাহী, হে কৃষ্ণ-ভক্ত শিরোমণি!
সর্ব্ব রসাস্বাদন, সর্ব্বাবতার পূর্ণ,-রূপ সর্ব্ব পণ্ডিতাগ্রণী,

হে মহাপ্রভু!!

হে ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল, হে রসিকভক্ত চুকুল,
রমণী হৃদয়াম্ভোরুহ ভানুমণ্ডল, জিতেন্দ্রিয় প্রেম বিহ্বল,

হে মহাপ্রভু!!

পতিত-পাবন হে, স্বভক্ত-জীবন হে, অদ্বৈত-পূজন দেবতা!
সন্ধ্যবতার, সুলক্ষণাঙ্গধর, আহি সর্ব্বজ্ঞ হরিনাম দাতা,

হে মহাপ্রভু!!

রসালস কঞ্জলোচন, পূর্ণাবতার ভগবান।
হে বসরাজ মহাভাব স্বভাবধর, জগদানন্দ প্রেমাধীন,

হে মহাপ্রভু!!

হে রায় রামানন্দ,-আনন্দামৃত কন্দ, চন্দনচর্চ্চিত সুবুদ্ধি!
হে রুদ্রলীলাকারী, গোপালবেশ ধারী, বরাহ-রূপী কৃপাম্বুধি,

হে মহাপ্রভু!!

গৌরাঙ্গ ভুবনপাবন, সুন্দর জগত্রয়-মোহন!
বিশ্বরূপী অনুজ, বিশ্বরূপ যে অজ, সারদারূপ ধৃতমান,

হে মহাপ্রভু!!

দামোদর পণ্ডিত, উচিত দণ্ডপাত, হে কর্ম্মী জ্ঞানী কার্য্যাকুশ
কনিষ্ঠ হরিদাস,-দণ্ডিল হরিদাস-শব সমাধি কর্ত্তা ঈশ,

হে মহাপ্রভু!!

উজ্জ্বল যজ্ঞসূত্রধর, হে সপ্তাঙ্গুল-শিখা-শিরঃ,
স্বনাম গুণবন্ত, স্বরূপ অনুরক্ত, শ্রীগুরুসেবা তত্ত্ব,

হে মহাপ্রভু!!

আহে প্রতাপরুদ্র,-সম্রাতা সর্ব্বভদ্র-পাবন অমৃত বচন,
বৈষ্ণব-মার্গকারী, ব্রাহ্মণ-প্রিয় হরি, উজ্জ্বল রসানুসন্ধান,

হে মহাপ্রভু!!

আচণ্ডাল প্রিয় বিশুদ্ধ, সর্ব্বপ্রাণী হিতে সংশুদ্ধ,
সর্ব্ব বৈরাগ্যমার্গ, শিক্ষাগুরু সংসর্গ, ব্রজপ্রাপ্তিকৃত বিদগ্ধ,

হে মহাপ্রভু!!

হে গোপীভক্ত গৌর,-কৃষ্ণ এ অষ্টোত্তর, শতনাম ফল মু মাগুচি,
তৎকাল মিলিব টি, যে ইহা ভাবিবে টি, শুনিবে যেঁউ কার্য্য ইছি,
হে মহাপ্রভু !!
তিলক স্মরণ সময়ে, পড়িলে কৃষ্ণ প্রেমোদয়ে,
এ সদানন্দ কবি সূর্য্যব্রহ্ম বিক্রীত হইছি তুম্ভ পদ্ম পায়ে,
হে মহাপ্রভু !!

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জানান।

আহে কৃষ্ণচৈতন্য, পতিত-পাবন, এ দীনেরে বারে কৃপা কর।
কোটি কোটি দুরাচার, করিছ উদ্ধার, দ্রব-হৃদ হুয় একবার॥
তুম্ভ বিনা এ সংসার, ভিতরে মোহর, কে অছি শরণ মনে কর।
যেবে করু অছ হেলা, ভবজলে ভেলা, বুড়িলা টি হে উদ্ধরি ধর॥
তুম্ভ দীনবন্ধু নাম, সার্থকর প্রেম,- দাতা বলি ত্রিভুবনে ডরে।
যেবে করিব নিরাশ, নাহি টি মু দোষ, কাঁহা নিন্দা হেব বিচাররে॥
তুম্ভ বড় বুলি করি, অবা কেহু ডরি, নিন্দা ন করিবে কদাচিত।
আপ চিত্তে হে জিবত, যেরে অনুচিত, শরণ রক্ষি ন পারিলি ত॥
শুনি লোকে অবিশ্বাস, করিবে অবশ্য, ভাবে যে ভজে সে নাশ যাই।
যেবে ন ভজিবে কেহি, প্রভু হেবে কেহি, এ কথা-মান্ কি মনে নাই॥
পাপ ব্যাধি ভরি পেট, সদা ছট ফট, তুম্ভ হঠ কু মো হঠসি না।
কলা বসন দণ্ডরে, বাঁধি ব্রহ্মাণ্ডরে, উড়াইবি টি পতিত বানা॥
এথি তুম্ভর আম্ভর, জিনা হারিবার, দেখন্তু বিবেক ভক্তমানে।
সে যে তুম্ভকো ন ডরি, উচিত যে পরি, কহিবে সহিব শুনি কর্ণে॥
মতে তারিলে জিনিব, নহিলে হারিব, এ কথা মনে বিচার কর।
আউ কার্য্য পাছে করি, শুন মু গুহারি, আগ আহে গৌর বিশ্বম্ভর॥
তুম্ভ গুমান লুচাই, থাঁউ কাঁহি পাই, ভুবন ভিতরে কলে খ্যাত।
মহাপাতকী সে দুই, জগাই মাধাই, তারিছ এমু ভরসায় ত॥
তব অবতার কালে, সে জনমিথিলে, মু এবে তাঙ্কু পরমশ্রেষ্ঠ।
যেতে কনিষ্ঠ পাপীঙ্কি. কৃপামৃত দেল, কহ এবে কি করিবে জ্যেষ্ঠ॥
এবে বহু সব কথা, তুম্ভ হর্ত্তা কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা তাহা করি পার।
রখ ক্ষিতিরে এ কীর্ত্তি, বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি, এ পাপী ভবার্ণবরু তার॥

অবা বিচারিব স্বর্গ, দেবী চারি বর্গ, তঁহি রে মু প্রয়োজন নাহি।
যহি তুম্ভ লীলামান, দিব্য বৃন্দাবন, সে ঠাঁরে জন্মিবি দেহ বহি॥
তব প্রিয় গদাধর, সে ঠাঁরে তাঙ্কর, যেঁউ রূপে হেরি সেবকারি।
তঁহি তুম্ভে যেঁউ মুর্ত্তি, তুম্ভ তাঙ্ক প্রীতি, আস্বাদিবি সদা মন ভরি।
জান চতুর্দ্দশ পদ, সম্পূর্ণ এ ছন্দ, গৌর চন্দ্রঙ্ক এ জানান।
সদানন্দ কবি সূর্য্য,- ব্রহ্ম লঘু কার্য্য, পড়িলে পাপরু পরিত্রাণ॥

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বরাগ।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরুছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥ ৭৪।

হায় হরি গোরা কেন কাঁদে।
নিজ সহচরগণ, পুছই কারণ, হেরই গোরামুখ চাঁদে॥
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে ভেল দুন, ঝর ঝর ঝরে প্রেম বারি।
বিছুন শিথিল, গাঁথল মোতিফল, খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুন পুন, আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি, ধরণী পড়িল মুরছিয়া॥
তঁহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়া করিল কোর, কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুন অট্ট অট্ট হাসে, জগজন মন তোষে, বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥ ৭৫॥

বাসক সজ্জা।

অরুণ নয়নে ধারা বহে। অবনত মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে। ভূমে পড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
কমল পল্লব বিছাইয়া। রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসকসজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া। বলে কিছু চরণে ধরিয়া॥ ৭৬॥

সুরধুনি তীরে নবভাণ্ডীর তলে। বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণে মিলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়। হিম সহ পবন বহয়ে মন্দবায়॥
তাঁহি বৈঠহি পহুঁ ললিত শয়নে। হেরই দশদিশ চকিত নয়নে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়ে উঠয়ে। বাসকসজ্জার ভাব বাসুঘোষে কহে॥
৭৭॥

উৎকণ্ঠিত॥

আজি কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান॥
মুখচাঁদ শুখায়েছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেনে হইয়াছে মলিনে॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাহুাইতে পায়॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোআসে নিশি পোহাইল॥ ৭৮॥

মান।

বরণ কাঞ্চন দশবাণ। অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে। অরুণ নয়নে ধারা বহে॥
খেণে শির করতলে রাখি। খেণে ক্ষিতিতলে নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়। সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়। নিশি দিশি আন নাহি তায়॥ ৭৯॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে মনে মনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়।
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়॥
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ না যায়।
মান ভাব গোরাচাঁদের বাসুঘোষ গায়॥ ৮০॥

নিশি পরভাতে, বসি আঙ্গিনাতে, কাতর বদন খানি।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, হেন ব্যবহার, এমত কখন না জানি॥
সখিরে এমতি করিল কে?
গোরা গুণনিধি, বিধির অবধি, তাহারে পাইল সে।
কস্তুরি চন্দন, করি ঘরিষণ, গাঁথিনু ফুলেরই মালা।
বিচিত্র পালঙ্কে, শেজ বিছাইনু, শুইবে শচীর বালা॥
হেদে গো সজনি, সকল রজনী, জাগিয়ে পোহানু বসি।
তিলে তিনবার, দণ্ডে শতবার, মন্দির বাহিরে আসি॥
বাসুঘোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে, এখনি বলিব তারে।
হেথা না আয়ল, রজনী বঞ্চল, কি জানি কাহার ঘরে॥ ৮১

বিরহ।

আজু কেন গোরচাঁদের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল বলি করয়ে বয়ান॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন না বুঝি কারণ॥
সমুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনী ধারা আঁখিযুগে ঝরে।
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদ গদ ভাষ॥ ৮২॥

রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণনাম মধু। অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু॥
শিব বিহি নাহি পায় যার পদ ভজি। তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি॥
ছাড়িয়া সকল সুখ গেল অপকতি। সাতকুম্ভ কলেবর ভাব বিভুতি॥
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কান্দে।
কান্দে বাসু ঘোষ হিয়া থির নাহি বান্ধে॥ ৮৩॥

ভাবি বিরহ।

আজি কেন নদিয়া উদাস লাগে মোরে।
গায় নাহি পায় সুখ দুটী আঁখি ঝোরে।
সুরধুনী তীরে মলিন তরু লতা।
ভ্রমর না খায় মধু শুখাইল লতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাই মুক হইল পারা॥
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে।
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে॥ ৮৪॥

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি, ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা শেষে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দু নয়নে, শুনিয়া উঠিল শচী মাতা।
আলু থালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি, কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
ধুয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ধ্রু। আমি ডাকি নিমাই বলিয়া॥

তা শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গ হরি,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥ ৮৫॥

সকল মহন্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন তন্ত্র,
কিবা হইল কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥
গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাঁথারে ভাসাঞা গেল,
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥ ৮৬॥

পড়িয়া ধরণীতলে, শোকে শচীদেবী বলে,
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
সোণার পুতলি গোরাচাঁদে॥
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা,
খাট পাট সোণার ঝুলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি,
মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদিয়া আঁধার হৈল,
ছট ফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, যথায় গৌরাঙ্গ পাব,
কান্দিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে নিমাই দেবে, মূল্য করি কিনে লবে,
হঙ মুঞি তার দাসের দাসী।

বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্দে অকারণে,
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী। ৮৭॥

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হায় অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় রে দারুণ বিধি কি কাজ সাধিলি।
কোলের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়ে দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ে হব ছার খার॥
বাসুঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥ ৮৮॥

সন্ন্যাস।

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর। সুরধুনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর॥
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী। সতী ছাড়ে নিজ পতি জপ ছাড়ে যতী॥
কাঁখে কুম্ভ করি তারা দাড়াইয়া রয়। চলিতে না পারে সেই নড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে এ নাগর যেন দেশে ছিল। সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া। আসিয়াছে জননীর পরাণ বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্য মাতা ধরেছিল গর্ভে। দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন নারী পেয়েছিল পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরি যাও আপন আবাসে। সন্ন্যাসী না হও না মুড়াইও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা। সাধ আছে কৃষ্ণপদে বেচিব নিজ মাথা॥
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি। দেখিয়া তাহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তিবর। বাসুদেব কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥

৮৯॥

প্রভু কহে নিজগুণে দেহ ত সন্ন্যাস।
হইও না সন্ন্যাসী নিমাই মুড়াইও না কেশ॥

কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে।
সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাহ ঘরে॥
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে ত সন্ন্যাস দিলে হয় ত উচিত॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ।
তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন॥
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই॥
এ কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দ উল্লাস।
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ॥
নাপিত বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
এরূপ মনুষ্য নহে এ তিন ভুবন॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পায়।
যে বল সে বল প্রভু কাঁপে মোর গায়॥
কার পায়ে হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
না করিও নিজ বৃত্তি ঠাকুর কহয়॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে।
অন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ণুলোকে॥
কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়।
বাসুঘোষ জোড় হাতে ভারতীরে কয়॥ ৯০॥

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে, বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ, উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুখানি কানি, ভারতী দিলেন আনি, আর দিল একটি কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌর-হরি, আপনাকে মানে অতি দীন॥

তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর, নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস, ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥
এত বলি গৌররায়, ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়, দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভকত জনার পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে, বাসুদেব হা-কাঁদকান্দনে॥ ৯১

হেদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশ হীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥ ৯২॥

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিল বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাই আশ॥ ৯৩॥

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

সাধন ভজন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি আছে, তাহা ছাড়া ভগবানের কৃপাতেও সিদ্ধ অবস্থা হয়। ইহাকে ভক্তিশাস্ত্রে "ভগবৎ প্রসাদজ ভক্তি" বলে। আর সাধনের দ্বারা অভ্যাস করিয়া যে ভক্তি লাভ হয় তাহাতে সদ্গুরুর আবশ্যক সদ্গুরু লাভ বড়ই ভাগ্যের বিষয়। বর্ত্তমান লৌকিক প্রথায় যে গুরুকরণ দীক্ষাগ্রহণ হয়, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তাহা অপেক্ষা করে না। যিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারেন, তিনিই গুরু। জীবের ভাগ্যোদয় হইলে ভগবান্ স্বয়ং গুরুরূপে জ্ঞান দান করেন। বর্ত্তমান সময়ে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ রূপান্তর হইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ আমাদিগকে "নববিধান বৈষ্ণব" বলিয়া সর্ব্বদা আলোচনা করেন, আর শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রচারিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শ্রীল শিশির বাবু শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, স্বরূপদামোদরের কড়চা প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থ হইতে গদ্যরূপে সরল ভাষায় সাধারণের হৃদয়ে গৌর-রস প্রবেশের জন্য প্রভুর আজ্ঞায় নানা ভাষায় পৃথিবীময় গৌরাঙ্গ স্মরণ করাইতেছেন, তাঁহার নিজের কাল্পনিক কিছুই নাই। সমস্ত গুলি গ্রন্থের আস্বাদ করার জন্য এবং সাধন-প্রণালী সহজে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে স্বার্থ আছে, অভিমান আছে, জাতি গৌরব আছে, সেখান হইতে নীলকান্ত মণি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অনেক দূরে থাকেন। আমরা ইহা শত শত বার স্বীকার করি, যিনি গ্রন্থ প্রচার করিয়া আমাদের পামর মনকে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ স্মরণ করাইতে পারেন, তিনিই আমাদের গুরু। আমরা এই সুযোগে প্রভুকে চিনিয়াছি। ভাই ভারতবাসী, বল জয় গৌরাঙ্গ, এমন সুবিধা পাইয়া হারাইও না। প্রভুর লীলা পাঠ করিতে করিতে অবশ্য কৃপা হইবে; তখন ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম আসিয়া তোমার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাড়িতের বেগে নয়নানন্দ চিদ্ঘন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া তোমার মন প্রাণ ভুলাইয়া ফেলিবে। বৈষ্ণব-জগতের প্রাচীন গোস্বামিগণ—শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, ব্যাস-বৃন্দাবনদাস—যে সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত গ্রন্থ

পাঠ করিয়া বংশপরম্পরা শিক্ষা পাইতেছেন, যাঁহারা বৈষ্ণব জগতে গুরু রূপে আজও পূজ্য, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের তাঁহাদের সম্বন্ধে এই শ্লোক লিখিয়াছেন।—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু যে আমার। তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

শ্রীমুকুন্দ লাল সরকার মালঞ্চি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার খেদ।

মনে ভাবি প্রাণসখি, হৃদয়ে সে রূপ আঁকি, নিশি দিশি করি নিরীক্ষণ।
করেতে লইয়া তুলি, ভাবিতে সে অঙ্গ গুলি, এলাইয়া পড়ে তনু মন॥
নয়নে বহয়ে নীর, পরাণ না হয় স্থির, কেমনে আঁকিব ছবি বল।
না হইল ছবি আঁকা, না হইল রূপ দেখা, সব আশা হইল বিফল॥
একবার মনে করি, শুন প্রাণ-সহচরি, নাথ সনে মনে কথা কই।
স্মরিতে তাঁহার কথা, হৃদে উঠে কত ব্যথা, আমাতে আর আমি যেন নই॥
বাক্যরোধ হয় মোর, না গলে নয়ন লোর, অমনি মূরছি পড়ি ধরা।
মনকথা র'ল মনে, না হ'ল নাথের সনে, আর মোরে করিল অধীরা॥
নিশিযোগে শুয়ে থাকি, মনে মনে ভাবি সখি, নিদ্রা এলে দেখিব স্বপন।
মোর ভাগ্য মন্দ অতি, যে অবধি গেছে পতি, নিদ্রা ত্যাগ করেছে নয়ন॥
কি আর কহিব দুঃখ, স্বপনেও চন্দ্রমুখ, একবার নারিনু দেখিতে।
আমার মরম ব্যথা, মরমে রহিল গাঁথা, কেবা আছে কব কার সাথে॥
কি আর বলিব বল, আমার করম ফল, সব দিকে হইনু বঞ্চিৎ।
গৌরাঙ্গ বিরহানল, কিরূপে নিভাই বল, উপায় যে না দেখি কিঞ্চিৎ॥
এবে দেখি সহচরি, কান্দিব জনম ভরি, এই মোর ললাট লিখন।
ছাড়ি গেল প্রাণধন, প্রাণ নাহি গেল কেন, বিধির বিধান নিদারুণ॥
না আমি চাহিনা সুখ, বুকভরা থাক দুঃখ, মরমে থাকরে মর্ম্মব্যথা।
জ্বলরে বিরহানল, পড়রে নয়ন জল, স্মরয়ে দেওরে গৌর-কথা॥
ছাড়ি গেছে প্রাণপতি, তোরা দুই মোর সাথি, এ দুঃখেতে আমার সহায়।
তোরা যদি যাস্ ফেলি, গৌর-কথা যাব ভুলি, তবে মোর কি হবে উপায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা, এতেক কহিয়া কথা, মূরছি পড়িল ভূমিতলে।
বলাইদাসের দাসী, অমনি পদ পরশি, লোটাই পড়িল তার তলে॥

আমি যাহা চাই।

শ্মশানের জলন্তচিতার সম্মুখে, গুরু-গম্ভীর মধুর স্বরে, গুরু শিষ্যকে বলিলেন, "বৎস! আমি যাহা চাই—তাহা আনিয়া দেও।" শিষ্য হতবাক্, অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন। কিসে গুরুদেব সুতৃপ্ত হইবেন—গুরু-হৃদয়ের বিশল্যকরণী কি—তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার, একে একে গুরুদেবের সুচারু চরণপ্রান্তে সন্নিবেশিত করিলেন। গুরুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি যে সমুদায় দ্রব্যের সংগ্রহ করিয়াছ, তাহাদের গুণাগুণ ও স্থায়িত্ব পরীক্ষা করিয়া যাহা শ্রেয় ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হইবে তাহাই গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া তৎসমুদায়, সেই জীবকুলের ভয়প্রদ উর্দ্ধশিখ গগনব্যাপী চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র রহিল না। গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—পৃথিবীর বিদ্যাবল বুদ্ধিবল গাম্ভীর্য্যবল, পৃথিবীর শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যবল, পৃথিবীর ধনগর্ব্ব জনগর্ব্ব, যাহা কিছু বল, সকলি এই সর্ব্বভুক্ সর্ব্বমুখ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিছুই এই সর্ব্বতোব্যাপী খাণ্ডবাগ্নির অলঙ্ঘ্য গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না। আমি তাহারি ভিখারী, আমি তাহারি জন্য লালায়িত, আমি তাহারি জন্য নানাজন্মে নানাদেশে নানাবেশ ধারণ করিতেছি, আমি তাহারি জন্য প্রমত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছি, আমি তাহারি জন্য তৃষাতুরা চাতকিনীর ন্যায় উর্দ্ধমুখে নবীনমেঘের উপাসনা করিতেছি, আমাকে তাহাই আনিয়া দেও—অগ্নি যাহাকে পোড়াইতে পারে না, বায়ু যাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল যাহাকে পচাইতে পারে না, শস্ত্র যাহাকে ভিন্ন করিতে পারে না; যাহা নিত্য, নিরন্তর, পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ; যাহা পাইলে জীবের কামনা ধুইয়া যায়; সকল সাধ মিটিয়া যায়, যাহা পাইলে জীব কৃতার্থ হয়, উন্মত্ত স্তব্ধ ও পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! তেমন বস্তু আমরা কোথায় পাইব! যাঁহার প্রসাদে আমরা স্বর্গের ইন্দ্রত্ব করিতেছিলাম, পারিজাতের দিগন্তব্যাপী সুরভিঘ্রাণে মন প্রাণ মোহিত হইতেছিল, স্থির স্নিগ্ধোজ্জ্বলা দেবাঙ্গনাগণের মৃদু মধুর চামর ব্যজনে দেহ মন শীতল হইতেছিল, অহং ভাবের গভীর গর্জ্জনে দারুণ কর্ম্ম-দুর্ব্বাসনার অভিসম্পাতে তাঁহাকে আমরা চিরদিনের জন্য অতলতলে

ডুবাইয়াছি। কেমন করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিব? যদি বল "সমুদ্র মন্থন করিয়া।" কিন্তু হায় আমরা যে হীনের হীন দীনের দীন শক্তি-সামর্থ্য আয়োজন বিহীন। আমরা কেমন করিয়া মন্থন দণ্ড মন্দরে ধারণ করিব! মন্থন রজ্জু বাসুকি কোথায় পাইব। কেমন করিয়া দেব দানবের সমাবেশ করিব! যদি বল "ডুবিয়া সে রত্ন লাভ কর;" তাহাও অসম্ভব। যদি ডুবিতেই জানিব তবে আর চিরকাল ভাসিব কেন? কত স্রোতে পড়িলাম, কত আবর্ত্তে ঘুরিলাম, কত তরঙ্গে ভাসিলাম; কই, তবু ত ডুবিতে পারিলাম না! আবার ডুবাও ত আপদ শূন্য নহে। তাহাতে শ্বাসরোধে শ্বাস-কাসের সম্ভাবনা। যদি তাহাও কৌশলে সম্পন্ন হয়, কিন্তু বারিধি-গর্ভ যে বিপদসঙ্কুল। নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। কিয়দ্দূর ডুবিলে তাহারা যে ভাসিয়া উঠিবে, তাহারা যে আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অতএব নিরাশা—একান্ত নিরাশা,—চতুর্দ্দিকে নিরাশার অন্ধকার, নিরাশার ঘনঘটা, নিরাশার ভীম-ভৈরব-পিশাচ-মূর্ত্তি, বিকট বদনে, বিকট দশনে, খল খল বিকট হাসি হাসিতেছে। আমি কেমন করিয়া সিন্ধুর তমোময় জলরাশি ভেদ করিয়া, সমুজ্জল রত্নখচিত তাহার তল প্রদেশে উপনীত হইব! যথায় আমার সর্ব্বস্বধন, হেম-গৌরী সিন্ধুবালা, রূপের ছটায় সিন্ধুতল আলোকিত করিয়া, হেম-সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী হৈমবতী বসিয়া আছেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ কমলের কৃপা-মধু পানে, উন্মত্ত ভৃঙ্গের মধুর গুঞ্জনে, সুখের গান গাহিয়া পরম সুখের অধিকারী হইব। তাই বলিতেছিলাম, নিরাশা—চতুর্দ্দিকে নিরাশা,—ভরসা মহাজন বাক্য "সাহসে জয়তে লক্ষ্মী।" অতএব ভয় নাই, আইস জীব এই মহামন্ত্র সম্বল করিয়া আমাদের যাহা সাধ্য অকূল সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া নতশিরে করজোড়ে অাখিনীরে সেই ভুবনমোহিনীরে আহ্বান করি। তিনি সুপ্রসন্না না হইলে, আমার সাধের ধন, যিনি আমার অন্তরের অন্তরে রমণ করেন, আমি যাঁহাকে চাই, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কেমন করিয়া পাইব! অতএব আইস, ফুল্লপ্রাণে, মর্ম্মভেদী তানে, উচ্ছ্বাসময়ী গানে, প্রাণভরিয়া বলি, চিন্ময়ি—চৈতন্যরূপিণি—সতি, তুমি একবার উত্থিত হও। তুমি যে পতিত-পাবনী, পতিতের কাতর ক্রন্দনে আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। দেখ দেখ, একবার চেয়ে দেখ, আমাদের মধ্যে তোমাকে

দেখিতে না পাইয়া তোমার কান্ত নবঘনশ্যাম মধুর মুরতি সদানন্দ মুরলী-বদন, আজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। দীনদয়াময়ি! আর নিভৃতে লুক্কায়িত থাকিও না। তোমার আশ্রিত জীব আজ ছারেখারে যাইতেছে। ব্রজসুন্দরি! একবার ব্রজের মোহিনীবেশে মধুরাহ্লাদিনী মূর্ত্তিতে উত্থিত হইয়া, অমৃত-বাহিনী আয়ত লোচনের মধুর বিলাস-ভঙ্গিমায়, হাসিতে হাসিতে তোমার রুদ্রপতিকে আবার বাঁশী বাজাইতে শিখাইয়া দাও। নহিলে আমি গেলাম গেলাম, ত্রিতাপে জ্বলিয়া মরিলাম। তুমি নিজগুণে দয়া করিয়া ত্রিতাপনাশিনী মন্দাকিনী রূপে মধুর কুলু কুলু ধ্বনিতে একবার তাপশুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া জ্বালা-মালা নিভাইয়া দেও। কেমন করিয়া তোমার দেব-দুর্লভ শীতল চরণচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া পাপ পুণ্যের শিকলি কাটিয়া তোমার নাম, তোমার গুণ গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ-তমালে উড়িয়া বসিতে হয়, শিখাইয়া দেও। আমি তোমার চরণে জীবন-পুষ্পাঞ্জলি দিতে চাই। আমি তোমার রাতুল পদের দাসীর দাসী হইতে চাই। আমার কালীঝুলিমাখা বিকৃতমূর্ত্তি দেখিয়া ঘৃণা করিও না। তোমার দাস্যের গুণে দুই দিনে নির্ম্মল হইয়া যাইবে। তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, এই বিশাল বিশ্বকক্ষের প্রত্যেক অনু পরমাণু মধ্যে, নিত্য চৈতন্য রূপিণী তুমি চমকিতেছ। আবার তুমিই সন্ধিনী, তুমিই সম্বিং, তুমিই আহ্লাদিনী। তুমি আরাধিকা, বৃন্দাবন-বিলাসিনী, প্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীমতী রাধিকা। আমি তোমারি চরণে মস্তক লুটাইতে চাহ। তুমি আর ডুবিয়া থাকিও না। বড় আব্দার করিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছি, নিজগুণে দয়া করিয়া, অবিদ্যা-সমুদ্র ভেদ করিয়া, বিদ্যারূপিণী তুমি, বৃন্দাবন বিলাসিনী মধুর শ্যাম-মোহিনী-মূর্ত্তিতে রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত করিয়া হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া উঠ। আমি তোমার দেবদুর্লভ মদনমোহিনী রস-তরঙ্গিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করি। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মরাশি ধুইয়া যা'ক। এবার তোমার শীতল চরণ-চ্ছায়ায় আশ্রয় পাইলে, এবার হারানিধি তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, এ দস্যু-রাজ্যে শত্রু-জন-সমাকুল ভগ্ন-মন্দিরে, তোমাকে আর রাখিব না। এ চির-দরিদ্র, সাত রাজার ধন, চিন্তামণির অমূল্য রত্ন লইয়া, ভগ্নকুটীরে পাঁশ চাপা দিয়া কোথায় রাখিবে। তোমার পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া, তোমার শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তোমার শক্তিতে মাথা-চোখা হইয়া, তুমি

যাঁহার, এবার তাঁহার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। তাই বলি, শক্তি-রূপিণি! আমি তোমার অভয়-চরণে প্রপন্ন হইলাম। করুণাময়ি! এক বার প্রকাশিত হইয়া শক্তিসঞ্চার কর। অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল। যে পথে গমন করিলে তোমার নিত্য বৃন্দাবনের সুরম্য অগম্য নিভৃত নিকুঞ্জে উপস্থিত হইতে পারি, যথায় গোপীবসন-হরা, ননীচোরা, মা যশোদার চঞ্চল যাদুয়া শ্রীনন্দদুলাল, তোমার রসিক-শেখর শ্যামরায়, ললিত ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া, ভাবে ঢুলুঢুলু হইয়া, মধুর বংশীধ্বনিতে জয় রাধা শ্রীরাধা নাম গানে বিভোর হইয়া আছেন। ইচ্ছাময়ি! ইচ্ছা পূর্ণ কর, আমি সাধনের ধন সেই বাঁকা নীলকান্ত মণিতে স্বর্ণলতা তোমাকে জড়াইয়া দিতে চাই। কৌস্তভরূপিণি! তোমাকে তোমার সাধের বধুঁয়ার গলে দোলাইতে চাই। তাহা হইলে তোমার অলোকসামান্য দিব্য অঙ্গ-দ্যুতিতে শ্যামতনু আবার গৌর হইবে। তখন নিত্যধামের নিত্য-বিলাসের তরঙ্গ উঠিবে। আমার আশা মিটিবে, ত্রিতাপ ছুটিবে, পাপ পুণ্যের বন্ধন টুটিবে। তখন প্রাণ ভরিয়া বলিব, "দেখিলাম গৌর বাঁকা, রাই রূপে যাঁর অঙ্গ ঢাকা।" দয়াল গৌরাঙ্গের মুখশশী দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব। তখন প্রাণ ভরিয়া বলিব, "হরি বোল," বাহু তুলিয়া বলিব "হরি বোল," করতালী দিয়া বলিব, "হরি বোল," তখন আমার সকল সাধ পূর্ণ হইবে। কারণ যথায় গৌরাঙ্গ তথায় অদ্বৈত; যথায় অদ্বৈত তথায় নিত্যানন্দ; তথায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ "হরি বোল"

শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্ত। গোড্ডা।

ওঙ্কার্ক-পর্ব্বত-গুহাস্থিত আশ্চর্য্য প্রাসাদ।

মোর অন্তঃপাতী গলেনাব ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ওঙ্কার্ক-পর্ব্বতে এক পরমাশ্চর্য্য গুহা লক্ষিত হয়। এই গুহাটি দেবখাত। অনধিক ষোল বৎসর হইল ইহা আবিষ্কৃত হইলেও এখনও ইহার অভ্যন্তরস্থ সকল স্থান কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

ওঙ্কার্ক-পর্ব্বতের নিবিড় বন-সঙ্কুল ভূখণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে সর্ব্বোচ্চ রোয়ার্ক শৃঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায়। এই শৃঙ্গের সর্ব্বোপরিভাগে আগ্নেয়-গিরির ধাতুবিশ্র-নির্গমন-দ্বার সদৃশ এক গহ্বর-মুখ দৃষ্ট হয়। গহ্বর-মুখে নিম্নে অবতরণ করিবার সিঁড়ি আছে। এই

সিঁড়ি দিয়া প্রায় ২০০ ফুট সরলভাবে নিম্নদেশে অবতরণ করিলে ভয়ানক অন্ধকারাবৃত তোরণ-সদৃশ প্রায় বৃত্তাকার এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায়। সুড়ঙ্গের ব্যাস ৭০০ ফুট, ও ছাদ ২২৫ ফুট উচ্চ। স্থানে স্থানে মর্ম্মর ও বিবিধ বর্ণের স্তর সমন্বিত প্রস্তরের স্তম্ভ গুলি সুড়ঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। স্তম্ভের লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতবৎ রেখা গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন সুদৃশ্য দ্রাক্ষালতা সমূহ অকস্মাৎ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। সুড়ঙ্গ-প্রাচীরের প্রতি লক্ষ করিলেও বোধ হয় যে, ইন্দ্রধনুর বিচিত্রতা অপহরণ করিয়া পুষ্পগুচ্ছ গুলি লতাপাতা সহ উপলাকার ধারণ করিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই দেব-নির্ম্মিত বিবিধ মূর্ত্তির সংস্থিতি লক্ষিত হয়; ইহাদের কোনটি স্থূল, কোনটি ক্ষীণ; কোনটি দীর্ঘ, কোনটি খর্ব্ব; কিন্তু সকল গুলিই যথাপরিমিত ও ভাবশুদ্ধ। আমরা অনেক সুদক্ষ শিল্পি-নির্ম্মিত প্রতিমা দেখিয়াছি; কিন্তু, সে সকল, যত কেন ভাবশুদ্ধ না হউক, কোন ক্রমেই বিশ্বশিল্পীর নির্ম্মিত এই মূর্ত্তি গুলির সমকক্ষ হইতে পারে না। এই সকল দেখিয়া মানুষের কৃতিত্বাভিমান চূর্ণ হইয়া যায়; তখন দর্শক গুহার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বিস্ময়ে যেন আত্মহারা হইয়া পড়েন; তখন তিনি মনে করেন, আমার এই দুরারোহ পর্ব্বতারোহণের পরিশ্রম সার্থক হইল।

এই বৃহৎ সুড়ঙ্গটি হইতে অল্প উর্দ্ধে উঠিয়া পাঁচ দিকে পাঁচটি সুড়ঙ্গ গমন করিয়াছে। এই পাঁচটিই পাঁচটি প্রকোষ্ঠে গমনের পথ। এই স্থানে একটি ক্ষীণ বারি-প্রবাহ দৃষ্টি গোচর হয়। ইহার জল অতি পরিষ্কার ও বরফের ন্যায় শীতল। স্রোত-পথ ধরিয়া বারিপ্রবাহের উৎপত্তি স্থানে গমন করিলে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার শৈত্যোষ্ণতা ফারেনহাইট্-তাপমানযন্ত্রের ২ ডিগ্রি। প্রকোষ্ঠের আর্দ্রতা ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় ফোঁটা ফোঁটা জল অনবরতই পতিত হইতেছে। বোধ হয় প্রতি মিনিটে ২০ গ্যালন জল পড়িতেছে। এই রূপ জলবিন্দুর সংমিশ্রণ দ্বারাই বারিপ্রবাহের উৎপত্তি হইয়াছে।

বৃহৎ সুড়ঙ্গের এক ধারের এক পথে গমন করিলে একটি সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৫৭০ ফুট, প্রস্থ ২০০ ফুট ও উচ্চতা ৩০০ ফুট হইবে। ইহার ঠিক মধ্য স্থানে একটি বিশুদ্ধ শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহদাকার সিংহাসন স্থাপিত আছে। শ্বেতপ্রস্তরের মধ্যে

মধ্যে বিবিধ মূল ও মিশ্রবর্ণ প্রস্তরের কৌশলময় সংযোগ দ্বারা সিংহাসনের শোভা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ৩৬ ফুট, প্রস্থ ১৬ ফুট, উচ্চতা ৬৫ ফুট, এবং চূড়াস্থিত বৃত্তের ব্যাস ১২ ফুট হইবে। প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে একটি প্রতিমাধার দৃষ্ট হয়। এই স্থানে আরও কতিপয় ক্ষুদ্রায়তন আসন স্থাপিত আছে। সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে ৩ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি শ্বেতস্তম্ভ ছাদ পর্য্যন্ত লম্বমান রহিয়াছে। স্তম্ভতল শূন্যগর্ভ। ইহার শূন্যগর্ভতাও একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্য গৃহে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহের প্রাচীর-চতুষ্টয় রক্ত পীত ও শ্বেত বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত। এই গৃহ হইতেও একটি বারিপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে।

বৃহৎ সুড়ঙ্গ হইতে নানাদিকে যে সকল পথ গিয়াছে, এবং সেই সকল পথ হইতেও যে সকল পথের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল ধরিয়া চলিয়া গেলে কত গুপ্তগৃহ—কত চমৎকার দৃশ্য—পরিলক্ষিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু দর্শক এতদ্বিষয়ে সাহসী হইলেও তিনি সর্ব্বত্র যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারেন না; কারণ সঙ্গীয় দীপালোকের দীর্ঘ জীবনের উপরই তাঁহার নিজের জীবন ও কৌতূহল-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দৈবাৎ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলেই তাঁহার সেই গহ্বর হইতে নির্গমন অসম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। ইহার একটি সুড়ঙ্গপথে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এক ব্যক্তি বার মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। গুহা পথে বায়ুর সঞ্চালন দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, এই গুহার ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাড়ী নামক স্থানের গুহার সহিত এই পথের সংযোগ আছে।

সচরাচর দর্শকেরা এই গহ্বরের যত দূর দর্শন করিয়া থাকেন তাহার বিস্তার ৩০ মাইলের উপরে হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন ইহার সম্যক্ বিস্তার ৩০০ মাইলের ন্যূন হইবে না।

জড়বিজ্ঞান দ্বারা এই দেবনির্ম্মিত মূর্ত্তি গুলীর উৎপত্তির কারণ নির্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন গুহার ছাদ হইতে যে ফোঁটা ফোঁটা জল পতিত হয়, সেই জলবিন্দু সহ আগত ধাতু-দ্রাবক ঘনীভূত হইয়া এই সকল পরম বিস্ময়কর মূর্ত্তি স্বভাবতঃই গঠিত হইয়া থাকে।

আমরা পুরাণাদিতে দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ-কৌশলের বিষয় শ্রুত আছি। এখন পাঠক ভাবিয়া দেখুন এই বিচিত্র গহ্বরস্থ প্রাসাদ কাহার নির্ম্মিত?

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

ভক্তির সাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে নামের বিষয় পৃথক রূপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শুধু কৃষ্ণনাম,—সুর তাল সংযুক্ত নয়,—শুধুই কৃষ্ণনাম। ইহাতে আবাল-বৃদ্ধ সকলকে আকর্ষণ করিবার জন্য আড়ম্বর নাই। ইহার মর্ম্ম কেবল সাধকেই জানেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন নহে,—যেই নাম সেই কৃষ্ণ। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্যই তাহার প্রমাণ। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুই ত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ। তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু, এই কথার তাৎপর্য্য কি? আমরা সম্প্রতি এই প্রশ্নটির মীমাংসা না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। সাধক অনুরাগ ভরে একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণনাম জপ করেন। কৃষ্ণ-নামের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে প্রাকৃত জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি কৃষ্ণনামের মাধুর্য্যাস্বাদনে যতই ব্যগ্র হন, ততই নাম হইতে সুমধুর রস বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আর্দ্র করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনঃপ্রাণ রসের মধ্যে ডুবিয়া যায়,—তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ দিয়া রসের প্রবাহ ছুটে,—তিনি যেন রসের অকূল সাগরে ভাসিতে থাকেন। যখন রস পান করিয়া সাধক প্রেমে উন্মত্ত হন, যখন সাধক কেবল প্রেমময়, যখন সাধকের কৃষ্ণ ব্যতিত কিছুই থাকে না, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বাধ্য হইয়া সাধকের সম্মুখে আসিয়া দর্শন দেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধকের যে দশা উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সাধক তখন দেখিতে পান,—নামেও যে রস, রূপেও সেই রস, এবং দেখিতে পান,—"কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুই ত সমান।"—কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ নাম নহে, কৃষ্ণই স্বয়ং; জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধকের চক্ষুতে চিরদিনের

একটি দাগ লাগিয়া যায়, সাধক চিরদিনের মত রসের সাগরে ভাসিতে থাকেন। সাধকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—
'দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্মনাম দেহস্বরূপ বিভেদ।'
"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম।"

এই কৃষ্ণনাম কলি-জীবের একমাত্র সম্বল। কলিকালে নাম ভিন্ন আর গতি নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নামের অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত মহিমা বর্ণন করিবার শক্তি আমাদের নাই। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রকাশানন্দ বলিতেছেন,—

"সন্ন্যাসী হইয়া কর গায়ন নর্ত্তন। ভাবক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবকের কর্ম্ম॥

তদুত্তর,

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদন্তাধিকার। কৃষ্ণনাম জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত। হাসি কাঁদি নাচি গাই যেন মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার। কৃষ্ণ নামে বুদ্ধিছন্ন হৈল আমার॥
পাগল হৈলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে। এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব। যেই জপে তার উপজায়ে কৃষ্ণভাব॥
কৃষ্ণ বিষয় প্রেম পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণ প্রায় চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেম তোমা করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত তনু ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥

স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য। উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥
নাচো গাইয়া ভক্তসঙ্গে করি সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥
এই তাঁর বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণ নাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের স্বরূপ, এবং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রধান সাধন। কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে কালাকাল স্থানাস্থান বিচার নাই। অনুরাগের সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে হয়। অনুরাগই নামের সাধনে প্রধান সহায়। অনুরাগ হইতে সাধকের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, এবং অনুরাগ হইতেই সাধকের একাগ্রতা জন্মে। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে অনুরাগ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহার বিঘ্ন বাধা অনেক। সেই জন্য গোস্বামি-শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে হয়, অনুরাগের প্রতিকূল বিষয় হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি।" নামোপাসনায় জপ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে, সাধক সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন না। কেন না,—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

মুক্তি ও প্রেম দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। মুক্তি লাভ হইলে প্রেম লাভ হয় না, কিন্তু প্রেম লাভ হইলে মুক্তি লাভ হয়। মহাপ্রভু অল্প কথায় নাম সাধনের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন; যথা,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপ লইলে নাম প্রেম উপজায়। তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভাব প্রেম উপজায়॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

"তৃণাদি" শ্লোকের ভাব মনে মনে ধারণ করিয়া, সর্ব্বদা মনে নাম গ্রহণ করিলেই হয়, বাহিরে সাধন দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কথা অনেকেই বলেন, এবং অনেকের ধারণাও এইরূপ।

মনে মনে সাধন করিতে পারিলে চলিতে পারে, মন লইয়াই ধর্ম্ম। কিন্তু মনের ধর্ম্ম দেখিলে মনকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ। মন বাহিরের বিষয় পাইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। (তাহাতে বাধ্য হইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়।) যে পর্য্যন্ত মন প্রাকৃত বিষয় লইয়া সুখী হয়, সেই পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত বিষয়ের সহিত তাহার প্রণয় হয় না। "কৃষ্ণের নাম, প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ," এই কথা মানিয়া লইয়া আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে সাধন করিতে হয়। কৃষ্ণনাম যেমন খাইতে শুইতে সর্ব্বদাই করিবার ব্যবস্থা আছে, তেমনই মনের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য, কৃষ্ণনাম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি সাধনাঙ্গ রাখার ব্যবস্থা আছে। যে বিধি কৃষ্ণ-নাম সাধনের সাহায্য করে, সেই বিধি পালন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুই প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া বাহিরের সাধন। এক প্রকার নিজে উদ্ধার হওয়া, অন্য প্রকার অন্যকে উদ্ধার করা। সুপবিত্র ভক্তির বস্তু অঙ্গে ধারণ করিলে, দ্রব্যের গুণে নিজেরও উপকার হইবেই, স্পর্শের কথা দূরে যাউক, তাহার দর্শন করিয়াও অন্যে উপকার পাইবে। দর্শনশক্তির দ্বারা এক বস্তুর গুণ অন্যে সঞ্চালিত হয়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

উচ্চ করিয়া নাম-কীর্ত্তন করিলে, মনে মনে নাম গ্রহণ অপেক্ষা অনেক ফল হয়। যিনি নামোচ্চারণ করেন, তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ে নামের শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ প্রবেশের সুযোগ পায় না। সহজেই তাঁহার একাগ্রতা জন্মে। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা নাম শ্রবণ করেন, তাঁহারাও অশেষ ফল প্রাপ্ত হন। সময় মত উচ্চকীর্ত্তনও প্রয়োজনীয়। ইহার প্রমাণ হরিদাস।

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধভক্ত, তাঁহাদের সাধন ভজন না হইলেও চলে। কিন্তু, সাধকের পক্ষে সেরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সাধ-

ককে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক থাকিতে হয়। যাঁহারা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের প্রেম বিহ্বলিত স্বভাবের নিকট কোন পাপই প্রবেশ করিতে পারে না; তাঁহাদের সাধন ভজনে তত প্রয়োজন হয় না। কেহ কেহ বলেন, লোক শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগকেও সাধন ভজনের মধ্যে থাকিতে হয়।

কৃষ্ণ নাম যিনি যত ভাল বাসেন, কৃষ্ণনামে তিনি তত সুখ পান। সাধক কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ মাধুর্য্যাস্বাদনে আত্ম-হারা হইয়া যান। তাঁহার অন্তঃকরণে অপার্থিব ভাবের সম্পূর্ণ উদয় হয়, তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও পার্থিব পদার্থের সহিত মিলিয়া থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে আস্বাদন করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-মাধুর্য্য নানাবিধ ভক্ত নানাবিধ ভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণনাম যে প্রকারে উচ্চারিত হউক, ফল নষ্ট হয় না। জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাম গ্রহণ করিলে, জীবের কল্মষরাশি বিনষ্ট হয়। প্রমাণ যথা—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলন মেববা।
বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ মশেষাঘ হরং বিদুঃ॥—শ্রীভাগবত।

এবং "মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়াবা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"—স্কন্দ পুরাণ।

হরিদাস বলিয়াছেন,—

"নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্র দেখি। শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥"

যদি একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই ফল হয়, তবে অনবরত উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য কি? এবং অজামিল যে একবারমাত্র নামো-চ্চারণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, জীবের ভাগ্যে তাহা দুর্লভ কেন? এক্ষণে এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে সময়ে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, সেই সময়ে পাপ থাকে না। কৃষ্ণনামের প্রভাবে পাপসমূহ অপসারিত এবং বিনষ্ট হইলে মুক্তি হয়। কিন্তু স্বভাবের

প্রবল প্রবাহ জীবের মুক্তাবস্থা থাকিতে দেয় না, মুক্তির বাধা জন্মায়। দ্বিতীয়তঃ অপরাধের সুদৃঢ় সংস্কার হঠাৎ বিনষ্ট হয় না। কাজেই সকলকে বাধ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ করিতে হয়।

মুক্তির জন্য এইরূপ করিতে হইলে, প্রেমের জন্য যে করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যাঁহারা কৃষ্ণনাম ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নামের স্বাদ গ্রহণ জন্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হয়।

যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, পরজন্মে তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন। ইহা যেমন একটি ব্যবস্থা; মৃত্যুকালে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া মরিতে পারিলে, অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়, ইহাও তেমনই একটি ব্যবস্থা। তাই অজামিলের মুক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাহাই কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? মৃত্যুকালে স্বভাবই আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়।

যে নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলে রাশি রাশি পাপ বিনষ্ট হয়, সে নাম গ্রহণ করিলে জীব পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয়, বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে সেই নামে কোন ফল হয় না। বৈষ্ণবাপরাধ বড় ভয়ানক জিনিষ। সাধক বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সর্ব্বপ্রকারে সতর্ক থাকেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবদিগের বন্দনা করিতে পারিলে বৈষ্ণবাপরাধ প্রবেশ করিতে পারে না। এই কলিযুগে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ প্রেম বিতরণের জন্য অবতীর্ণ। যিনি শ্রীগৌর নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণবদিগের বন্দনা করেন এবং গোস্বামি শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণনাম সাধন করেন, তাঁহার পক্ষে প্রেম-ভক্তি দুর্লভ নহে।

যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করেন না, এবং নাম বলে পাপে প্রবৃত্ত হন, নামের শক্তি সেই সকল ব্যক্তিতে প্রকাশ পাওয়া সুকঠিন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, নাম হইতে অপরাধের বিনাশ হয়, আবার নাম হইতেই অপরাধের উৎপত্তি হয়। "নববিধ-ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়," এই কথা যেমন সম্পূর্ণ সত্য, এই কথার যোগ্যপাত্র হওয়া তেমনই সম্পূর্ণ উচিত। পাত্রভেদে ফলের তারতম্য আছে।

কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণনাম জপিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম জপ করা কর্ত্তব্য। যেমন কৃষ্ণলীলার পদ গাহিবার পূর্ব্বে

গৌরচন্দ্র গাহিবার ব্যবস্থা, সেইরূপ কৃষ্ণনাম জপিবার পূর্ব্বে গৌরনিত্যানন্দের যুগল নাম জপিবার ব্যবস্থা। কৃষ্ণনামে বিচার আছে, ভুক্তি মুক্তির ব্যবস্থা আছে; কিন্তু শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নামে কেবল প্রেমই আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম জপিলেই কৃষ্ণনামে প্রেম আপনা হইতেই হয়। সকলের শ্রীগৌর নিত্যানন্দের যুগলনাম সার করা কর্ত্তব্য। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু না পাইয়ে কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম চৈতন্য নিতাই দিলা যথা তথা। জগাই মাধাই তাহে আনের কি কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার। বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপি দেখি চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিতাই বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। অনায়াসে সর্ব্ব অঙ্গে অশ্রু-গঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলক গদ্গদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনাম ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন বহু অশ্রুধার॥

আর একটা কথা না বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতে পারিতেছি না। সুতরাং সেটিও বলিতে হইল। যে নাম শ্রীকৃষ্ণ বাঁশরীতে সাধিয়াছেন, যে নাম করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্চ্ছিত ও ধূলি ধূসরিত হইয়াছেন, সেই রাধা নামের সুধা কি জীবের ভাগ্যে ঘটে না? রাধা নামের সাধন কোথায়? শ্রীরাধিকাকে ভক্তের মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহার নামের সাধন কেহ অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন করুন, আমরা কিন্তু বলিব, কৃষ্ণ নাম এবং রাধা নাম ভিন্ন নহে, কৃষ্ণ তত্ত্বের মধ্যে রাধা তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। কৃষ্ণনাম সাধন করিতে জানিলেও রাধা নামের সুধা পাওয়া যায়, এবং রাধানাম করিতে জানিলে কৃষ্ণনামের স্বাদ পাওয়া যায়। ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ নাম শুণে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
এবং "কৃষ্ণ নাম রাধা নাম, সত্য সত্য রসধাম।"

রাধা কৃষ্ণ যুগল নামের বিষয় অন্য সাধনাঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। এখন সকলে জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় রাধাকৃষ্ণ বলিয়া নাম সাধনের কথা এই খানে বন্ধ করুন।

হে সহৃদয় পাঠক! আপনি যদি কৃষ্ণ নামের স্বাদ কখন গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর সেই অরুণ আঁখি, সেই বিগলিত অশ্রু, সেই পুলকাবৃত বিশাল দেহ, সেই কৃষ্ণনাম অবরুদ্ধ কণ্ঠ, সেই ঘর্ম্ম, সেই কম্পন, সেই প্রেমবিহ্বলিত ভাব একবার স্মৃতিপথে উদিত করুন। জানিতে পারিবেন,—

"কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

বৈষ্ণব চরণরেণু-প্রয়াসী—শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস।

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ, ভজহ আমার মন, হেন দয়াময় আর নাই রে।
কত শত দুখী জনে, পূর্ণ হল প্রেম ধনে, তাই গোরা গুণ গান গাই রে॥
ব্রজের কিশোরী-মণি, শ্রীরাধিকা সুবদনী, শ্যামল সুন্দর গুণধাম।
দুই জনে হৈল এক, সবে দেখে পরতেক, গোরা দ্বিজরাজ অনুপাম॥
শ্রীগৌরাঙ্গ বল ভাই, হেন প্রভু আর নাই, ভজনীয় সর্ব্ব গুণ-যুত।
সে রাঙ্গাচরণ তলে, রহিলেই কুতুহলে, সদা দেখে সব অদ্‌ভুত॥
জয় জয় দীনবন্ধু, গৌরাঙ্গ করুণা-সিন্ধু, জয় জয় সর্ব্বজন ত্রাতা।
কলি-মল যুত চিত, নর-নারী ছিল ভীত, তারা বলে জয় প্রেমদাতা॥
প্রভুবর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আনন্দকন্দ, গদাধর আর শ্রীনিবাস।
সর্ব্ব পরিকর সঙ্গে, নদিয়া বিহার রঙ্গে, অহর্নিশি কীর্ত্তন বিলাস॥
স্মরিলে সে সব লীলা, শেষ হয় ভবলীলা, ব্রজলীলা প্রবেশে উল্লাসে।
এ বিশ্বাস দৃঢ় করি, সুখের পাথারে পড়ি, শ্রীগৌরবিনোদ রসে ভাসে॥

শ্রীগৌরবিনোদ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনধাম কেশীঘাট।

বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া।

গোরা-বিয়োগিনী বালা নয়নে বহিছে জল,—
ক্ষণে করে হায় হায়, ক্ষণে পথ পানে চায়,—
আলুয়িত কেশদাম চুমিছে চরণ তল।
গদ গদ ভাষে বালা কহে "কোথা প্রাণাধার ?
কি এত করেছি দোষ, কেন বঁধু এত রোষ,
এ জীবনে দিবে না কি মোরে দরশন আর ?
চিরতরে কেন বল ত্যেয়াগিলে অবলায়।
নিতি করি ডাকাডাকি, পাওনা শুনিতে তা কি,
কেন দিলে বুক ভাঙ্গি নিদারুণ উপেখায়।
হেন নিঠুরতা পরে কেন নাথ মোরে আর,—
বিঁধিতেছ অবিরত, আমি যে মরমে হত,
বল বল আরো সাধ কিবা আছে গো তোমার ?
তোমার ঘরণী হ'য়ে কেন অনিমিষু হায়,—
পথের পথিক যারা, তোমা ধনে পায় তারা,—
যতনে লুঠায়ে পড়ে ওই দুটি রাঙ্গা পায় ;
আমিও হতেম নাথ যদি অন্য কোন জন,
তবে এ নয়ন ধারা, মোরে না করিত সারা,
নিদারুণ নিঠুরতা সহিত না এ জীবন।
ইহাই বলিয়া বালা জুড়ি চারু করদ্বয়,—
উর্দ্ধনেত্রে চাহি হায়, যেন কারে ক্ষমা চায়,
আপন হৃদয় বালা চাহিয়া আবার কয়,—
কি বলিলি বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ মোর নিরদয় ?
যদি প্রলয়ের ঝড়ে, দিনকর খসি পড়ে,
মক্ষিকা সুমেরু তুলি অনন্ত মাঝারে লয়,—
অনন্তে মিশিয়া যায় যদি এ ব্রহ্মাণ্ড খান,—
সতী ছাড়ে নিজ পতি, ত্যজে তপ ঋষি যতি,
তবু দয়া মাখা রবে নাথের বিমল প্রাণ।

কে বলে সে গেছে ভুলে হ'য়ে মোরে নিরদয়?
আমার মরম ঘরে, সে যে নিতি খেলা করে,
এক দণ্ড এক তিল মোর কাছ ছাড়া নয়।
যদি গৃহমাঝে মোর রহিত হৃদয়ধন,
(শুধু) রহিতেন পতি মম, আজি মোর প্রিয়তম,
হইয়া জগত পতি তুষিছে জগত জন।
আলয়ে রহিলে শুধু আমিই পেতেম সুখ,—
আজি সারা বিশ্বজন, হেরি তাঁর চু'চরণ
পাইছে অনন্ত শান্তি ভরিয়া দগধ বুক।
সবে সুখে ভাসে হেরি বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি-মুখ,
এ হ'তে সৌভাগ্য আর, কিবা আছে অবলার,
উছসি উঠিছে হিয়া ভাবি এ অতুল সুখ।
যেখানে সেখানে রও রবে মোর (ই) প্রাণাধার,
মোর পতি বিনাভাবে, অন্য-পতি নাহি কবে,
তবে আর কেন কাঁদি কেন এত হাহাকার।
বিলাও বিলাও প্রেম যত সাধ এ ধরায়,—
এ দাসী যেন গো তায়, নাহি হয় অন্তরায়,
আর মোর কোন দুখ নাহি নাথ এ হিয়ায়।
হইয়া জগত-পতি বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণাধার,
এ সারা জগতপরে, সুধা বরিষণ করে,
সুখ শান্তি প্রীতি স্থল আজি গো সে এ ধরায়।
এর চেয়ে কিবা সুখ আছে বা আমার হায়,
আর—নাহি মোর শোক দুখ, নব সুখে পূর্ণ বুক,—
আচণ্ডালে দাও প্রেম মনে যত সাধ যায়।

বৈষ্ণবজনসেবিকা—
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী। হুগলী

শ্রীধামের ধূলোট পর্ব্ব।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামের ধূলোট-পর্ব্বের কথা বৈষ্ণব সমাজের আবাল-বৃদ্ধবণিতাগণের মধ্যে কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন। তবে এই পর্ব্ব কতদিন কাহা কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন না। তাই অদ্য আমরা প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আমাদের শ্রীপত্রিকার পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে প্রস্তুত হইলাম। আমাদের জনশ্রুতি দ্বারা সংগৃহীত বিষয়ের মধ্যে যদি কোন অংশ অসত্য বা অসঙ্গত বলিয়া কাহারও প্রতীতি হয়, তাহা হইলে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিয়া গৌরভক্তগণকে কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ লীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহাদিগের প্রিয় শিষ্যগণ শ্রীধামে বাস করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মাগণ তিরোহিত হইলে শ্রীধাম শ্মশান ভূমিবৎ প্রতীয়মান হইল। শাক্ত রাজা নবদ্বীপাধিপতি শ্রীল কৃষ্ণচন্দ্র বৈষ্ণবদিগকে বড়ই পীড়ন করিতেন, সুতরাং শ্রীধাম ক্রমে এক প্রকার বৈষ্ণব শূন্য হইয়া উঠিল। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর এমন ইচ্ছা নহে যে, শ্রীধাম বৈষ্ণব শূন্য থাকেন। তাই পরম সাধু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব তোতারাম দাস বাবাজী শ্রীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল গিরিশচন্দ্র বাহাদুর তখনকার নবদ্বীপের রাজা ছিলেন। বাবাজী স্বীয় সাধন বলে রাজার নিকট কয়েক বিঘা জমী নিষ্কর ভোগ করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। সেই স্থানেই বড় আখড়া, নূতন আখড়া, নাট মন্দির প্রভৃতি সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই নাট মন্দিরই গানের নাটমন্দির বা গান-তলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিগত ১২৪৫ বা ১২৪৬ সালে ভক্তধুরন্ধর শ্রীমন্মাধব দত্ত নামক জনৈক চুচুড়াবাসী বণিক্, (কেহ কেহ ইহাঁকে উদ্ধারণ দত্ত-বংশ-জাত বলিয়া থাকেন,) এই ধূলোট যাত্রার ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তখন সামান্য একখানি তৃণ কুটীরে এই কীর্ত্তন গান সম্পন্ন হইত, কয়েক বর্ষ পরে নাট মন্দির প্রস্তুত হয়।

ভক্তগণ বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিবেন বলিয়া এই ধূলোট পর্ব্বের সৃষ্টি। রাঢ়দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়কগণ এই সময়ে শ্রীধামে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করেন, এবং নূতন গায়কগণও বৈষ্ণব সমাজে নিজের গুণপণা দেখাইবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

মাঘ সপ্তমী দিবসে এই কীর্ত্তনের অধিবাস হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলার পূর্ব্ব-রাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রসালস পর্য্যন্ত গানের শেষ সীমা। মাঘী পূর্ণিমার পর তৃতীয়ার রাত্রিতেই রাস গান আরম্ভ হইয়া থাকে, গায়কদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনিই রসালস (কুঞ্জভঙ্গ) গান করিবার অধিকারী। আমরা পূর্ব্বে গোবিন্দ দাস, নন্দ দাস, আখুরে গোপাল দাস, হৃদয় দাস এবং বিপীন দাস প্রভৃতিকে কুঞ্জ ভঙ্গ গান করিতে দেখিয়াছি। নন্দ এবং গোপাল দাসের ন্যায় কীর্ত্তনীয়া বোধকরি আর দেখিতে পাইব না। যাহা হউক চতুর্থী দিনে কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া, শ্রীধামের রজঃ লইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রক্ষণ, নৃত্য ও নগর ভ্রমণকেই ধূলোট বলে। এ দিনের নৃত্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নিজ ভক্তগণকে পরম প্রেমানন্দ প্রদান করেন।

ভক্তপ্রবর মাধব দত্ত তাঁহার আজীবন কাল পর্য্যন্ত এই ধূলোট পর্ব্বের আর্থিক সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহাবসান হইলে তদীয় বংশধরেরা কয়েক বর্ষ যাবৎ পিতৃকীর্ত্তি বজায় রাখিয়া, পরে সেই সাহায্য বন্ধ করিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহই দাঁড়াইতে পারে না। শ্রীধামবাসী শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ দাস এবং শ্রীযুক্ত রতনমণি কুণ্ড এই ভার বহন করিলেন, এবং কয়েক বর্ষ কাল এই ধূলোট পর্ব্বের আর্থিক সাহায্য করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন।

তৎপরে ভাগ্যকুল নিবাসী ধনকুবের শ্রীযুক্ত মথুরানাথ রায় এই কার্য্যে সাহায্য করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, ভাগ্যকুলবাসী কুণ্ডবংশীয়গণ নাটমন্দিরের সংকীর্ত্তণ-ব্যয় বন্ধ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিজ মন্দিরে একটী নূতন গানের সৃষ্টি করিলেন, সুতরাং পুরাতন স্থানের গানের বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল।

প্রভুর ইচ্ছায় এবারও গান বন্ধ হইল না। পূর্ব্বদেশীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার পালচৌধুরী সংকীর্ত্তন-ব্যয় বহন করিলেন। এরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এ বৎসর আবার বিভ্রাট উপস্থিত। পাল বাবুদের শ্রীধামে একটী বাড়ী আছে। মাঘী পূর্ণিমার সময়ে শ্রীধামে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়, সকলেই নাট মন্দিরের গানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, পাল বাবুদের নাম অনেকেই হয় ত জানেন না। এই জন্যই হয় ত তাঁহারা নিজ বাটীতে এই গান পর্ব্ব সম্পন্ন করিতে

প্রদান করিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় এবৎসর তাঁহাদের নিজ গৃহের সুমধুর বৎসর খোল করতাল ধ্বনিতে নিনাদিত হইল। কিন্তু বড় আখড়ার ঠাট মন্দিরে যে দ্বাদশ দিবসব্যাপী লীলা কীর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহার বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল। বৈষ্ণব-সেবা ও গায়কের বেতনই এই কার্য্যের মুখ্য ব্যয়, সে ব্যয় সঙ্কুলান করা মহান্ত মহারাজের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু বাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্ত-বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে মুক্ত হস্ত। তাই তিনি এবারে কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত শ্যামবল্লভ দ্বারা এই পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্যামবল্লভ বাবু প্রতিবর্ষেই এই ব্যয় প্রদান করিয়া বৈষ্ণব সাধুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু তাঁহার মঙ্গল করুন!

মাধবার্য্য-প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

শ্রীমন্মাধবাচার্য্য প্রভু সম্বন্ধে যাহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, তাহা মহা বিভ্রাটের কথা। কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না, কিন্তু শাস্ত্রীয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উভয়ের ঐক্য হইলে সেইটী মহা মূল্যবান হইয়া থাকে। যদি কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে, এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ তাহার বিরোধী হয়, তবে বুধগণের নিকট এ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত যে কিরূপ উৎকট হয় তাহা পাঠক মহাশয়গণ সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর খুড়ার পুত্র যে মাধবাচার্য্য, তিনিই মাধবী মাধব, ইহা প্রেমবিলাস গ্রন্থের প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছেন। লেখক আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বংশ নাই। কিন্তু মাধবাচার্য্য প্রভুর বংশাবলী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে এবং তাঁহার পরিবার শিষ্য অনুশিষ্য, ঢাকা ময়মনসিং পাবনা যশোহর রাজসাহী দিনাজপুর রংপুর মালদহ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও সৎশূদ্রাদি অসংখ্য রহিয়াছে, এবং ৺ বৃন্দাবন ধামে তাঁহাদের কুঞ্জও রহিয়াছে। সেই বংশধর গোস্বামীগণ রাঢ়িশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ৫ম বর্ষের ১৫ সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় দ্রষ্টব্য। আর কালিদাসের পুত্র মাধবপ্রভু বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, ইহা পৃথিবী ব্যাপিত কথা,

সকলেই জানেন। কালিদাসপুত্র মাধব, ইনিই মাধবী মাধব। ইঁহার বংশ নাই। যাঁহার বংশ নাই, তাঁহার পরিবার কিরূপে থাকিতে পারে? যিনি ব্রজের মঞ্জরী কি সখা হন, তাঁহারই বংশ "ও যেরূপেই হউক" পরিবার থাকা সিদ্ধান্তের কথা। কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে হইলে দৃষ্টান্তের স্থলে সিদ্ধান্তের আবশ্যক হয় কি? হাতের কঙ্কণ দেখিতে দর্পণের প্রয়োজন হয় কি?

প্রায় ৪০০ শত বৎসর হইতে চলিল পরাশর-পুত্র মাধবাচার্য্যের বংশাবলি এখনও চলিয়া আসিতেছে ও তাঁহারই রচিত কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ। তাহার প্রমাণ ৫ম বর্ষের ১৫ সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, ও তিনিই মাধবী সখী। আর কালিদাসের পুত্র মাধব স্বরূপ সুধীরা সখী, তাহার প্রমাণ বৈষ্ণবাচার দর্পণ ৫ম বিভব ৩৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সুধীরা যে সখী মাধবাচার্য্য এবে। সনাতনমিশ্র পুত্র সুধীরা জানিবে॥
নবদ্বীপে বাস বিষ্ণুপ্রিয়া শাখা জানি। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী যাঁহার ভগিনী॥

বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীনবদ্বীপে মাধব মিশ্র প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি গৌরাঙ্গদেবের শ্যালক, ইহা বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন। বৈষ্ণবাচার দর্পণের লিখিত অনুসারে, শ্রীমাধব, সনাতন মিশ্রের পুত্র এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মাধবাচার্য্য প্রভুর রচিত কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ ব্যতীত, আর এক খানা হস্ত লিখিত "প্রেম রত্নাকর" নামক বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গত আশ্বিন মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, মাধবাচার্য্য চূড়াধারী; বৈষ্ণব ছিলেন না, শাক্ত ছিলেন। মাধবাচার্য্য যে চূড়াধারী নয়, তাহা শ্রীপাট খড়দহ ও শ্রীপাট শান্তিপুর প্রভৃতি গোস্বামিপাদদিগের অনুমোদনে ৺বৃন্দাবনধামের সকল প্রধান প্রধান দেবালয়ের গোস্বামী দিগের প্রদত্ত অভ্রান্ত প্রমাণসূচক যে সকলের স্বাক্ষরযুক্ত এক খানা ২৮। ২৯ বৎসরের দলিল আছে, সেই দলিল খানা ৺ধাম হইতে আনাইয়াছি। তাহা পাঠক ও সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ প্রকাশের মানসে ছাপাইতে দেওয়া হইয়াছে। ছাপা হইলেই শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ জন্য পাঠাইব।

আর এক কথা, মাধবাচার্য্য প্রভু বৈষ্ণব ছিলেন না, শাক্ত ছিলেন, কেবল কপটতা করিয়া বৈষ্ণব বেশে গোপদিগকে ভুলাইয়াছিলেন। পাঠক এই বিষয়টী ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন, ইহা কেমন আশ্চর্য্যের কথা। আশ্বিনের পত্রিকায় প্রকাশ ছিল যে, মাধবাচার্য্যের কেবল একটী পুত্র ছিল, তাঁহার নাম জয়রাম গোস্বামী। তবেই জানা যাইতেছে যে, মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র বা শিষ্য ছিলেন, ইহাই নিঃসন্দেহের কথা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত গুলিন গোস্বামী, মহান্ত ও বৈষ্ণব হইয়াছেন তাঁহারা কি পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন? না মহাপ্রভুর করুণা প্রভাবে অন্যান্য মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন? হইতে পারে, এ স্থলে স্বীকার্য্য মাধবাচার্য্য প্রভু মূলে শাক্ত ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর করুণা গুণে বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি আমি শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া মহাপ্রভুর বাটীর গোস্বামীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ ঠাকুর (বিগ্রহ) কাহার স্থাপিত? ও আপনারা কি পরিবার ও কি স্বরূপ? তাহা তাঁহারা বলিতে পারিলেন না; কেবল বলিলেন যে, এই মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থাপিত ও ইহা বিষ্ণুপ্রিয়ার শাখা মাধব মিশ্রের পাট। পাঠক মহাশয়গণ! উপরোক্ত সমস্ত বিষয় পাঠ করিয়া সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, দুইটী পক্ষ অনুকূল ও প্রতিকূল থাকায়, আপন আপন পক্ষ টানিয়া কোন কোন গ্রন্থে কোন কোন কথা প্রক্ষিপ্ত বা ও কোন কোন কথা ত্যাগ করিয়া, আপন আপন মত প্রবল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার দর্পণের ৩৪১ পৃঃ ৫ম বিভব ও ৫ম বর্ষের ১৫ সংখ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা পাঠ করিলে, পাঠকগণ তাহার সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

পাঠক এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চূড়াধারী প্রবাদটী তবে কাহার হইল? উত্তরে বলিতেছি। মুর্শিদাবাদের অধীন বাজিতপুরের ৺ শ্যাম ও সর্ব্বেশ্বর নামক বিগ্রহদিগের মহান্ত চূড়াধারী ও তাহারা শূদ্র জাতি। এই পাটে যখন যিনি মহান্ত নিযুক্ত হইয়া গদিতে বসেন, তখন তিনি মাথায় চূড়া বান্ধিয়া স্বয়ং রূপ ধারণ করিয়া বসেন; এই কথা দেশ বিখ্যাত। পরাশর পুত্র মাধবাচার্য্য প্রভুর সহিত এই পাটের কোন সংস্রব নাই।

বৈষ্ণব দাসানুদাসের অযোগ্য দাস শ্রীঠাকুরদাস দাস।

মকদমপুর, মালদহ।

শুভ সমাচার।

বিগত ৩০ পৌষ এবং ১লা ও ২রা মাঘ দিনত্রয় মালঞ্চী শ্রীহরিসভার ৭ম বার্ষিক মহোৎসব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদগণ আগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ, ও ভক্তিবিষয়ক সুমধুর হৃদয়গ্রাহি বক্তৃতা ও হরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী প্রভু সুমধুর কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গান করিয়া স্ত্রী পুরুষ আবালবৃদ্ধকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নবীন বয়সে যেরূপ প্রেমের ভাব দেখিলাম এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেরূপ অধিকার করিয়াছেন, ইহা দ্বারা বৈষ্ণব জগতের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

* * * *

নৈহাটি ষ্টেশনের বাজার মধ্যে একটী মেলা আরম্ভ হইয়াছে। তথায় নদীয়ার কারিগরের কতকগুলি নয়নানন্দকর ছবি দেখিলাম। ১ম ছবি—মহাপ্রভুর জন্ম, অতি অপূর্ব্ব দর্শন। তার পর প্রভুর ষষ্ঠী পূজার দৃশ্য। ২য় ছবি—গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি পঞ্চতত্ত্ব ছবিগুলি ভাবপূর্ণ; দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। ৩য় ছবি—ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি। ৪র্থ ছবি—কাজির লোকজন কর্ত্তৃক প্রভুর নগরকীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিতে আগমন। সকলের হাতে লাঠি, ভয়ানক মূর্ত্তি। ভক্তগণ কীর্ত্তনে বিভোর, কোন ভয় নাই, প্রভুর পানে চাহিয়া আছেন। ৫ম দৃশ্য—পাষণ্ড দলন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মধ্যস্থলে, চারিদিগে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। এই দৃশ্যগুলি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। নগরে নগরে এইরূপ প্রদর্শনি হইলে সকলেই প্রাণ ভরিয়া প্রভুর লীলা দর্শন করিতে পারেন। নদিয়ার কারিগর দ্বারাই নদিয়া-নাগর বেশ প্রকাশিত হন। আমার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় একজন কারিগরকে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কারিগর বলিল, একটি প্রতিকৃতি পাইলে গড়িতে পারি। তাহাকে আমাদের ফটোগ্রাফ শ্রীচৈতন্য ভাগবত পড়িতে দেওয়া গেল। তিনি পাঠ করিয়া একটী মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। শ্রীমায়াপুরধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত ও রূপ মধুর মূর্ত্তি কোন খানে দেখি নাই। সেও শ্রীগৌরাঙ্গদাস শ্রীযুত দ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের মনোনীত। তিনি

আমাদের প্রভুর বড়ই প্রিয়, প্রভুর লীলাক্ষেত্র তাঁহার স্বরূপ, বেশ ইঞ্জিনয়ারিং করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

বিগত ১০ই মাঘ সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কলিকাতা নগরে শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের বড়ই আনন্দ হইয়াছে। ৺কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে বৈষ্ণব, শাক্ত, যোগী, স্ত্রী পুরুষে পুরশ্চরণে বসিয়াছেন, সকলেই ধ্যানে মগ্ন, সকলেই স্বীয় মন্ত্রজপে বিভোর, সহস্র সহস্র নরনারী মাকে এই গ্রহণ সময়ে দর্শনার্থ ব্যস্ত, শরীরের কষ্ট তৃণজ্ঞান করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কে কাহার উপর পড়ে জ্ঞান নাই, বহুমূল্য বস্ত্র ছিঁড়িতেছে। শ্বাস রুদ্ধ হইতেছে, কোন বাধা নাই। স্ত্রীগণ ছাদের উপর হইতে গঙ্গা জল তণ্ডুল ও পুষ্প বর্ষণ করিতেছে, প্রাঙ্গনে "বল ভাই গৌর নিতাই" কীর্ত্তনের রবে মৃদঙ্গ করতালের গগনভেদী রব উঠিতেছে, কীর্ত্তনে সকলেই উন্মত্ত হইয়াছেন। আজ সব পীতবরণ হইয়াছে। কীর্ত্তনের মানুষ গুলি হরিদ্রা বর্ণের। গ্রহণচ্ছলে হরিনাম করিয়া প্রভুর জন্ম। আজও অবশ্য তিনি এই কীর্ত্তনে আসিয়াছেন। তাহাতেই বুঝি সব মানুষ গৌরবরণ হইয়াছে। এইরূপ মাঝে মাঝে গ্রহণ হইলে ভারতের অমঙ্গল দূর হইবে ও হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইবে। শ্রীমুকুন্দলাল দাস। মালঞ্চী।

"অনুরাগ-বল্লী।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদে ও গৌরভক্তগণের আশীর্ব্বাদে আজ আমরা আর এক খানি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। গ্রন্থখানির নাম "অনুরাগ-বল্লী," গ্রন্থকার শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য মনোহর দাস, গ্রন্থরচনার কাল ১৬১৮ শকাব্দা, এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থকারের পরাপর গুরু শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের চরিত্র আস্বাদন।

এই গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা উত্তম রূপে জানিতে পারা যায়। শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামী শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস গ্রন্থে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে অনেকেই মনে করেন গোপালভট্ট গোস্বামী প্রবোধানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। কিন্তু

এই গ্রন্থকার শ্রীমনোহর দাস সেই সকল বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, এবং প্রবোধানন্দকে মহাপ্রভুর প্রিয়-ভক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর গুরু ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরী পাঠ করিলেই পাঠকগণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সক্ষম হইবেন।

এই গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার স্পষ্টরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করেন নাই, তবে সপ্তম মঞ্জরীতে আচার্য্যপ্রভুর শাখাবর্ণন প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে—

শ্রীশ্যাম দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাঁর ছোট শ্রীরাম চরণ চক্রবর্ত্তী হয়॥
পরমার্থে দুই ভাই প্রভুর সেবক। ব্যবহার ক্রমে দোঁহে হয়েন শ্যালক॥
ছোট জন ভক্তিগ্রন্থ পড়িবারে সঙ্গে। চিরদিন ছিলা রাধাকৃষ্ণলীলা রঙ্গে॥
প্রবাস চলিলে মাত্র বন্ধন করয় * * * *

শ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আচার্য্যপ্রভুর শ্যালক রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য রামশরণ চট্টোরাজ, এই রামশরণ চট্টোরাজের নিকটেই মনোহর দাস দীক্ষা মন্ত্রগ্রহণ করেন। রামশরণের বাস স্থান কাটোয়ার নিকট "বাইগণকোলা" বা, "বেগুণকোলা" গ্রাম। মনোহর গুরুকুলে বাস করিতেন তাহা তাঁহার এই গ্রন্থেই প্রকাশ।

গ্রন্থকার নিজ-মত সংস্থাপন করিবার জন্য অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং একটী একাদশক দ্বারা স্বীয় গুরুদেবকে স্তুতি করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে মনোহর সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য বুৎপন্ন ছিলেন।

তিনি ১৬১৮ শকাব্দার চৈত্র শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ কোন গ্রামে বসিয়া "অনুরাগ-বল্লী" রচনা করেন।

বাঙ্গালা ভাষাও গ্রন্থকারের বেশ আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁহার লেখায় যতিদোষ, মিলদোষ বা গ্রাম্যদোষ পরিলক্ষিত হয় না। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীআচার্য্য প্রভুর জীবনী সংগ্রহ করিতে যে সকল বিষয় প্রয়োজন, তাহাতে তিনি বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তবে তিনি তৎকালের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই কবিত্বশক্তি দেখাইবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত চতুর্দ্দশাক্ষরবৃত্তি পয়ারছন্দে লিখিত। ইহাতে দুইটী মাত্র

পদ আছে, তাহা শ্রীআচার্য্যপ্রভুর রচিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতি মঞ্জরীর শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

শ্রীরূপ নপকিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস॥

এই গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা জানিতে পারা যায়। তাহার মধ্যে পঞ্চনামগ্রহণ একটী। পঞ্চনাম-গ্রহণ লইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই পঞ্চনামগ্রহণ-প্রণালী আধুনিক কোন রসিকভক্ত-গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রচারিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু অনুরাগবল্লী পাঠে জানা যায় যে মনোহর দাসের সময়েও পঞ্চনামগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা তৃতীয়-মঞ্জরী শ্রীআচার্য্য প্রভুর মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবে—

প্রথমে করিলা কৃপা শ্রীহরিনাম। তবে রাধাকৃষ্ণ দুই মন্ত্র অনুপাম॥
পঞ্চনাম শুনাইয়া সিদ্ধ নাম দিলা। শ্রীমণি মঞ্জরী গুরু মুখেতে শুনিলা॥

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবেও এইরূপ লিখিত হইযাছে—

হরিনাম রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র পঞ্চনাম। দিয়া কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান॥
ইত্যাদি।

গ্রন্থকার শ্রীআচার্য্যপ্রভুর মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবের মধ্যেই মঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজন, অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ, শ্রীকৃষ্ণে পরকীয় নাগর জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের কোন সংস্রব নাই এবং শ্রীরূপ মঞ্জরীর যূথেই সকল ভক্তের গতি ইত্যাদি সিদ্ধান্ত দ্বারা গৌর-প্রাণ বৈষ্ণববৃন্দের ভজন-প্রণালীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মনোহরের শ্রীবৃন্দাবনে গৌরবিগ্রহ স্থাপন বৃত্তান্তটী অতীব মনোহর। চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের বিবরণ এরূপ বিশদরূপে বর্ণন আর কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না।

অধিক কি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবদিগের ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনে আশ্চর্য্য কাণ্ড।

জানি না, কে কোথা হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ব্রত-মন্ত্রের মীমাংসা শিরোনাম দিয়া একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছে। বৃন্দাবনে এই বিজ্ঞাপনটা ঢাকার বাবু লালমোহন সাহার দাতব্য চরিতামৃতের সঙ্গে অনেকে পাইয়াছেন। কিন্তু ইহার নিম্নে শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ জীউর টহলিয়া শ্রীজগন্নাথ দাস কামদারের নাম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানিলাম যে তিনি এ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। এই বিজ্ঞাপনের বিষয়ে আমার একটু লিখিবারও প্রয়োজন আছে, কারণ ইহাতে আমারও বিষয় লেখা আছে।

এই পত্রে একখানি মীমাংসা পত্রের উল্লেখ আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, আমার সম্মতি মত এই মীমাংসা হইয়াছে। গৌরভক্তগণ ইহা দেখিয়া অবশ্য আমার উপর বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হইবেন। কিন্তু ইহা আমার সম্মতি মত হয় নাই। শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরে এই মীমাংসা পত্রে সাক্ষর করিবার জন্য আমাকে অনেক উৎপীড়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু আমি কোন প্রকারে স্বাক্ষর করিলাম না। আমি এখন জানিতে চাহি যে, আমার বিনা অনুমতিতে আমার নাম উহাতে কেন দেওয়া হইল?

এই মীমাংসা পত্রে সারল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বিবাদের মীমাংসা না হইয়া বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রত মন্ত্রাদিকে শাস্ত্রীয় ও বিধি প্রযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। সেই কারণে কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে একটা দেশব্যাপি আন্দোলন হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রত-মন্ত্রাদি শাস্ত্রীয় ও বৈধ। সেই সময় হইতে প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় একটা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র দল করিয়া আছেন। সাহা মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রভুপাদের দলের লোক। তাহার ইচ্ছা এই দলটা যাহাতে বজায় থাকে তাহাই করা। সেইজন্য তিনি দুই দলকে এক করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির অনেক দিন স্বতন্ত্র ছিলেন সম্প্রতি শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরও সেই দিকে গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিবাদ মীমাংসা কিছুই হইল না। শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির, শ্রীরাধারমণ জীউর

মন্দির, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশের প্রধান স্থান শ্রীশৃঙ্গারবট, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশের প্রধান স্থান পুরাতন সীতানাথ জীউ ও সমস্ত ব্রজমণ্ডলস্থ বৈষ্ণবগণ প্রভৃতি মহোদয়গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রত-মন্ত্র লইয়াই আছেন। পূর্ব্ব আন্দোলনের সময় ইহাঁরা সকলে প্রতিজ্ঞা করেন যে, "যে কোন ব্যক্তি প্রভুত্রয়ের জন্মদিনে উপবাস উপাসনা সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন, আমরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিব। ইহা আমরা শ্রীগুরু-গোবিন্দ-গৌরচন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। যিনি বিপক্ষ-গণের ভয়ে শাসনে প্রলোভনে পূর্ব্বলিখিত বিষয়ের কোন অংশের অন্যথা করিবেন, তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও শ্রীহরি-গুরু বিমুখ হইবেন।"

শ্রীব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবগণকে শ্রীবৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং প্রভুপাদের এই মীমাংসা গ্রাহ্য করিবার জন্য চতুর্ব্বিধ উপায়ই করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী প্রভু সরল ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রত-মন্ত্রাদিকে শাস্ত্রীয় ও বৈধ বলিয়া সমাদর না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত আমরা সেই দলে মিলিতে পারিব না। সরল ভাবের তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত প্রভু বিদ্বান্ ও লেখাপড়া জানেন। তিনি কৃপা করিয়া ইহা প্রকাশ করুন যে ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-মত-বোধিনী সভার সময়ে তাঁহার যে মত ছিল, এক্ষণ তাহাতে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি কোন্ কোন অংশে মানিতেন আর কোন্ কোন্ অংশে মানিতেন না, এক্ষণই বা কি মানেন কি মানেন না, ইহা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করারই নাম সরল ভাব। যদি বা "পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে," প্রভুর লিখিত এই ফাঁকির এই অর্থ হয় যে, প্রভুর মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পূর্ব্বে যে মত ছিল এক্ষণও তাহাই আছে, তাহা হইলে আমরা জানিতে চাহি যে মীমাংসা কি হইল? যাহাদের কেবল খাওয়া দাওয়া লইয়া গোলমাল, তাহাদের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। কিন্তু যাহাদিগের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব লইয়া গোলমাল, তাহাদিগের সহিত কি মীমাংসা হইল? অতএব এই পত্রিকা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে ও শ্রীগৌরভক্তগণকে জানাইতেছি যে আমি কোন মীমাংসা করি নাই এবং শ্রীবৃন্দাবনেও কোন মীমাংসা হয় নাই।

অবনত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী।

শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর মন্দির।

আমাদের নিবেদন।

আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হয়, তখন শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী প্রভুপাদকে সকলে বেশ চিনিতে পারেন। তাঁহার এই আচরণে গৌরভক্তগণ মর্ম্মাহত হন, এবং তাঁহদের নিকট তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন। এই কয়েক বৎসর আর কোন উচ্যবাচ্য না করায় ক্রমে তাঁহারা প্রভুপাদের অপরাধ বিস্মৃত হইতেছিলেন। কিন্তু আবার যখন তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, তখন গৌরভক্তগণ আর তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন না। "যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর বিদ্বেষী, সেই আমাদের ত্যজ্য," এই কথা স্মরণ করিয়া গৌরভক্তগণ এখন সাবধান হইবেন। এখানে সাহা মহাশয়কে আমদের একটী বক্তব্য আছে। তিনি যে আজ মহাপ্রভুর কথা লইয়া আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার কি একটু কৃতজ্ঞতাও নাই? যদি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতীর্ণ না হইতেন, যদি তিনি জাতিবিচার না করিয়া, আচণ্ডালকে উদ্ধার না করিতেন, তবে আজ সাহা মহাশয়ের স্থান কোথায় হইত?

প্রার্থনা।

তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, পরমাত্মা, পরাৎপর,
বিশ্বরূপ বিশ্বের ঈশ্বর।
আদি অন্ত নাহি তব, ত্রৈলোক্য ব্রহ্মাণ্ড সব;
আছে লোম কূপের ভিতর।
তুমি প্রভু সর্ব্বোপর, কেহ নাহি তব পর,
সৃষ্টি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
তোমার সংসার যাত্রা, তুমি অধিপতি ত্রাতা,
তুমি অধিকারী মহাশয়॥
তুমি প্রভু মূলাধার; বেদে কি জানে তোমার,
কত রূপে কত অবতার।
তোমার গুণ মাহাত্ম্য না জানে শিব অনন্ত,
কি জানে এ নারী জাতি ছার॥

কলি প্রবর্ত্তন কালে, তুমি হৈলা সেই স্থলে,
সংসার যাত্রায় অধিষ্ঠান।
জীবেরে সদয় হৈয়া, শচী গর্ব্ভে উদয় হৈলে,
জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান॥
তুমি গৌড় গুনমণি, সংকীর্ত্তন শিরোমণি,
পতিত পাবন দয়াময়।
তব প্রিয় মহেশ্বর, ভক্তিমাখা কলেবর,
স্মরণে শমন পরাজয়॥
গোলোক বৈকুণ্ঠধাম, ত্রিভুবনে অনুপাম,
গোলোক ত্যজিয়া কি কারণে।
নিগমে গোপন সাজি, চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ নাই,
ভক্তের হৃদয় সিংহাসনে॥
করুণার কল্পতরু, কৃপা-সিন্ধু বিশ্ব-গুরু,
প্রেম-রত্ন দিলে জনে জনে।
পাপী তাপী দুষ্ট জন, দয়া করে কে এমন,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বিনে॥
রাসসুন্দরী অভাজন, আশা পাব শ্রীচরণ,
না জানি কি হবে দয়াময়!
নিরাশ করো না হরি, দিতে হবে পদ-তরী,
এ দীনার প্রাণান্ত সময়॥

শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসী।

—•—

গ্রন্থ প্রাপ্তি স্বীকার।

ভক্তিময়ী—শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। হাটখোলা সাধারণ হরিসভার অন্তর্গত বান্ধব সম্মিলিতে গীত। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী তরুণ যুবক, তিনি এই কীর্ত্তন প্রচারের

দিনে কতকগুলি সঙ্কীর্ত্তন পদাবলী, "ভক্তিময়ী," নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করায় আমরা সুখী হইয়াছি। কেন না আজিকার দিনে ধনী ও জমীদার পুত্রগণের যে সকল সাধারণ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, শরৎ বাবুতে তাহার ঠিক বিপরীত পরিলক্ষিত হইল। তিনি যে এই সময়ে সাধারণ নায়ক নায়িকা ঘটিত গীত রচনা না করিয়া, হরিগুণ গানে মত্ত হইয়াছেন, ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। এই গ্রন্থ তাঁহার প্রথম উদ্যম হইলেও আমরা তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তিনি যে এক জন গৌরভক্ত, তাহা তাঁহার প্রথম সংখ্যক গীতটী পাঠ করিয়া জানিতে প্পারা গিয়াছে। শ্রীপত্রিকার পাঠক গণের অবগতির জন্য সেই প্রথম গীতটী একাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

তাল কাটা চৌতাল।

কি ভাবে কিসের অভাবে নবদ্বীপে অবতীর্ণ।

বৃন্দারণ্য করি শূন্য ও কি জন্য শ্রীচৈতন্য॥

কাল রূপ পরিহরি, ন'দে এলে গৌরহরি, এ ভাব বুঝিতে নারি, হেরে জ্ঞান হয়েছে শূন্য। ইত্যাদি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহার প্রকাশক ভক্তবর শ্রীযুক্ত বাবু রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কৃত এই গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তিনি তাঁহার লিখিত ভূমিকায় অতি বিশদভাবে সঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য লিখিয়া পাঠকগণের সংকীর্ত্তন গ্রন্থ পাঠে রুচি জন্মাইয়া দিয়াছেন। ভরসা করি লেখক ও প্রকাশক এই রূপ গ্রন্থ নিচয় প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম প্রচার কার্য্যে সহায়তা করুন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার অষ্টম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের নিকট শ্রীপত্রিকার মূল্য বাকি আছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। এ সম্বন্ধে বারম্বার পত্র লিখিতে আমরা নিতান্ত কুণ্ঠিত হই, ভরসা করি এই বিজ্ঞাপনকেই সকলে পত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। ইতি

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিদায় দান।

যে দিন প্রথম নাথ, হেরিনু ও মুখচাঁদ,
হারায়েছি আমি সমুদায়।
সব করি সমর্পণ, পেয়েছিনু শ্রীচরণ,
আজি তুমি মাগিছ বিদায়!
যত কিছু এ জগতে কিছু লাগিত না চিতে,
তব আগে কিবা কোন ছাব।
এ জগতে কোন্ ধনী, আমা সম আছে ধনী,
শ্রীচরণ সম্পত্তি আমার।
নাথ, গৃহকাজে রহি, মনে জাগে বহি রহি,
বিধি দিয়াছেন যেই ধন
মোর সে নিধির কাছে কিবা এ জগতে আছে,
আমার সম্পত্তি শ্রীচরণ॥
নাথ, তুমি নিদ্রা গেলে, বসি তব পদ তলে,
হেরিতাম চরণ যুগল
অতুল গৌরবে মোর, নয়নে বহিত লোর,
এ সম্পত্তি আমারি কেবল!
প্রভু তুমি নিতি নিতি, কীর্ত্তনে পোহাও রাতি,
একা গৃহে আমি ভাবি মনে।
তব পদ সেবা ভার, আমারি ত অধিকার,
চিরদিন তোমার চরণে।
আমারি ত আছে নিধি, দিন যবে দেন বিধি,
পূরাইব সাধ সমুদায়!
হেরি তব পদতলে, সবে ভাগ্যবতী বলে,
আজি তুমি মাগিছ বিদায়!
কি ভাগ্য করিছি আমি, চরণে রাখিবে তুমি,
কত জন্ম সাধনের ধন।
পেয়েছিনু অবহেলে, তাই হারাইনু ফেলে,
তোমার দুখানি শ্রীচরণ!

যেন শতদল দল, অরুণ ও-পদতল,
কেমনে চলিবে বল পথে;
কণ্টক বিঁধিবে পায়, কত ব্যথা পাবে তায়,
কত বা সহিবে মোর চিতে!
নাথ, তুমি মাগিছ বিদায়!
গতি তুমি, তুমি স্বামী, কি আর বলিব আমি,
ভিক্ষা মাগি তোমার ও পায়॥
যেন ওই শ্রীচরণ, আমার সর্ব্বস্ব ধন,
কভু না হারাই প্রাণেশ্বর
বলাই দাসের দাসী, তুয়া পায় অভিলাষী,
দুঃখিনীরে আশীর্ব্বাদ কর॥

—o—

শ্রীপ্রিয়াজীর আক্ষেপ।

দুঃখিনীর প্রাণধন নদীয়ার চাঁদ।
দাসী হব তব পায় ছিল বড় সাধ।
দিয়াছিলে রত্ন মোরে অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভয় হতো সদা পাছে ফেলি হারাইয়া
তাই নিধি সপিলাম তোমার চরণে।
চাহ নাথ একবার প্রসন্ন নয়নে॥
আগে শুনিতাম তব মধুর চরণ
কত মধু রাঙ্গা পায় জেনেছি এখন॥
চরণ শীতল তব শুনিতাম কাণে
এবে পড়ে আছি সেই শীতল চরণে॥
না জ্বালিতে যদি প্রভু হৃদয়ে অনল।
কোথা পাইতাম তব চরণ শীতল॥
নাহি দিতে যদি বঁধু দারুণ পিপাসা।
কেমনে এ সুধা পানে মিটা'তাম তৃষা॥
ধন লয়ে দিবানিশি কেন বহি ভার।
তুমি ত রয়েছ মোর অক্ষয় ভাণ্ডার॥
আগে শুনেছিনু নাথ বাঁশী বাজে বনে।
এবে সেই বাঁশী শুনি শয়নে স্বপনে॥
নানা কথা বলে লোকে আমি শুনি বাঁশী।
ও চরণের গুণ গায়ে বলা'য়ের দাসী॥

খাটী সুখ।

মানুষ সুখ চায়! যেখানে থাকুক, যে অবস্থায় থাকুক, যে কার্য্য করুক, বা যাহা ভাবুক—সুখ তাহার লক্ষ্য। মানুষের সমস্ত গুলি বাসনা সুখরূপ কেন্দ্রের দিকে প্রধাবিত; অথচ কি জানি, কেমন মায়ার ঘোরে, মোহের আন্ধারে, কুবুদ্ধির কুহকে পড়িয়া মানুষ বেমালুম অশান্তি ও দুঃখের আঁধার কূলে পতিত হয়, পতিত হইয়া পাছে হা হুতাশ করিতে থাকে! সে তখন বুঝিতে পারে যে, সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে,—সে যাহা সুখকর বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহা প্রকৃত সুখকর নহে, ভ্রান্তি মাত্র, তৃষাতুর মৃগের মরিচীকা মাত্র। এই ভবের বাজারে মানুষ চিরদিনই এইরূপ প্রতারিত হয়,—গিল্টি জিনিস সোণা ভ্রমে ক্রয় করিয়া পাছে হা হুতাশে মরে

কোথায় প্রকৃত সুখের উৎপত্তি, কোথায় উহার স্থিতি, কি প্রকারে উহার বিস্তৃতি, উহার পরিণতিই বা কোথায়, এই তত্ত্ব না জানিয়া কেবল সুখের জন্য ছুটাছুটী করিলে, কোথাও মানুষ সুখ লাভ করিতে পারে না ভবের গিল্টি করা সুখের জন্য আমরা অনেকেই পাগল। খাটী-সুখ না চিনিয়া অখাটীতে মাতিয়াছি, ঠকিতেছি পদে পদে, ঠকিতেছি যে তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু বুঝিয়াও যে শিখিতেছি না ইহাই আশ্চর্য্য।

গিল্টি কয় দিন টিকে? তৈলে জলে তাপে আজ না হয় দুই দিন পরে গিল্টি উঠিয়া যায়; যে সোণার দরে গিল্টি জিনিস খরিদ করে তখন তাহার চৈতন্য হয়। কিছুকালের জন্য ভ্রম ঘুচিয়া যায়, তখন আপশোষের আর সীমা থাকে না ভবের বাজারে প্রতি মুহূর্ত্তেই এইরূপ দুঃখ ঘটে। ধনে ধান্যে, রাজ্য সম্পদে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, স্ত্রী পুত্রে, ইহার যেখানেই সুখের আশা সংস্থাপন করা যায়, সেইখানেই নূন্যাধিক প্রতারিত হইতে হয়। লাভের আশায় বাণিজ্য করিতে যাইয়া অনেককেই সমূলে হারা হইতে হইয়াছে। তাহাদের নয়নজলে মা বসুন্ধরাও অনেক পরিমাণেও গলিয়াছেন। প্রেমের আধার প্রণয়িণী, প্রাণের অধিক পুত্র, অতি স্নেহের সহোদর,—ইহার কেহই প্রকৃত সুখ দিতে পারে না, বরং অনেক সময়েই অভাবের তাড়নায় যমের যাতনায় ইহাদিগের জন্যও বহুল ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। গিল্টি সুখের এইরূপ

অবস্থা। কিন্তু খাটী সুখ খাটী সোণার মত খাটী সোণা আজও যেমন দশ দিন পরেও তেমন, ছায়াতে যেমন রৌদ্রেও তেমন, ঘরেও যেমন বাহিরেও তেমন, তৈলেও যেমন জলেও তেমন। কোন অবস্থাতেই তাহার বিকৃতি জন্মে না। কিছুতেই উহার বিকৃতি জন্মাইতে পারে না।

এইরূপ যে সুখ নিত্য তাহা সর্ব্বদাই স্থায়ী। অভাবের তাড়নায়, যমের যন্ত্রণায়, হিংসা দ্বেষ ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কুবাসনার উত্তেজনায়, সে সুখের বিকৃতি জন্মে না। প্রেমময়ের প্রেমামৃতে তাহার উৎপত্তি, বিশুদ্ধ নিষ্পাপ প্রেমিক হৃদয়ে উহার স্থিতি, নিঃস্বার্থতায় উহার বিস্তৃতি, মানুষকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া দেওয়াই উহার পরিণতি। এই সুখ আস্বাদনে মর-জগতের অশান্ত মানুষ অমর হয়েন, লক্ষপতির রাজসুখে তাঁহার তাচ্ছিল্য জন্মে, শোক তাপ জ্বালা যাতনা দূরে যায়, তিনি হিংসা দ্বেষ ক্রোধাভিমানেও প্রেমের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হয়েন। তিনি শোকে গলেন না, লোভে ভুলেন না, লাভে টলেন না। তিনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই স্থির গম্ভীর ভাবে নিত্য সুখে কাল যাপন করেন। এহেন মনুষ্য আমাদের এই দগ্ধ সংসারে নন্দন-কাননের সৃজন করেন। তাঁহার কথায় তাপিত প্রাণ শীতল হয়, দর্শনে নয়ন চরিতার্থ হয়, উহাঁর চরণ-রেণু-স্পর্শনে দেহ মন পবিত্র হইয়া যায়। ইনিই সুখের মানুষ অথবা ইনিই সুখ।

এতাদৃশ মহানুভবগণের সংসর্গ খাটী সুখের একটী উপায়। ইহাদের সংসর্গে যে একটী আনন্দ জন্মে তাহাই খাটী সুখ। এই সুখে চিত্ত প্রসন্ন হয়। অন্যান্য কোন সুখের সহিত ইহার তুলনা হয় না। ধন ধান্য, বিষয় আশয়ে, পুত্র কলত্রে, ছাই ভস্মে খাটী সুখ কোন দিন মিলে নাই, কোন দিন মিলিবেও না। তবে যাঁহারা সারগ্রাহী তাঁহারা হয় ত মধুমক্ষিকার ন্যায় সকল পদার্থেই খাটী সুখ বাছিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অসতে সৎ, অখাটীতে খাটী, বুঝিয়া লওয়া সকলের আয়ত্ত নহে। মানুষ আপন অজ্ঞতায় এখানে সেখানে সুখের আশায় তৃষাতুর মৃগের ন্যায় দিবা নিশি কেবল সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। মানুষ তখন মরুভূমির ভ্রান্ত তৃষাতুর মৃগের কার্য্যেরই ঠিক অনুকরণ করে। মানুষ তখন দিশেহারা হইয়া যায়,—সুখের আশায় ধাবিত হয়, যাহা সুখ বলিয়া পূর্ব্বে বোধ করে, পরে তাহাই দুঃখজনক বোধ হয়, তখন বুঝে উহা

সুখ নহে—ছলনা মাত্র—চক্ষের ধাঁধা মাত্র—মনের খেয়াল মাত্র; আবার হয় ত ডাহিনে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, এখানে সেখানে সুখের অন্বেষণ করে। কিন্তু মায়িক সংসারে সর্ব্বত্রই প্রতারণা—সর্ব্বত্রই মিছে ধাঁধা। তখন নিরাশায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দেহ অবসন্ন হয়, এবং অন্তরাত্মা নিভৃত বিরলে বিষাদিনী চিন্তা লইয়া জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

এই ঘোর নারকীয় যাতনায়, এই তীব্র বেদনায়, এই নিরাশার ভীষণ চাপে সহসা বিষণ্ণ জীবের রুদ্ধ কণ্ঠে সময়ে সময়ে শ্রীভগবানের কৃপা-সুধা তদীয় মধুর নামের আকারে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। সে মধুর নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই প্রাণের অশান্ত ভাব নিমিষের মধ্যে উড়িয়া যায়, বিষণ্ণ হৃদয় প্রফুল্ল হয়, মলিন মুখে আশার হাসি ফুটিয়া উঠে, অঙ্গে অঙ্গে নব নব শক্তি সঞ্চারিত হয়, মানুষ তখন মরিতে বসিয়াও নবজীবন লাভ করে। পতিত দুর্গত ভব-মোহান্ধ জীবগণের প্রকৃত সুখের উপায় এই তারকব্রহ্ম নাম। দুঃখী তাপের ও নিরাশ জীবের হৃদয়ই উহার সাক্ষ্য। শাস্ত্রীয় উপদেশ উদ্ধার করার ভার পণ্ডিত জনের উপর। প্রত্যেকের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেই ইহার অকাট্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

সেই সুখ-স্বরূপকে লাভ করার আমাদের আর একটী উপায়—অনন্য মনে ভক্তি ও প্রেম ভরে তাঁহার শ্রীশ্রীনাম গ্রহণ। আমরা তাঁহাকে এ অবস্থায় সহজে ধরিতে পারি না। সেই 'অধরা' কেবল আমাদিগকে নামে ধরা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের নাম অভিন্ন; বরং শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তাঁহার নাম ভারী—সত্যভামার ব্রত-দক্ষিণার সময় এই সত্য প্রকটিত হইয়া গিয়াছে। নাম নিত্য, নাম পূর্ণ এবং নামই শুদ্ধ। ভক্তিভরে নাম করিলেই হরি মিলে, ডাকিলে তাঁহাকে আসিতে হইবে, আমার মুখ পানে চাহিতে হইবে। ইহা অতি সত্য। অবিশ্বাসের কারণ নাই—পরীক্ষিত সত্য। স্বর্গ কামনা ব্যবসায় মাত্র—কিঞ্চিৎ লাভ আছে—তাহাও অতি তুচ্ছ। কিন্তু লোকসানের ভয় সর্ব্বদাই বড় বেশী—এ লাভের আশা ভাল নয়। জীবন রূপ অমূল্যধন স্বর্গ প্রাপ্তির ব্যবসায় ভাল নহে। যোগিজনের কঠোর সাধনে সকলের অধিকার নাই, সুবিধাও বড় অল্প। আমাদের প্রভু বড় দয়াল। তিনি দেখিলেন কলির জীবের ভজন-সাধনের প্রক্রিয়া অন্যান্য যুগের ন্যায় চলিতে

পারে না। সে পন্থা অপেক্ষাকৃত সরল করা উচিত। সেই সরল উপায় শ্রীভগবানের নাম-জপ। শ্রীভগবানের মধুর নাম শ্রবণ মঙ্গল, ভুবন মঙ্গল ও সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন। নামের দোহাই দিলে বিঘ্ন বিপত্তি দূরে যায়। নামে হৃদয় সরল হয় শীতল হয় এবং প্রাণ পুলকিত হয়। ইহাতে লোভ-তস্করের ভয় থাকে না, ক্রোধ দস্যুর আশঙ্কা থাকে না, ইন্দ্রিয়-লম্পটের খলতা থাকে না, হিংসা দ্বেষের ঘাতিকা প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং নাম হইতেছে মধুর।

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্।

বেদ পুরাণ স্মৃতি তন্ত্র, মন্ত্র সন্ধ্যা গায়ত্রী ধর্ম্মের কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পত্রাদি স্বরূপ। শ্রীভগবানের মধুর নামই উহার ফল। নামই ধর্ম্ম, নামই কর্ম্ম নামই সাধনা, এই নামেই সাধকের সিদ্ধি।

নাম যাঁহার সাধনা, নামেই তাঁহার প্রাণ আকুল। নামে ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়, নিদ্রা যায়, ভৌতিক দেহের কার্য্য ক্রমেই অবসর লইতে থাকে নামের এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। সে শক্তি মানুষের ঘৃণা মান কুল, শীল, লজ্জা, সম্ভ্রম সব দূর করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রচার করে। যিনি নামে আকুল তিনি বাড়ী ঘর ভুলিতে পারেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা ভুলিতে পারেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখ ভুলিতে পারেন, ভুলিতে পারেন না কেবল ঐ মধুমাখা হরিনাম। সে জীবন নামের সহিত একসূত্রে গাঁথা। নাম হইতে বারণ কর তখন তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। শ্রীল হরিদাসই ইহার সাক্ষী। দ্বাবিংশতি স্থানে দারুণ প্রহার সহ্য করিয়াও হরিদাস ঠাকুর নাম লইতে বিরত হইতে পারিলেন না। যাঁহার প্রাণের মাঝারে নামের তরঙ্গ খেলা করে তিনি অন্য সুখকে সুখ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না,—তাহার নিকট নামই মধু।

আমাদের বৃন্দাবন বিলাসিনী প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে তাঁহার মান নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, ভয় নাই, এমন কি ধর্ম্ম বলিয়াও জ্ঞান নাই। মিলন তাঁহার লক্ষ্য। কিন্তু সহসা শ্রীভগবানের চরণরেণু মিলে না। বিরহে তখন শ্রীমতী ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। তখন সখীকে মনের বেদনা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন—

পহিল শুনিনু রব, শ্যাম দুই আখর, তৈখন মন চুরি কেল।

শ্যামের নামেরই কেমন শক্তি—নামেই মন চুরি করে। সে মন আর সংসারে থাকে না—সে মন শ্যাম পানে আকৃষ্ট হয়—বাহিরের সংবাদ রাখিবার আর অবকাশ পায় না। শ্যামের নামে সাধকের মন সংসার হইতে অপহৃত হয়। শ্রীভগবানের নামের শক্তি শ্রীমতীর মুখেই বলি।

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, রসনা ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো কেমনে হেরিব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তা'র, নয়ানে দেখিয়ে গো যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

প্রিয়জনের নামটী বড় মধুর সতী স্ত্রী ঘরের কোণে আপন মনে গৃহকার্য্য করিতেছেন। পতি প্রবাসে কে কার নাম করিতেছিল, তাহার মধ্যে তিনি তাঁহার পতির নামটী শুনিলেন। শুনা মাত্রই প্রাণ পুলকিত হইল। এক বারের যায়গায় দশ বার তাঁহার মনে ঐ নামের স্রোতই বহিতে লাগিল—ইহাতে তাহার চেষ্টা নাই—একবারেই স্বাভাবিক তাঁহার প্রাণবল্লভের নাম কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া একবারেই তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল।

শ্রীরাধিকা নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন কে কোথায় শ্যামনাম করিল, আর শ্রীমতী নাম-তরঙ্গে অধীর হইলেন। শ্যাম-নামের সুধারসে শ্রীমতীর হৃদয় তখন ডুবিতেছে ও ভাসিতেছে। তাই বলিলেন—

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, রসনা ছাড়িতে নাহি পারে।

নাম সুধায় শ্রীমতী উন্মাদিনী। সে মধু অক্ষয়, অনন্ত, অপরিসীম। সে নামে কত মধু আছে শ্রীমতী তাহার সীমা দিতে অক্ষম।

ফলে শ্রীভগবানের শ্রীনাম সুধামাখা। যাহারা একবার এই সুধা পান করেন, তাঁহারা এই জগতে অমর হইয়া যান, ধরাধামে বৈকুণ্ঠের সুখ উপভোগ করেন, তাঁহাদের ত্রিতাপ-জ্বালা সহসা ও সহজেই প্রশমিত হইয়া যায়, এবং অত্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি হওয়ায় খাটী সুখলাভ হয়।

প্রভু আমার কাশীতে সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে উপস্থিত। প্রভু সন্ন্যাস লইয়াছেন, অথচ সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার, মৌনাবলম্বন, বেদপাঠ, ইহার

কিছুই প্রভুতে নাই,—আছে কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরুদ্ধ তাণ্ডব-নর্ত্তন ও উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন। ইহাতে সন্ন্যাসীগণ প্রভুকে উপহাস করিলেন। সরস্বতী প্রকাশানন্দ মায়াবাদী পণ্ডিত। ইতি অন্যান্য সন্ন্যাসী-গণেরও পূজা প্রভুকে আশ্রমাচারের বিরুদ্ধ কার্য্য করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু আমার অতি বিনীত। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"শ্রীপাদ আমি মূর্খ, বেদ বুঝিবার অধিকার আমার নাই। আমার ন্যায় জড়-বুদ্ধির পক্ষে বিধানানুযায়ী ভগবদুপাসনা অসম্ভব মনে করিয়া গুরু আমাকে হরিনাম জপ করিতে আদেশ করেন। সেই হইতে নাম-গ্রহণ ও নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছি শাস্ত্র কি, জানি না, শাস্ত্রের মর্ম্মও বুঝি না। গুরু উপদেশে নাম জপিতে জপিতে বুঝিতে পারিলাম আমি যেন আর আমাতে নই। নামে কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন নাচায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমি যেন নামে উন্মত্ত হইলাম। এই অবস্থা শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, 'এ সকলই নামের শক্তি। সত্বরেই সুফল ফলিবে, সিদ্ধি আয়ত্ত হইবে।' গুরু-বাক্য শ্রদ্ধা করিয়া সেই হইতে কেবল নাম ধরিয়াই পড়িয়া রহিয়াছি। শাস্ত্র বুঝি না, বুঝিবার ক্ষমতাও আমার নাই।" প্রভুর বিনয়ে ও সদুত্তরে প্রকাশানন্দ বিস্মিত হইলেন. ক্রমিক আলাপে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া অবশেষে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধানতম ভক্তে পরিণত হইলেন। মায়াবাদী মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসীগণের শিরোমণি এক নামকীর্ত্তনীয়া বাঙ্গালী বালকের চরণ যুগলে আত্মসমর্পণ করিলেন শ্রীভগবানের ভুবনবিজয়ী নামের জয় হইল।

প্রভু আমার নামেতে উদাসী, নামেতে সন্ন্যাসী, বিষয়ে বৈরাগী, নামে অনুরাগী। ঘরে নাম করিতেছেন, সাধ মিটিল না। পথের ধূলায়, গিরি-গুহায়, জনকোলাহলে, নীরব নির্জ্জনে, গহন অরণ্যে, সমুদ্রের তরঙ্গে, জগৎ জুড়িয়া হরিনাম না করিলে, হরিনাম না ছড়াইলে, প্রশান্ত হৃদয়ের বিশ্বব্যাপি উচ্ছ্বাস সঙ্কীর্ণ স্থলে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। প্রভু গৃহ ছাড়িলেন, নামে ব্যাকুল হইলেন, পাগল হইয়া গেলেন—আকুল প্রাণে, সুধাময় কণ্ঠে, সুধাময় হরিনাম সাগরে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল যবন সকলেই হরিনামে প্রমত্ত হইলেন। হরিনামে দেশ মাতিয়া গেল, নাচিয়া উঠিল, নাম প্রবাহে দেশ ভাসিয়া গেল।

সেই সুধামাখা হরিনামে প্রভু আমার জ্ঞানহারা, মানহারা, ক্ষুধাহারা, তৃষ্ণাহারা, দিশেহারা, অবশেষে আত্মহারা হইয়া গেলেন। কিন্তু তবু প্রভুর আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। প্রভু কান্দিতে লাগিলেন, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। কাঁন্দিয়া বলিলেন, "সাধ মিটিল না। কবে আমার এমন দিন হইবে, যখন—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব্নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

হরি, তোমার নাম লইতে লইতে কবে নয়ন গলিতাশ্রু প্রবাহ-গদ্গদ স্বরে বাক্যরোধ এবং শরীর কণ্টকে পরিপূর্ণ হইবে।

যথার্থ সে দিন আসিল। শ্রীশ্রীরাধার প্রেমে ও মধুমাখা হরিনামে প্রভু আমার আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। নামের সহিত নিজের অস্তিত্ব মিশিয়া গেল, ধর্ম্মের মৃত-প্রাণে সুধামাখা হরিনাম আপনার মৃত-সঞ্চারিণী শক্তি সঞ্চারিত করিল। জগৎ জানিল। অধর্ম্মের মায়া মোহ হইতে প্রভু নাম ও প্রেম জগৎ জাগাইতে আনিয়াছিলেন। জগৎ চৈতন্য পাইল, তাই প্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। পাষণ্ড, নাস্তিক, তার্কিক ও কুপণ্ডিত-গণ হরিনামে মাতিয়া গেল। আকাশে প্রান্তরে, ভূধরে ভূস্তরে, নগরে কাননে, ঘাটে মাঠে, পথে সর্ব্বত্রই বিশ্ববিজয়ি হরিনামের তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়া গেল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বীজ-শক্তি মধুমাখা হরিনাম বিশ্ব ব্যাপিয়া স্ফুরিত হইল। নামের সঞ্জীবনী-শক্তিতে মৃত-দেহে প্রাণ আসিল, ধর্ম্মের মৃত-মলিন-বদনমণ্ডলে হাঁসির রেখা দেখা দিল।

প্রভু আমার নাম লইয়া, নামের শক্তিতে তাপিত ধরার তাপিত প্রাণে, সুখের মন্দাকিনী স্রোত বহাইয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন—সুখের পথ দেখাইয়া দিয়া প্রভু আমাদের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর হইলেন।

মোহান্ধ মানব! ভুলিও না, প্রভুর প্রদর্শিত পথ ভুলিও না। নামামৃতে বিভোর হইয়া দিবানিশি সুধামাখা নামতরঙ্গে দেহ মন আত্মা সমর্পণ কর, দেখিবে সুখের জন্য আর এথা সেথা ধাবিত হইতে হইবে না। দেখিবে খাটী সুখ আপনা আপনি তোমার করতলস্থ হইয়াছে।

এখানে একটী গান লিখিয়া উপসংহার করিতেছি।

সুখ বলে মন বেড়াও মিছে, সুখ কি আছে পরের কাছে।
হয়ে আত্মারাম ভজ নাম, মাতাও পরাণ নামের পিছে।

তুমি পাবে আরাম, ছোঁবে না কাম, বিষময় বিষয় বিছে॥
কত ধনীর ধনী, মহামানী, নামসাগরে সাঁতার দিছে।
কত ভবরোগী, বিলাসভোগী, মহাযোগীর ভাব ধরেছে।
কুঁড়ে ঘরে খুদের কুড়, তোমার আছে কিনা আছে?
ত্যজিতে তাই, পার না ভাই, পাবে কি সুখ বিষয় মাঝে।
ত্যাগে শক্তি, শক্তিতে সুখ, কৃষ্ণের উপদেশ আছে।
নামে হয়ে রাগী, হওরে ত্যাগী, ছুটিবে দুখ তোমার পিছে।
নিজের ঘরেই সুখের বাসা, বাহিরে কি সুখ সাজে?
হরিনাম তরঙ্গে, রঙ্গে রঙ্গে, বিরাজে সুখ হৃদয় মাঝে॥

সেবকাধম সেবারাম—রসিক মোহন।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইল সভাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ, দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে॥
করযোড় করি আগে, দাঁড়াইলা মায়ের আগে, পড়িলেন দণ্ডবৎ হঞা।
দুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব দিলা চাঁদ মুখে, কান্দে শচী গলাটি ধরিঞা॥
ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত, এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা করি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, উহা নাহি দেখা যায়, কার বোলে হইলে বৈরাগী।
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে, ত্রিজগতে করিল ঘোষণা।১৪

পূরবে বান্ধিল চূড়া এবে কেশহীন। নটবর বেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥
গাভী-দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে। করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী। কলিযুগে দণ্ড ধরি হইল সন্ন্যাসী॥
বাসুঘোষ কহে শুন নদীয়া নিবাসী। বলরাম অবধৌত কানাই সন্ন্যাসী।১৫॥

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখচান্দে, রাধা রাধা বলি কান্দে, কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাষাণ মিলাঞা যায়, গদাধর না জীয়ে পরাণে॥
বহিছে তপন ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মহান্ত ঘরে, বিধাতা বুঝাইয়া ফেরে, তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
অনন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন, কি লাগি তেজিল তার লেহ॥
কি কব দুখের কথা, কহিতে মরম ব্যথা, না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি, বিরহে আকুল প্রাণী, বাসুঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥ ৯৬।

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ। কবে মোর মনের মিটব সব দুখ॥
কত দিনে গোরা পহুঁ করবহি কোর। কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর॥
কত দিনে শ্রবণে হইবে শুভ দিন। চাঁদ মুখের বচন শুনিব নিশি দিন॥
বাসুঘোষ কহে গোরা গুণ সঙরিয়া। ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া।
৯৭॥

গোরা লাগি প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া।
গোরা বিনু হৈল শূন্য সকল নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষে কান্দে গুণ সঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥ ৯৮॥

আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোণা।
কহইতে লাজে নাহি পাসরি আপনা॥
কহইতে বাণীর সনে পরাণ না গেল।
কি সুখ লাগিয়ে প্রাণ বাহির না হ'ল॥
নয়নের তারা গেলে কি কাজ নয়নে।
আর না হেরিব গোরার সে চাঁদ বয়ানে॥

হাসি মুখে সুধামাখা বাণী না শুনিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
বাসু ঘোষ কহে গোরা গুণ সঙরিয়া।
মুঞি কেন সভার আগে না গেনু মরিয়া॥ ৯৯॥

না হেরব চাঁদ মুখ না শুনব বাণী।
হেন মন করি হাম পশিব ধরণী॥
মৃদুল কমল পদে না হেরব শোভা।
তার লাগি মোর মন অতিশয় লোভা॥
ধিক ধিক ধিক মোর এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন স্থানে॥
গেল সুখ বৈভব সে সকল কেলি।
এই শেল সন্দেহ হৃদয়ে রহি গেলি॥
ডাহিনে আছিল বিধি এবে ভেল বাম।
কহে বাসুদেব ঘোষ বিদরে পরাণ॥ ১০০॥

হরি হরি গোরা কোথা গেল। মরমে পশিল শেল বাহির না হৈল॥
কাহারে কহিব দুখ নাহি সরে বাণী। অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
মো যদি জানিতাঙ গোরা যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া॥
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে।
এত দিনে বাসুঘোষ পরাণে মরিবে॥ ১০১॥

সজনি কি জানি মোর ভেল। ভাবিতে গৌরাঙ্গ গুণ তনু মোর গেল॥
গোরা গুণ সোঙারিয়া কান্দে বৃক্ষলতা। গুণ সঙরিয়া কান্দে বনের দেবতা॥
গোরা গুণ সঙরিয়া গলয়ে পাথরে। গুণ সঙরিয়া কেহো নাহি রহে ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কান্দে।
পশু পাখী কান্দে গুণে স্থির নাহি বান্ধে॥ ১০২॥

হরি হরি কি না হৈল নদিয়া নগরে।

কেশব ভারতী আসি, বজর পাড়িল গো, রসবতীর পরাণের ঘরে॥
গিরি পুরী ভারতী, আসিয়া করল স্থিতি, অাঁচলের রতন কাঢ়ি নিল।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, যে সুখ করিলাঙ রঙ্গে, সে সব স্বপন সম ভেল॥
সুরধুনী তীরে তরু, কদম্ব খণ্ডিত অরু, প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
আমরা পরের নারী, পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিব বিষ্ণুপ্রিয়া॥
নদীয়া আনন্দ ছিল, গোকুলের প্রায় হ'ল, বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥১০৩

———

হরি হার গোরা কোথা গেল। কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল॥
হিয়া মোর জর জর পাঞ্জর খসে। পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে॥
ফুকরি কান্দিতে নারে চোরের রমণী। অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা মুখ খানি॥
ঘরের বাহির নাহি কুলের ঝি। স্বপনে না হয় দেখা করিব কি॥
সে রূপ মাধুরী লীলা কাহারে কহিব। গোরা পহুঁ বিনে মুঞি অনলে পশিব॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ। বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

———

॥১০৪

হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা।

সভারে সদয় হৈয়া, মুঞি নারী বঞ্চিয়া, এ শোক সায়রে ভসাইলা॥
এ নব যৌবন কালে, মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, না জানি সাধিল কোন সিদ্ধি।
কি ছার পরাণ সে, পশুয়া পণ্ডিত যে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে দিল বিধি॥
সন্ন্যাসী হইয়া গেলা, পুন যদি বাহুড়িলা, নাহি আইলা নদীয়া নগরে।
হৃদয়ে হৃদয় ধরি, নিজ পর এক করি, চাঁদ মুখ দেখিবার তরে॥
অক্রূর আছিল ভাল, রাজ বোলে লৈয়া গেল, হরি লয়ে থুল মধুপুরী।
নিতি লোক আসে যায়, তাহাতে সংবাদ পায়, ভারতী করিল দেশান্তরি॥
এত কহি বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেব ঘোষে কয়, মো সমান পামর নাই, তব হিয়া বিদরি না যায়॥১০৫।

———

কহ সখি জীবন উপায়। ছাড়ি গেলা গোরা নটরায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল খীন। বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন। কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিহি লিখিল মোর ভালে। চিরা দেখি কি আছে কপালে॥

হিয়া জর জর অনুরাগে। এ দুখ কহিব কার আগে॥
কহে বাসুঘোষ নিদান। গোরা বিনু না রহে পরাণ॥ ১০৬॥

মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বিমুখ ভৈগেল॥
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি দুখ দেল॥
কাহারে কহব ইহ দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরব গোরামুখ। তবে এ জীবনে কিয়ে সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রসগান। গোরা বিনে না রহে পরাণ॥ ১০৭॥

আজিকার স্বপনের কথা, শুনগো মালিনি সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে চাহিয়া, মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম, অচেতনে বাহির হৈলাম, নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণ ধূলী, নিল নিমাই শিরে তুলি, পুন কান্দে গলায় ধরিয়া।
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে, রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইলাম নদীয়া পুরে, কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে
আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি, হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কান্দিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হ'তে প্রাণ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, কি করিব কহ না উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়, নহিলে কি দশা দেখ তায়॥১০৮॥

চিতচোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর,
অকিঞ্চন জন করই কোর, পতিত অধম বন্ধুয়া।
ভুবন তারণ কারণ নাম, জীব লাগিয়া তেজল ধাম,
প্রকট হইলা নদীয়া নগরে, যৈছে শারদ ইন্দুয়া॥
অসীম মহিমা কে করু ওর, যুবতী জীবন করয়ে চোর,
বিধি নিরমিল কি দিয়া গোর, বড়ই রসের সিন্ধুয়া।
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ, হরল সকল মনের দুখ,
বাসুঘোষ কহে কিবা সে রূপ, নিরখি চিত সানন্দুয়া॥ ১০৯॥

আজুরে কনকাচল নীলাচলে গোরা।
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা॥
কণ্ঠে লোহিত দোলে বকুল কি মাল।
অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল॥
কত কত ভাব উঠে বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলু ঢুলু প্রেম তরঙ্গ॥
গদাধরে হেরিয়ে লহু লহু হাসে।
সো নাহি সমুঝল বাসুদেব ঘোষে॥ ১১০॥

সিংহদ্বার ছাড়ি গোরা সমুদ্র পানে ধায়।
কোথা আমার প্রাণের কৃষ্ণ সবারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝেতে কনকগিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মুরছায়
উত্তান নয়ন মুখে ফেন বহি যায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥ ১১১॥

চেতন পাইয়া গোরা রায়। ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রাম রায়। দেখি পহুঁ করে হায় হায়॥
কাঁহা মোর মুরলীবদন। এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ। কৃপা করি দেহ দরশন॥
এত বিলাপয়ে গোরাচান্দে। দেখিয়া বাসুঘোষ কান্দে॥ ১১২॥

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন। ত্রিভুবনে করে যার চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর। নদীয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর॥
কেহো বলে পুরবে রাবণ বধিলা। গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার। হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥
১১৩॥

কি কহব শত শত তুয়া অবতার। একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার॥
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী। শিব শুক নারদ লইয়া জনা চারি॥
সেতুবন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে কীর্ত্তন করিলা সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপ তপ এ বেদ বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার॥ ১১৪॥

গৌরাঙ্গ না হত, কেমনে হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেম রসসীমা, জগতে জানাইত কে॥
মধুর বৃন্দা-, বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইলাম মন।
এ ভব সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়া এক জন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমন ধরিল দে।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥ ১১৫॥

আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা। পাঞাছি তোমারে কত করিয়া কামনা॥
আপনা বলিয়া মোর নাহি কোন জনা। রাখহ চরণতলে করিয়া আপনা॥
তোমার বদন চাঁদের নাহিক তুলনা। দেহ প্রেম সুধারস রহুক ঘোষণা॥
কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণা।
বাসুঘোষে দেহ পদ এ তাপিত জনা॥ ১১৬॥

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িবে। আপন করিয়ে নিজ চরণে রাখিবে॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু। শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু।
এ কূলে ও কূলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি। রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষে বলে চরণে ধরিয়া। কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥১১৭

বিদ্যাপতি ও অদ্বৈত প্রভু।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু তীর্থ ভ্রমণে ব্যস্ত; ভ্রমর যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, কমলাক্ষ তেমনি তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছেন; বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, ভারতে যথায় যত তীর্থ আছে—যাইতেছেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্বৈত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। যথা—

"তবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আইলা মিথিলায়।
সীতার জন্মস্থান দেখি ধূলায় লোটায়॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
হেনকালে শুন এক অপূর্ব্ব কথন॥"

একি? হঠাৎ অদ্বৈত স্তম্ভিত হইলেন। উন্নত-ফণা অহিরাজ গতি স্থগিত করিয়া বংশীনাদে যেমন বিমুগ্ধ হয়, অদ্বৈত তেমনি ভাবে কি শুনিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের প্রাণ পুলকিত হইল, অদ্বৈতের জ্ঞান-গভীর হৃদয়-সরোবরে প্রেমের তুফান বহিল, তালে তালে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। কেন?—কেন সে প্রশান্ত সাগর বিক্ষুব্ধ হইল? কেন তরঙ্গে তরঙ্গে কূল প্লাবিত করিল? সন্নিকটে এক বৃদ্ধ-বিপ্র মধুর কৃষ্ণলীলা গাইতেছিলেন, তাহারই মাধুরিতে অদ্বৈত মোহিত, তাহারই আকর্ষণে সাগরে জোয়ার আরম্ভ। যথা—

"সুমধুর সুললিত কৃষ্ণগুণ গান।
শুনি প্রভু সেই দিকে করিলা পয়ান॥
বটবৃক্ষতলে দেখে এক দ্বিজরায়।
গন্ধর্ব্বের সম কৃষ্ণগুণামৃত গায়॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া কৃষ্ণ-রূপের বর্ণন।
প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন॥
আলিঙ্গন ছলে প্রভু দয়া প্রকাশিয়া।
প্রেম দান করিলেন শক্তি সঞ্চারিয়া॥
স্পর্শমণির স্পর্শে যৈছে লৌহ হয় স্বর্ণ।
তৈছে প্রভুর স্পর্শে দ্বিজ হৈলা প্রেমে পূর্ণ॥
প্রভুরে ঈশ্বর জ্ঞানে দ্বিজ প্রণমিলা।
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥"

এই দ্বিজবর কে? সাক্ষাৎ শঙ্করূপী অদ্বৈত যাঁহার সঙ্গীত প্রভাবে প্রমত্ত হন—তিনি কে? অদ্বৈতপ্রভু জিজ্ঞাসিলেন—

"দ্বিজ তব কিবা নাম শুনিতে মন হয়।
কাহার রচিত এই গীত সুধাময়॥
রসনার মাধুর্য্য ঐছে নাহি শুনোঁ আর।
তাহে তব স্বরালাপ অতি চমৎকার॥
এ হেন সঙ্গীত সুধা মোরে পিয়াইয়া।
মত্ত করি এস্থানে আনিলা আকর্ষিয়া॥"

বৃদ্ধ বিনয়ের খণি, এখানে শুধু বিনয় নহে, ভক্তি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত। অদ্বৈতের প্রশ্নে—

বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি।
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত।
সারগ্রাহী সাধু তুহুঁ তেঁই ইথে প্রীত॥
তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোন জনে।
নিজ গুণে কৈলা মোর উদ্ধার সাধনে॥"

অদ্বৈত প্রভু তদুচিত উত্তরে বলিলেন—

অদ্ভুত তোমার রচিত গীতামৃত।
জীব কোন ছার কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হৈল॥"

অতঃপর—

"এত কহি প্রভু তারে আলিঙ্গন করি।
শ্রীঅযোধ্যাধামে চলে স্মরিয়া শ্রীহরি॥"

(উদ্ধৃত পয়ারগুলি অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে গৃহীত।)

এইরূপে অদ্বৈত প্রভুর সহিত কবিকুলশিরোভূষণ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলন হয়। সে সম্মিলন কি অপূর্ব্ব কি মধুর, মানস নেত্রে পাঠক একবার অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হও। সে কতকালের কথা, কিন্তু তাহা স্মরণে আজ কে না পুলকিত হইবে?

১৩৩০ শকাব্দে বিদ্যাপতি বিসপী গ্রাম (শিবসিংহ রাজা হইতে)

প্রাপ্ত হন। শিবসিংহ রাজ্যাভিষেকের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত বিসপী গ্রাম দান করেন। যখন বিদ্যাপতির কবি-কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছিল, সেই সময়েই রাজপ্রসাদ লাভের সম্ভাবনা; এবং তখন কবির বয়ঃক্রম ১৫। ১৬ বর্ষের কম ছিল, অনুমিত হয় না। এমতে (২। ৪ বর্ষ অগ্র পশ্চাৎ) আন্দাজ ১৩০৭ শকে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন, ইহা বোধহয় বলিলে বলিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক—এ কথা প্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাস কৃত একটী পদে আছে—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঙ্ক বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরমাণ॥"

অর্থাৎ ১৩২৫ শকে তৎকৃত গীত রচিত হয়।

অপর, বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত একখানি শ্রীমদ্ভাগবত আছে, তাহাতে প্রতিলিপির তারিখ ১৩৭৯ শকাব্দ লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা ১৩৭৯ শক পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

শিবসিংহের রাজত্ব কাল সার্দ্ধ তিন বৎসর,—১৩৮৩ শকাব্দের পর পর্য্যন্ত। ইহার পরে তদীয় মহিষীত্রয়ের সিংহাসনারোহণের কথা আছে (মহিষীত্রয়ের রাজত্বকাল সার্দ্ধ একাদশ বর্ষ;) তৎপর কুমার নরসিংহদেব রাজা হন (১৩৯৫ শক) ইহার রাজত্বকাল ১৪০১ শক পর্য্যন্ত। ইহাঁরই রাজত্ব সময়ে বিদ্যাপতি রাজাদেশে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব ১৪০১ শকাব্দ বা তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির বিদ্যমানতা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

এদিকে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম, বাল্যলীলা সূত্রানুসারে ১৩৫৬ শকাব্দ। অদ্বৈতপ্রকাশেও লিখিত যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সূতিকাগৃহে গিয়া অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন—

"অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল।
তোমার লাগি ধরাধামে এ দাস আইল॥"

ইহাতেও অদ্বৈত প্রভু ১৩৫৬ শকে অবতীর্ণ হন, জানা যাইতেছে।

অদ্বৈত প্রভু ১২শ বর্ষ বয়সান্তে শান্তিপুরে গমন করেন; তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ শ্রীমহাপ্রভু আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

পক্ষান্তরে চতুর্দ্দশ শকাব্দার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির সহ অদ্বৈতাচার্য্যের সম্মিলন প্রসঙ্গ একটী ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা—সন্দেহ নাই। যোগ্যে যোগ্যে মিলন, আমরা সে মধুরাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া অবসর গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবৈষ্ণবদাসস্য। শ্রীহট্ট।

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা কর।

হে গৌরাঙ্গ কৃপাময় পতিত-পাবন।
পাতকী নারকী আমি, অপরাধী মহাকামী,
জগতে আমার মত নাই হেয় জন ॥ ১ ॥
আমার অবস্থা কার্য্য করিয়া বিচার।
দেখিয়াছি আমি অতি, দুষ্কর্ম্মা পাপমতি,
এ কারণ দুঃসহ যাতনা আমার ॥ ২ ॥
নিজের অবস্থা কাজ দেখিলে ভাবিয়া।
সুকৃতি দুষ্কৃতি কত, জানা যায় সুস্পষ্টতঃ,
মানবের বুঝা ইহা উচিত চিন্তিয়া ॥ ৩ ॥
পরিত্রাণ কর মোরে কৃপা-পারাবার।
হে গৌরাঙ্গ দয়াময়, তারিতে কু লোকচয়,
কলিতে তোমার নবদ্বীপে অবতার ॥ ৪ ॥
তব অবতার কলিযুগে জন্ম মোর।
তাহাতে ভরসা অতি, ওহে অগতির গতি,
অবশ্য করিবে কৃপা গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ ৫ ॥
তুমি কৃপাময় প্রভু আমি মূর্খ দীন।
আমাকে করুণা করা, শ্রীশচীনন্দন গোরা,
তোমার কর্ত্তব্য গত না করিয়া দিন ॥ ৬ ॥
করিতেছি হাহাকার ত্রিতাপে জ্বলিয়া।
তব লীলা গুণ গান, করিয়া জুড়াতে প্রাণ,
নাহি পারিতেছি কভু যাইব মরিয়া ॥ ৭ ॥

দিনে দিনে আয়ুঃকাল হইতেছে ক্ষয়।
রোগ শোক পরিতাপে, বিলাপ বৃথালাপে,
যাইতেছে দিন ইহা পরাণে কি সয়? ৮॥
পতিত-পামর-বন্ধু গৌর-ভগবান।
নিজ গুণে কৃপা কর, জানি মোরে শোচ্যতর,
বড়ই যাতনা গ্রস্ত আমার পরাণ॥ ৯॥

শ্রীরাজীবলোচন দাস।

শ্রীখণ্ডের বলরাম দাস।

পদকল্পতরু, পদকল্প-লতিকা প্রভৃতি যে কয়েক খানি পদময় গ্রন্থ বৈষ্ণব জগতে প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর পদকর্ত্তা বলরাম দাসের রচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রসভাব-সমন্বিত নিম্নোক্ত পদগুলি দেখিতে এবং কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। বোধ করি অনেকের তাহা শিক্ষা নাই।

যদিও এ সময় উৎকট উর্দ্ধশ্বাস, প্রবল বায়ু ও মস্তিষ্ক পীড়ায় সর্ব্বদা অস্থির, এবং এক প্রকার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ও মৃত্যু নিকটস্থ মনের স্থিরতা নাই, লিখিবার সামর্থ্যও নাই, অত্যন্ত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, এ সময়ে যত শীঘ্র হয় পতিতপাবন শ্রী গৌরাঙ্গ নাম স্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা করিতে এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ভক্তগণের নিকট বিদায় লইতে পারিলেই মঙ্গল। পরন্তু মনে কেন ক্ষোভ থাকে, কথায় বলে "যত-ক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" নিয়ম ভঙ্গ করিতে নাই। সকলেই নিয়মের দাস; যতই রোগ শোক হউক না কেন, অঙ্গীকার পালন করা কর্ত্তব্য।

সেদিন বৈষ্ণবের প্রাণ-সর্ব্বস্ব দ্বিতীয় সংখ্যক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা শিয়রে পাইয়া শ্রীগৌরাবতারের পূর্ব্বাভাসে বলরাম দাসের কয়েকটী পদ পাঠ করিয়া বড়ই সুখ পাইয়াছি, এবং সেই উৎসাহে পাঠক ও গায়কদিগের কৌতুহল বা আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত পদসমুদ্র গ্রন্থ হইতে উক্ত পদ কর্ত্তার কয়েকটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

রাগিণী পঠমঞ্জরী, তাল তেওট ও ছোট দশকোশী।

একদিন ধনী, নিকুঞ্জে বসিয়া, গাঁথিল ফুলের হার।
মল্লিকা মালতী, জাতি যুথী দিয়া, করিল শেজ বিথার॥

কস্তুরি চন্দন, করি ঘরষণ, রাখিলা যতন করি
কর্পূর তাম্বূল, বীটিকা সাজায়ে, রাখিল পালঙ্কোপরি ॥
শ্যামের লাগিয়ে, রহিল জাগিয়ে, সখী সহ বিনোদিনী ॥
ত্রিযামা-রজনী, পূর্ব শুক উজরল, দেখিয়া ব্যাকুল ধনী।
নিশির ভূষণ, খদ্যোতিকা তারা-, মণি হল জ্যোতি হীন।
তাম্বূলের রাগ, অধরে মিশিল, অলসে বদন ক্ষীণ ॥
শ্যামের আশায়, নিরাশা হইয়া, সখীরে কহিছে রাই।
বলনা কি করি, ওলো সহচরী, ঐ রজনী পোহায় ॥
হেদে লো সজনি, সকল রজনী, জাগিয়া পোহাইনু রাতি।
তিলে তিন বার, দণ্ডে শত বার, মন্দির বাহিরে গতি ॥
আসিব বলিয়া, এলনা নাগর, সকল হইল বৃথা।
যাও সহচরী, শ্যাম অন্বেষণে, আছয়ে নাগর যথা ॥
শঠের সহিত, পিরীতি করিয়া, এতহুঁ দুর্গতি মোর।
আজু হাম তথি, গমন করিব, যেখানে আছয়ে চোর ॥
হাতে লোতে ধরি, তারে সাজা দিব, এ ভেক বদল করি।
কহে বলরাম, নিশি শেষ প্রায়, বিলম্ব করো না প্যারি ॥

শ্রীরাধা বচনে, দূতী ত্বরা করি, শ্যাম অন্বেষণে যায়।
ঢুঁরিতে ঢুঁরিতে, চন্দ্রাবলী কুঞ্জে, কস্তুরিকা গন্ধ পায় ॥
গন্ধেতে মাতিয়ে, পুঞ্জ পুঞ্জ অলি, ভ্রমণ করয়ে তথা।
তা দেখিয়া দূতী, মনে বিচারিল, নাগর আছয়ে হেথা ॥
দাঁড়ায়ে আড়েতে, গবাক্ষের পথে, কুঞ্জের দিকেতে চায়।
চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে, আছেন নাগর রায় ॥
ধিকি ধিকি জ্বলে বাতি ॥ ধ্রু ॥
কোকিল জাগিল, কুহু শব্দ করি, অলপ আছয়ে রাতি।
তা দেখিয়া দূতী, ত্বরিত গমনে, চলিল রাইর পাশ।
আজু নিশি শেষে, কলহ বাধিবে, কহে বলরাম দাস ॥

হেথা ধনী বিনোদিনী, বিরলে বসিয়া।
দক্ষিণ নয়ন নাচে থাকিয়া থাকিয়া ॥

ময়ূর না করে কেলি অমঙ্গল দেখি।
সাত পাঁচ মনেতে ভাবয়ে চন্দ্রমুখী॥
মুখখানি মলিন দূতী আইল হেন কালে।
শ্যামের বারতা দূতী ধীরে ধীরে বলে।
তোমার নাগর বলি জানে সব সখী।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম শুন চন্দ্রমুখী॥
বদনে বদন দিয়া আছয়ে শয়নে।
সুখের অবধি নাই বলরাম ভণে॥

সখি আজুকি শুনাওলি রে।
পাঁজর জর জর, অন্তর কাতর,
তা সহ কঠিন পিরীতি রে॥ ধ্রু॥
একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিলা হেন পিরীতির ব্যাধি॥
কি হল কি হল সই কিবা সে করিনু।
কানুর কথায় কেন শেজ সাজাইনু॥
জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানি আন।
সে নবনাগর বিনে কাঁদয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঁঞি ছাব পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন জাতিকুল ত্যজে।
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥

(ধনি) এতেক চিন্তিয়া মনে, আজ্ঞা দিলা সখীগণে, বলরাম বেশ সাজাইতে।
শ্বেত চন্দন আনি, অঙ্গেতে মাখায়ে দেহ, শিঙ্গাটী আনিয়া দেহ হাতে॥
ভেক বদল করি, যথা আছয়ে বৈরী, যাব আমি তাহার নিকটে।
দেখিব লম্পট চোরে, কে তারে রাখিতে পারে, ধরিয়া আনিব তারে বাটে॥
আজ্ঞা পেয়ে সখীগণে, শিঙ্গা আনি ততক্ষণে, বলরাম বেশ সাজাইল।
চন্দনে ঢাকিল গোরি, না ঢাকিল কুচগিরি, বলরাম ভাবিত হইল॥

ললিতা বলেন শুন, ভাবনা করহ কেন, তবে সখী বৃথা নাম ধরি।
কদম্বের ফুল আনি, গলায় গাঁথিয়া দিল, ঢাকিল সে কুচযুগ-গিরি॥
জয় জয় বলিয়া, শিঙ্গায় নিশান দিয়া, দক্ষিণ চরণ বাড়াইলা।
কি কব রূপের ছটা, জিনিয়া বিজরি ঘটা বলরাম দেখে সুখী হৈলা॥

শিঙ্গাটী লইয়া হাতে বলরাম বেশে। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাই করিলা প্রবেশে॥
বলরাম দেখি চন্দ্রাবলী লুকাইল। (ধনি) শ্যামের করেতে ধরি বাহির হইল॥
মনে মনে ভাবে শ্যাম বলরাম দেখি। অঙ্গ গন্ধে জানিলেন রাধা চন্দ্রমুখী॥
মুখেতে বসন দিয়া সখীগণ হাসে। এবে সে মিলন রস বলরাম ভাষে॥

নব অনুরাগে মিলল দোঁহ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে প্যারী রস পরিপুঞ্জে॥
বন্ধু কি আর বলিব তোরে।
তোমা বিনা দেখি মুঞি সব অন্ধকারে॥ ধ্রু॥
পেয়েছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোক দুরাচার॥
এক তিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি।
শেজ বিছাইয়া কাঁদি জাগিয়া সর্ব্বরী॥
হিয়ার মাঝারে থুব বদন ঝাঁপায়ে।
বলরাম কহে রাই দৃঢ় কর হিয়ে॥

মিলন।

নব অনুরাগিণী, নব অনুরাগে। মিলল দোঁহ তনু গলে গলে লাগে॥
রাধামাধব রমণ রতি বিরামে। বৈঠল রাধা মাধব বামে॥
হেরি সব সহচরী, চামর বীজই। নয়ান পাখালি কোই বদনে মুছই॥
কোই সখী দেওত তাম্বুল বদনে। আনন্দে হেরই চর চর নয়নে॥
কোই সখী দেওত গন্ধ অধিবাসে। চরণ সেবন করু বলরাম দাসে॥

নিবেদন।

বন্ধু আর কি বলিব আন। যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক প্রভু গায় সর্ব্বলোকে। লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সম্মুখে॥

এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি। সমরসা সহ প্রেম, এই দুঃখে মরি॥
"শুনি কহে, নাগর কান। তোমা বিনু নাহি জানি আন॥ ধ্রু॥
শ্যাম অঙ্গ লুকাবে যখন। প্রাণ শেষ হইব তখন॥
গুরুরূপ ধরিয়াছ তুমি। এই দুঃখে মর্ম্মাহত আমি॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ। সকল নিছিয়া নিমু তব পরিবাদ॥

ইহার পরে অন্য পদে এইরূপ আভাস আছে। যথা—

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি।

"শুনইতে রাই, বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময় কান।
আপনক ভাবে, ভাব প্রকাশিত, ধনি অনুমতি ভেল জান॥
"সুন্দরি কি কহব তোমার স্বরূপ।
কহি নাহি জানয়ে, কেবল তোমা বিনু, মোহে করাব হেম রূপ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরীমা, কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি কহব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোঁহারি স্বরূপ বিনে, এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম-গুরু করি, নবদ্বীপে হইব উদয়॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা, জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাস কয়, প্রভু মোর দয়াময়, না ভজিনু মুঞি নরাধম॥

পশ্চাদুক্ত পদ সমূহে পদকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ গৌরচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

পূরব ভাবে নয়নে ধারা বহে। অবনত মাথে গোরা রহে॥
নিতাই দেখি চমকিত মনে। ভূমে পড়ি করয়ে রোদনে॥
কমল পল্লব বিছাইয়া। রাইরূপ ধ্যান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসর সজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া। বলে কিছু চরণে ধরিয়া॥

বৈষ্ণব সংহিতার মতে পূর্ব্বকার পদকর্ত্তা মহাজনগণ এই পৃথিবীতে অমর কবি। তাঁহাদের কবিতা-কামিনীর কোন কালে ক্ষয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বঙ্গের আদিকবি সাধক-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস নিজকৃত পদে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়। এ ত নহে শ্যামরায়॥" ইত্যাদি।

মহাজনগণ সিদ্ধ দেহে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ রূপ মাধু-

ইঁহারা যখন যাহা কিছু হৃদয়পটে দেখিতেন, তখনই তাহা চিত্র তুলিকায় আঁকিতেন এবং বিচিত্র রঙ্গে রং ফলাইতেন। তাই ইঁহাদের কীর্ত্তিত কীর্ত্তন গানে যে আনন্দ সে আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ সুখ অতি তুচ্ছ

দাস বলরাম গ্রন্থকার ও পদকর্ত্তা উভয়বিধ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে বৈদ্যকুলসম্ভুত বিখ্যাত কবিরাজ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌমার কালেই বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শ্রীবৈষ্ণব দাসের পদে আছে—

"কবি নৃপ বংশজ, ভুবনে বিদিত যশঃ, ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁজন, নিরুপম গুণগণ, গৌর প্রেমময়-ধাম॥ ইত্যাদি

দাস বলরাম শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর হৃদয় বিলাসিনী শ্রীশ্রীজাহ্নবী দেবী ঠাকুরাণীর শিষ্য। তাঁহার আদি নাম নিতাই, নিত্যানন্দ গুরুর নাম বলিয়া শিষ্য হইবার কালে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দেবী কর্ত্তৃক বলরাম নাম প্রদত্ত হয়।

বলরাম শ্রীখণ্ডে থাকিয়া বৃদ্ধ নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট বহু উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। শেষে ইষ্টদেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যাবতীয় লীলাস্থান দর্শন করিয়া সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হন।

এই সিদ্ধ দেহেই তিনি শ্রীগুরুর আজ্ঞায় প্রেমবিলাস গ্রন্থ ও বলরাম দাস ভণিতা দিয়া বিস্তর পদ পদাবলী লিখিয়াছিলেন। "রসরাজ নামক" একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা বিদিত আছে।

বড়ই সুখের কথা; অনেক দিন শুনিয়াছি ও চক্ষেও দেখিয়াছি তাঁহার কৃত প্রেমবিলাস বিশুদ্ধ গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুবংশীয় বৈষ্ণবের প্রাণসর্ব্বস্ব অপূর্ব্ব লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীশ্রীপ্রভু অতুলচন্দ্র গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীপ্রভু বলাই চাঁদ গোস্বামী এবং ভূতপূর্ব্ব বৈষ্ণবপত্রিকার সম্পাদক (এক্ষণে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক) বৈষ্ণব-হিতৈষী পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালিদাস নাথ মহাশয় সকল আয়োজন করিয়াছেন। এবং আমার প্রাণ-প্রিয়তম চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সমস্ত পদাবলী প্রকাশক বৈষ্ণব জগতে পরিচিত মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক বলরাম দাসের সমস্ত পদ বিস্তারিত জীবনীর সহিত প্রকাশের

বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন। ভগবদিচ্ছায় ঐ গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশ হইলে সাহিত্য জগতে কীর্ত্তি ও পুণ্য দুই থাকিবে।

আমি বড়ই হতভাগা; জগতে আসিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান জীবনে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত "পদ সমুদ্র" গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভাষা কথায় আছে—

মনে করি, করি করি, হয় হয় হয় না।"

এমন পোড়া অদৃষ্ট যে, ভাগ্যলক্ষ্মী একদিনও প্রসন্ন নহেন। এ অবস্থায় কখন কি দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হয়? "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" ইত্যাদি।

তবে এই এক ভরসা যে, বাক্য দ্বারা যাঁহাদিগকে গ্রন্থ প্রকাশের ভার দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ও ক্ষমতাপন্ন এবং আমার প্রাণতুল্য। আমার অবর্ত্তমানে তাঁহারা ঐ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন। উপস্থিত দুঃসময় দেখিয়া তাঁহাদিগকে ভারগ্রহণ করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

যাঁহার সুললিত গীতা পাঠে অরসিকে রসিক হয়, যাঁহার ইংরাজী, হিন্দি ও বঙ্গ এই ত্রিবিধ ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত পাঠে মূর্খ ব্যক্তিও পণ্ডিত হয়, এই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার শীতল তরুর ছায়ায় থাকিয়া বড়ই সুখে ছিলাম। এখন তাঁহার হাত এড়াইয়া বহুদূরে নির্দ্দয় কালের হাতে পড়িব এই একটা বড় দুঃখ।

বৈষ্ণব-পদরজ-আকাঙ্ক্ষী
শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি। বদনগঞ্জ।

"বৈষ্ণবধর্ম্ম মূর্খের ধর্ম্ম।"

আমার জনৈক বন্ধুর পিতা পরম বৈষ্ণব এবং সেই প্রকার সুপণ্ডিত। ইঁহার নিবাস বীরভূম জেলাস্থ কোন গ্রামে। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং সেই জেলাস্থ কোন ব্রাহ্মণরাজের বৈদ্য। রাজার কোন কার্য্য উপলক্ষে বৈদ্যরাজ পূর্ব্ব অঞ্চলের অপর এক রাজবাটীতে গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রধান কার্য্যকারকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই প্রধান কার্য্যকারক-দেওয়ান ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত

এবং বাঙ্গলা সাহিত্যজগতেও ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতি আছে। কথায় কথায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা উঠে। তাহাতে দেওয়ান মহাশয় বলিলেন,—"মহাশয়! আমার ধারণা আপনাদিগের মহাপ্রভুর ধর্ম্মটা তেলী মালীর ধর্ম্ম।" রাজবৈদ্য ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে দেওয়ান বলিলেন যে, "আপনাদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে পণ্ডিত কেহ নাই। যাহারা লেখাপড়া জানে না বা যাহাদিগের বুদ্ধি নাই, তাহারাই আপনাদের মত বিশ্বাস করে।" রাজবৈদ্য তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে,—বোধহয় দেওয়ান মহাশয়ের বৈষ্ণব গ্রন্থ কিছু দেখা নাই, কারণ মহাপ্রভুর পার্ষদগণ সকলেই পরম পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় যে সমুদয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন কি না, তাহা বলা উচিত। দেওয়ান মহাশয় তাহার পর হইতে যে কোন কারণেই হউক বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং পরম্পর শুনিয়াছি তিনি এখন গৌরপ্রেমে ঢল ঢল। তিনি একখানি ভক্তজীবনী পুস্তকও লিখিয়াছেন। অনেকেরই ধারণা আছে যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকলেই নির্ব্বোধ। যাঁহাদের একপ ধারণা তাঁহারা যেন অন্ততঃ "প্রবোধানন্দ সরস্বতীর জীবনী" একবার পাঠ করেন।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

উড়িয়া ভাষায় গৌরসঙ্গীত।

শ্রীরাধার উক্তি।

সাবেরি।

শ্যামবন্ধুহে। মনোহার গৌররূপ রসিক ইন্দু হে॥
কেউঁ ভাগ্যে স্বপ্নযোগে আজ, দেখিলি গুঁণ্ডের নটরাজ।
কিবা কহিবই তাঁক তেজ, রঙ্গে চলি চলি নাচে সখা সমাজ॥ ১॥

বৃন্দাবন সম সেই স্থান। নানা বৃক্ষলতা বিহঙ্গম॥
সুবে তহিঁ কাঞ্চন বরণ। দেখি ধৈর্য্য সুহে মোর হৃদয় মন হে॥ ২॥
বিষ্ণু আদি নানা ক্ষেত্রে মূর্ত্তি। দেখি অছি মুহি নেঁএ সতি॥
চিত্ত মোর না হোই এ রীতি। সেহি গৌর-ছবি মোরে দেখাঅ পতি হে॥৩
এহা কহি রাধা বিহ্বলিত। দেখি শান্তি করন্তি অচ্যুত॥
বোধ দেই অতি তোষ চিত্ত। কহে বলরাম এহি মাধুর্য্য মত হে॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

প্রিয় সখি গো। ভাগ্যযোগে গৌররূপ তু দেখি গো।
শুন প্রাণপ্রিয়া মো উত্তর। তোর ভাব রসে মুহি ভোর॥
তেণু তোর ভাব কান্তি সাব, এহি শ্যাম দেহে নাহি সে ভাব মোর গো॥১
তেণু গৌররূপ রসময়। নবদ্বীপ ধামরে উদয়॥
সেহি স্থান আটই চিন্ময়। মহামাধুর্য্য রস জ্যোতির্ম্ময় গো॥২॥
গৌর-তত্ত্ব কৃষ্ণচন্দ্র কহি। রাধা মুখে স্নেহে চুম্ব দেই॥
কৌস্তুভমণি জ্যোতি রহি। তহি নিজে মিলি গৌর স্বরূপ দেখাই॥৩॥
গৌর প্রেমে রসি কৃষ্ণ রাধা। মুদ ভরে গাই প্রেম বাধা॥
ভাব রসে মন প্রাণ বাধা; কহে বলরাম সেহ পাদে শরধা॥৪॥

শ্রীবলরাম বহিদার। সম্বলপুর।

পৌরাণিক গৌরলীলা।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব যে পূর্ণব্রহ্মসনাতন, শ্রীগৌরগণের এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে তাঁহারা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, সই গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা আপামর সাধারণের ভ্রম অপনোদন করিয়া তাহাদিগকে গৌর-রসে নিমজ্জিত করেন এবং সেই সকল প্রমাণাদি পাঠে ভক্তগণের গৌর-কীর্ত্তন করণক আনন্দ সম্মোহ সিন্ধু-তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া হৃদয়কে প্রেমানন্দরসে আপ্লুত করে।

আমিও অদ্য গৌরভক্তগণের সন্নিকটে প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাস দ্বারা গৌর গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এই ইতিহাসটী অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ভবিষ্য মহাপুরাণ হইতে সমুদ্ধৃত।

একাল পর্য্যন্ত ভবিষ্য মহাপুরাণ বড়ই দুর্লভ ছিল। কিন্তু এক্ষণে বোম্বাই নিবাসী পরমভক্ত শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শেঠ ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস বহু উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া বোম্বাই প্রদেশের অতি প্রাচীন প্রাচীন পুস্তকালয় হইতে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সকল সংগ্রহ করতঃ এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব প্রকাশক মহাশয়

ভারতবর্ষস্থ সর্ব্ব সম্প্রদায় ও সকল সামাজিক লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন। যেহেতু এই মহাপুরাণে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও সকল সামাজিক লোকের পূর্ব্ব পুরুষগণের ইতিহাস অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পুরাণ সকলের কথা বুঝিবার জন্য ও তাহার একবাক্যতা করিবার জন্য একটী বিশেষ বুদ্ধি ও মস্তকের আবশ্যকতা। অল্প শিক্ষা ও বিকৃত মস্তিষ্ক কিম্বা তর্কনিষ্ঠ বুদ্ধি দ্বারা তাহা হইতে পারে না উদাহরণ স্বরূপ এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে যে সমস্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণ লোকেরা তাহার পার্থক্য ও বিরোধ দেখিতে পায়, কিন্তু ভক্তগণের হৃদয়ে কি প্রকার সামঞ্জস্য হয় তাহা ভক্তগণেরাই বুঝিতে পারেন।

ভবিষ্যপুরাণ হইতে যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সংগ্রহ করা হইতেছে, আমি তাহার সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিব না, যদি হয় তবে তাহা সময়ান্তরে করিব, কিম্বা প্রভু যাহাকে প্রেরণা দ্বারা করাইবেন তিনিই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আমি সম্প্রতি কেবল সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিলাম মাত্র।

ভবিষ্য মহাপুরাণ চতুর্যুগখণ্ড অপর পর্য্যায় চতুর্থ খণ্ডে কলিযুগেতিহাসে ভবিষ্য কথা সকল বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রথমাধ্যায়ের একাদশ অঙ্কে শৌনকাদি মুনিগণ সূত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ্রুতং কৃষ্ণস্য চরিতং ভগবন্ ভবতোদিতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি রাজ্ঞাং তেষাং ক্রমাৎ কুলম্॥
চতুর্ণাং বহ্নিজাতানাং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
স হরি স্ত্রিযুগী প্রোক্তঃ কথং জাতঃ কলৌযুগে॥

মুনিগণের এই প্রশ্নে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রশ্নটী মহাপ্রভুর অবতার বিষয়েই। কারণ কলিযুগে আর কেহ অবতীর্ণ হয়েন নাই, বুদ্ধ অবতার কলিযুগের সন্ধ্যায় হইয়াছেন এবং কল্কী কলিযুগের সন্ধ্যাংশে হইবেন। বুদ্ধ এবং কল্কীকে যুগাবতার বলিয়া গণনা করা হয় নাই। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবই এই প্রশ্নের বিষয় বুঝিতে হইবে।

এই প্রশ্নের পরে সূত মহাশয় ইহার উত্তর আরম্ভ করিলেন। সে উত্তরে কলিযুগের ভবিষ্যৎ রাজগণের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠাধ্যায়ে পঁয়তাল্লিশ অঙ্কে তিমিরলিঙ্গ (তৈমুরলঙ্গ) বাদসাহের বর্ণন।

যথা—নাম্না তিমিরলিঙ্গশ্চ মধ্যদেশ মুপায়েযুঃ
মুকুলাম্বর সম্ভূতো ম্লেচ্ছভূপঃ পিশাচকঃ॥
আর্য্যান্ ম্লেচ্ছাং স্তদাভূপান্ জিত্বা কালস্বরূপকঃ
দেহলী নগরী মধ্যে মহদ্বধমকারয়ৎ॥

ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছ রাজ্যের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, এই তিমিরলিঙ্গ দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং শালগ্রাম শিলাসকল লইয়া উষ্ট্র পৃষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক তৈত্তির দেশে গমন করিবে। তাতার দেশই তৈত্তির দেশ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবে। তিমিরলিঙ্গ তৎপ্রদেশে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সকল শালগ্রামশিলা দ্বারা নিজ উপবেশনার্থ সিংহাসন প্রস্তুত করিবে।

এই সকল অবৈদিক কার্য্য দর্শন করিয়া দেবগণ দুঃখিতান্তঃকরণে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিবেদন,—করিলেন হে দেবরাজ আমরা শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় শালগ্রাম শিলায় বাস করিয়া থাকি, কিন্তু ম্লেচ্ছরাজ তিমিরলিঙ্গ সেই শিলা সকল লইয়া আসন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছে, এজন্ত আমরা ম্লেচ্ছাক্রান্ত হইয়া বড়ই দুঃখভোগ করিতেছি। দেবগণের এই সকল শোকসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কুপিত হইয়া সেই রাজার উদ্দেশে বজ্রনিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্র অলক্ষ্যভাবে গিয়া ম্লেচ্ছ-রাজকে সংহার করিল। তখন দেবগণ সকল শালগ্রামশিলা গণ্ডকী নদীতে নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

তখন দেবরাজ কলির প্রভাবে খিন্ন হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন—

মহেন্দ্রস্তু সুরৈঃসার্দ্ধং দেব পূজ্যমুবাচ হ।
মহীতলে কলৌ প্রাপ্তে ভগবন্ দানবোত্তমাঃ॥
বেদধর্ম্ম সমুল্লঙ্ঘ্য মমনাশন তৎপরা।
অতো মাং রক্ষ ভগবন্ দেবৈঃসার্দ্ধং কলৌযুগে॥

জীব উবাচ—

মহেন্দ্র তব যা পত্নী শচীনাম্না মহোত্তমা।
দলৌ তস্তৈ বরংবিষ্ণুঃ ভবিতাস্মি সুতঃকলৌ॥

তদাজ্ঞয়াচ সা দেবী পুত্রীং শান্তিময়ীং শুভম্।
গৌড়দেশে চ গঙ্গায়াঃ কূলে লোকনিবাসিনীম্॥
প্রত্যাগত্য দ্বিজোভূত্বা কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি।
ভবান্ বৈ ব্রাহ্মণোভূত্বা দেবকার্য্য প্রসাধয়।
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং রুদ্রৈর্বৈকাদশৈঃসহ।
অষ্টাভির্ম্মুভিঃ সার্দ্ধমশ্বিভ্যাং স চ বাসব॥
তীর্থরাজমুপাগম্য প্রয়াগঞ্চ রবিপ্রিয়ম্।
মাঘেতু মকরে সূর্য্যে সূর্য্যদেবমতোষয়ৎ॥
বৃহস্পতিস্তদাগত্য সূর্য্য মাহাত্ম্য মুত্তমম্।
ইন্দ্রাদীন্ কথয়ামাস দ্বাদশাধ্যায়মাপঠন্॥ ।ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ॥

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শচীদেবীর গর্ভে শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণরূপে গঙ্গাকূলে শান্তিপুরে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন না। আমাদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সকলের মধ্যেও অনেকস্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে মিশ্র-পুরন্দর বলা হইয়াছে। তিনি যে ইন্দ্র ইহা এখানেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তবে শ্রীনবদ্বীপে না বলিয়া যে শান্তিপুর বলা হইয়াছে, ইহাতেও কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ শ্রীনবদ্বীপ ও শান্তিপুর এতই সন্নিহিত যে একই মণ্ডল বলিতে পারা যায়।

ইন্দ্র যখন প্রয়াগে শ্রীসূর্য্যের আরাধনা করিতেছিলেন, তখন বৃহস্পতি সেখানে আসিয়া সূর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। সপ্তমাধ্যায়ের আরম্ভ হইতে শ্রীসূর্য্যের মহিমা বর্ণন। এখানে ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের জন্য শ্রীসূর্য্যের আরাধনা কেন? তাহার কারণ এই যে, শ্রীসূর্য্যমণ্ডল বেদত্রয়ীময় আর সর্ব্বদেব সার শ্রীগৌরাঙ্গদেব সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত।

শ্রীসূর্য্যদেবের ধ্যানে এই প্রকার লেখা আছে—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময় বপুর্দ্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

এই হিরণ্ময় মূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গ সুতরাং অপ্রকটলীলা সময়ে সূর্য্যমণ্ডল ভিন্ন কনক-কান্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আর কোথাও পাওয়া সুকঠিন। সুর-গুরু বৃহস্পতি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী সেই জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গাবতা-

সপ্তমাধ্যায়ের আরম্ভ হইতে আবার বৃহস্পতি এবং ইন্দ্রের সংবাদ। বৃহস্পতি সূর্য্যের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সূর্য্য-মণ্ডলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত অধিকারি জীবগণ ভগবৎ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিযুগে শ্রীহরি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীরামানন্দ স্বামী ও নিম্বার্কস্বামীর পূর্ব্ব জন্ম ও ইহ জন্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে মাধবাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুস্বামী বাণীভূষণ, ভট্টজী দীক্ষিত ও বরাহ মিহির আচার্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নবমাধ্যায়ে ধন্বন্তরি, সুশ্রুত ও জয়দেব গোস্বামীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপরে দশমাধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম বৃত্তান্ত, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপঃ—বিষ্ণুশর্ম্মা নামে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী নিজ গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আগমন করিয়া তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ দেখিয়া কৃপাযুক্ত হইলেন, এবং একটী স্পর্শমণি প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি তিন দিনের মধ্যে যত সুবর্ণ করিতে পারিবে তাহা তোমারই হইবে। ব্রাহ্মণী ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থিত কতক গুলি লৌহভাণ্ডকে সুবর্ণ করিয়া পরমানন্দে পতির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। এই সময়ে বিষ্ণুশর্ম্মা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নী কতক গুলি স্বর্ণভাণ্ড লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ নিজ পত্নীকে সুবর্ণের সহিত দর্শন করিয়া অতিশয় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ভীতা হইয়া মণিজাত সুবর্ণ ও স্পর্শমণি বিষ্ণুশর্ম্মাকে প্রদান করিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা সেই সকল স্বর্ণ ও স্পর্শমণি গ্রহণ করত তন্নিকটবর্ত্তিনী ঘর্ঘরা নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যার সময়ে যখন সেই ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন সেই দরিদ্রা ব্রাহ্মণী অগ্নিতে পাক করিতেছেন। ব্রহ্মচারী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণীও ব্রহ্মচারী সমীপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল সবিস্তার বর্ণন করিলেন। ইতি মধ্যে বিষ্ণুশর্ম্মাও গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মচারী ভর্ৎসনা করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আমি দ্বাদশ বৎসর যাবৎ শিবের উপাসনা করিয়া এই স্পর্শমণি লাভ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি নষ্ট করিলে কেন?" বিষ্ণুশর্ম্মা ইহা শ্রবণ করিয়া

সেই ব্রহ্মচারীর সহিত ঘর্ঘরা নদী তীরে গমন করিয়া তত্রস্থ পাষাণ খণ্ড গ্রহণ করিয়া কতকগুলি লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিয়া বলিলেন, "এই শিলাখণ্ডের মধ্যে কোনটী তোমার স্পর্শমণি তাহা বাছিয়া লও" ব্রহ্মচারী ইহা দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিলেন, "আমার স্পর্শমণিতে আর কোন প্রয়োজন নাই, আপনার দর্শনে স্পর্শমণি লাভ হইয়াছে।"

এই বিষ্ণুশর্ম্মা সূর্য্যমণ্ডলান্তর্যামী শ্রীভগবানকে আরাধনা করত সূর্য্য-মণ্ডলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী। বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর জন্মোৎসব।

বিগত ২৫ শে ফাল্গুন মঙ্গলবার বাসন্তী-পূর্ণিমাতে শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর পারি-ষদ্ স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, সকলেই নিরম্বু ব্রত করিয়া থাকেন। দিবা ২টা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুর অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিত্তসন্তাপ-হারী হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। খণ্ডবাসী প্রভুদের তাৎকালিক নামোন্মত্ততা দেখিয়া কোন পাষণ্ডই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে নাই। রাত্রিতে শাস্ত্রমত অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। অভিষেকানন্তর শ্রীপাট স্থিত কয়েকজন বিরক্ত-বৈষ্ণব ও প্রভুপাদগণ সকলে শ্রীপাট মন্দিরে একত্রিত হইয়া, চৈতন্য চন্দ্রামৃত ব্যাখ্যা, চৈতন্য ভাগবত, পাঠ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দ্বারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই অতিশয় বিমো-হিত হইয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। রস গান হইতে উদ্দণ্ড কীর্ত্তনে সাধারণের চিত্ত সংযোগ সমধিক হয়; রসগান শ্রবণে শ্রোতার আত্মসংযমন চাই, কিন্তু উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের এমনি মোহিনী শক্তি যে তাহাতে কি শ্রোতা কি বক্তা, সকলেই হৃদয় মিলাইতে চায়, যে অঙ্গভঙ্গী ক্ষেত্র বিশেষে হাস্যরসের পরিপোষক, আবার নাম সংকীর্ত্তনে তাহাই জীবের রুচিকর, আপনা ভুলিয়া জগত ভুলিয়া হরি-নামের মধুররোলে গলা মিশাইয়া, পরিণামের সার হরিকে ডাকিতে কে

না চায়? হরিনামের তুল্য জীবের প্রাণঢালা সামগ্রী আর কিছুই নাই। এ হেন নাম সংকীর্ত্তনে খণ্ডবাসী ইতর ভদ্র সকলেই একত্রিত হইয়া নাম-সুধা পানে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল।

মধ্যাহ্নে গোস্বামী, মহান্ত ও বৈষ্ণবমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসব সমাধা করা হয়।

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়। শ্রীখণ্ড চতুষ্পাঠী।

গত ২৫শে ফাল্গুন তারিখে দক্ষিণখণ্ড ঠাকুরবাটীতে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের জন্মোৎসব অভিষেকাদি, তাঁহারই মন্ত্র-ধ্যানাদি দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীবৎ ফাল্গুন পৌর্ণমাসীর ব্রতোপবাসাদি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমে বিহ্বল হইয়া যে শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া অবস্থান করিতেন, এবং শ্রীক্ষেত্রে ঐ শ্রীখণ্ডবাসীর ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বপ্রধান মহাত্ম শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরকে নিজের পুত্র বলিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের গলার মালা ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ ক্রোড়ে লইয়া নৃত্যাদি করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ শ্রীনরহরি ঠাকুর ও শ্রীগৌরপুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর যেরূপ পৃথক শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনব্রতোপবাসাদি করিতেন, ঠিক সেইরূপই শ্রীশ্রীরঘুনন্দন বংশধরগণ জগতবিখ্যাত শ্রীশ্রীগৌর-প্রেমের ভাণ্ডারী শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরের বিশুদ্ধ বৃহৎ বৈষ্ণবদিগের পূজা পদ্ধতি অনুসারে করিতেছেন।

পূর্ব্বে ২৪শে তারিখে আপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় অত্রত্য শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিপ্রদায়িনী সভার এক অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রতোপবাসাদি যে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীবৎ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অকরণে নরকপ্রাপ্তি, তদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় বচন বটিত এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধদ্বারা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাধানন্দ ঠাকুর বিদ্যাবিনোদ বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

২৬শে উপবাসী ব্যক্তিগণের ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের ভোজন প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল।

২৫শে তারিখে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাধানন্দ ঠাকুর বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীগিরিধারি দাস বাবাজীর গান, এবং মৃদঙ্গ-বাদ্যার্ণব গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ ঠাকুর ভাগবতভূষণের মধুর মৃদঙ্গের বাদ্যে শ্রোতৃবর্গের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। জন্মোৎসব গান প্রভৃতি এবং পরদিন দোবী গান হইয়াছিল।

২৫শে পূর্ব্বাহ্নে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সকলানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রীশ্রীজন্মলীলা এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীগৌরভাবামৃত পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতঃ—

নদীয়া উদয়-গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপ-তম হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস, জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
হেনকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়, নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার গাওন রঙ্গে, কেন নাচে কেহ নাহি জানে।
দেখি উপরাগ রাশি, শীঘ্র গঙ্গা ঘাটে আসি, আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাইয়া উপরাগ ছলে, আপনার মন বলে, ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে বিস্ময় ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, তুমি কিছু কাজে আছে ভাস॥
আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দ বিহ্বল মন, কৈল হরি সঙ্কীর্ত্তন, নানা দান কৈল মনোবলে।
এইমত ভক্ত তথি, যার যেই দেশে স্থিতি, তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, দান করে গ্রহণের ছলে।

শ্রীশ্রীগৌরদাসানুদাস—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী। দক্ষিণখণ্ড চতুষ্পাঠী।

২৫।২৬ ফাল্গুন মঙ্গল ও বুধবার মালঞ্চী হরিসভায় শ্রীগৌর-পূর্ণিমায় উৎসবানন্দ সমারোহে হইয়াছে। পূর্ণিমার রজনীতে জন্মলীলা গান এবং অর্চ্চনাদি হইয়াছে। পরদিন "জগন্নাথ উৎসব "ঠিক নন্দোৎসবের ন্যায় দধি হরিদ্রা পঙ্কে লিপ্ত হইয়া গগনভেদি স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছে। যথা,

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে ইন্দ্রচন্দ্র। নবদ্বীপে ভক্তনামে পেয়ে গৌরাঙ্গ॥
হরিনামের জয় পতাকা উঠিল অম্বরে।
দেখ, শচীর কোলে গৌরশশী জগৎ আলো করে।
বাজিল মৃদঙ্গ, খোল করতালধ্বনি।
স্বর্গ হোতে পুষ্পবৃষ্টি করে সুরমণি।
আয়রে আয় নদেবাসী দেখবি যদি আয়।
শচীর ঘরে পূর্ণব্রহ্ম এক হোল হে উদয়।

গ্রামে নরনারি অনেকে উপবাস করিয়া উৎসবান্তে পারণ করিয়াছিলেন যাহারা উপবাসে অক্ষম তাহারাও অনুমোদন করিয়া উৎসাহে

যোগদান করিয়াছিলেন। যাহার নামে আনন্দ হয়, তাঁহার সেই বালশশি রূপ শচিমার কোলে স্মরণ করিলে যে কি প্রকার ভাব হয় তাহা গৌর কৃপাপাত্র ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারেন। বিশ্বাসীগণের পক্ষে গোলযোগ হয়, তাই আজ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-রূপ প্রকাশিত হইয়া গৌর-ভক্তের নয়ন মন শীতল করিতেছেন।

যাঁহার আরাধনা রসের, যাঁহার স্বরূপ রসময় মূর্ত্তি, তাঁহাকে রূপক ভাবিলে কিছুই সুখোদয় হয় না। আমরি! কি মধুর মূর্ত্তি! গৃহস্থ বৈষ্ণবজনের নয়নানন্দকর, প্রিয়াজীর সঙ্গে বিরাজিত। প্রেমময়ের সন্ন্যাসী বেশ আমরা চাই না। বেশ চূড়াটী বাঁধা, ত্রিভঙ্গ ভাবে যুগলরূপে চাই। তবেত যুগলমন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা হইবে। বড়ই গুঢ়ভাব, আমার এ ক্ষীণ লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অসক্ত। এ বুঝাইবার জিনিস নহে, এ সাধনের ধন প্রেমরতন, প্রত্যক্ষ প্রেমময় ও প্রেমময়ীর সন্মীলন। যদি অবতার পৃথক হইল, তবে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া কলির একমাত্র আরাধ্য, এবং ইহাদের জন্মোৎসব আর আর অবতারের ন্যায় অবশ্য করণীয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম বড় সরল। কেন সচ্ছদর্পণে মলাবৃত কর? হস্তের কঙ্কণ কি আর্শি দিয়া দেখিতে হয়? বল জয় গৌরাঙ্গ জয়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। একবার দাসের হৃদয়ে প্রকাশিত হও, প্রাণ ভরিয়া ঐ মধুররূপ দেখি। তাহারাই ধন্য, যে তোমার ঐ মূর্ত্তি হৃদয়ে গাঁথিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে পরম ভক্তবর শ্রীল হরলাল রায় মহাশয় নিম্নলিখিত পদগুলি রচনা করিয়া শ্রীপত্রিকার পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন:—

ফাল্গুণ-পূর্ণিমা যামিনী আইল।
কৃষ্ণ প্রেমে দশদিক শোভিল॥

কি শোভা গগনে, চন্দ্রের কিরণে, কৃষ্ণ-প্রেমে সমুজ্জ্বল।
মধুর কল্লোলে, সুরধুনী চলে, কৃষ্ণ-প্রেমে ঢল ঢল॥
মলয়-অনিল, সুমন্দ বহিল, কৃষ্ণ-প্রেমে সুশীতল।
সুরাগ-রঞ্জিত, পুষ্প সুবাসিত, কৃষ্ণ-প্রেমে বিকাশিল॥
পহেলা প্রহরে, পূর্ণ শশধরে, রাহু আসি পরশিল।
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে, ঘরে, শঙ্খ ঝাঝরি বাজিল॥

যত নারীনরে, হরিধ্বনি করে, পাপ তাপ পাসরিল।
হেন মহাক্ষণে, এ মর্ত্ত্য ভুবনে, গৌরচন্দ্র উদিল॥
ধন্য কলিকাল, ধন্য ধরাতল, পতিত-পাবনে পাইল।
জীবে উদ্ধারিতে, হরিনাম সাথে, গোরা গুণমণি এল॥
দুর্দ্দিন ঘুচিল, সুদিন আইল, কৃষ্ণের কৃপা হইল।
হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি হরি বল॥

—:—

হরিবোল বল সবে নদেবাসীগণ। ফাল্গুণ-পূর্ণিমা রাত্রে হইল গ্রহণ॥
বৈষ্ণব শাকত শৈব হরিনাম লয়। লইতে লইতে হয় ভাবের উদয়॥
সহস্র সহস্র লোক শত শত ঘাটে। সহস্র সহস্র লোক গৃহে পথে মাঠে॥
সহস্র সহস্র লোক প্রাসাদ উপরে। সহস্র সহস্র লোক প্রাঙ্গন চত্বরে॥
একদৃষ্টি হয়ে সবে হেরিয়া গ্রহণ। মনের আনন্দে করে গোবিন্দ স্মরণ॥
কেহ অর্দ্ধস্ফুট ভাষে নামজপ করে। কেহ হরি হরি বলে গদগদ স্বরে॥
কেহ মহোল্লাসে হরি বলে উভরায়। তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত তর্জ্জনী ঘুরায়॥
উচ্ছাসে উচ্ছ্বাসে উঠে মহা হরিধ্বনি। পবিত্র হইল নদে পবিত্র ধরণী॥
সলিল অনিল ব্যোম পবিত্র হইল। হেন মহা শুভক্ষণে গৌরাঙ্গ আইল॥

—০—

কি হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল রে—
মহানাদে—গগণ ভেদ করি, ভুবন শীতল করি,
হেন শুভক্ষণে মোর গৌরাঙ্গ আইল রে—
কৃষ্ণের কিবা লীলা, জীবে কি বুঝিবে রে!

—০—

আকাশে রাহু গ্রাসিল চন্দ্র। ভূতলে প্রকাশ গৌরচন্দ্র॥
কলি-তম যবে প্রগাঢ় ভেল। সে তম নাশিতে গৌর এল॥
যাগ যজ্ঞ তপ ঘুচিল এবে। গোরা এল হৈল তারিতে জীবে॥
কৃষ্ণে পাসরিয়ে জীব ডুবিল। কৃষ্ণ দিতে জীবে গৌর এল॥
কৃষ্ণে ভুলি জীব আছিল মরি। চেতাইতে তারে এল গৌরহরি॥
সংসারে মজিয়া হিয়া শুকাল। প্রেম দিতে জীবে গৌর এল॥
জীবে বুঝাইতে রাধা-কৃষ্ণলীলা। গৌর সুন্দর দেহ ধরিলা॥
পাষাণ গলাতে হরিনাম বলে। প্রেমে ভাসাইতে মহীমণ্ডলে॥
করিতে সমগ্র বিশ্ব হরিময়। হরিময় গৌর ভেল রে উদয়॥

অপার আনন্দে শচী পুত্র কোলে নিল। অপূর্ব্ব বাৎসল্যে হিয়া উথলি উঠিল॥
শীতল হইল তনু ঝরিল নয়ন। স্পন্দহীন হয়ে শচী রহে কতক্ষণ॥
কিছু নাহি বলে কিছু বলিতে না পারে। অনিমিখে অপরূপ শিশুরে নেহারে॥
পরম সুন্দর শিশু কি দিব তুলনা। কনক-কমল যেন চাঁদের জোৎস্না॥
অমানুষী ভাব পূর্ণ শিশুর বদন। যেই দেখে তারে শিশু করে আকর্ষণ॥
চৌদিকে ঝাঝরি শঙ্খ বাজিছে সঘন। উঠিতেছে হরিধ্বনি ভেদিয়া গগন॥
সেই হরিধ্বনি যেন শুনিতে শুনিতে। হাসিল কাঁদিল গোরা মায়ের কোলেতে॥
শচী ভাবে হেন পুত্র কারো হয় নাই। জন্ম জন্মান্তরে যেন এই পুত্র পাই॥
দৃঢ় করি নিরন্তর বুকেতে ধরিব। জাগ্রতে নিদ্রাতে হেন রত্ন না ছাড়িব॥
এ নিধি মিলেছে তোরে বহু পুণ্যফলে। জগতের সারবস্তু শোভে তোর কোলে॥
তোর পুণ্যে বসুন্ধরা হ'ল ভাগ্যবতী। তোর পুণ্যে অগতি জনার হ'ল গতি॥
এই শিশু হরিনামে মাতাবে সংসার। ধরণী গোলোক হবে কৃপাতে ইহার॥
হরি হরি বল সবে আনন্দিত মনে। হরিনাম মহোৎসব গৌর জন্ম দিনে॥

—০—

প্রতিবাসী নারী আসি কহিছে শচীরে। তোর সম ভাগ্যবতী নাহি ত্রিসংসারে॥
বহু পুণ্যে পাইয়াছ হেন পুত্রধন। এ নহে সামান্য বস্তু পরম রতন॥
যেই মাত্র তোর পুত্রে নয়নে হেরিনু। মনে হ'ল মোরা যেন নিষ্পাপ হইনু॥
আলো করিয়াছে শিশু সুতিকা আগার। আলো ফুটিয়াছে যেন বদনে ইহার॥
মনে লয় এই শিশু আমাদের ধন। তোর পুত্রে পুত্রবতী মোরা সর্ব্বজন॥
তোর কোলে তোর পুত্রে হেরি হয় মনে। দেবকীর কোলে কৃষ্ণে হেরিনু নয়নে॥

—০—

শচীর পুত্রেরে হেরি কৃষ্ণে পড়ে মনে। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বলিব কেমনে॥
অভিন্ন গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলে ভক্তজন। অনুমানি এই হবে ইহার কারণ॥
গৌরে হেরি কেশব ভারতী বলেছিল। 'তোমা দেখি কৃষ্ণে মোর চৈতন্য হইল'॥
দেখিলে স্মরিলে গৌরে নিলে গৌরনাম। কৃষ্ণ পদ লভি জীব হয় পূর্ণকাম॥
যে দেখেছে শিশু গৌরে বড় ভাগ্য তার। তার পদে করি আমি কোটী নমস্কার॥
গৌরাঙ্গের জন্ম স্মরি বল হরি হরি। গৌর এল ভয় ঘুচিল জীব গেল তরি॥
মহাঘোর অন্ধকার ঘেরেছে সংসার। কলির ভীষণ রাত্রে গৌর পদ সার॥

—০—

পদকল্পতরু।

এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহকারের সমকাল পর্য্যন্ত যে সকল পদকর্ত্তা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃত পদাবলী সংগ্রহ করতঃ বৈষ্ণবদাস নামক কোন মহাত্মা ইহা গ্রন্থিত করেন। সঙ্কলয়িতৃ বৈষ্ণবদাসের প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, তাঁহার বাসস্থান কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী টেঞা বৈদ্যপুর। গোকুলানন্দ সে সময়ে একজন প্রধান গায়ক ছিলেন, তিনি যে স্বরে গান করিতেন তাহাকেই এখন টৈঞার ছপ কহে গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম "গীতকল্পতরু" তবে সাধারণ গীত হইতে পৃথক রাখিবার জন্যই গ্রন্থের আদি মুদ্রাকর ইহার "পদকল্পতরু" নাম দিয়া থাকিবেন। গোকুলানন্দ বা বৈষ্ণবদাস কত দিনের লোক, তাঁহার বংশের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁহার সময় নির্ণয় করিবার একটী সহজ উপায় যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহাই শ্রীপত্রিকার পাঠক পাঠিকাদিগকে অবগত করিতেছি। বৈষ্ণবদাস গ্রন্থ শেষে অনুবাদ প্রকরণে তাঁহার গ্রন্থ করণের একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই—

অদোষ দরশী তোমরা গৌর-ভক্তগণ। অপরাধ ক্ষমি শুন মোর নিবেদন॥
আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন। কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস। যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥

শ্রীরাধামোহন "ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাও তিনি পূর্ব্ব মহাজনদিগের পদ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল রসের পদ তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সে সকল স্থানে নিজে পদ রচনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ খানি দেখিয়াই বৈষ্ণবদাস "গীতকল্পতরু" গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তিনিও আবার যে সকল রসের পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তাহা তিনি নিজে রচনা করিয়া গ্রন্থ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে, শ্রীরাধামোহনের অল্প কাল পরে বা তিনি জীবিত থাকিতেই এই গীতকল্পতরু সংগৃহীত হইয়াছে শিবাজী ও প্রতাপাদিত্যের চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় রাজা নন্দকুমারের জীবনী

সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, রাধামোহন ঠাকুর রাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। রাজা নন্দকুমার ইংরাজাধিকারের প্রথমে বর্ত্তমানছিলেন। এই সকল কারণে জানা যায় যে ১৬৪০ বা ১৬৪৫ শকাব্দায় বৈষ্ণবদাস জীবিতছিলেন এবং এই কালের কিঞ্চিৎ অগ্র বা পশ্চাৎ গীতকল্পতরু গ্রন্থের সংগ্রহ কাল বলিতে পারা যায়।

যাহা হউক এই গ্রন্থখানি গৌরগত-প্রাণ বৈষ্ণবমণ্ডলীর বড়ই আদরের গ্রন্থ ইহা একখানি উপাসনা গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ি আচার্য্যগণ যে সকল ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তদিগের কৃষ্ণভজনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, আমাদের বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ও অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রস ভাবময় পদসমূহ সংগ্রহ করিয়া সেই সকল উপাসনা গ্রন্থ সমূহেরই অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইবার চেষ্টা করিব। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্রাদি লইয়া একটী মহান্ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এই দেড়শত বর্ষের পূর্ব্বের সংগ্রহ গ্রন্থও সেই গৌড়মন্ত্র গ্রহণের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বৈষ্ণবদাস মঙ্গলাচরণের প্রথমেই নিজকৃত যে পদদ্বারা গুরুদেবকে বন্দনা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে বৈষ্ণবদাসের সময়েও গৌর মন্ত্র লওয়ার প্রথা তিরোহিত হয় নাই বা তাহার পূর্ব্বেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইহ লোচন আনন্দধাম।

অযাচত এ হেন পতিত হেরি যো পহুঁ যাচি দেওল হরিনাম॥

পদে। এই অংশ দ্বারা জানা যায় যে বৈষ্ণবদাস গুরুদেবের নিকট প্রথমে হরিনাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে—

দুরগতি অগতি অসতমতি যো জন নাহি সুকৃতি লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন তাহে করল উপদেশ॥

এই অংশ দ্বারা গ্রন্থকারের গুরুদেব-নিকটে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমন্ত্র গ্রহণ প্রমাণিত হইল। ইহার পরে—

নিরমল গৌর, প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল সব মন আশ।

পদে। এই অংশ দ্বারা জানা যায় যে বৈষ্ণবদাস প্রথমে হরিনাম তৎপর যুগলমন্ত্র লাভ করিয়াও মনের আশা মিটাইতে পারেন নাই। পরে যখন তাঁহার গুরুদেব নির্ম্মল গৌর-প্রেমরস সিঞ্চন করিলেন, তখন

শিষ্যের মন আশা পূর্ণ হইল। ইহা দ্বারা গৌর-মন্ত্র গ্রহণ প্রথার কি প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইল না?

ইহার পরে গৌর-তত্ত্ব নিরূপণ। প্রথম শাখার প্রথম পল্লবের পঞ্চম সংখ্যক পদে শ্রীনন্দ-নন্দন ও শ্রীশচীনন্দন যে একবস্তু তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন এটী গোবিন্দ কবিরাজ কৃত পদ। যথা—

"নন্দ নন্দন, গোপীজন বল্লভ, রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুর-নরগণ-মনমোহন ধাম॥" ইত্যাদি।

এই পদের অন্য অংশে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কৃত পদ দ্বারা গৌরাবতারের একটী সাধারণ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে কারণটী এই—

"অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী তীরে, আইলা নাগররাজ।
তাঁহার পিরীতে, হইয়া ত্বরিত, উদয় নদীয়া মাঝ॥" ইত্যাদি।

অদ্বৈত প্রভু কলি-জীবের দুর্গতি দেখিয়া কলিযুগে নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্ত করিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অসীম কারুণ্য তাহাও দেখান হইল।

শ্রীগৌরমন্ত্রের স্বতন্ত্রতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রত-মন্ত্রাদি অবৈধ বলিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে এক খানি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। এ কথা গত সংখ্যা শ্রীপত্রিকা পাঠে সকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন। সেই দেশব্যাপী আন্দোলনের পর বিরুদ্ধ-পক্ষীয়গণের পুনঃ ওরূপ চেষ্টা করা বৃথা; সুবুদ্ধির পরিচায়ক কি না, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির না বলাই ভাল।

শ্রীমহাপ্রভু গয়া হইতে আসিয়াছেন; পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভক্তির খেলা খেলিতেছেন, কৃষ্ণভক্তের নাম শুনিলেই দৌড়িয়া যাইতেছেন। সেই সময়ে অদ্বৈত প্রভু ভক্তিরাজ্যের রাজা; অদ্বৈত ভক্তি-বলে জানিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। ঐ সময়েই একদা শ্রীমহা-প্রভু গদাধর সহ অদ্বৈতালয়ে উপস্থিত হন। ভক্তভাবে অদ্বৈতের সহিত প্রভুর ইহাই প্রথম মিলন। তখন কি হইল? চৈতন্য ভাগবত বলেন—

"অদ্বৈত দেখিবামাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িল মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী উপর॥

ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। এই মোর প্রাণনাথ জানিল সকল॥
কতি যাবে চোর আজি বলে মনে মনে। এতদিন চুরি করি বুল এই খানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই। চোরের উপর চুরি করিব এথাই॥"

এইরূপ মনে করিয়াই—

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি লই সেই ঠাঞি। চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে,—

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

এইটী কৃষ্ণপ্রণামের প্রসিদ্ধ শ্লোক এই সূত্রেই কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণমন্ত্রাদিতেই গৌরার্চ্চন সিদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে আমরা কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া আরও দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলচলে বাস করিতে লাগিলেন। প্রভুর এই দৃষ্টান্তে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি অনেকেরই আসক্তি জন্মিল। স্বয়ং প্রভু সন্ন্যাসী তাঁহার প্রধান প্রধান পরিকর, যথা শ্রীনিতাই, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সন্ন্যাসী; কাজেই সন্ন্যাসের দিকে, লোকের ঝোঁক পড়িল। কিন্তু ধর্ম্ম যে গৃহত্যাগের গণ্ডীতেই মাত্র আবদ্ধ নহে, এ কথা বুঝান তখন আবশ্যক হইয়া উঠিল। তাই নীলাচলে একদা প্রভু নিতাইয়ের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রভু নিতাইকে বলিলেন—

তুমি যাহ গৌড়দেশে, করহ সংসার। তবে এই সব লোকের হইব নিস্তার॥
নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার।

পতিব্রতা রমণীকে পতি পরিত্যাগ করিতে বলা যে কথা, একজন উদাসীনকে সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অনুরোধ করাও তদ্রূপ। প্রভুর এই নিদারুণ আদেশে সদানন্দ নিত্যানন্দের আনন্দ তিরোহিত হইল; কিন্তু প্রভুর আদেশ অলঙ্ঘ্য। নিতাই কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"তুমি যন্ত্রী হও, যন্ত্র তুল্য হই আমি।
যখন যে করাও ফিরাও যথা যথা। কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা॥
বিশেষ আমার তুমি হও হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা।
বিকর্ম্ম সুকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা॥
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা। * * *

পুন মোরে কাহতেছ করিতে সংসার
আপনাতে জাতিধর্ম্ম করিলে স্বীকার॥
এমন বিগ্রহ কেনে করিছ গোঁসাই।
তুমি সে অনন্য মোর আর নাই॥
আজ্ঞাকারী দাস আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা তাহা বহি শীরে ধরি॥"

নিত্যানন্দ পথে পথে প্রেমের বন্যা ছুটাইয়া গৌড়ে—অম্বিকা নগরে উপনীত হইলেন। অম্বিকাতে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সহিত প্রথমেই তাঁহার মিলন হইল। অম্বিকাতে সূর্য্যদাস নিত্যানন্দের তেজঃপুঞ্জ-কান্তি দর্শনে ও প্রেমভাবে বিমোহিত হইলেন। সূর্য্যদাস নিতাইয়ের অনুসঙ্গী উদ্ধারণ দত্তকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে—

উদ্ধারণ কহে ইহা ব্রহ্মণ উত্তম। রাঢ়ীশ্রেণী সর্ব্বশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠতম॥
রাঢ় চূড় মণি ইহাঁর শাস্ত্রে খ্যাতি। নিত্যানন্দ নাম হয় প্রেমপূর স্থিতি॥

নিত্যানন্দকে সূর্য্যদাস নিমন্ত্রণ করিলেন। নিতাই সূর্য্যদাস গৃহে উপস্থিত হইয়া আনন্দ সহকারে ভোজন করিলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বিবাহযোগ্যা দুই কন্যা—বসুধা ও জাহ্নবা। সূর্য্যদাস নিতাইকে কন্যাদ্বয় সমর্পণ করিলেন। এইরূপে সূর্য্যদাস পরিবারের সহিত গ্রন্থিবিহীন নিতাইয়ের সম্বন্ধ বন্ধন সংস্থাপিত হইল।

সূর্য্যদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুই জন—দামোদর ও জগন্নাথ; এবং কনিষ্ঠ তিন জন—গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য। তন্মধ্যে গৌরীদাস নিতাইকে দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহার সহজ জ্ঞান লোপ হইয়া গেল; গৌরীদাস নিতাইয়ের প্রেমে পাগল হইলেন ইহার পর নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। গৌরীদাস যখন এ কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা ঘটিল, তাহা বর্ণনার অতীত। সেই ভাবিবিচ্ছেদানুভবের কালে একদা গৌরীদাস প্রভুকে পাইয়া তদীয় শ্রীচরণে পতিত হইলেন; আর ছাড়িয়া দিতে চান না। প্রভু প্রেম-পাশে বাঁধা পড়িলেন, কাজেই গৌরনিতাই গৌরীদাস গৃহে চিরতরে রহিয়া গেলেন। সে অপরূপ—রোমাঞ্চকর কাহিনী কিছু পূর্ব্বে শ্রীপত্রিকায় "গৌরীদাস পণ্ডিত" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যাহা হউক, গৌরীদাস যে দুই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন, শাস্ত্রানুসারে

সেই বিগ্রহযুগলের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রভু বা তৎপরিকরগণ যদি শাস্ত্র সম্মান রক্ষা না করেন, তবে কে করিবে ?

এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে গৌরীদাস শ্রীমদদ্বৈত প্রভুকে আহ্বান করিলেন। গৌরবিগ্রহ সংস্থাপন তখন এক নূতন ব্যাপার, আর অদ্বৈত তখনকার সময়ে সম্মানে ও ভক্তিগৌরবে সকলের শীর্ষস্থানীয়, কাজেই গৌরীদাস তাঁহাকে আহ্বান করিলেন

অম্বিকায় অদ্বৈত প্রভু যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অদ্বৈত তনয় অচ্যুতানন্দ প্রভু কহিলেন—

"মোরে আজ্ঞা কর প্রভু যাঙ অম্বিকাতে।
কিবা ধ্যান মন্ত্রে পূজা হৈব নির্ব্বপণ। দয়া করি কহ সত্য না কর গোপন॥
হাসি সীতানাথ কহে জানিয়া না জান। স্বয়ং কৃষ্ণ নদীয়ায় হৈলা অবতীর্ণ॥
রাধা অঙ্গ কান্ত্যে ঢাকা সর্ব্ব কলেবর। যৈছে বস্ত্র আবরণে দৃশ্য রূপান্তর॥
তেঁই গোপালের দশাক্ষরী মন্ত্র ধ্যানে মহাপ্রভুর পূজা হৈব কহিনু সন্ধানে॥"
অদ্বৈত প্রকাশ।

গৌরগত-প্রাণ অচ্যুতের এ কথা ভাল লাগিল না, তিনি পিতার সাময়িক উদ্দেশ্য—গম্ভীর আশয় অনুধাবন করিলেন না। প্রীতির স্বভাব এইরূপই—প্রীতি দূরদর্শনে অশক্ত। পিতৃভক্ত অচ্যুতের মনোমত কথা হইল না বলিয়া তিনি স্পষ্ট প্রতিবাদ করিলেন না, জিজ্ঞাসিলেন—

"কিন্তু খণ্ডবাসী সুপণ্ডিত নরহরি। সরকার ঠাকুর যেঁহ প্রেমের গাগরি॥
শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তেতে গণন যাঁরে কৃষ্ণের নিত্য সখী কহে সাধুগণ॥
তিঁহ মোরে কহে গৌরের পূজা মতান্তরে। ইহার কারণ কিবা কহ প্রভু মোরে॥
প্রভু (অদ্বৈত) কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমার্ণবে।
ভক্তি অনুসারে পূজা সকলি সম্ভবে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে ভক্ত মাঝে।
যে যৈছে ভজয়ে কৃষ্ণ তারে তৈছে ভজে॥" অদ্বৈত প্রকাশ।

তখন মনোমত উত্তর পাইয়া অচ্যুত পরমানন্দিত হইলেন। যথা—
শুনি শ্রীঅচ্যুতানন্দ আনন্দে মাতিলা গৌরীদাস সঙ্গে তিঁহ অম্বিকাতে গেলা॥

এখানে একটা কথা বলিব। যখন শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন, বৈষ্ণবগণ যখন তাঁহাকে স্বয়ং তিনি বলিয়া পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকিল না, থাকা অসম্ভব। একান্ত ভক্তগণ

একথা প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। দুর্জ্জনগণ এই কথা লইয়া ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিল। মনে রাখিতে হইবে, ভগবানের অবতার কথা লোকের নিকট তখন একবারে নূতন ও অসম্ভাবনীয় ব্যাপার ছিল। এরূপ ঠাট্টা তামাসায় ভক্তগণ মর্ম্মাহত হইতেন। তখন শ্রীমহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হ'ল। তাঁহারা শাস্ত্র হইতে ভবিষ্য-দ্বাণী সকল সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলেন, শাস্ত্রে অবতারের যে যে লক্ষণ কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গে তাহা প্রযুক্ত করিয়া লোকের মোহ বিদূরিত করিতে লাগিলেন। এই ভক্ত-দলের অগ্রণী ছিলেন শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য। তাঁহারই সাধনে গৌরবিধুর উদয় ঘটে। অশেষ যত্ন ও বিবিধ পরীক্ষায় তিনি আপন আনিত ধনের মহিমা দেখিতে দেখিতে প্রচার করিয়া ফেলিলেন। জন সাধারণ শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করিল, বুঝিল যে তিনিই গৌররূপে ভুবন আলো করিতেছেন

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কেন গৌরাঙ্গকে প্রথমেই "নমো ব্রহ্মণ্য" ইতি শ্লোকে প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং কি জন্যই শ্রীগোপাল মন্ত্রে পূজা করিতে বলেন, এতক্ষণে বোধহয় পাঠক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সুধীজনের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য যে কালজ্ঞ ও দূরদর্শী অদ্বৈত প্রভু তখন ঐরূপ না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে, "মতান্তরে" (অর্থাৎ গৌর মন্ত্র) শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিতে বিরোধি ছিলেন, তাহা নহে। এই জন্যই তিনি অচ্যুতের প্রশ্নে স্বীকার করিয়াছেন সরকার ঠাকুর গৌরমন্ত্রে যেরূপ গৌরার্চ্চনা করেন, তাহাই সঙ্গত ও সিদ্ধ।

যখন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে গৃহীত হইলেন, অদ্বৈত প্রকারা-ন্তরে তখন আপন চিরপোষিত মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ইহা অদ্বৈত প্রভুর অগাধ বিজ্ঞতার সামান্য একটী নিদর্শন। অদ্বৈত তখন বলিতে লাগিলেন যে অচ্যুতের মতই তাঁহার মত, অচ্যুতের মতে সকলে চলিলেই তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা হয়। কেবল অদ্বৈতপ্রকাশে নহে, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও অদ্বৈত প্রভুর বাক্যের প্রতিধ্বনি আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত সেই মত সার। আর যত মতে সব হৈল ছারখার ॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য চরণ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

গৌরাঙ্গের পৃথক মন্ত্রেই গৌরার্চ্চন হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই অচ্যুতের মত; ইতিপূর্ব্বে পাঠক তাহা জানিয়াছেন। অচ্যুতের মতকে আপন মত বলায় শ্রীআচার্য্য প্রভুও পরিশেষে তাহাই স্বীকার করিলেন, তাহা-রই প্রাধান্য দিলেন।

কৃপা পূর্ব্বক পাঠক মহোদয় আর একটা কথা শুনুন। কৃষ্ণমিশ্র অচ্যুতের অনুজ;—অচ্যুতের প্রাণতুল্য। অচ্যুতের মতেই তাঁহার মত। সুতরাং কৃষ্ণমিশ্রের মত যাহা, অচ্যুতের তাহাই মত, ইহা সিদ্ধ হইল। এই কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে চাঁপাকলা নিবেদন করেন। এতৎ সম্বন্ধে অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে; যথা—

"আগে প্রণব মহামন্ত্র করি উচ্চারণ। গৌরায় নমঃ বলি কৈলা সমর্পণ॥"

ইহাই গৌর-মন্ত্র। অদ্বৈত পুত্রের ব্যবহারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা—

"প্রভু কহে কিবা মন্ত্রে কৈলা নিবেদন। শিশু কহে সপ্রণব গৌরায় নমঃ॥"

শিশুর মন পরীক্ষার্থ—

প্রভু কহে গৌরায় স্থলে কৃষ্ণায় কহা যুক্ত। শিশু কহে গৌরনামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত॥

তখন—

"আশ্চর্য্য মানিলা প্রভু তাঁহার বচনে। প্রেমাবিষ্ট হঞা চুম্বে শিশুর বদনে॥
পুত্রের সিদ্ধান্ত শুনি সীতার বিস্ময়। মনে ভাবে ধন্য ধন্য আমার তনয়॥"

অদ্বৈতপ্রকাশ।

এখন মনে ভাবুন, যদি গৌরমন্ত্রে গৌরার্চ্চনা অদ্বৈত প্রভুর অমত হইত, তবে কি তিনি প্রীতিভরে কৃষ্ণমিশ্রের মুখচুম্বন করিয়া অনুমোদন করিতেন? গৌরমন্ত্রে গৌরার্চ্চনা অসিদ্ধ হইলে সীতা দেবীই কি পুত্রের সিদ্ধান্ত শুনিয়া "ধন্য ধন্য" করিতেন? কখনই না। আর কৃষ্ণমিশ্রেরই বা কি অপরূপ সিদ্ধান্ত—"গৌরনামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত।" এস্থলেই গৌর-মন্ত্রের স্বতন্ত্রতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল মাত্র কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু একীভূত তনু রাধা-কৃষ্ণ। অদ্বৈত প্রভু কি জানিতেন না যে তিনি রাধা-কৃষ্ণের মিলিত অবতার? জানিতেন বলিয়াই তিনি অচ্যুতানন্দ ও কৃষ্ণমিশ্রের মতকেই প্রবল রাখিয়া-ছেন, সে মতকেই আপন মত বলিয়াছেন।

যদি শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে পূজা করাই কর্ত্তব্য বল, তবে বলিব,

তাঁহাকে রাধা-মন্ত্রে পূজা করিতেই বা দোষ কি? তিনি ত উভয়ের সম্মিলিত অবতার? এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথক মন্ত্রের আবশ্যক, এই জন্যই গৌরমন্ত্রে গৌরার্চ্চনা সিদ্ধ। এই জন্যই উদ্ধাম্নায় সংহিতা, ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, সনৎকুমার সংহিতা, ঈশান সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই।

ভাল কথা মনে হইল। অনন্তসংহিতা গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য। চৈতন্য ভাগবতে ঐ গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; এই অনন্ত সংহিতাতে গৌরাঙ্গের ধ্যান মন্ত্রাদি কথিত হইয়াছে। অদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণ কালে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট এই গ্রন্থখানি পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ও গ্রন্থখানির নকল লিখিয়া লন। একথা পূর্ব্বে "প্রেম প্রসঙ্গ" প্রস্তাবে শ্রীপত্রিকায় লিখিয়াছি এস্থলে উল্লেখ পুনরুক্তি মাত্র অদ্বৈতপ্রভু পৃথক মন্ত্রে গৌরার্চ্চনার অপক্ষপাতী ছিলেন না, এ সকল কথা আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। তবে বিজ্ঞ শিরোমণি অদ্বৈত প্রভু কালের গতি লক্ষ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন করিতে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার পক্ষে উপযোগীই ছিল। তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বিরুদ্ধবাদিগণ মহাজনের অভিপ্রায় কি, এবং মহাজন সিদ্ধ ব্যবহারই বা কি, বুঝিতে পারিবেন। আর বলিতে পারি কি ভাই! স্ব স্ব গুরু উপদেশানুরূপ চল কে কি করিতেছে না করিতেছে, তাহার খোঁজ লইয়া তোমার কি? বিশেষতঃ, তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ নহে;—কোন মন্ত্র সিদ্ধ, কি অসিদ্ধ, তাহারই বা কি জান? 'ভাবে লাভ" একথা স্ত্রীলোকেও বলে। হায়, হায়, অভিমানই আমাদিগকে ছারেখারে দিল!! হায় হায়, যে প্রতিবাদের বিষয় স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ—ভজনীয় বস্তু; সে বিষয়ে ভেদ ধরা কি সহৃদয়তার কার্য্য? দেশে এখনও গঙ্গা ও যমুনা আছেন, দড়ী ও কলসী আছে, এরূপ কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের মরিয়া যাওয়াই উচিত।

শ্রীবৈষ্ণব দাসস্য। শ্রী-ট্র।

—*—

যুগল-মিলন।

আজ,　বসিলেন গৌরচন্দ্র রত্ন-সিংহাসনে।
বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী মোর বসিলেন বামে॥
প্রিয়াজীর মুখ যেন পূর্ণিমার শশী।
হৃদয়ে না ধরে সুখ মুখে মৃদুহাসি॥
ভক্তগণ ঘেরি ঘেরি গোরাগুণ গায়।
গদাধর নরহরি চামর ঢুলায়॥
সুগন্ধি চন্দন কেহ দেয় দুহুঁ অঙ্গে।
ভাসিলেন ভক্তগণ সুখের তরঙ্গে॥
মালতীর মালা কেহ দুহুঁ গলে দেয়।
নিত্যানন্দ প্রভু ছত্র ধরিলা মাথায়॥
শচীমাতা ভাসিলেন সুখের সাগরে।
ধান্য দূর্ব্বা দেন পুত্র বধূমার শীরে॥
একে ত গৌরাঙ্গ রূপের নাহিক তুলনা।
তাহে বামে বিষ্ণুপ্রিয়া কি দিব তুলনা॥
আজ,　বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের যুগল-মিলন;
জনম সফল কর হের রে নয়ন॥

ম্লেচ্ছের হিন্দুত্ব প্রাপ্তি।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর পরগণার উত্তর ভাগে শৈল-মালা বিরাজিতা। তদুপরিভাগে অসভ্য গারো হাজঙ্গ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির বাসস্থান। তন্মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পাথর হাজঙ্গ নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। দৈবনির্ব্বন্ধ বশতঃ পাথরের আত্মকলহ উপস্থিত হয়। পাথর নিজে শান্তপ্রকৃতির লোক ছিল। সে মনে করিল, আত্মবর্গের সুখের জন্য লোকে কত অকার্য্য করে এবং সুদুষ্কর ক্লেশ-ভার বহন করিয়া থাকে। সেই সুহৃদ্বর্গই যদি শত্রুতা সাধন করে, তবে এ জীবন রাখাই বিফল। এক্ষণে প্রাণত্যাগের সদুপায় জিজ্ঞাসু হল দৃষ্ট হয় না। তবে দেও (দেবতা) পূজিয়া তদভিপ্রায়ানুসারে

কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই যুক্তি স্থির করিয়া, সে পূর্ব্ব রীতি অনুসারে দেও পূজিল। দেও আদেশ করিলেন যে, দক্ষিণ উড়িষ্যাদেশের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে পৌছিলেই তোমার প্রাকৃত দেহত্যাগের সুযোগ হইবে। অদ্যাপি পার্ব্বতীয় প্রদেশে দেও পূজার অনেকটা প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট হয়। অনন্তর পাথর তীর্থরাজ সমুদ্রতীরাভিমুখে শুভযাত্রা করিল। সে দ্বিভাষী ছিল, অর্থাৎ জাতীয় ভাষা ভিন্ন বাঙ্গলা ভাষাও কিছু কিছু বুঝিত ও বলিতে পারিত। এই বিদ্যাবলেই সে পার্ব্বতীয় লোকের সম্মানিত ছিল। পাথর প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল নদ অত্যন্ত বেগবান্ এবং বৃহৎ পরিসর, অপর পারের গ্রামাদি মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হয়। তৎপরে নাবিকের সমীপে জানিল দশ কাহন কড়ি না দিলে কদাচ অপর পারে যাইতে পারিবে না। তাহার নিকট এক কপর্দ্দকও ছিল না, সে নিরুপায় ভাবিয়া শ্মশানস্থিত মৃণ্ময়ী কলসী অবলম্বন পূর্ব্বক অসীম সাহসে সেই বৃহৎ নদে সন্তরণ করিতে করিতে বহু ক্লেশে সমস্ত দিবাবসানে ভাগ্যক্রমে অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সুসঙ্গের মহারাজ তীর্থ ভ্রমণে নৌকাযোগে যাইতে ছিলেন। তিনি পাথরের তাদৃশী লোকবিস্ময়কারিণী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সত্বরে নৌকায় উঠাইলেন এবং আকৃতি দর্শনে অনায়াসে তাহাকে হাজঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারিয়া বহুভাষাবিৎ নৃপতি পার্ব্বতীয় ভাষায় পাথরের সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দয়া বশতঃ সঙ্গে লইয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনা ১৪৪০ শকাব্দায় সংঘটিত হয়। তৎকালে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্য দেব শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজিত এবং রথযাত্রায় সমাগত গৌড়ীয় ভক্তগণসহ সমবেত। উক্ত মহারাজ শ্রীক্ষেত্রধামে পৌছিলেই পাথর তৎসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যে দিবস জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা হয়, তৎসময়ে চল-জগন্নাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু মহা-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র পতাকা উড়িতে লাগিল, শত শত খোল করতাল বাদন দ্বারা স্বর্গীয় গন্ধর্ব্বগণকে স্তম্ভিত করিল, মধ্যে মধ্যে ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ফুৎকার দ্বারা ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। অগ্রে সংকীর্ত্তনের মূল-সূত্রধার অদ্বৈতচন্দ্র, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তদ্দক্ষিণে প্রভু নিত্যানন্দ, বামে ভক্তশক্তি-গদাধর এবং

চতুষ্পার্শ্বে ভক্তমণ্ডলী। অহো! কি অপূর্ব্ব শোভা। প্রভু নীতারাগে হরি-নাম-সংশ্লিষ্ট অপ্রাকৃত স্বরালাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুমধুর রসে ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া গেল। গৌর-নিত্যানন্দ তাহে তান করিয়া তদনন্তর গম্ভীর স্বর সংযোগ করিলেন। অহো! তাহাতে কি সুমধুর, মধুর হইতে সুমধুর, ধ্বনি অণ্ডকটাহ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠস্থ ভক্তহৃদয়ে অমৃতানন্দ-শক্তিবিশিষ্ট মধুময় চক্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ করিয়াছিল। অহো! সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী সর্ব্বচিত্তমোহিনী সর্ব্বভয়বারিণী শুদ্ধভক্তি-দায়িনী হরিনাম সংকীর্ত্তন দেবতা! ক্রমে সেই প্রেমাসবে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজগণের সহিত বিহ্বল হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই নামাসবের কণা পাথরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট মাত্র অমনি তাহার হৃদয়ভৃঙ্গ নাচিয়া উঠিল। সংকীর্ত্তন-দিব্য-অয়স্কান্তের অমোঘ আকর্ষণে পাথর-লৌহ তথায় উপস্থিত হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কীর্ত্তনানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজগণের বহুল পরিশ্রম অনুভব করিয়া সংকীর্ত্তন নিবৃত্তি পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। কিন্তু পাথরের নৃত্য ভঙ্গ হইল না। তদ্দর্শনে শ্রীনারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত কহিলেন, এ ব্যক্তি কি প্রেমভাবে নৃত্য করিতেছে? না উন্মাদ? না আমাদের নৃত্যের পরিহাস করিতেছে? শ্রীঅদ্বৈত—ইহার কিছুই নয়। শ্রীবাস—তবে কি? অদ্বৈত—প্রাকৃতানন্দে। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নিত্যানন্দের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন, তুমি ভিন্ন এমন দয়াল আর কে আছে যে ভক্তিহীন ম্লেচ্ছ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইবে। প্রভু নিত্যানন্দ, পাথরের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালেশ স্ফুরিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া প্রেমাবেশে হুঙ্কার পূর্ব্বক—

"কৃষ্ণ আজ্ঞা মহাবেদ লঙ্ঘে শক্তি কার।"

এই বলিতে বলিতে নানা রঙ্গভঙ্গী করতঃ পাথরের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাথরও অনুকরণ করিতে লাগিল। দয়াল নিত্যানন্দ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ক্ষীরসাগর হইতে দিব্যজ্ঞানের জোয়ার ছুটিয়া পাথরের হৃদয়-মরুভূমি আর্দ্রীভূত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহাতে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইল। পাথর সজলপ্রলোচনে প্রভুকে কহিল, আমি জানিলাম তুমিই বঙ্গদেশে পরম দয়াবতার; অজ্ঞান ম্লেচ্ছ

জাতিকে ভবরোগ হইতে পরিমুক্ত করণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। ধন্য, তোমার নবসঙ্কল্পের ধন্য। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তদ্বাক্যে রোমাঞ্চিত হইয়া পার্ব্বতীয় ভাষায় কহিলেন,—পাথর! ত্বরা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান করিয়া আইস; এখনি তোমার ম্লেচ্ছস্বরূপ মলাপকর্ষণ হইবে। তবেই ভবব্যাধি শান্তির মহৌষধি পান করিতে পারিবে। প্রভুর আদেশে পাথর স্নানান্তর শ্রীতুলসীবেদী সমীপে উপবিষ্ট হইল। দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ পাথরকে তুলসীকাষ্ঠ-মালা এবং দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করাইয়া হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। পাথর নাম-ব্রহ্ম-দিব্য-চিন্তামণি ধারণ মাত্র কদম্বকুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া প্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডাকার প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল অশ্রু-গঙ্গায় প্রক্ষালন করতঃ প্রেমগদ্গদস্বরে কহিতে লাগিল,—প্রভো! তুমিই বিধাতার বিধাতা; তুমিই সর্ব্বজীবের পরমাত্মা পরাৎপর। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে তুমি যে দয়া দ্বারা বনপশু উদ্ধার করিয়া অচিন্ত্য মহিমা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা প্রাকৃত জীব মরীচিকাতে জল ভ্রমের ন্যায় স্বার্থ বিমিশ্রিতা দয়া বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু অদ্য মহাপশুকে যে উদ্ধারোন্মুখ করিয়াছ ইহা সর্ব্বসম্মত অহৈতুকী সুদুর্ল্লভা। বোধ হয় এতদপেক্ষায় বিশুদ্ধা দয়া আর নাই। ধন্য, তোমার কলিযুগে দয়াময়ী শ্রীমূর্ত্তির ধন্য ধন্য। ভক্ত ক্রন্দনে দয়াল নিত্যানন্দ আর কি স্থির থাকিতে পারেন? দরদরধারায় অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক কহিলেন, অরে! তারক-ব্রহ্ম হরিনামে তোর ম্লেচ্ছত্ব অপসারিত হইয়াছে; এক্ষণে তুই আর্য্যজাতিতে গণনীয়; অদ্যাবধি তোর নাম জগন্নাথদাস হইল; তোর বংশ পরম্পরা হিন্দুজাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাথর উপাধি প্রাপ্ত হইবে এবং বৈষ্ণবতা লাভ করিয়া পার্ব্বতীয় প্রদেশ পবিত্র করিবে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে পাথর অপূর্ব্ব বর প্রাপ্ত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিল। তৎপর প্রভুর আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাম্বুজে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক অনন্ত অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনা করতঃ কহিতে লাগিলেন,—হে জগদ্গুরো! তুমিই মূলদীপ, আত্মার আত্মা, মনের মন, জগন্নিস্তারের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ। দয়ামহাসিন্ধো! এই অজ্ঞান ম্লেচ্ছাধমের প্রতি একবার করুণামৃতের পরমাণু বর্ষণ করতঃ ত্রিতাপে উত্তাপিত হৃদয় সুশীতল কর। এই বলিয়া প্রেমাশ্রু -শান্তি সলিলে তাঁহার পাদপদ্ম অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অহো! সেই ত্রিলোকসম্মোহিনী

গৌরপদরজোবাহিনী সর্ব্বতীর্থ জননী বিশুদ্ধাশক্তি-গঙ্গা পান করিয়া পৃথ্বীদেবীর অনন্ত পিপাসা বিনিবৃত্ত হইয়াছিল। ধন্যা বসুন্ধরা পরমা ভাগ্যবতী। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের তাদৃশী অবস্থায় গলদশ্রু লোচনে কহিলেন,—অরে জগন্নাথদাস! তোর আর ভয় নাই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বাক্য অমোঘ। তাঁহার প্রসাদে তোর দেহেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহাভাগবতগণের চরণরেণু ধারণ করিয়া কৃতার্থ হও। জগন্নাথদাস অবিলম্বে প্রভু সীতানাথের শ্রীচরণে পতিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরম কারুণিক প্রভু অদ্বৈত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—এই জগন্নাথদাসের হৃদয়ে অবধৌত শ্রীনিত্যানন্দ স্বশক্তি সঞ্চার করাতে ইহার দেহেন্দ্রিয় গঙ্গাসলিলবৎ পরম পবিত্র। মহাপ্রভু এবং প্রভুদ্বয়ের সকরুণ আদেশ শ্রবণে ভক্তমণ্ডলী হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিল। তৎপর নবসংস্কার প্রাপ্ত শ্রীজগন্নাথদাস সর্ব্বভক্তচরণরেণু মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল হইয়া—

"শ্রীচৈতন্য সীতানাথ গুরু নিত্যানন্দ। হরে রাম রাধে কৃষ্ণ গৌরভক্তবৃন্দ॥"

এই পদ গান করতঃ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ—"অহো! প্রভু নিত্যানন্দের চিন্ময়ী দয়ার বলিহারি যাই। এই বলিয়া প্রেমাবেশে উক্ত পদ কীর্ত্তন করতঃ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ক্রমে সেই নবভক্ত প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গ-মহাশক্তিতে নিত্যস্থায়িনী শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিল। বস্তুতঃ তাহার সিদ্ধ দেহ লাভ হইয়াছিল। এক দিবস জগন্নাথদাস প্রভুর সঙ্গে শ্রীজগবন্ধু দর্শনে পুরীমধ্যে গমন করিয়া শ্রীবলদেব-বিগ্রহ স্থলে শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিয়া পরমাশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—প্রভো! এ কি? ঐ যোগপীঠে ভবদীয় প্রকাশরূপ উদ্ভাসিত। ঐ শ্রীমূর্ত্তি মধুপানে মত্তের ন্যায় খল খল হাসিতেছেন।

নিত্যানন্দ।—বৎস! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীবলদেব তোমাকে গুরুরূপে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। হাস্য বিস্ফুরছলে শ্রীবিগ্রহের চৈতন্যতা প্রামাণীকৃত হইল। জগন্নাথদাস প্রেমাবেশে কহিলেন,—ভগবন্! আর দিব্য-চাতুর্য্যমায়িক দ্বারা আমাকে বিমোহিত করিতেছেন কেন? বুঝিয়াছি তুমিই সাক্ষাৎ বলদেব মূলসঙ্কর্ষণ, ম্লেচ্ছাদি পাষণ্ড উদ্ধারের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ। নিত্যানন্দ ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! তুমি

শ্রীবৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তি-চক্ষু লাভ করিয়াছ ; তন্নিবন্ধন অলৌকিক ব্যাপার তোর গোচরীভূত হইল। জগন্নাথদাস—জগদগুরো! এক্ষণে বুঝিলাম স্বীয় মহাত্মত্ব গোপন করা তোমার এই নরলীলার স্বাভাবিকী বৃত্তি।

অনন্তর একদিবস প্রভু নিত্যানন্দ জগন্নাথ দাসকে কহিলেন,—বৎস! তোমার জন্মভূমি পার্ব্বতীয় প্রদেশে হরিনাম এবং চৈতন্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রস্থান কর। তদ্দ্বারা তোমাতে অনন্তকালের জন্য গৌর-কৃপাকল্পলতা ফলবতী হইবে। শ্রীগুরু-মুখপদ্ম বিনিঃসৃত, ব্রহ্মাদির সুদুর্লভ বরেণ্য বর প্রাপ্তমাত্র জগন্নাথদাস বিশুদ্ধ প্রেমে বিহ্বল হইয়া হা জগচ্চৈতন্যকারি শ্রীচৈতন্য! হা প্রেমদাতা নিত্যানন্দ! হা দয়াসিন্ধু সীতানাথ! ম্লেচ্ছোদ্ধার পতাকা লইয়া আমার হৃদয়-ব্যোমযানে আরোহণ কর। অসভ্য ম্লেচ্ছ পূর্ণ পার্ব্বতীয় প্রদেশে ভক্তি-বীজ রোপণ করতঃ দিব্যলোকের চিত্তচমৎকারিণী লীলা প্রকটন কর। এই বলিয়া প্রেমামৃতে সর্ব্ব গৌরগণকে অভিষিক্ত পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলেন। ভক্তবর স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া তুলসীবেদী সমীপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনশনে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াছিলেন। সেই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শনে পার্ব্বতীয় হাজঙ্গেরা তাঁহাকে দেবত্ব প্রাপ্ত মহাপুরুষ জ্ঞানে অচলা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমে ভক্ত-সিংহের হরিনামসংশ্লিষ্ট গভীর গর্জ্জনে পার্ব্বতীয় অসভ্যতা ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি অজ্ঞানরূপ দুষ্ট পশুগণ দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহার দয়ামৃত বর্ষণে হাজঙ্গ-হৃদয় মরুভূমিতে ঐশীভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা জীবহিংসা মহাপাপ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিবেচনা ও সদাচার আত্মার উন্নতিজনক বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। বস্তুতঃ অত্যল্প দিনের মধ্যে হাজঙ্গ জাতি পরম বৈষ্ণব হইল। অহো! ধন্য প্রভু নিত্যানন্দের দয়ার ধন্য!

ম্লেচ্ছ হাজঙ্গেরা হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গৃহে গৃহে ভগবৎ শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রতিষ্ঠিত, হরিসংকীর্ত্তনে আবাল বৃদ্ধ যুবক প্রেমে মাতোয়ারা। ধন সঞ্চিত হইলে তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই মহোৎসব করতঃ মহাপ্রভু এবং প্রভুদ্বয়ের ভোগ সরাইয়া সহস্র সহস্র দীন-দুঃখীজনগণকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। উক্ত ভক্তবর জগন্নাথদাসের বংশধরেরা পাথর উপাধি বিশিষ্ট। তাহারা অন্যান্য হাজঙ্গের গুরু। এক্ষণেও তদ্বংশে হরিচরণ পাথর বর্ত্তমান আছে। অদ্যাপি ঐরূপ

(সুবর্ণবণিক) শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুদিগের শিষ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই হাজজাতি মাত্র নিত্যানন্দ-পরিবার ভিন্ন দৃশ্য হয় না। পাঠক! ম্লেচ্ছ হাজজ আর্য্যজাতি রূপে পরিগণিত হইল বলিয়া বিস্মিত হইবেন না। যে প্রভুর কৃপাবলে জীব অনায়াসে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার কৃপায় যে ম্লেচ্ছ আর্য্যজাতি হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই গুপ্ত রহস্য উঁহারাই পুরুষপরম্পরা জ্ঞাত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভোর্দাস দাসাভাস
শ্রী শ্রীনাথ গোস্বামী—উখলী।

অলৌকিক ঘটনা।

আজ পঁচিশ বৎসরের কথা, কলিকাতা সুকিয়াষ্ট্রীট ৩নং বাড়িতে বাবু নবীনচন্দ্র বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততির মধ্যে একটী কন্যা ও একটী পুত্র। কন্যাটীর বয়স বার ও পুত্রটীর দুই বৎসর। অল্প দিবস হইল কন্যাটীকে সৎপাত্রস্থ করিয়াছেন, আর সেই জন্য তাঁহারা বড় মনের সুখে আছেন। কিন্তু এ সুখ তাঁহাদের সহিল না, বিধি বাদ সাধিলেন,—বিবাহের পর ছয় মাস গত না হইতেই সোণার লতিকাটি হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। কন্যাটীর শোকে পরিবারস্থ সকলেই, বিশেষতঃ তাঁহার পিতা মাতা, শোকে অভিভূত হইয়া আছেন। শোকের প্রথম বেগ এখনও কাটাইতে পারেন নাই, এমন সময় হঠাৎ শিশু সন্তানটী পীড়িত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ব্যারাম কিছু বৃদ্ধি হইল। সম্প্রতি একটি নিদারুণ শোক পাইয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং পুত্রের পীড়া দেখিয়া তাঁহারা বড় ভীত হইলেন। তখন কন্যার শোক দমন রাখিয়া, পুত্রের উত্তমরূপ চিকিৎসা ও মন প্রাণ দিয়া সেবা ও যত্ন করিতে লাগিলেন।

পুত্রটি পীড়িত হইবার পর ৬।৭ দিন গত হইয়া গিয়াছে, ব্যারাম কিছু কমে নাই, সমভাবেই আছে। এক দিন রাত্রে নবীন বাবুর স্ত্রী ছেলেটির কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ঔষধ ও পথ্য দিতেছেন। নবীন বাবু অপর বিছানায় নিদ্রা যাইতেছেন। রাত্রি

তখন দুই প্রহর গত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। হঠাৎ তাঁহার বোধ হইল নিচে পাতকুয়া হইতে কে জল তুলিতেছে। এত রাত্রে পাতকুয়া তলায় কে গেল? মনে এইরূপ বিস্ময়-জনক ভাব উদয় হওয়ায়, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া জানালা খুলিলেন শুক্লপক্ষ, আকাশ বেশ পরিষ্কার, সুতরাং সমস্ত বস্তুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি জানালা খুলিয়া নিচের দিকে তাকাইলেন। দেখেন, কে একটি বালিকা কুয়া হইতে জল তুলিতেছে। দেখিতে অনেকটা তাঁহার কন্যার মতন। প্রথমে, চোখের ভ্রম ভাবিয়া ভাল করিয়া ঠাহরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বালিকাটী ঘাড় হেট করিয়া জল তুলিতেছে, সুতরাং মুখ দেখা যাইতেছে না। তবে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার কন্যার মতনই বটে। "সত্য সত্য কি সেই? সে কি তবে মরে নাই?" এই কথা মনে উদয় হওয়ায়, যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল, "সে ত আমার নাই, আমার কোলেই ত সর্ব্বনাশ করিল।" সেই সঙ্গে সঙ্গে আশাও চলিয়া গেল। তখন ভাবিলেন, তবে কি সে পেত্নিনী হইয়া আছে।" অমনি শরীর রোমাঞ্চ হইল।

রসিকশেখরের কি খেলা দেখ! যাহাকে এত ভালবাসি, যাহার মৃত্যুতে শোকে আকুলি হইয়াছি, হঠাৎ যদি তাহাকে সশরীরে দেখিতে পাই, তবে অমনি আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া যাই! ভূত পেত্নিনী করিয়া যে একটা ভয়, ইহা আমরা শৈশব হইতেই শিক্ষা করি। কিন্তু যাঁহারা এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই পৃথিবীতে যাহার যেরূপ স্বভাব থাকে, মৃত্যুর পরে প্রথমে তাহার সে স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ক্রমে যত আত্মার উন্নতি হইতে থাকে ততই তাহার স্বভাব ভাল হয়।

বালিকাটীর জল তোলা শেষ হইল, সে সমান হইয়া দাঁড়াইল। তখন আর কোন সন্দেহ থাকিল না, নবীন বাবুর স্ত্রী তাঁহার সেই কন্যা বলিয়া বেশ চিনিতে পারিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি সুখ পাইলেন না, ভয় আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীকে ডাকিলেন। নবীন বাবু ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ডাকায়, তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয়েছে কি? খোকা ত ভাল আছে?" তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রমণী বলিলেন,

"খোকা ত ভাল আছে, এখন শীঘ্র দেখ্‌বে এস।" ইহাই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জানলার কাছে একরূপ টানিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া বলিলেন, "কুয়াতলার দিকে চাহিয়া দেখ।" নবীন বাবু চাহিলেন, বেশ করিয়া ঠাহরিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, "কৈ, কিছুত দেখিতে পাইতেছি না?" রমণী ইহাতে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিজেই তাকাইলেন, কিন্তু তিনিও আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন স্বামীসহ বিছানার কাছে আসিয়া রমণী সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। আরও বলিলেন "এই জ্যোৎস্নার আলোতে আমি তাহাকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি।" নবীন বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া স্ত্রীকে সাহস দিবার জন্য বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ও কিছু না, তোমার চোখের ভ্রম।"

কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রি হইতে ছেলেটির পীড়া বৃদ্ধি হইল। পরদিবস রাত্রে নবীনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সন্তানটীর পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দোর খুলিয়া গেল। উভয়েই দোরের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা চমকাইয়া উঠিলেন। দেখেন যে, তাঁহাদের সেই কন্যা। তাহার যে ব্যারামের চেহারা আর নাই, এখন বেশ সুস্থ, রং যেন খণ্ডে খণ্ডে ফাটিয়া পড়িতেছে, পরিধান এক খানি পরিষ্কার কাপড়, কিন্তু মুখ খানি অতিশয় মলিন। বালিকাটী আসিয়াই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা! বাবা! আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি খোকাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না।" নবীন বাবুর মুখে প্রথমে কোন কথা সরিল না, তিনি কন্যার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। বালিকাটী আবার সেইরূপ কাতর স্বরে বলিল, 'বাবা! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমাদের সেই হতভাগিনী—।"তখন নবীন বাবু একটু সামলাইয়া, তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন কোথায় কাহার কাছে আছ?"

বালিকা।—আমি এই বাটিতেই আছি। খোকাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, খোকাকে আমায় দাও।

নবীন বাবু।—ছি! ও কথা বলিতে নাই।

ইহাতে বালিকা কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া তাঁহারাও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। তখন চাহিয়া দেখেন বালিকাটী সেখানে নাই।

হিন্দুরপক্ষে এরূপ ভুত পেত্নিনী হইয়া থাকা বড় দোষের কথা। সুতরাং নবীন বাবু প্রথমে এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তাহার পর হইতে বালিকাটিকে বাড়ির প্রায় সকলেই যখন তখন দেখিতে লাগিলেন। কেহ বা রাত্রে উপরে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখেন বালিকাটি পাশ কাটাইয়া নিচে নামিয়া গেল; কিন্তু নিচের ঘরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেহ বা সন্ধ্যার পর দেখিতে পাইলেন যে, মেয়েটী ছাদের উপর বেড়াইতেছে, কিন্তু ছাদে উঠিয়া আর তাহাকে দেখা গেল না। কেহ বা বারান্দা দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ দেখেন, মেয়েটী বারান্দার অপর পার্শ্ব দিয়া একটী ঘরে প্রবেশ করিল। তখনই সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা গেল, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। ক্রমে বাড়ীর চাকর চাকরাণী পর্য্যন্তও তাহাকে দেখিতে লাগিল।

এদিকে ছেলেটীর অসুখও ক্রমে বাড়িতেছে। সুতরাং নবীন বাবু আর চুপ করিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। তখন কয়েকজন বন্ধুর নিকট এই কথা প্রকাশ করিলেন। প্রথমে, দুই একজন "চক্রে" বসিবার প্রস্তাব করিলেন। চক্রে বসাও হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যখন ইহা সাব্যস্ত হয়, তখন আমরাও সেখানে ছিলাম। সাব্যস্ত হইল, সেই দিন রাত্রের গাড়িতে নবীন বাবুর একটী আত্মীয় গয়ায় যাইবেন।

ইহার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার পর আমরা নবীন বাবুর তল্লাস লইতে গেলাম। যাইয়া দেখি, তিনি একক বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই বলিলেন, "এসেছ, বেশ হয়েছে। কাল যে বড় একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হয়ে গিয়েছে।" আমরা উপবেশন করিয়া উৎসুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?" নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন, "কাল দুপুরের সময় হঠাৎ একটী সোঁ সোঁ শব্দ আমাদের কানে গেল, বোধ হইল যেন ঝড় আসিতেছে। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম, কিন্তু ঝড়ের আর কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না, কেবল একটা মাত্র শব্দ কাণে শুনিতে লাগিলাম। তখনই এক জন বলিয়া উঠিল, 'ঐ যে পেয়ারা গাছটা ঝড়ে নড়িতেছে।' তখন আমাদের সকলের দৃষ্টি সেই পেয়ারা গাছের উপর পড়িল। দেখি, প্রচণ্ড ঝড়ে যেন উহাকে নড়াইতেছে। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ গাছটী ভিন্ন, আর কিছুই নড়িতেছে না। এইরূপ কয়েক মিনিট কাল নড়িয়া একটী মোটা ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর গাছটী স্থির হইল। সেই হইতে আর মেয়েটীকে দেখিতে পাইতেছি না।"

নবীন বাবুর কথা শেষ হইলে, আমরা এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় সেই গয়ার লোকটী ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়াই নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, পিণ্ড দেওয়া ত হয়েছে?" প্রত্যুত্তরে লোকটী বলিল, আজ্ঞা হাঁ, পিণ্ড দিয়াছি; কিন্তু যে দিন দিবার কথা ছিল, সে দিন দেওয়া হয় নাই।" ইহাই বলিয়া সে বলিতে লাগিল, "মহাশয় সে দিন রাত্রে বাঁকিপুরে পৌঁছিলাম। শুনিলাম গয়ার গাড়ি পর দিবস ১০টার সময় ছাড়িবে। তাই ভাবিলাম খগোলে আমার একজন আত্মীয় আছেন, রাত্রে সেখানে যাইয়া থাকিব, এবং পরদিন সকালের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া গয়ার গাড়ি ধরিব। ইহাই ঠিক করিয়া আমি গাড়ির মধ্যে বসিয়া আছি, গাড়ির আর সকলে নামিয়া গিয়াছে, হঠাৎ কে যেন আসিয়া গম্ভীরস্বরে আমাকে বলিল, 'তুমি আসিয়াছ গয়ায় পিণ্ড দিতে, এখন চলিলে কোথায়?' এই আওয়াজ কাণে যাইবা মাত্র, আমি চমকাইয়া উঠিলাম ও তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। রাত্রে ষ্টেসনেই কাটাইলাম। পর দিন গাড়িতে গয়ায় গেলাম। সেখানে পৌঁছিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। সুতরাং সে দিন আর পিণ্ড দেওয়া হইল না। পরদিবস পিণ্ড দিয়া বৈকালের গাড়িতে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়াছি।"

ছেলেটীর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমনকি ডাক্তারেরাও ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু গয়ায় পিণ্ড দিবার পর হইতে বালকটী ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য গয়ার পিণ্ড দিবার যে ব্যবস্থা আছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে প্রকৃতই কি আত্মার মুক্তিলাভ হয়? কেহ কেহ বলেন, এ পৃথিবীতে যাহার যেরূপ সংস্কার থাকে, মৃত্যুর পরেও কিছুকাল তাহা থাকিয়া যায়। সুতরাং এ জগতে থাকিবার সময় যাহাদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, গয়ায় পিণ্ড দিলে তাহারা উদ্ধার হইবে, অর্থাৎ এ পৃথিবীস্থ লোকের নিকট হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইবে, মৃত্যুর পরেও তাহাদের আত্মার সেই সংস্কার থাকিয়া যাওয়ায়, গয়ায় পিণ্ড দিলেই আত্মা অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

শ্রীঃ—

ব্রজবিলাস।

পূর্ব্বরাগ।

শ্রীকৃষ্ণ ও সখী।

১

বল হে গোকুল চাঁদ,
অবলা বধিতে,
নিঠুর চিতেতে,
পাতিলে কেমন ফাঁদ!
কেন সাধ বাদ,
কিবা অপরাধ,
হ'য়েছে তোমার পায়,-
কেন বধ অবলায়!

২

যবহি তো মনোহরা,-
হেরল কিশোরী,
আপনা পাসরি,
মূরছি পড়ল ধরা।
মৃদু মৃদু ঘাম,
মুখে তুহুঁ নাম,
যেন হে পাগল পারা,
আতঙ্কে হইনু সারা।

৩

ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাস,-
ক্ষণেক নীরব,
দেখি যেন শব,
দূরে গেল নিশোয়াস।
আধ বোল মুখে
আধ রহে বুকে-
বিঁধিয়াকি হেন বাণ,
বধিছ ধনী কো জান! (যদি)

৪

কিম্বা কহ ছাড়ি ছল,
তব আঁখিবাণ,
বিঁধেনি পরাণ
বেয়াধি করেছে বল।
কিন্তু ব্যাধি তার,
নিরূপিত ভার,
(যদি) তুহু নাম কাণে পশে,
তবহিঁ উঠিয়া বসে।

৫

তাই আমি সাধি তোয়,
চল মোর সনে,
নিকুঞ্জ কাননে
যাঁহা সো পিয়ারী রোয়।
যদি ব্যাধি তার,
পার বুঝিবার,
করিও ঔষধি দান,
বাঁচাতে ধনীর প্রাণ।

৬

শুনিয়া সখীকো ভাষ -
বঙ্কিম চাহিয়া,
কহিছে কালিয়া
ঢালি মধুরিম হাস।
পীরিতী বিকার,
ভেল রাধিকার,
অবহিঁ সারিতে পারে -
(যদি) দেখিবারে পাই তারে।

৭

কিন্তু তা কেমন হয়?

ধনী পরনারী, মিলনে হামারি
কেমনে ধরম রয়!
যদি বা যাইব, কেমনে সহিব,
উপহাস ব্রজ ময়!
বলিহ ধনীতে, নারিব যাইতে,
(যেন) ধৈরয ধরিয়া রয়।
বালা ভাবে চিতে, সখি পরখিতে,
(হেন) এত চতুরালী চয়।

সখীর উত্তর।

১

কিবা তু' করলি শ্যাম
যেই তোর তরে,
নিতি ঝুরে মরে,
তাহারে হওলি বাম!
বাজাইয়া বেণু
তুমি রাখ ধেনু
সে যে হৈ রাজার বালা,-
তবু তোর তরে,
সদা হাহা করে,
এমনি পীরিতী জ্বালা!

২

শাখায় কোকিল ডাকে,
ভাবি তুয়া বাঁশী,
হইয়া উদাসী,
আন মনে চেয়ে থাকে।
ঘরে নব ঘন,
করে গরজন,-
তোমার নুপুর বলি,-
ইতি উতি চায়,
দেখিতে না পায়,-
আবেশে পড়য় ঢলি।

৩

পাগল হ'ল বা ধনী-
চাহি নীলাকাশ,
ছাড়ে নিশোয়াস,
পরি তো' পীরিতি-ডোর।
(যদি) ডাকিলে না ভাষে
কভু কাঁদে হাসে,
কি তাহে করিলি কালা,
পীরিতের বাণ,
করেছে সন্ধান
বুঝেছে নগেন্দ্র বালা।

৪

নিতি ঢালে আঁখি লোর,
সে কনক কাঁতি,
ভেল হীন ভাঁতি
পরি তো' পীরিত ডোর।
এত নিঠুরালি,
কেন বা দেখালি,
কদম্ব তলেতে মুখ!
রাজার নন্দিনী,
তুয়া কাঙ্গালিনী-
স্মরিতে উপজে দুখ।

৫

মরমে কাটলি সিঁধ,
ভাবি নিরবধি,
কি দিব ঔষধি,
স্মরি তুয়া নীলমণি।
তুমিত রাখাল,
রাখ ধেনু পাল,-
কি জান পীরিতি রীতি।
সুপুরুষ জন,
করে না এমন,
বুঝেসে পিরীতি নীতি।

৬

মান ভরে এত বলি,-
অবনত শিরে,
সখী ধীরে ধীরে,
রাই পাশে গেল চলি।
পাইয়া রতন,
করি অযতন,
হারাইনু ভাবি মনে,-
তুষিতে কানাই,
বিনোদিনী ঠাঁই,
ভেজল এ দাসী জনে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী। বড়াল পাড়া লেন, হুগলী। (ক্রমশঃ)

——(*০:০*)——

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী।

সকল ভকত মেলি আন আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে
গৌরাঙ্গ শোভিয়া আছে, কেহত নাহিক কাছে,
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি, ভূমেতে বসিয়া কেলি,
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥ ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ, চমকিত হৈয়া মন,
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায়, কিছুই না বুঝা যায়,
কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহ কেহ জল করে, মুখানি পাখালে নীরে,
কেহো করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা, ভাবের মুরতি তারা,
বাসুঘোষ মলিন বদন॥১২২॥

———

সংকীর্ত্তনে নিত্যানন্দ নাচৈ। প্রিয় পারিষদগণ কাছে॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান। শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ॥
পতিতের গলায় ধরিয়া। কান্দে পহুঁ সকরুণ হৈয়া॥
গদগদ কহে পতিতেরে। শুনি যাহা পাষাণ বিদরে॥
তা সভার ধরি বাহু ধায়। ধর ধর প্রেমের পসার॥
তা সভার দুর্গতি নাশিব। ব্যাজের সহিত প্রেম দিব॥
তারা প্রেমে চাহে মুখচান্দে গলায় ধরিয়া তায় কান্দে॥
সে হেন করুণা সোঙরিয়া। বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥ ১১৮॥

আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদ বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষে গান॥ ১১৯॥

এত দিনে সদয় হয়ল মোরে বিধি। মিলায়ল গোরা গুণনিধি॥
এত দিন মিটল দারুণ দুখ। নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা পরবন্ধ। লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥ ১২০

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ।

কলি তিমির ঘোর, গোরাচাঁদের উজোর, পারিষদ তারাগণ মাঝ।
কীর্ত্তনে চর চর, অঙ্গ ধূলি ধূষর, হানত ভাব তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি, বোলত হরি হরি, ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে।
বামে প্রিয় গদাধর, কান্ধের উপরে তার, সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি বৃন্দাবন, আকুল অনুক্ষণ, ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
আঁখি যুগ ঝর ঝর, যেন নব জলধর, দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে, কলি জীব উদ্ধারিতে, বরিখল হরিনাম ঘটা। ১২১

কি আনন্দ খণ্ডপুরে, ঠাঁকুর নরহরির ঘরে,
মহোৎসবের কি কহ আনন্দ।
সকল মহান্ত আসি, প্রেমানন্দ রসে ভাসি
নিরখয়ে গৌর মুখচন্দ্র ॥
দ্বাদশ গোপাল আর, চৌষট্টি মহান্ত সাথ,
আর ক্রমে ছয়টী গোসাঁই।
শাখা উপশাখা যত, আইল সকল ভক্ত,
আনন্দে গৌর গুণ গায় ॥
শ্রীনিবাস জনে জনে, বসাইল স্থানে স্থানে,
বসিল মহান্ত সারি সারি।
যার যৈছে অনুমানে, বসাইল স্থানে স্থানে,
দুই প্রভু মধ্যে গৌরহরি ॥
দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ, বামেতে অদ্বৈতচন্দ্র,
তার বামে গদাধর আচার্য্য
ভোজনে বসিলা সভে, রঘুনন্দন আসি তবে
করে পরিবেশনের কার্য্য ॥
মহাপ্রভু সুখোল্লাসে, করে লয়ে এক গ্রাসে,
দিছেন প্রভু নিত্যানন্দের মুখে।
এইরূপ পরস্পর, নরহরি গদাধর
ভোজন করয়ে প্রেম সুখে ॥
ভোজনান্তে জয়ধ্বনি, জয় গৌর দ্বিজমণি,
সভে মেলি কৈল আচমন।
শ্রীনিবাস সুখোল্লাসে, করে লয়ে মুখ বাসে,
সভে দিল মালা চন্দন ॥
নরহরি ঠাকুর ধন্য, যার গৃহে শ্রীচৈতন্য,
নিত্যানন্দ সহিত আপনি।
তা দেখি বৈষ্ণবগণ, হরি বলে ঘনে ঘন,
বাসু মাগে চরণ দুখানি ॥ ১২২ ॥

শুনিয়া ভকত দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
চলে গোরা সহচর সাথে।
ত্বরিত গমনে যায়, নিমিখে যোজন পায়,
ভকত মিলল নদীয়াতে॥
গদাধর পড়ি আছে, নরহরি তার কাছে,
আর কার মুখে নাই বাণী।
দেখিয়া ভকত দশা, কহে গদ গদ ভাষা,
ধরণী লোটায় ন্যাসিমণি॥
হায় কি করিলাম কাজ, সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ,
মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যাব নীলা-চলে, থাকিব ভকত কোলে,
ইহা বলি হরল গেয়ান॥
সঙ্গে সহচর ছিল, ধাই গৌরাঙ্গ নিল,
রাখিলেন গদাধর কোলে।
পরশ পাইয়া দোঁহ, কথা কহে লহু লহু,
ভাসিলেন আনন্দ-পাথারে॥
গৌরাঙ্গ-শ্রীমুখ দেখি, শীতল হইল আঁখি,
পরশেতে হিয়া জুড়াইল।
আর নাহি ছাড়িব, হিয়ার মাঝারে থোব,
বাসুঘোষের আনন্দ বাড়িল॥ ১২৩॥

স্বায়ম্ভুব মনু।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতিই প্রধান। স্মৃতিশাস্ত্র ভিন্ন ধর্ম্মের কোন মীমাংসাই হইতে পারে না। এখানে ধর্ম্ম শব্দ লৌকিকধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়; কারণ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র লৌকিকধর্ম্ম লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও তাহার মধ্যে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া স্বর্গাদি গমনের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ইহাও লৌকিকধর্ম্ম, কেন না

১২২। ১২৩ সংখ্যক পদ দুইটীতে বাসুদেব ঘোষের নামের ভণিতা আছে সত্য, কিন্তু এরূপ অসঙ্গত কথা তাঁহার লেখা বলিয়া বোধ হয় না।

তাঁহারা কেবল বিষ্ণুপদ প্রাপ্তিই পরলোক বলিয়া মনে করেন। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মই পারলৌকিক ধর্ম্ম।

লৌকিক পারলৌকিক ধর্ম্মের আর একটী মীমাংসা করা যাইতে পারে। শারীরিক ধর্ম্ম লৌকিক, আর আত্মার ধর্ম্ম পারলৌকিক। মনে করুন, যে জীব আজ ব্রাহ্মণ-শরীরধারী, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সন্ধ্যা-বন্দনাদি তাহার পক্ষে ধর্ম্ম; আবার সেই যদি কর্ম্মানুসারে অপর জন্মে ম্লেচ্ছ হয়, তাহা হইলে সেই সন্ধ্যা-বন্দনাদি তাহার পক্ষে অধর্ম্ম, অর্থাৎ তাহা করিলে সে নিরয়গামী হইবে। সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকল লৌকিক ধর্ম্ম, শরীরের সঙ্গেই তাহার সংশ্রব, আত্মার সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আত্মারই নিত্য ধর্ম্ম, অতএব ইহাকেই পারলৌকিক ধর্ম্ম বলা যায়।

স্মৃতিশাস্ত্র সকলের মধ্যে যে কেবল লৌকিক ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে পারলৌকিক ধর্ম্মও বর্ণিত হইয়াছে; তবে সে সকলে লৌকিক ধর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

স্মৃতিশাস্ত্র সকলের মধ্যে মনু-স্মৃতি প্রধান, ইহা শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে—

মন্বর্থ বিপরীতা যাঃ সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতি।

অর্থাৎ,—যে স্মৃতি মনু-স্মৃতির বিরুদ্ধ, কিংবা যে অর্থ মনু-স্মৃতির অর্থের বিপরীত, সে স্মৃতি প্রামাণ্য নহে। স্মৃতি সকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় সকল দেখিতে পাইলে মনু-স্মৃতিরই জয় হয়, ব্যবস্থা স্থানে অপর স্মৃতির অর্থ অবহেলা করিতে হয়। যজুর্ব্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে একটী শ্রুতি দেখা যায়—

যদ্বৈ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্।

ইহার অর্থ এই যে,—মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সকলই ঔষধি। এই শ্রুতির অর্থ লইয়া প্রাচীন অনেক স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সকলই গ্রাহ্য, মনু-স্মৃতির মধ্যে কোন অংশকেই অমান্য করিতে পারা যায় না, বরং যদি কোন বিষয় শ্রুতি শাস্ত্রে না দেখা যায়, আর মনু স্মৃতিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে স্থলে তদর্থে শ্রুতি আছে এরূপ কল্পনা করিতে হইবে।

কল্পনার অর্থ এই যে, যদি স্মৃত্যুক্ত বিষয় এখন শ্রুতিতে না দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাচার্য্যও

সর্ব্ব-বেদ-দর্শী মনু বেদের কোন শাখায় এই শ্রুতি দেখিয়া তাহার অ আপনার স্মৃতিতে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যদিও সম্প্রতি সেই শ্রুতি দেখিতে পাই না, তবু তাহা কোন শাখান্তরে অবশ্য ছিল, এক্ষণে হয়ত লুপ্ত হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, মনুকে সর্ব্বতোভাবে সমাদর করিতে হইবে, না করিলেই নয়। মনুর এত গৌরবের কারণ কি তাহা একবার মনু-স্মৃতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা যেরূপ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া যে কথা লিখিব, বোধ হয় ভক্তগণ তাহা হইতেও শতগুণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উহা পাঠ করিবেন। সে কথাটী এই যে, স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীগৌরভক্ত,—তাঁহার এত সমাদরের ইহাই কারণ।

মনু আপনার গ্রন্থে দ্বাদশধ্যায়ের শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাস্যতা বর্ণন করিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গই মূলতত্ত্ব, বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয়বিধ দেবতা রূপে শ্রীগৌরাঙ্গই পূজিত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন অপর কোন পরতত্ত্ব নাই, সমস্ত ঋষিগণ বিবিধ নামে বিবিধ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গকেই সমর্থনা করিয়া থাকেন।

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্‌॥ ১২২॥

ইহার অর্থ এই যে, ও যিনি সকলের প্রশাসন কর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী—সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি অণু হইতেও অণু, সুবর্ণের ন্যায় কান্তি (আদি কান্তি), যিনি স্বপ্ন ও বুদ্ধি দ্বারা গম্য হন, তাঁহাকেই পরম পুরুষ জানিবেন। মনু এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গকেই বর্ণনা করেন, যদি কেহ দুরাগ্রহ করিয়া পরমাত্মাকে ইহাতে টানিয়া আনেন, তাহা হইলে বড়ই শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়; কেননা "রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্য" এই দুইটী বিশেষণ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিতে পারে না। কারণ পরমাত্মা তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গ নহেন, আর যদি বা বড়ই টানাটানি করিয়া কোন প্রকারে মূলতত্ত্ব মহাপুরুষের সঙ্গে ঐক্য করিয়া পরমাত্মাকে রুক্মাভ বলিতেও পারেন, কিন্তু তিনি স্বপ্নধীগম্য কোন প্রকারেই হইতে পারেন না। যেহেতু পরমাত্মা জাগ্রৎ স্বপ্নও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থার অতীত। পরমাত্মা যদি স্বপ্নগম্য হন তাহা হইলে তিনি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ও অবস্থাত্রয়ের অতীত হইতে পারেন না। যখন শাস্ত্রে তাঁহাকে অবস্থাত্রয়ের অতীত বলা হইয়াছে, তখন তিনি স্বপ্নধীগম্য কোন প্রকারেই হইতে পারেন না, অতএব মনুর এই বাক্যের বাচ্য আমার শ্রীগৌরাঙ্গ।

অনভিজ্ঞ লোকের মনে একটী সংশয় হইতে পারে যে, পরমাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের একটী অংশ (য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽংশাংশ বিভবঃ-) তিনি যখন স্বপ্নধীগম্য নহেন, তখন পরতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নধীগম্য কি প্রকারে হইতে পারেন। কিন্তু যে স্বপ্নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অবস্থাত্রয়ান্তর্গত, মলিমস রাজস্ স্বপ্নান্তর্গত নহে। ইহা লীলাশক্তির বিশুদ্ধ বিলাসময় আহ্লাদিনী শক্তির স্বপ্ন এই স্বপ্নের তত্ত্ব জানিবার জন্য একবার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বপ্নবিলাসামৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। সেই স্বপ্নধীগম্য পরতত্ত্ব মনুর আরাধ্য, সুতরাং মনু যে সর্ব্বজগৎমান্য হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই পরতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গকেই বিবিধ রূপ নামে বর্ণনা করা হয়, ইহা মনু পর শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১২৩॥

ইহাঁকেই কেহ অগ্নি বলেন, কেহ মনু বলেন, কেহ প্রজাপতি বলেন, কেহ ইন্দ্র বলেন, কেহ প্রাণ বলেন, কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহার সমন্বয় এই ভাবে করা হইয়াছে যথা—

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে। সেই মন্ত্রে সেই মূর্ত্তি দেখান বিশ্বম্ভরে॥

আরও লেখা আছে—

গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিৎ। মন্ত্র পড়ি জল ঢালে হয়ে হরষিত॥

স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীগৌরতত্ত্বকে আরও একটু প্রকাশ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকর ভিন্ন আর কোন পরিকরে দেখা যায় না। মনু সেই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভি র্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ
জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥

এই পঞ্চমূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীচরিতামৃতের এই শ্লোকের একবাক্যতা করুন;—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥

মনু এইরূপে সপরিকরে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বকে বর্ণন করিয়া স্বকীয় স্তুতি সাঙ্গ করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত বলিয়াই শ্রীভাগবতে চতুরানন তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব কোটিতে বর্ণন করিয়াছেন যথা—

বেদাহমাদি পরমন্যাহি যোগমায়াম্
যূয়ং ভবশ্চ ভগবন্ অথ দৈত্য বর্য্যাঃ।
পত্নীমনোঃ সচ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হি ঋভুরাদি উতঃ ধ্রুবশ্চ॥

এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় মনু, তাঁহার পত্নী, এবং তাঁহার পুত্র সকল পরম বৈষ্ণব। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা ভিন্ন কি কেহ এমন সকুটুম্ব বৈষ্ণব হইতে পারেন? কিংবা এমন সমুজ্জ্বল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও রীতিনীতিময় সর্ব্বমান্য শাস্ত্র প্রচার করিতে পারেন? যখন আমরা বিচার করি যে, মনু গৌরভক্ত, মনু-স্মৃতি গৌরভক্তের লেখা গ্রন্থ, তখন যে অসীম আনন্দ-স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তাহা এই সংকীর্ণ প্রস্তাবে পূর্ণ করা যায় না।

অবনত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী।— -শ্রীশ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণের নাপিতরূপে আকবর-শাহের সেবা।

আকবর-শাহ মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাঁহার উদারহৃদয়ে ধর্ম্মান্ধতা স্থান পায় নাই; তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরাগভাজন হইয়াও ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মতবাদ গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং নানা ধর্ম্মাবলম্বী যাজক-দিগকে পরস্পরে ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। এই সকল উপায়ে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা চলিয়া যায় ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস যত কেন ভ্রমাত্মক না হউক, যদি সে আত্মা-লোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে ধর্ম্মান্ধতার পরিবর্ত্তে স্বতঃই তাহার মনে সদ্ধর্ম্মের উদ্রেক হয়। আকবরেরও তাহাই হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুচরিত্রের শ্রেষ্ঠতাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং দেবী, পুরুষোত্তম ও বীরবর এই ব্রাহ্মণত্রয়কে পরম ভক্তি করিতেন। দেবী ও পুরুষোত্তমের পরিচয় আমরা বিশেষ জানি না; কিন্তু বীরবর ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের নিকটই পরিচিত। গুণগ্রাহী ব্যক্তি বীরবরকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। বাদশাহের অনুগ্রহে বহুধনের অধিপতি হইয়াও বীরবর পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ রাখিবার জন্য যত্নে রক্ষিত পূর্ব্বের জীর্ণবস্ত্র প্রতিদিন অবসর পাইলেই পরিধান করিতেন।

এক দিন আকবর-শাহ্ অকস্মাৎ বীরবরের তাম্বুতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিধানে জীর্ণ-বস্ত্র দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরবর বলিলেন, বাদশাহ্! ঐশ্বর্য্যে মানুষের মনে অহঙ্কার জন্মে; কিন্তু আমি যখন এই জীর্ণবস্ত্র পরিধান করি, তখন, ঐশ্বর্য্যভাব মন হইতে দূর হয়, দীনভাব আসিয়া আশ্রয় করে, এবং তৎসঙ্গে অকিঞ্চনের প্রাপ্য ভগবদ্ভক্তিরও উদয় হয়। আকবরের ন্যায় ব্যক্তি এইরূপ মহাত্মাকে ভক্তি না করিয়া কি থাকিতে পারেন?

আকবর-শাহ্ যে ভক্তকেই ভক্তি করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজেও ভক্ত ছিলেন। প্রকৃত ভক্তই ভক্তকে ভক্তি করিতে জানেন, ভক্তই ভক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। ভক্ত যেমন ভগবানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন, ভগবান্‌ও কত ভাবে, কত ছলে, ভক্তের সেবা করিয়া যান। এইটি ভক্তি-রহস্য। আকবরের জীবনেও তাহা ঘটিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটি মহারাষ্ট্রীয় কবি পূর্ণানন্দ স্বামী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন।—

সেনা নামে আকবরের এক প্রিয় নাপিত ছিল। সেনা কৃষ্ণ-ভক্ত। এক দিন সেনা কোন দেবালয়ে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে করিতে এত তদ্গতচিত্ত হইয়া যায় যে বাদশাহের ক্ষৌরকর্ম্মের সময় অতিবাহিত হইলেও তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। এদিকে সেনাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আকবর পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতে লাগিলেন। সকলেই আসিয়া বলিল, সেনা বাড়ী নাই। আকবর ক্রুদ্ধ হইলেন ও সেনাকে গিরেফ্তার করিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেনার পত্নীও বিষ্ণুভক্তিতে মূর্ত্তিমতী; বাদশাহের কোপে স্বামীর সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা জানিয়াও তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল না, মনে মনে তখন কেবল বিপদ-ভঞ্জন হরির পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিল। ভগবান্ ভক্তবৎসল, ভক্তানুরোধেই তিনি লীলাময়। এই সময়েও শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রকাশে ভক্তের উদ্ধার সাধন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেনার রূপ ধারণ করিয়া আকবর-শাহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আকবর সেনাকে ভাল বাসিতেন। সেনারূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কান্তি দর্শনে তাঁহার ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়া ভালবাসার উদ্রেক হইল; আকবর সেনাকে ক্ষমা করিলেন। তখন সেনারূপী কৃষ্ণ ক্ষৌরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কালে ক্ষৌরকর্ম্মের সঙ্গে নাপিতকে তৈলমর্দ্দনও

করিতে হইত; শ্রীকৃষ্ণ তাহাও করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শে আকবরের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল, এই অলৌকিক আনন্দে তাঁহার মন নির্ব্বিষয় করিয়া দিল তিনি কেন, কি জানি কি ভাবে, তৈল-পাত্রের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পাত্রের তৈলে কৃষ্ণ-রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, সেই রূপ দর্শনে তাঁহার মনে আরও সুখোদয় হইল। এদিকে সেনারূপী কৃষ্ণ ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপন করিয়া বাদশাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, বাদশাহও কতিপয় স্বর্ণখণ্ড পারিতোষিক দানে তাহাকে বিদায় করিলেন। সেনাকে বিদায় দিলেন সত্য, কিন্তু সেই সুখভোগের লিপ্সা তাঁহার মন হইতে চলিয়া যায় নাই, তিনি আবার সেনার জন্য লোক পাঠাইলেন। এদিকে প্রকৃত সেনা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর মুখে বাদশাহের লোক প্রেরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া ক্ষৌরকর্ম্মের হাতিয়ার আনিতে গেল। দেখিল, সেখানে কতক গুলি স্বর্ণখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে হাতিয়ারের সঙ্গে বাদশাহের পুরস্কার স্বর্ণখণ্ড গুলি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সেনা জানিত না, সুতরাং তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেনা বাড়ী হইতে বাহির হইলে বাদশাহের লোকেরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিতে মারিতে সম্রাটের কাছে লইয়া গেল। সেনা আকবরের নিকট উপস্থিত হইয়া কাল-বিলম্বের জন্য মাপ চাহিল। আকবর ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া ইতিপূর্ব্বে সেনার ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈলমর্দ্দন ও পুরস্কার লাভের বিষয় মনে করিয়া দিলেন। সেনা কিছুই জানিত না, তাহার ঘরে যে কতকগুলি স্বর্ণখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে কেবল তাহাই সে বাদশাহের নিকট নিবেদন করিল। সেই স্বর্ণখণ্ড গুলি বাদশাহ ভবনে আনিত হইল। তখন তৈলবাটিতে কৃষ্ণরূপ দর্শনের কথা বাদশাহের মনে পড়িল, এবং এই সকল যে ভক্তবাঞ্ছা লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ড তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

যাহাদের ধর্ম্মে আস্থা নাই, ভক্তি রহস্য যাহাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেনারূপ ধারণ ও যবন আকবরের সেবা প্রভৃতি ঘটনা বিশ্বাস না করিতে পারেন। তাহাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা তাহাদিগকে শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ অনেক ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়াছেন ইহা মহাভারতাদি পাঠে জানা যায়। কিন্তু কলিযুগে ব্রাহ্মণ যবন ও কাহাকে

বলে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। গায়ত্রী-তন্ত্রে লিখিত আছে ;—

গায়ত্রীনির্ম্মিতো দেহো যস্য জীবস্য পার্ব্বতি।
ব্রাহ্মণঃ কথ্যতে তেন মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
গায়ত্র্যামপ্যবিশ্বাসো যস্য বিপ্রস্য জায়তে।
স এব যবনো দেবি গায়ত্রীং স কথং জপেৎ।
স পাপী যবনো দেবি যদ্দেশে বিদ্যতে সদা।
তদ্দেশং পতিতং মন্যে রাজা পাতক সংযুতঃ।
গায়ত্রীরহিতস্যান্নং যবনান্নাধমং স্মৃতং।
যবনান্নং বরং ভুঙ্‌ক্তে ন জলং তস্য পার্ব্বতি।

অর্থাৎ—যাঁহার দেহ গায়ত্রী নির্ম্মিত তিনিই ব্রাহ্মণ। যে বিপ্রের গায়ত্রীতে অবিশ্বাস হইয়াছে, সে যবন-ভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যবন-ভাবাপন্ন ব্যক্তি যে দেশে সদাকাল বাস করে, সে দেশ পতিত ও সে দেশের রাজা পাতকভাগী হয়। গায়ত্রী রহিত ব্যক্তির অন্ন যবনান্নের অধম; বরং প্রকৃত যবনের অন্ন খাওয়া যায়, কিন্তু গায়ত্রী রহিত ব্রাহ্মণের জল পর্য্যন্তও পান করা যায় না।

পুনশ্চ,— স চ শূদ্রময়ো বিপ্রঃ কলিকালে চ ভারতে।
ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রকর্ম্মাণ অতএব কলৌ যুগে।
নাপিতোঽপি দ্বিজং ত্যক্ত্বা নানাজাতি মুপাস্মহে।

অর্থাৎ,—ভারতে কলিকালে বিপ্রগণ শূদ্রময়; অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্র-কর্ম্মা নাপিতেরাও দ্বিজগণকে পরিত্যাগ করিয়া নানা জাতির উপাসনা করে।

এতাদৃশ জাতিব্রাহ্মণের সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তির অবমাননা করিবেন না। "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ভক্ত ভিন্ন ব্রহ্মকে জানিবার অধিকার আর কাহারও নাই; সুতরাং প্রকৃত ভক্তই ব্রাহ্মণ। এই ভক্ত,—চণ্ডাল ম্লেচ্ছ যবন,—যে জাতি বলিয়াই কেন গণ্য হউন না, ভগবানের দৃষ্টিতে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অন্তর্য্যামী, মানুষের মনের ভাব সমুদয়ই জানেন, সে স্থানে মেকি চালাইবার যো নাই, ধর্ম্মধ্বজীর আদর নাই। আকবর-শাহ সাংসারিক লোকদিগের নিকট যবন বলিয়া গৃহীত হইয়াও, ভক্তির আতিশয্য বশতঃ কার্য্যত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন; "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এইরূপ বাক্য আকবর-শাহ সম্বন্ধে তৎকালের ব্রাহ্মণেরাই কহিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নাপিতবেশে তাঁহার সেবা ও স্বকীয় রূপ দেখাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া যান। অপরদিকে পরম ভক্ত সেনা-নাপিতের কার্য্যোদ্ধার করিয়া আপনার ভক্তবৎসল নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ

পদকল্পতরু-সঙ্গীত রহস্য।

প্রথম শাখার প্রথম পল্লব অষ্টম পদে বৈষ্ণবদাস পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা করিতেছেন। পঞ্চতত্ত্ব কি? তাহা কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে দেখাইয়াছেন যথা—পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তিশক্তিকং॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পঞ্চতত্ত্বাত্মক, ভক্তরূপ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তাখ্য—শ্রীবাসপণ্ডিতাদি, এবং ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি। ইহাই পঞ্চতত্ত্ব।

ইহার পরে গৌরভক্তের বন্দনা, পরে দশম পদে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বন্দনা। এই রূপে প্রাচীন পদ কর্ত্তাদিগের বর্ণন করিয়া পরে দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত প্রভৃতি গৌরগণের বন্দনা করিয়াছেন, পদগুলি বড়ই মধুর রচনা। ইহার মধ্যে একটী পদে দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের বিবরণ, এই পদটী পাঠ করিলে বোধহয় গ্রন্থকার এই দ্বিজ হরিদাসের বংশীয় কোন মহাত্মার নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিবেন।

এই পল্লবের ত্রয়োবিংশতি পদ হইতে ষড়বিংশ পদ পর্য্যন্ত চারিটী পদে শ্রীকীর্ত্তনের অধিবাস বর্ণন। শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অধিবাস সম্বন্ধে কোন পদ সংগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বৈষ্ণবদাস প্রাচীন প্রথা অনুসারে অধিবাসের পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অধিবাসের প্রথা পৌরাণিক কালেও বর্ত্তমান ছিল।

পদ্মপুরাণান্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যে ভাগবতের অধিবাসের কথা এইরূপ লিখিত আছে যথা—দেশে দেশে তথা স্বেয়ং বার্ত্তাপ্রেষ্যা প্রযত্নতঃ। ভবিষ্যতি কথা চাত্র আগন্তব্য কুটুম্বিভিঃ। দেশে দেশে বিরক্তা যে বৈষ্ণবাঃ কীর্ত্তনোৎসুকাঃ। তেষেব পত্রং প্রেষ্যঞ্চ তল্লেখনমিতীরিতং॥ ভগবৎ সম্বন্ধে কথা যাহাতে আছে তাহাকেই ভাগবত কহে, এই ন্যায় হেতু এই গ্রন্থখানিও ভগবৎ কথা পূর্ণ, ইহা ভাগবত স্বরূপ। ইহার অধিবাসেও সেইরূপ বৈষ্ণব আমন্ত্রণ করার কথা লিখিত হইয়াছে। যথা ত্রয়োবিংশ পদে—শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে। যে বা পায়, যে বা যায়, আমন্ত্রণ করি তায়, পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে। ইত্যাদি।

অধিবাসের চারিটী পদের মধ্যে দুইটী পদ বেদব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখিত।

সঙ্গীত রহস্য।——দ্বিতীয় পল্লবেই গ্রন্থারম্ভ। শ্রীকৃষ্ণলীলা গানই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্গীতাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা গানেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীত-পারিজাত নামক সঙ্গীতগ্রন্থপ্রণেতা অহোবল আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলা গানেরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন যথা—

গায়ন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গ পাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥

এবং শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

সংগীত শাস্ত্র প্রণেতৃগণ সকলেই একবাক্যে সঙ্গীতের বেদমূলত্ব স্বীকার করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক জগতকে সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মা চারি বেদের সার আকর্ষণ করিয়া এই সঙ্গীত নামক পঞ্চম বেদ কল্পনা করিলেন।

ঋগ্ভ্যঃ পাঠ্যং মভূদ্গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত।
যজুর্ব্বেদাঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃস্মৃতাঃ॥

ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ব্ববেদ হইতে রস উদ্ভূত হইয়াছিল। মহাকপি হনুমান, শার্দ্দূল, কোহল, হাহাহূহূ গন্ধর্ব্ব, রাবণ, রম্ভা, বাণসুতা উষা, এবং বায়ু প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সঙ্গীত শাস্ত্রে সঙ্গীত প্রভাব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

শ্রুতি স্মৃত্যাদি সাহিত্য নানাশাস্ত্র বিদোপি চ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাস্মৃতাঃ॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও সাহিত্য শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও যদি সঙ্গীতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হয়, তবে সেই ব্যক্তি দ্বিপাদ বিশিষ্ট পশু বলিয়া কথিত।

সঙ্গীত-দামোদর নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

গীতেন হরিণাবদ্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যাপি পক্ষিণঃ।
বশাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ॥

গীত শ্রবণ করিলে হরিণ ও পক্ষিগণ আবদ্ধ হয়, সর্প আবদ্ধন করে এবং শিশুগণ রোদন করে না।

সঙ্গীত শাস্ত্রে সঙ্গীত মাহাত্ম্য সূচক এইরূপ ভূরি ভূরি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। তবে আর একটী শ্লোক দেখাইয়াই বিনিবৃত্ত হইব। শ্লোকটী এই—

পরমানন্দ বিবর্দ্ধনমভিমত ফলদং বশীকরণং।
সকল-জন-চিত্তহরণং বিমুক্তিবীজং পরং গীতম্॥

এই সঙ্গীত পরমানন্দের বর্দ্ধনকারী, অভিমত ফলদাতা, বশীকরণ; সকলের চিত্তহারী এবং মুক্তির আদি কারণ।

সঙ্গীত শব্দের দুইটী অর্থ, গীত ও বাদ্যকে সঙ্গীত কহে, কেহ কেহ গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে সঙ্গীত বলেন। সেই গান মার্গ ও দেশী ভেদে দুই প্রকার। যাহা ব্রহ্মা ভরত মুনিকে উপদেশ করেন, তাহাকেই মার্গ কহে এবং দেশভেদে যে গান তাহাকে দেশী কহে। এই গানের মূল নাদ, নাদই জগতের আত্মা স্বরূপ,—নাদই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম এবং নাদই স্বয়ং ভগবান্। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগঃ তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতি র্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ॥

কোন কবি বলিয়াছেন সরস্বতীদেবীও নাদ-সমুদ্রের পরপার পরিজ্ঞাত নহেন, সেই জন্যই তিনি মজ্জন ভয়ে ভীত হইয়া বীণারূপ তুম্বী সর্ব্বদাই বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আছেন।

এই নাদের জন্ম সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণ নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ বলেন অগ্নি ও প্রাণবায়ু হইতে নাদের উৎপত্তি, কেহ বলেন আকাশ, অগ্নি এবং বায়ু হইতে নাদের উৎপত্তি; সকলের কথাই সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। সঙ্গীত মুক্তাবলীকার বলেন হৃদয়স্থিত আকাশ অগ্নি ও বায়ু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া নাভীর ঊর্দ্ধভাগ হইতে উচ্চারিত হইয়া যে শব্দ মুখে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকেই নাদ বলে। এই নাদ প্রাণীভব, অপ্রাণীভব এবং এই উভয়-ভব ভেদে তিন প্রকার।

যে নাদ প্রাণীগণের মুখ হইতে উচ্চারিত হয় তাহাকে প্রাণীভব

নাদ কহে, বীণা আদি তন্ত্র বিশিষ্ট যন্ত্রোদ্ভব নাদকে অপ্রাণিভব বলে এবং বংশী প্রভৃতি ছিদ্রযুক্ত যন্ত্রজাত নাদকে প্রাণী-অপ্রাণীভব নাম কহে। নাদ পুনঃ ত্রিবিধ, যথা—মন্দ্র, মধ্য ও তার। হৃদিস্থিত নাদকে মন্দ্র, কণ্ঠস্থিত নাদকে মধ্য এবং মূর্দ্ধোদ্ভব নাদকে তার কহে।

নাদ বায়ু কর্ত্তৃক আহত হইয়া শ্রুতি উৎপাদন করে, মনুষ্য হৃদয়ে ঊর্দ্ধ ও বক্র ভাবে দ্বাবিংশতি সংখ্যক নাড়ী অবস্থিতি করে, এই নাড়ী সংখ্যা হইতেই শ্রুতির সংখ্যাও দ্বাবিংশতি কথিত হইয়াছে, এই শ্রুতি কফ-দুষ্টকণ্ঠে পরিব্যক্ত হয় না। শ্রুতি হইতেই স্বরের উৎপত্তি, শাস্ত্রে আছে—

নাদাচ্চ শ্রুতয়োজাতা স্তাভ্যঃ ষড়জাদয়ঃ স্বরাঃ।

অর্থাৎ নাদ হইতে শ্রুতি সকল জন্মে এবং সেই শ্রুতি হইতেই স্বরের উৎপত্তি।

দ্বাবিংশতি শ্রুতির নাম যথা—নান্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা, চিত্রা, ঘনা, কন্দলিকা, সরঘা, মালা, মাগধী, শিবা, মাতঙ্গিকা, মৈত্রেয়ী, বালা, কলা, কলরবা, শার্ঙ্গরবী, যাতা, রসা, অমৃতা, বিজয়া ও মধুকরী।

নান্দী হইতে বিচিত্রা পর্য্যন্ত চারিটী শ্রুতি হইতে ষড়জ, এইরূপ চিত্রা, ঘনা এবং কন্দলিকা হইতে ঋষভ, সরঘা ও মালা হইতে গান্ধার, মাগধী, শিবা, মাতঙ্গী এবং মৈত্রী হইতে মধ্যম। বালা, কলা, কলরবা এবং শার্ঙ্গরবী হইতে পঞ্চম। যাতা, রসা ও অমৃতা এই তিনটী হইতে ধৈবত। বিজয়া ও মধুকরী এই দুইটী শ্রুতি হইতে নিষাদের উৎপত্তি জানিতে হইবে।

শ্রুতি ও স্বরের নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বচনটী গ্রহণ করিয়াছেন যথা—

শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ।
জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে॥

যেমন জলচর মৎস্যগণ জলের ভিতর কখন কোন্ পথে গমনাগমন করে তাহা মনুষ্যের অগোচর, তদ্রূপ শ্রুতি স্থানে স্বরের গতি কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন, অধিক কি ব্রহ্মাও তত্ত্বের দ্বারা বুঝিতে অক্ষম।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে শ্রুতি গুলি স্বরের জননী। কেন না সঙ্গীত শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

ইতি স্বরাণাং শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতি রুদীরিতা।

ইহার টীকা এইরূপ যথা—স্বরাণাম্ ইত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতি-বৎ। স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ।

স্বর বা সুরের নাম যথা—

ষড়জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চম স্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তাত্র কীর্ত্তিতাঃ॥
সরিগমপধনিশ্চেত্যেতেষ মপরাভিধাঃ॥

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ইহার নামান্তর স, রি, গ, ম, প, ধ ও নি। ষড়জাদি সাতটী সুরের প্রথম অক্ষর লইয়াই সরিগমাদির নামকরণ হইয়াছে।

স্বর সমূহের উৎপত্তি স্থান—বক্ষঃ নাসা, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টী স্থানকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া প্রথম স্বরের ষড়্জ এই নাম হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য স্বরের বিষয় শাস্ত্রে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে কথিত হইয়াছে, বিস্তার ভয়ে লিখিত হইল না।

সাধারণকে স্বর বোধ করাইবার জন্য সঙ্গীত গ্রন্থে আর একটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। যথা—

ময়ূরঃ ষড়জমাখ্যাতি ঋষভং ব্যক্তি চাতকঃ।
ছাগো গান্ধার মাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্॥
কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে ভেকো বদতি ধৈবতম্।
নিষাদং ভাষতে হস্তীত্যেতদ্ব্রহ্মাদি সম্মতম্॥

ময়ূরের শব্দ ষড়্জ, চাতকের শব্দ ঋষভ, ছাগশব্দ গান্ধার, ক্রৌঞ্চ-শব্দ ধৈবত, কোকিলশব্দ পঞ্চম, ভেকের শব্দ ধৈবত এবং হস্তীর শব্দই নিষাদ। কিন্তু সঙ্গীত-দামোদর গ্রন্থকার অন্যপ্রকার শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ময়ূর, বৃষ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, অশ্ব এবং হস্তী এই সাতটী জন্তুর স্বরই ষড়জ প্রভৃতি সাতটী স্বর বুঝিতে হইবে।

এই স্বর পুনঃ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—বাদী, সম্বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী। ইহার মধ্যে বাদী—রাজা, সম্বাদী—পাত্র, বিবাদী—শত্রু, অনুবাদী—পাত্রের ভৃত্য। এই সাত সুরের আবার কুল নির্ণীত হই-হইয়াছে যথা—সা, গ ও ম এই তিনটী স্বর দেবকুল-জাত, প পিতৃ-কুল সম্ভূত, রি ও ধা মুনিবংশীয়। নি দৈত্যকুল-জাত বুঝিতে হইবে।

স্বরদিগের জাতি নির্ণয় যথা—সা, ম, প ব্রাহ্মণ, রি, ধ ক্ষত্রিয়। গ, নি বৈশ্য এবং বিকৃত স্বরকেই শূদ্র জাতি বলা যায়।

এইরূপ আবার সেই সকল স্বরের বর্ণ কথিত হইয়াছে সা—কমলাভ, রি—পিঙ্গলবর্ণ, গা—স্বর্ণবর্ণ, ম—কুন্দাভ, প—শ্যাম, ধা—পীত, নি—কর্ব্বুর বর্ণ। ইহার পরে কোন স্বর কোন দ্বীপজ, তাহাও বর্ণিত আছে—সা—জম্বু, রি—শাক, গ—কুশ, ম—ক্রৌঞ্চ, প—শাল্মলী, ধ—শ্বেত এবং নি—পুষ্কর দ্বীপ-জাত। অগ্নি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, বিষ্ণু, নারদ, তুম্বুরু এবং কুবের এই সাত দেবতা সা, রি, গ, ম, প, ধ ও নি স্বরের দর্শক জানিতে হইবে। অগ্নি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, শিব, বিষ্ণু, গণেশ এবং সূর্য্য এই সাতটী স্বরের দেবতা। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, উষ্ণিক্ এবং জগতী এই সাতটী সাত স্বরের ছন্দ বুঝিতে হইবে।

সঙ্গীত শাস্ত্র প্রণেতৃগণ এইরূপ স্বরের বহুবিধ বিভাগ করিয়া স্বরের পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সকল অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

এই সাত স্বরের তিনটী গ্রাম। স্বর সকলের অতি সূক্ষ্ম ভাবকে গ্রাম বলে। ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটী গ্রাম ত্রয়ের নামধেয়। ইহাকেই মন্দ্র, মধ্য ও তার অথবা উদারা, মুদারা ও তারা কহে। ইহার মধ্যে ষড়্জ গ্রাম মূর্চ্ছনার আধারভূত বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইহা ষড়্জের মূর্চ্ছনা। ম, প, ধ নি, সা, রি, গ ইহা মধ্যমের মূর্চ্ছনা। গ, ম, প, ধ, নি, সা, রি ইহা গান্ধারের মূর্চ্ছনা।

সঙ্গীত রত্নাকর কৃত শ্লোক যথা—

ক্রমাৎ স্বরণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
সামূর্চ্ছেত্যুচ্যতে গ্রামস্থা এতাঃ সপ্ত সপ্তচ॥

এই গ্রাম ত্রয়ের প্রত্যেকের সাতটী করিয়া মূর্চ্ছনা বলিয়া একবিংশতি সংখ্যক মূর্চ্ছনা কল্পিত হইয়াছে। এবং ইহার পরে গ্রহস্বর, অংশস্বর, ন্যাসস্বর প্রভৃতি নানাবিধ স্বরভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পরে রাগের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন কীর্ত্তনের পদে যে সকল রাগ রাগিণীর কথা লিখিত হইয়াছে, ইহার কোন মূল নাই; এ কথা গুলি নিতান্ত ভ্রমাত্মক, সাধারণের

সেই সকল ভ্রমাপনোদন করিবার জন্যই শাস্ত্রীয় রাগ রাগিণীর কথা কিছু বলা যাইতেছে।

যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগৎত্রিতয় বর্ত্তিনাম্।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভি র্ভরতাদিভিঃ॥

যাহা দ্বারা ত্রিজগৎবর্ত্তি জীবগণের চিত্ত রঞ্জিত হয়, ভরতাদি মুনিগণ তাহাকেই রাগ কহিয়াছেন।

ভগবানের রাসলীলা কালে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যোড়শসহস্র গোপীগণ প্রত্যেকে এক একটী রাগ দ্বারা গান করেন, সেই নিমিত্ত রাগের সংখ্যা ষোড়শ সহস্র।

এষু রাগেষু ষট্ ত্রিংশৎ রাগাজগতি বিশ্রুতাঃ।

এই ষোড়শ সহস্র রাগের মধ্যে ষট্ এবং ত্রিংশৎ রাগই জগতে বিখ্যাত যে হেতু সঙ্গীত দামোদরে কথিত হইয়াছে—

রাগাঃ ষড়েব তু প্রোক্তা রাগিণ্যস্ত্রিংশদেবহি।

রাগ ছয়টী এবং রাগিণী ত্রিশটী। কিন্তু মতান্তরে রাগ ছয়টী এবং রাগিণী ছত্রিশটী, এখানে শেষ পক্ষই আমাদের অবলম্বনীয়। কেন না ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীই অস্মদ্দেশে প্রচলিত। ছয় রাগ যথা—

মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাটঃ ষট্ পুংরাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল এবং কর্ণাট এই ছয়টীকে রাগ বলে।

ধানশী মালসী রামকেলী চ সিন্ধুড়া তথা।
আসাবরী ভৈরবী চ মালবস্যপ্রিয়া ইমাঃ॥

ধানশ্রী, মালসী, রামকেলি, সিন্ধুড়া, আসাবরী এবং ভৈরবী এই ছয়টী রাগিণী মালব রাগের প্রিয়া।

বেলাবলী চ প্রবরা কানড়ী মাধবী তথা।
কোড়ী কেদারিকা চৈব মল্লারস্যপ্রিয়া ইমাঃ॥

বেলাবলী, প্রবরা, কানড়ী, মাধবী, কোড়ী, এবং কেদারিকা এই ছয়টী রাগিণী মল্লার রাগের প্রিয়া।

বেলাপারী চ গৌরী চ গান্ধারী সুভগা তথা।
কৌমারী চৈব বৈরাটী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ॥

বেলাপারী, গৌরী, গান্ধারী, সুভগা, কৌমারী ও বৈরাটী এই ছয়টি রাগিণী শ্রীরাগের পত্নী।

তোড়ীচ পঞ্চমীচৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুজ্জরীচ বিভাষাচ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ॥

"তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুজ্জরী এবং বিভাষা এই ছয়টি রাগিণী বসন্তরাগের পত্নী।

ময়ূরী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহিড়া।
বরাড়ী মারহট্টা চ এতা হিন্দোল যোষিতঃ॥

ময়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী এবং মারহট্টা ইহারা হিন্দোলের স্ত্রী।

নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথাঃ।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ॥

নাটিকা ভূপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী এবং কল্যাণী ইহারা কর্ণাট রাগের দয়িতা।

যে সকল রাগ রাগিণীর নাম উল্লেখ করা হইল দেশভেদে ও মতভেদে ইহাদিগের নামেরও ভেদ দেখা যায়।

এই রাগ সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব ভেদে ত্রিবিধ। যাহাতে সাতটী স্বরই গীত হয় তাহাকে সম্পূর্ণ, যাহাতে ছয়টী স্বর গীত হয় তাহাকে ষাড়ব এবং যে রাগে পাঁচটী স্বর গীত হয় তাহাকে ঔড়ব কহে।

শ্রীরাগ, নটনারায়ণ, কর্ণাট, বসন্ত, ভৈরব, বঙ্গাল, পঞ্চম, কামোদ, মেঘ, দ্রাবিড়, গৌড়, বরাটী, গুজ্জরী, তোড়ী, মালসী, সিন্ধুড়া, দেবক্রী, রামক্রী এবং বেলাবলী প্রভৃতি কতকগুলি রাগ রাগিণী সম্পূর্ণ শ্রেণী-ভুক্ত। গৌড়, কর্ণাট, ধানশী প্রভৃতি কতিপয় রাগ ষাড়ব শ্রেণীভুক্ত। মল্লার, দেশপাল, মালব, হিন্দোল প্রভৃতিকে ঔড়ব কহে।

এই সকল রাগ-গানের ফলাফলও শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

পূর্ণরাগের ফল— আয়ুর্ধর্ম্মো যশঃ কীর্ত্তি বুদ্ধি সৌখ্যবলানি চ।
রাজ্যাভি বৃদ্ধি সন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়তে॥

ষাড়বরাগের ফল— সংগ্রামে বীরতা রূপ লাবণ্য গুণকীর্ত্তনং।
গানে ষাড়বরাগাণাং গদিতং পূর্ব্ব সূরিভিঃ॥

ঔড়বের ফল— ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয় শোক বিনাশনে।
ঔড়বাস্ত প্রগাতব্যা গ্রহশান্ত্যর্থ কর্ম্মণি॥

এই রাগ রাগিণী গুলি আবার দুই তিনটী রাগ একত্রিত হইয়া

সংকীর্ণ নাম ধারণ করে সঙ্কীর্ণ রাগের সংখ্যা করা যায় না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে দুই একটী সংকীর্ণ রাগের কথা বলা যাইতেছে—

দেশাখ্যায়াশ্চাথ মল্লারিকায়াঃ স্যাদংশাভ্যাং পৌরবীয়ং প্রদিষ্টা।

অর্থাৎ দেশ ও মল্লারী একত্রিত হইয়া পৌরবী নামে কথিত হয়।

বারাট্যাখ্যা নাট কর্ণাটকেভ্যঃ সম্ভূতেয়ং মঞ্জু কল্যাণিকাখ্যা।

অর্থাৎ বরাটী ও নাট-কর্ণাট মিলিত হওয়ায় কল্যাণী নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছে। "সারঙ্গস্যাত্তোড়ী ধন্নাসিকাভ্যাং অর্থাৎ তোড়ী ও ধন্নাসী বা ধানশী হইতে সারঙ্গের উৎপত্তি এবং শ্রীরাগ ও গৌড় হইতে গৌরী। এই প্রকার রাগের অসংখ্য ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে যে সকল রাগ রাগিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল গানে-রও একটী সময় নির্দ্ধারিত আছে। সেই নির্দ্ধারিত সময় উল্লঙ্ঘন করিলে সর্ব্বনাশ হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তবে "শ্রেণীবদ্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদং।" আবার এরূপও বিধি আছে যে, যদি কেহ লোভ বা মোহ বশতঃ অসময়োচিত গান করে, তবে গুজ্জরী রাগিণী গানে সেই সকল দোষ নষ্ট হয়। কতকগুলি রাগ আছে তাহা সকল সময়েই গীত হইয়া থাকে, যথা—বসন্ত, রামকেরী, গুজ্জরী প্রভৃতি। দেবর্ষি নারদ বলেন, "দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতং," অর্থাৎ রাত্রি দশ দণ্ডের পরে সকল রাগই গীত হইতে পারে।

মহাপ্রভুর জন্মোৎসব।

[১]

গত ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে অত্রস্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুবিগ্রহের অঙ্গরাগ ক্রিয়া সমাপনান্তে অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস স্থানীয় ব্যবসায়ী মহাজনগণের বিশেষ যত্নে হরিনাম সংকীর্ত্তন, পদাবলী গান ও মহোৎসব হয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ বনবাড়িয়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীল ক্ষুদীরাম পোদ্দার মহাশয় শ্রীবাস অঙ্গনের অভিষেক লীলা ও গোবর্দ্ধন পূজা বিষয়ক মহাজনী পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তিনি যেরূপ প্রেমপূর্ণ ভাবে পদাবলী গান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সমাগত বৈষ্ণবমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হন, এবং ভাবে বিভোর হইয়া কোন কোন মহাত্মা অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট

সাত্ত্বিক ভাবের কোন কোন অঙ্গের অধিকারী হইয়াছিলেন। সে প্রেমোচ্ছ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া বেলকুচী নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র পোদ্দার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদার মহাশয় ভাব-প্রাবল্যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! ধন্য শ্রীবৈষ্ণবগণ! ধন্য শ্রীপ্রভুর নাম। ধন্য শ্রীগৌরভক্তমণ্ডলী! যাঁহারা শ্রীগৌর-প্রেমে এত উন্মাদিত হয়েন। সুদুর্লভ শ্রীরাধা-প্রেম প্রাপ্তি জীবের পক্ষে পরম অধিকার বটে। কিন্তু তাহা কি জীবে পাইত, যদি শ্রীগৌরগুণমণি ও দয়াল নিতাই যারে তারে অযাচক হইয়া না বিলাইতেন? গৌরভক্তগণ! একবার প্রাণভরিয়া বল "শ্রীগৌরনিত্যানন্দের জয়," "সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতের জয়।"

গত দ্বাদশী তিথিতেও এখানকার মহাজন শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ-চন্দ্রশেখর সাহা মহাশয়দের গদিতে তাঁহাদের প্রধান কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সাহা মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এক হরিবাসরের অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীল ব্রজবাসী পাল মহাশয় পদকীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় মকিমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীল গোপালচন্দ্র অধিকারী প্রভুপাদও উপস্থিত ছিলেন। ভাবুক প্রধান শ্রীল শ্যামাচরণ মজুমদার মহাশয়ের এই সভাতেও ভাবাবেশ হয়, তিনি প্রেমভাবোচ্ছ্বাসে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করেন। ধন্য শ্রীপ্রভুর নামকীর্ত্তন ধন্য! ধন্য শ্রীগৌরভক্তমণ্ডলী ধন্য!

আজ আহ্লাদের সহিত শ্রীবৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাপন করিতেছি যে, দিন দিন শ্রীগৌরভক্তের সংখ্যা সর্ব্বদেশেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। আরও আনন্দের সমাচার এই যে, নব্য সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত অনেক যুবক, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে মহাপুরুষের বেশী বলিতে চাহিতেন না, তাঁহারা এখন অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া একমাত্র আশ্রয় স্থল করিতেছেন। আমরাও শ্রীল গোবিন্দ দাসের সঙ্গে একবাক্যে প্রার্থনা করি যে,—

"এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোর কিশোরী।"

শ্রীগৌরানুগত দাসাধম শ্রীরামচন্দ্র দাস।

সিরাজগঞ্জ—বণিকপটী।

—০:*:০—

[২]

শ্রীগৌর-পূর্ণিমার প্রাতে আমরা গ্রামস্থ সকলে আমাদিগের শ্রীহরি সভায় একত্র হইলাম। পুষ্প দ্বারা সভাগৃহ সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সভার অন্যতম আচার্য্য বড়গাছির ঠাকুর কৃষ্ণদাস বংশ্য শ্রীগৌরভূষণ গোস্বামী মহাশয় অল্পক্ষণ-স্থায়িনী একটি বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাটি একটি সাময়িক প্রার্থনা। প্রার্থনার পরেই আমরা নিশান, কাসর, খোল, করতাল, প্রভৃতি লইয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইলাম। গ্রামের প্রধান প্রধান পথগুলি ভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নে পুনরায় শ্রীহরি সভায় উপস্থিত হইলাম। সংকীর্ত্তনকারী আমরা সভাপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলে, এ প্রদেশের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণদাস মহাশয় পদ গান করিয়া সভাস্থ সকলেরই মনে বিশুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইলেই আবার সকলে সভায় উপস্থিত হইলেন। সভার অধিবেশন আপাততঃ পক্ষান্তে নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সময়ে সভাগৃহকে শোভাসৌন্দর্য্যে বিভূষিত ও অন্য দিন অপেক্ষা আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গিত দেখিয়া সভাস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস শ্রীপ্রভুর জন্মবিষয়ক পদ গান করিয়া সকলকে আরও অনির্ব্বচনীয় ভাবে আবিষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভু কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশজাত কুকুণপুর নিবাসী পরম বৈষ্ণব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী গোস্বামী মহাশয় একখানি আধুনিক সরল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের জন্মবর্ণন কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করিলেন। তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর শ্রোতাই প্রভুর অবতারের প্রয়োজন ও অন্যান্য মনোহর বিবরণ অনেক পরিমাণে জানিতে পারিয়া আনন্দিত চিত্ত হইলেন। তদনন্তর আচার্য্য কুকুণপুর নিবাসী অধুনা আলুকদিয়া প্রবাসী শ্রীগৌরভূষণ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত উৎসবের হেতু ও অবতারের প্রয়োজনাদি অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। উপবাসের জন্য ইঁহার শরীর বলশূন্য হইয়া পড়িলেও ইঁহার মন উৎসবজনিত উৎসাহে এতই পূর্ণ হইয়াছিল যে ইনি অধিকক্ষণই বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাষা ও ভাব উৎকৃষ্ট বলিয়া ইঁহার বক্তৃতাটি শ্রোতৃবৃন্দের এমনই হৃদয়গ্রাহিণী হইল যে, তাঁহারা উহা স্থির ভাবে শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে সভাস্থ সকলে

আনন্দে বিভোর হইয়া হরিধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার সময়ে চন্দ্রগ্রহণ দর্শনে প্রফুল্লিত অন্তঃকরণ শ্রীনবদ্বীপবাসিগণের হরিধ্বনির কথা মনে পড়িতে লাগিল। আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে প্রাচীন বহুশাস্ত্রদর্শী সুবিজ্ঞ সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র সরকার মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণেও আমরা রঞ্জিত-চিত্ত ও উপকৃত হইয়াছিলাম। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত গায়ক বটকৃষ্ণদাস অনেকক্ষণ গান করিয়াছিলেন। এইরূপে সর্ব্বজনবন্দনীয়া পরমানন্দদায়িনী শ্রীগৌর-পূর্ণিমা আমাদিগের উৎসবানন্দেই প্রায় অতিবাহিত হইয়াছিল।

হে গৌরভক্তগণ! শ্রীগৌরসুন্দরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত আপনারা কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, আগামী শ্রীগৌর-পূর্ণিমায় আমরা দুঃখি তাপী সকলে একত্র হইয়া যেন অধিকতর সমারোহ সহকারে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদিগের এই তাপিত দেহ মন জুড়াইতে পারি—অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদন করিয়া আমরা যেন কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীগৌরাঙ্গদাসাভাস শ্রীবীরচন্দ্র দাস বৈরাগী।
আলুকদিয়া শ্রীহরিসভার সহ-সম্পাদক।

—:০:—

বৈশাখী পূর্ণিমা।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার পর নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুর বাটীতে মিলিত হইয়াছেন। এই যে ভক্তগণ আসিয়াছেন, প্রভুর সে জ্ঞান নাই; তিনি গৃহের এক কোণে বসিয়া আছেন। মুখখানি অতিশয় মলিন, কাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন না, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আর চক্ষের জলে মুখ ও বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সরূপ নিকটে বসিয়া আছেন, প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রভুকে একটু সজীব ও অন্যমনস্ক করিবার জন্য, কত প্রবোধ দিতেছেন, কত কথা কহিতেছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত হইতেছে, প্রভুর আবেগ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। শেষে বলিলেন, "প্রভু, ভক্তগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের লইয়া কীর্ত্তন করিবেন চলুন।" প্রভুর এ সব ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু সরূপ ছাড়েন না, কাজেই উঠিতে

হইল। সরূপ তাঁহাকে ধরিয়া আঙ্গিনায় আনিলেন। তখন সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন, এবং কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ গাহিতেছেন, আর প্রভু স্থির হইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া আছেন। কীর্ত্তন যে হইতেছে তাহা যেন তিনি শুনিতে পাইতেছেন না। তাঁহার ভাব দেখিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তনে কোন রস পাইতেছেন না। তাঁহারা মুখে গাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মন পড়িয়া রহিয়াছে প্রভুর দিকে।

হঠাৎ প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু যদি উঠিলেন, ভক্তগণও সেই সঙ্গে উঠিলেন, আর কীর্ত্তন থামিয়া গেল। প্রভু দুই এক পদ চলিলেন, ক্রমে বাড়ীর বাহির হইলেন, শেষে রাস্তা বাহিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রভু যান কোথা? কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কাহার কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না,—ছায়ার স্থায় সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। খানিক যাইয়া প্রভু দাঁড়াইলেন, পার্শ্বে একটী উদ্যানের দিকে চাহিলেন, এবং দ্রুতপদে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই উদ্যানটীর নাম জগন্নাথবল্লভ। সে সময় ইহার ন্যায় বিস্তৃত ও মনোরম বাগান নীলাচলে আর ছিল না। দেখিলেই বোধ হইত বিধি যেন গোলোকের বস্তু আনিয়া বাগানটী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বৈশাখমাস, পূর্ণিমার রাত্রি, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, সুতরাং আজ বাগানটীর শোভা আরও মনোহর হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বাগানটীর শোভা এইরূপ বর্ণন করিতেছেন, যথা—

প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী যেন বৃন্দাবন। শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্প-গন্ধ লঞা বহে মলয় পবন। গুরু হঞা তরু লতা শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল। তরুলতাদি জোৎস্নায় করে ঝলমল॥

ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।

বাগানের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াই প্রভুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি যেন নবজীবন পাইয়া নব উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, শ্রীমতী আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া একরূপ হতাশ হইয়াছেন। হঠাৎ শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। এই সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত বৃন্দাবনে প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শুক শারী তান ধরিয়া দিল, বৃক্ষ-

লতা মুকুলিত হইল, ধীর সমীরণ বহিতে লাগিল। অনেক দিন পরে বঁধুকে দেখিবেন এই উল্লাসে শ্রীমতী গাহিতে লাগিলেন—

আজু হরি আওব নিকুঞ্জ বন। আজু হেরব সো চাঁদবদন॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার। বসাইব প্রাণপ্রিয়া হিয়ার মাঝার॥
উপহার দেওব যৌবন ভার। আজু এ নিকুঞ্জ বনে সুখের পাথার॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই যে অকৈতব প্রেম, ইহা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কাজেই মনুষ্যের তাহা অনুভব করাও কঠিন। রাধার সেই কৃষ্ণপ্রেম যে কিরূপ, তাহাতে যে মলিনতা নাই, প্রভু তাহাই জীবকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জন্য সেই রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলা সকল নিজে যজিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, যে যখন পুরুষ মানুষেরও শ্রীমতীর ন্যায় কৃষ্ণপ্রেম হইতে পারে, তখন ইহাতে কামগন্ধ থাকিতে পারে না। প্রভুর কৃপায় এখন রাধাকৃষ্ণের লীলা সকল জীবের নিকট জীবন্ত হইয়াছে, এখন সাধনা করিলেই জীব সেই লীলা সকল চোকে চোকে আস্বাদন করিতে পারেন।

বহু দিন পরে বঁধুর সঙ্গে মিলন আশায় শ্রীমতীর মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, আজ প্রভু জীবকে তাহাই পরিষ্কার রূপে দেখাইতেছেন। তিনি ইহা অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন না, নিজে প্রকৃতই রাধাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। শ্রীমতীর ন্যায় তিনিও কৃষ্ণ-বিরহে ডুবিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশায় শ্রীমতীর ন্যায় তাঁহারও ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। অমনি মলিন বদন প্রফুল্লিত হইল, আহ্লাদে হৃদয় নাচিয়া উঠিল, আর অমনি তিনি জয়দেবের এই মধুর পদটী ধরিয়া দিলেন—

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥ ধ্রু॥
উন্মদ মদন মনোরথ পথিক বধূজনজনিত বিলাপে।
অলিকুল সঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে॥
মৃগমদ সৌরভ রভস বশম্বদ নবদলমাল তমালে।
যুবজন হৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে॥
মদন মহীপতি কনকদণ্ডরুচি কেশর কুসুম বিকাশে।
মিলিত শিলীমুখ পাটলি পটল কৃত স্মরতূণ বিলাসে॥

বিগলিত লজ্জিত জগদবলোকন তরুণ করুণ কৃত হাসে।
বিরহি নিকৃন্তন কন্তমুখাকৃতি কেতকি দন্তুরিতাশে ॥
মাধবিকা পরিমলললিতে নবমল্লিকয়াতি সুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপিমোহনকারিণি তরুণা কারণ বন্ধৌ ॥
স্ফুরদতি মুক্তলতা পরিরম্ভণ মুকুলিত পুলকিত চূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর পরিগত যমুনাজলপূতে ॥
শ্রীজয়দেব ভণিত মিদ মুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারম্।
সরস বসন্ত সময় বনবর্ণন মনুগত মদন বিকারম্ ॥

প্রভুর এই আনন্দময় মূর্ত্তি, মৃদু মধুর হাস্য, গদগদ ভাব, ভক্তগণ অনেক দিন দেখেন নাই। সুতরাং প্রভুর এই অপূর্ব্বভাব ও উদ্যানের অপরূপ শোভা দেখিয়া, তাঁহারাও প্রফুল্লিত হইলেন। তাঁহারাও আপনা-দিগকে ভুলিয়া, প্রকৃতই নিকুঞ্জবনে আসিয়াছেন এই ভাবে আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন, এবং প্রভুর সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন।

প্রভুর আজ আনন্দের সীমা নাই। কৃষ্ণ আসিতেছেন, এখনই তাহার বহুকালের হারানিধি পাইবেন, এই কথা যতই মনে উদয় হইতেছে, ততই তাঁহার মন আহ্লাদে ডগমগ হইতেছে। কিন্তু তাঁহার দেরী সহিতেছে না। এই আসেন, এই আসেন, করিয়া সময় কাটিতে লাগিল। কিন্তু কৈ কৃষ্ণ ত এখনও আসিতেছেন না? কতকাল প্রাণনাথ হারা হইয়া আছেন! কতকাল তাঁহার সেই মধুর হাস্যমাখা চন্দ্রবদন দর্শন করেন নাই! প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? যতই সময় যাইতেছে, ততই অধীর হইয়া পড়িতেছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখেন তমাল তলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াইয়া আছেন! অমনি প্রভু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া

"এই ত আমার প্রাণবল্লভ হে।
আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি, হারান রতন হে ॥"

এই পদ গাহিতে গাহিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়িয়া গেলেন। রসিক শেখরও অমনি প্রভুর দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিয়া অদর্শন হইলেন। "পাইয়া হারাইলাম!" ইহাই বলিয়া প্রভু সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও এতক্ষণ আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে এ প্রকৃত ব্রজপুরী নহে, আর তাঁহারা

ব্রজনারী নহেন। যেই প্রভু, "এই যে আমার প্রাণবল্লভ" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অমনি যেন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ব্রজের ভাবও চলিয়া গেল। তাঁহারা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রভুর নিকট গেলেন।

কিন্তু প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহাদের বেশী চেষ্টা করিতে হইল না। প্রভুর আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকৃতই আসিয়াছিলেন, তাহা ভক্তগণ, তাঁহার দর্শনলাভ না করিলেও, বেশ বুঝিতে পারিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান ভরিয়া গেল। এই অঙ্গগন্ধ পাইয়া প্রভুর মূর্চ্ছা আপনিই ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়াই শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইয়া বিশাখাকে যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সেই শ্লোকটী গদগদ ভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকটীর ভাব শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় অপূর্ব্ব পয়ারছন্দে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কস্তূরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখিহে কৃষ্ণ গন্ধে জগত মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাহা বৈসে, কৃষ্ণ পাশে ধরি লৈঞা যায়॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে॥
হেম কীলিত চন্দন, তাহা করে ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, মিলি তাকে যেন কৈল চুরি॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত নারী, হেন ডাকাইত অঙ্গগন্ধ॥
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পীয়া পেট ভরে, পীঙ পীঙ তভু করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদনমোহন নাট, পসারি গন্ধের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনে মূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥

শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে প্রভুর হৃদয়ের বেগ উথলিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গগন্ধে তিনি পাগলের ন্যায় মাতিয়া উঠিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন, যখন তাঁহার অঙ্গগন্ধ পাওয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয় কৃষ্ণ এখানে আছেন। এই আশায় তিনি একটী বৃক্ষের নিকট গেলেন,

সতৃষ্ণ নয়নে ইতি উতি চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার বঁধুযাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ক্ষুণ্ণ মনে অন্য বৃক্ষের নিকট গেলেন। সেখানেও কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইয়া হৃদয় ভরিয়া গেল। ভাবিলেন, এইবার তাঁহাকে ধরিয়াছি। মনে অমনি আশার সঞ্চার হইল। গাছের উপর নিচে চারিদিকে বেশ করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার চিত্তচোরকে পাইলেন না। এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া শেষে হতাশ হইয়া বলিতেছেন, "সখি! এ আমার কি হইল? আমি ত তাঁহার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছিলাম। তিনি কেন আবার আমাকে দেখা দিলেন, আর চকিতের মতন দেখা দিয়া কেনই বা আবার অদর্শন হইলেন। সখি! এখন কি করি, আমার উপায় বুদ্ধি বলিয়া দাও, আমি যে আর বাঁচি না, আমার নিভা অনল যে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল, এখন সেই অনলে যে পুড়িয়া মরি!" প্রভু চুপ করিলেন, করিয়া আবার বলিতেছেন, "তিনি কি নিঠুর! নিঠুরালী করিয়া কি তাঁহার তৃপ্তি হয় না? এরূপ ভাবে নারীবধ করিয়া তিনি কি সুখ পান?" এই বলিতে বলিতে প্রভুর হৃদয়ে বেগ আসিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন, নয়নদ্বয় ছল ছল করিয়া উঠিল, শেষে নয়নজলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। স্বরূপ ও রামরায় তখন আর উপায় না দেখিয়া প্রভুর ভাবোচিত গীত ধরিয়া দিলেন। প্রভু তখন স্থির হইলেন, ক্রমে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। তখন প্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রে স্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলেন।

কাম্যবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য।

কাম্যবন শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী—শ্রীমথুরাধাম হইতে পশ্চিমাভিমুখে ১৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থানটী অতি মনোরম; চারিদিকে পাহাড়-শ্রেণী বিরাজিত থাকায় ইহার প্রাকৃতিক শোভাও অনুপম ও চিত্ত মুগ্ধকর। কাম্যবন একটি বৃহৎ প্রাচীন নগর। জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের রাজত্বকালে এই নগরী মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল। উক্ত মহারাজার একটি প্রাচীন দুর্গ ও দুর্গমধ্যস্থ সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ অদ্যাবধি

এখানে বিরাজিত—কিন্তু এখন উহার ভগ্নাবস্থা। সমস্ত নগরটী প্রাচিরে বেষ্টিত, উহাতে ৭টী প্রবেশ দ্বার; প্রত্যেক দরজার ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—মথুরাদরজা, দীগদরজা, লঙ্কাদরজা, আমেরিদরজা, দেবীদরজা, দিল্লিদরজা, এবং রামজীদরজা। ফটকগুলি অত্যুচ্চ—প্রস্তরনির্ম্মিত; নগরমধ্যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকে কেবল বৃহৎ বৃহৎ বহুকারুকার্য্য-খচিত প্রাচীন অট্টালিকা—কোনটি দ্বিতল কোনটি ত্রিতল কোনটী বা চারিতল, এক্ষণে সকলেরই ভগ্নাবস্থা।

এই নগরীর পূর্ব্বপ্রান্তে—দীগদরজার বাহিরে একটি সুবৃহৎ সরোবর বহু প্রাচীনকাল হইতে স্থাপিত, এই সরোবরের নাম বিমলকুণ্ড। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই কুণ্ড স্থাপিত। ইহার শোভা অতিশয় মনোহর। ইহার পরিমাণ দীর্ঘে ৪০০হাতের উপর ও প্রস্থে ২৫০ হাতের উপর হইবে। কুণ্ডের চারিধার প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানরাজীতে এমন করিয়া বাঁধান যে, কোন স্থানেও একটু মাটি বাহির হয় নাই। কুণ্ডটী উত্তর দক্ষিণে লম্বা।—কুণ্ডের উপরিভাগে চারিধারে ক্ষুদ্রবৃহৎ ২৫।২৬টী দেব দেবীর মন্দির। দক্ষিনদিকের ঘাটের উপরে যাত্রিগণ থাকিবার জন্য একটি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী। ইহা ছাড়া কুণ্ডের চারি ধারে পাহাড়ের উপর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও নিবিড় লতা-মণ্ডপ থাকায় কুণ্ডের শোভা আরও মনোরম হইয়াছে—প্রতি লতামণ্ডপে, প্রতি বৃক্ষডালে ময়ূর ময়ূরী শুক শারী, কপোত কপোতী আরও যে কতরকম পক্ষী তাহার নাম জানি না, সর্ব্বদাই গান করিতেছে ও বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে উড়িয়া বেড়াইতেছে; সে সকল শোভা না দেখিলে বুঝান যায় না। যথা শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমায়—

কাম্যক কানন, হইতে বৃন্দাবন, অষ্টাদশ ক্রোশ হয়
কুণ্ড যে বিমল, তাহে নিরমল, জল অতি সুধাময়॥
রতন সোপান, কাঞ্চন নির্ম্মাণ, চারিদিকে বৃক্ষগণ।
যত তরুতলা রতনে বান্ধিলা তাহে নানা পক্ষগণ॥
নানা পুষ্পলতা, চৌপাশে বেষ্টিতা, মণ্ডপ আকার হৈয়া।
কাঞ্চনভবন, অঙ্গন প্রাঙ্গন, আছে স্থান আচ্ছাদিয়া॥
পক্ষীগণধ্বনি, সুধাসারজিনি, কর্ণ রসায়ন করে।
রাধাকৃষ্ণগুণ, গায় অনুক্ষণ, শুনি জগমনহরে॥

প্রবাদ যে এই কুণ্ডে স্নান করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়, কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠব্যাধি নাশ হয় এবং চক্ষুহীনের নেত্রলাভ হয়। এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র গোপীর সহিত স্নান করিয়াছিলেন। কুণ্ডের জল সুনির্ম্মল। কুণ্ডের গভীরতাও কম নহে, এক্ষণে উহাতে ১০।১২ হাত জল আছে। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে বনযাত্রার সময় এই কুণ্ডে বহু সংখ্যক যাত্রি আগমন করেন, তখন দুই দিন এখানে মেলা হয়।

কাম্যবনে দর্শন যোগ্য পদার্থ অসংখ্য। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান। যথা—শ্রীনিতাইগৌর, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীকামেশ্বর মহাদেব, শ্রীচন্দ্রমাজিউ, শ্রীপঞ্চপাণ্ডব, অনতিদূরে শ্রীচরণপাহাড়ি ও শ্রীভোজনথালি শ্রীকুণ্ড, শ্রীলুক্ লুক্ কুণ্ড, শ্রীরামসীতা, শ্রীরামেশ্বর, সেতুবন্ধ, শ্রীচক্রতীর্থ এবং চৌরাশী খাম্বা।

১। শ্রীনিতাইগৌর।

১৭৪৪ সম্বৎ অর্থাৎ ২১১বৎসর পূর্ব্বে কাম্যবনে শ্রীনিতাই গৌরের সেবা তথাকার কোন ধনী জমিদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হন। উক্ত ধনী ব্যক্তি এতদ্দেশবাসী হইলেও তাঁহার শ্রীগৌরনিত্যানন্দে বড়ই প্রীতি ছিল। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া শ্রীনিতাইগৌরের একটি সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এই বাটীতে নিচে উপরে ৬০।৬৫টী প্রকোষ্ঠ, শুধু যে তিনি মন্দির নির্ম্মাণার্থ বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা নহে। দুই প্রভুর সেবা স্থায়ীরূপে পরিচালনের জন্য তাঁহার জমিদারির অন্তর্গত ৩টী গ্রাম শ্রীনিতাই গৌরকে তিনি সমর্পণ করিয়া যান। তিনি অপুত্রক ছিলেন; তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজে আপ্ত হইয়া যায়, বলা বাহুল্য সেইসঙ্গে উল্লিখিত ৩টী গ্রামও বাজে আপ্ত হয়; পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঐ গ্রামত্রয় তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তখনকার রাজা ছিলেন জয়পুরাধিপতি মহারাজা জয়সিংহ। পরে ভরত পুরাধিপতি এই নগরী যুদ্ধে জয় করিয়া লয়েন—তাঁহার নিকট হইতে দিল্লির বাদসাহ—বাদসাহের নিকট হইতে পুনরায় ভরতপুরের অন্য রাজা জয় করিয়া লয়েন, সে যাহা হউক এই সকল গোলযোগে উক্ত গ্রামত্রয় একেবারে হস্তান্তরিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এখানকার অধিবাসীগণের অবস্থা তত ভাল নহে সুতরাং সেবা অতি কষ্টে চলিতেছেন। এখানকার বর্ত্তমান মহান্তের জন্মস্থান বঙ্গদেশে, তিনি

৩৫ বৎসর এই সেবা চালাইয়া আসিয়াছেন—তাঁহার বয়স ৮০বৎসরের উপর হইয়াছে।

২। শ্রীবৃন্দাদেবী।

শ্রীবৃন্দাদেবীর পরিচয়ের পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে যে শ্রীমহাপ্রভু আছেন, তাঁহার বিষয় অগ্রে কিছু বলিব। এই শ্রীমহাপ্রভুর সেবা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত—কিন্তু কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক এই সেবা প্রকাশিত হয় তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন—তবে ইহা যে বহু প্রাচীন সেবা তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাদেবী এখানে প্রকট হন—তাঁহার মন্দিরাদি জয়পুরের রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দেন—অদ্যাবধি তাহার সনদ বর্ত্তমান আছে। সে যাহা হউক এদেশের লোকের শ্রীগৌরনিত্যানন্দে যেরূপ প্রীতি দেখিলাম তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, অভূতপূর্ব্ব ও লোকাতীত।

কাম্যবনে ৩ জন মাত্র বাঙ্গালী বাস করেন—শ্রীবৃন্দাদেবীর বাড়ীতে আরতির সময় প্রত্যহ লোকে লোকারণ্য হয়—পাশাপাশি ৩টী মন্দির। সদর দরজায় ঢুকিয়াই অগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, পরে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাদেবী। দর্শকবৃন্দ আসিয়া অগ্রেই মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, পরে শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীগোবিন্দজিউ দর্শন করেন। বলা বাহুল্য দর্শকগণ প্রায় সমস্তই এতদ্দেশবাসী। আরাত্রিকের সময় বড় আনন্দ। এক বাঙ্গালী বৈষ্ণব তিনি প্রত্যহ করতাল লইয়া আরতি কীর্ত্তন করেন আর নৃত্য করেন—সঙ্গে সঙ্গে বহুতর বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী গাহিতে ও নাচিতে থাকেন বাবাজী মহাশয় প্রথমে এই পদটী ধরেন যথা—

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি। বাজে সঙ্কীর্ত্তন মধুর ধ্বনি॥ ইত্যাদি

তিনি উচ্চৈঃস্বরে যেমন এই পদটী ধরেন আর সেই সঙ্গে বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী সকলেই একত্রে গাহিতে থাকেন পাঠক! সে আনন্দ—সে গগনভেদী সুমধুর ধ্বনি আর সেই প্রাঙ্গন মধ্যস্থ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমি বুঝাইতে পারিলাম না—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে বালকের কণ্ঠস্বর মিশিয়াছে, বালকের কণ্ঠস্বরে যুবকের কণ্ঠস্বর, আবার যুবকের কণ্ঠস্বরে যুবতীর কণ্ঠস্বর মিশিয়াছে—চারি কণ্ঠস্বর একত্রে মিশিয়া যেন কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিতে থাকে, স্বরটী বাস্তবিকই হৃৎকর্ণরসায়ন—যিনি একবার শুনিয়াছেন তিনি ইহ জন্মে আর ভুলিতে পারেন না—তাঁহার কর্ণে যেন

সদাই লাগিয়া থাকে। আর সেই যে দৃশ্য সে অতি চমৎকার—সে যে কি চমৎকার তাহা এক 'অতি' বিশেষণের দ্বারা কি ব্যক্ত করিব, না দেখিলে সে দৃশ্য বিশেষণে ব্যক্ত হইবার নহে। গাহিতেছেন আর সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছেন—বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী সকলেই এক ঠাঁই—বৃদ্ধের মাথায় পাগড়ী, গায়ে চাপকান, যুবকের মাথায় টুপি গায়ে কোর্ত্তা আর রমণীগণের চিত্র বিচিত্র ঘাঘরা কাঁচলি ওড়না পরিধানে। বালক বৃদ্ধ যুবা গাহিতে গাহিতে ঘুরিতেছেন আর তাঁহাদের মাঝে মাঝে রমণীগণ ঈষৎ অবগুণ্ঠনে করতালি দিয়া মধুর ভঙ্গিতে ঘুরিতেছেন। সে যাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গে যে তাঁহাদের প্রীতি তাহা আরও একদিন দেখিলাম।

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে শুক্লা সপ্তমীতে এখানে শ্রীশ্রীসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ দাস বাবাজীর তিরোভাব উপলক্ষে একটিমহোৎসব হয়, এই মহোৎসবে ব্রজের নানা স্থান হইতে অনেক বৈষ্ণব আগমন করেন। বাবাজী মহারাজ লালাবাবুর পরম গুরু। বহুকাল ধরিয়া শ্রীবিমলকুণ্ডের তীরে ভজন করিয়াছিলেন—লালাবাবু ছয়মাস তাঁহার কুটীরে বাস করেন। এখানে ৩দিন ৩জায়গায় তাঁহার উৎসব হয়; ১মদিন তাঁহার ভজন কুটীরে, ২য় দিন শ্রীবৃন্দাদেবী গোবিন্দজীউর মন্দিরে, ৩য় দিন শ্রীগোপীনাথের বাড়ীতে। ২য় দিনে মহাসমারোহে নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। শ্রীবিমলকুণ্ডের তীর হইতে নগরকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া সমস্ত নগরটী পরিক্রমা দেওয়া হয়। আমি এবারকার শ্রীসংকীর্ত্তনোৎসব দর্শন করিলাম। যখন শ্রীসংকীর্ত্তনের দল নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সকল বৈষ্ণবেরই উন্মত্তভাব—সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন—মণিপুরবাসী কতিপয় বৈষ্ণব এই সঙ্গে ছিলেন তঁহাহাদের মধ্যে একজন অতি অপূর্ব্ব মৃদঙ্গ বাজাইলেন। বৈকাল পাঁচটার সময় দল নগরীর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ দীগদরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অট্টালিকার বারণ্ডার উপর ও ছাদের উপর রমণীগণ সুচিত্র বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া সারি সারি দাঁড়াইলেন। রমণীগণ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, অধরে মৃদুমন্দ হাস্যচ্ছটা, সকলে অনিমিষনেত্রে পরম ঔৎসুক্যের সহিত দিক আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর করজোড়ে হেটমুণ্ডে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই সময় সকল বৈষ্ণবের মুখে কেবল এই ধ্বনি যথা—

গৌর হে ওহে গৌর।

তখন মুসলমান সকলে ভুলিয়াছেন, সকলেরই মুখে কেবল ঐ ধ্বনি "গৌর হে ওহে গৌর" মধ্যে মধ্যে কেহ কেহবা বলিতেছেন "ওহে আমার প্রাণ গৌর" এই ধ্বনি পরিশেষে বালক বালিকা নর নারী সকলেরই মুখে। অনন্তর রাস্তায় রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে এত লোক চলিল যে ভিঁড় দেখিয়া অবশেষে পুলিষ আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাঠক, এখন ভাবুন ইহা কতদূর আশ্চর্য্যের বিষয়। কাম্যবন পৌরণিক প্রথানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলেও বহুকাল হইতে ঐ নগরী রাজপুতনারই অন্তর্গত ও তথাকার হিন্দুরাজগণের রাজ্যভুক্ত অদ্যাপিও কাম্যবন ইংরাজসাশনের বহির্ভূত—ভরতপুরাধিপতির শাসনাধীন। এমন স্থলে ২১১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কাম্যবনবাসীগণ কর্ত্তৃক শ্রীনিতাইগৌর পরম প্রীতি, অকপট ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সেবিত, পূজিত এবং উপাসিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? গৌড়-দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, বিনা ঐশ্বর্য্যে কত কত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণের অত্যন্ত দুর্লভ যে 'প্রেমভক্তি' যাহা কোন যুগে কোন অবতারে কেহ কাহাকেও প্রদান করেন নাই, আমাদের দয়ার সাগর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের প্রতি অসীম দয়া করিয়া সেই প্রেমভক্তি অকাতরে আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছেন।

পাঠক বলুন দেখি—শ্রীগৌরাঙ্গের এতাধিক মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও গৌড় দেশের নগরের কথা দূরে থাকুক কোন গ্রামে প্রীতি ভক্তি তো দূরের কথা সামান্য বিশ্বাসের সহিত অদ্যাবধি সমগ্র গ্রামবাসীকে এক মতাবলম্বী হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিতে দেখিয়াছেন কি?

আর দেখুন, প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন হিন্দুমহারাজগণের রাজত্বকাল হইতে বিদ্বজ্জন সমাকীর্ণ এই কাম্যবনে যে আমাদের ঘরের ঠাকুর, ভক্তাবতার ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ সর্ব্ব সাধারণের নিকট স্বয়ং ভগবান বলিয়া পরম ভক্তির সহিত পূজিত, অকপট প্রেমের সহিত আদৃত এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উপাসিত হইয়া আসিয়াছেন এবং হইতেছেন ইহা কি অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?

শ্রীবৃন্দাদেবী ও শ্রীচরণ পাহাড়ী প্রভৃতির বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী শ্রীআশুতোষ বসু দাস।

মোং কাম্যবন—পোঃ ভরতপুর রাজ্য।

চরণ সুধা।

নব বরষের, মধুর উষায়, শ্যামল তটিনী তীরে।
কি এক ভাবনা, হৃদয়ে জড়ায়ে, গিয়েছিনু ধীরে ধীরে॥
প্রভাতের পাখী, মধুর ডাকিল, মধুর বহিল বায়।
কল কল নাদে, মৃদুল তরঙ্গ, মধুর বহিয়া যায়॥
পূরব গগনে, কনক কিরণে, হাসিল উষার জ্যোতি।
হৃদয় মাঝারে, সহসা জাগিল, কি এক মধুর ভাঁতি॥
মধু-রসালসে, বসিয়া পড়িনু, নবীন তরুর ছায়।
নয়ন মুদিয়া, হেরিনু ভিতরে, এসেছে গৌরাঙ্গ রায়॥
কিবা রসময়, বঁধুয়া আমার, সময় নাহিক মানে।
সহসা আসিয়া, ঘাটে পথে মোর, পরাণ ধরিয়া টানে॥
আকুল পরাণে, ডাকি বন্ধুয়ারে, সাড়া নাহি পাই তার।
খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে, বেড়াই যখন, দেখাটি পাওয়াও ভার॥
সে দিন উষায়, তারে কি ডেকেছি, গেনুকি খুঁজিতে তারে?
তবুত বন্ধুয়া, সহসা আসিয়া, দেখা দিয়া গেল মোরে॥
এমনি করিয়া, বঁধুয়া আমার, ছড়ায় ব্রজের মধু।
অযাচিত ভাবে, যাচিয়ে যাচিয়ে, দিয়ে যায় দেখা বঁধু॥
আমার বঁধুর, দেখা যদি পাও, পড়িবে বিষম ফেরে।
ভবের বৈভবে, মন নাহি রবে, লইবে পরাণ কেড়ে॥
কাম ক্রোধ লোভ, বৈর নির্য্যাতন, পালাবে হৃদয় ছাড়ি।
দিন রাত সুধু, প্রেমেতে মাতিবে, বেড়াবে জগত ঘুরি॥
প্রভুত্ব যাইয়া, দাসত্ব আসিবে, সেবায় রহিবে ভোর।
সেবারাম কহে, চরণ সুধায়, গলিবে মায়ার ডোর॥

সেবকাধম সেবারাম—রসিকমোহন

—*:*:*—

গুরু ও শিষ্য।

জব্বলপুরের বাজারে বাজপেয়ী উপাধিধারী একটি খোট্টা ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইনি ধনে-মানে, স্বভাব-প্রকৃতিতে একরূপ এখানে খ্যাত্যাপন্ন, অর্থাৎ সদরে প্রায় সকল লোকেই ইহাঁকে জানে। ইহাঁর সম্পর্কীয় খুড়া একটি ব্রাহ্মণ ইহাঁর আশ্রয়ে বাস করিতেন। ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী। সর্ব্বদা

দেবসেবা ও সাধন-ভজন লইয়া থাকিতেন। গত অগ্রহায়ণ মাসে সেই ব্রহ্মচারী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার প্রাপ্তিকালে একটি অদ্ভুত ঘটনা হয় তাহাই আজ পাঠক পাঠিকাদিগকে বিদিত করিব।

ব্রহ্মচারীর গুরুপাট শ্রীধাম কাশী। ইনি মরিবার কিছু কাল অগ্রে পীড়িত হন ও সেই অবস্থায় গুরুদেবের নিকট পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া তাঁহার নিকট অন্তিমকালের বিদায় প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তাহার উত্তরে লেখেন, বৎস! তুমি ভীত হইও না। তোমার আগে আমি যাইব, তুমি আমার পশ্চাৎ আসিবে। এই পত্র লেখার পাঁচ দিন পরে, অর্থাৎ ৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার একাদশীর দিনে, রাত্রি চারিটার সময় গুরুদেব সিদ্ধি প্রাপ্তি হন, দ্বাদশীর দিন বেলা আট টার সময় শিষ্য দেহত্যাগ করেন। সেই সময়েই কাশীধাম হইতে গুরুদেবের সিদ্ধি-প্রাপ্তি সংবাদ আইল। এই ঘটনায় সদরের সমস্ত লোক যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বহু ধুমধামের সহিত ব্রহ্মচারীকে নর্ম্মদা নদীতে লইয়া গিয়া তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন। বাজপেয়ী বাবুও ব্রহ্মচারীর প্রীত্যর্থে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। আজকালকার দিনে গুরু শিষ্যে এরূপ অনুরাগ দেখা যায় না, এবং ব্রহ্মচারীর গুরু প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ তাহার আর সন্দেহ নাই। নচেৎ তিনি কিরূপে পূর্ব্ব হইতে আপনার মৃত্যুর বিষয় অবগত হইলেন।

—০:*:০—

শ্রী—

—০:*:০—

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি।

কি করিব কোথা যাবো কি কর্ত্তব্য মোর।
না জানিয়া বসে আছি চাই মুখ তোর ॥
এক বছর গেল পহুঁ আর বছর এলো।
আশা পথ চেয়ে চেয়ে আঁখি আন্ধা হলো ॥
নব অনুরাগ কালে পানু কিছু সুখ।
সে সব স্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক ॥
এই ত ফাগুনে তোমা সনে পরিচয়।
ভুলিলাম দেহ গেহ তোমার চিন্তায় ॥
চূরণী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে।
সুশোভিত সেই বৃক্ষ রাঙ্গা রাঙ্গা ফুলে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু মনে নাহি হয়।
সেই হতে প্রাণ পহুঁ দিনু তোমা পায় ॥
পানু নব জন্ম, দেখি সব সুখময়।
রসেতে পূরিল চির নীরস হৃদয় ॥
একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোশর।
রসে ডগ মগ তনু আনন্দে বিভোর ॥
হিয়া আশাশূন্য ছিল ভুবন আন্ধার।
পহিলা জানিনু তুমি আছহ আমার ॥
তোমা কথা শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া।
সুখের তরঙ্গে চলি ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ।
আমারে না নিয়া গেলে করি তোমা সাথ ॥
তোমার বিহনে কাল কাটাইতে নারি।
শেষকালে দুঃখ কেন দেহ গৌরহরি ?
কেবা সে সুখ-মালঞ্চ ভাঙ্গিল আমার।
আর কি সে দিন হবে সুখের পাথার ?
নৃত্য গীত কি উৎসব ভাল নাহি লাগে।
শুধু ইচ্ছা করে কেবল কান্দি তোমা আগে ॥

তুমি নাহি প্রাণনাথ কাঁদি কার কাছে।
মরমী সঙ্গিনী এক নাহি জগমাঝে॥
সঙ্গিনী পাইতাম যদি কথার ব্যথিত।
গলা ধরে কাঁদি জুড়াতাম তপ্ত চিত॥
তোমারে ভকতগণে রেখেছে ধরিয়া।
আমি দূর হতে দেখি চাহিয়া চাহিয়া॥
ভুবন-পাবন ভক্ত ঘেরিয়া তোমারে।
কেমনে বলাই যাবে তাহার মাঝারে॥

—*:*:*—

পদকল্পতরু।

* ইহার পরে গীতভেদ কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ ভেদে গীত দুই প্রকার। আ-তা-না-রি প্রভৃতির আলাপ এবং সা, রি, গ, ম, প, ধ নি প্রভৃতির আলাপকে অনিবদ্ধ গীত কহে। কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত অবয়ব বিশিষ্ট গীতকে নিবদ্ধ কহে। সেই নিবদ্ধ আবার শুদ্ধা, ছায়ানগ ও ক্ষুদ্রা এই তিন নামে অভিহিত। কেহ কেহ বা শুদ্ধ, শালগ ও সঙ্কীর্ণ এবং মতান্তরে ইহাকেই প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক কহে। শুদ্ধ গীতকে প্রবন্ধ কহে, শুদ্ধ গীতে চারিটী ধাতু ও ছয়টী অঙ্গ থাকে। তিন ধাতু ও পঞ্চ অঙ্গবিশিষ্ট গানকে বস্তু বলে, এবং দুই ধাতু ও দুই অঙ্গবিশিষ্ট গানকে রূপক কহে।

ধাতু কি ইহা অনেকেরই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাই আমরা শাস্ত্রবাক্য এবং উদাহরণ সহ এই স্থানে ধাতুর বিষয় প্রকাশ করিতেছি—

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্দ্ধা প্রকীর্ত্তিতঃ।
উদ্‌গ্রাহকো মেলাপকো ধ্রুবাভোগ ইতিক্রমাৎ॥

প্রবন্ধ অর্থাৎ নিবদ্ধগীতের অবয়বকে ধাতু বলে, সেই ধাতু উদ্‌গ্রাহ, মেলাপ, ধ্রুব এবং আভোগ ভেদে চতুর্ব্বিধ।

উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমোভাগ স্ততোমেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবস্তাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগ স্তিমোমতঃ॥

গানের প্রথমভাগ উদ্‌গ্রাহ, দ্বিতীয় মেলাপক, তৃতীয় ধ্রুব এবং শেষ ভাগকে আভোগ কহে।

মতান্তরে প্রথম ভাগকে উদ্‌গ্রাহ, মধ্যভাগকে ধ্রুব এবং অন্তিম ভাগকে আভোগ কহে।

উদাহরণ—

নিরমল গোরাতনু, কষিত কাঞ্চন জনু, হেরইতে পড়ি গেলুঁ ভোর

ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন, অন্তর কাঁপয়ে মোর॥

পূর্ব্বরাগের এই প্রথম পদটীর এই অংশটুকু উদ্‌গ্রাহ বুঝিতে হইবে।

সজনি যব হাম পেখলুঁ গোরা।

আকুল দিগ, বিদিগ না পাওই, মদন লালসে মন ভোরা॥ ধ্রু

পদের এই অংশটীকে ধ্রুব বলে এবং ইহার শেষ চরণটী অর্থাৎ—

মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ জানসি যদি মঝু লাগি করবি উপায়।

বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন সুন্দরি, গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

এই অংশকে আভোগ বলে। পদকল্পতরুস্থিত পদের যে স্থলে "

এই চিহ্ন আছে সেই অংশটী ধ্রুবপদ বুঝিতে হইবে।

"ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবোমধ্যঃ" এই বচনানুসারে ধ্রুব পদকে নিত্যপদ বলা যায়। যে হেতু এই অংশের সহিত গানের সকল অংশেরই মিল থাকে এবং সকল অংশের সহিতই গীত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গানে যাহাকে ধুয়া বা ধোয়া বলে, শাস্ত্রে তাহাকেই ধ্রুব বলে। আভোগের পূর্ব্বে ধ্রুবের পরে যদি আরও কোন অংশ থাকে, তবে তাহাকে অন্তরা বলা যায়।

ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ।

অর্থাৎ ধ্রুব ও আভোগের মধ্যস্থিত ধাতুকে অন্তরা বলে। যেমন আমাদের উদাহৃত নিরমল ইত্যাদি গানটীর ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে।

অরুণিত নয়নে, তেরছ অবলোকনে,

বরিখে কুসুম শর সাথে।

জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাঅলুঁ,

ডুবলুঁ গঙ্গা অগাধে॥

এই অংশটীকে অন্তরা বলে। মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ এই গুলিকেই নিবদ্ধ গীতের ধাতু বলে। এই বিশুদ্ধ গীতের ছয়টী অঙ্গ সঙ্গীত-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সেই অঙ্গ ছয়টীর নাম যথা—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ ও তাল।

সা, রি, গ, ম প্রভৃতিকে স্বর, গুণ বর্ণনাদিকে বিরুদ, নামাদিবাচক

কবিন্যাসকে পদ, তা না নানা প্রভৃতিকে তেনক, ধা ধাগিন্‌ ধেনাং প্রভৃতি বাদ্যোদ্ভব অক্ষরকে পাঠ এবং যতি, একতালী আদিকে তাল বলে।

যে প্রবন্ধগীতে ছয়টী অঙ্গই বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে মেদিনী, পাঁচ অঙ্গ থাকিলে নন্দিনী, চারি অঙ্গ থাকিলে দীপনী, তিন অঙ্গ থাকিলে পাবনী এবং দুই অঙ্গ থাকিলে তাহাকে তারাবলী কহে। কোন গীতে এক অঙ্গ থাকিলে তাহাকে গীত বলা যায় না। এই রূপ প্রবন্ধ গীতের অসংখ্য-ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ গণই স্বীকার করিয়াছেন।

ন রাগাণাং ন তালানাং ন বদ্যানাং বিশেষতঃ।
নাপি প্রবন্ধ গীতানামন্তো জগতি বিদ্যতে॥

যাহা হউক এই গীত আবার তালের সহিত যুক্ত না হইলে বিশুদ্ধ হয় না, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ বলেন যে, যেমন কর্ণধার বিনা নৌকা সুন্দর রূপে চলেনা, তেমনি তাল ব্যতীত গীতও বিশুদ্ধ হয় না। ইহার প্রমাণ যথা—

বিনা তালেন গীতাদে গীত শুদ্ধি র্ন যায়তে।
কর্ণধারং বিনা নাব ইবাতস্তান্ প্রচক্ষহে॥

তাল শব্দের অর্থ কি এ কথা সকলেরই জানিতে বাসনা হইতে পারে, তাই শাস্ত্র বচন দ্বারা সেই অর্থ দেখান যাইতেছে

তালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যত্তত্তালো নিগদ্যতে।

গীত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকেই তাল বলে, ইহার টীকাকার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি। তল প্রতিষ্ঠায়াং ধাতুঃ।

এই তাল-শব্দের অর্থ নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। কেহ বলেন ত কার শিব এবং ল কার গিরিজা, এই শিব-শক্তিই তাল নামে কথিত। কেহ বলেন তকার শরজন্মা (কার্ত্তিক), আকার বিষ্ণু, এবং লকার পবন, এই দেবগণ মিলিয়াই তাল শব্দ হইয়াছে, ইত্যাদি যিনি যাহা বলুন সকলের কথাই সমীচীন, কিন্তু বাচস্পতি বলেন—

হস্তাঙ্গুলি প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়া হি যা।
তয়া কালস্য মানং যৎ স তাল ইতি কথ্যতে॥

হস্তাঙ্গুলির প্রসারণ ও আকুঞ্চন আদি ক্রিয়া দ্বারা যে কালের পরিমাণ তাহাই তাল বলিয়া কথিত।

এই তালের সংখ্যা চঞ্চৎপুট, চাচপুট, চর্চ্চরী, সিংহনীল ও কন্দর্প প্রভৃতি ভেদে শতাধিক একশত।

সেই তালের পাঁচটী অঙ্ক যথা—অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু এবং প্লুত।

এক মাত্রাকে লঘু, দুই মাত্রাকে গুরু, তিন মাত্রাকে প্লুত, অর্দ্ধমাত্রাকে দ্রুত এবং সিকি মাত্রাকে অনুদ্রুত কহে। এই প্রকার নানাবিধ ভেদ থাকিলেও বিস্তারভয়ে সে সকল পরিত্যক্ত হইল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে সঙ্গীত বলে, তন্মধ্যে গীতের বিষয় যথাশাস্ত্র বর্ণিত হইল। ইহার পরে বাদ্যের বিষয় বলা যাইতেছে।

বাদ্য প্রকরণ—তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন ভেদে বাদ্য চারি প্রকার। সঙ্গীত দামোদর-গ্রন্থকার বলেন

তততং তন্ত্রীগতং বাদ্যং বংশাদ্যং শুষিরং তথা

চর্ম্মাবনদ্ধ মানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতম্।

বীণা প্রভৃতি তন্ত্রোদ্ভব বাদ্যকে তত; বংশাদি বাদ্যকে শুষির, চর্ম্মাবৃত মৃদঙ্গাদিকে আনদ্ধ এবং কাংস্য করতালাদিকে ঘন বলে।

তন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্রের নামাবলী যথা দামোদরে—অলাবণী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘুকিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্ম্মী, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশরী, শততন্ত্রী, নকুলৌষ্ঠী, কংশরী, ঔডুম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, পুষ্কল, গদাবারণহস্ত রুদ্র বীণা, স্বরমণ্ডল, কপিলাস, মধুস্যন্দী এবং ঘোণা। এই গুলি বীণা বিশেষের নাম বুঝিতে হইবে। পারিজাতকের রাসপ্রকরণে এই সকলের মধ্যে কোন কোন বীণার নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

আনদ্ধ—মর্দ্দল, মুরজ, ঢক্কা, পটহ এবং পণব প্রভৃতিকে আনদ্ধ কহে, তন্মধ্যে মর্দ্দলই শ্রেষ্ঠ। মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত মর্দ্দলকে মৃদঙ্গ বলে, এই মৃদঙ্গই সঙ্কীর্ত্তনে খোল নামে অভিহিত।

শুষির—বংশী, পাবা, মাধুরা, তিত্তিরী ও শঙ্খাদি ভেদে শুষিরবাদ্য বহুবিধ। তন্মধ্যে বংশীই প্রধান। বেণু, খদির ও রক্তচন্দন কাষ্ঠে বংশী নির্ম্মিত হয়। বেণু অর্থাৎ বাঁশ বৃক্ষ হইতে যে বংশী জন্মে তাহাকেই সাধারণতঃ বংশী বলে। ইহার পরিমাণ ভেদে আবার নামভেদ হইয়া থাকে। দশ অঙ্গুলি পরিমিত বংশীকে মহানন্দা, একাদশাঙ্গুলী পরিমিত বংশীকে নন্দা, দ্বাদশাঙ্গুলিকে বিজয়, চতুর্দ্দশাঙ্গুলিকে জয় বলে।

ঘন—করতাল, ঘণ্টা প্রভৃতিকে ঘন বাদ্য বলে। এই ঘন বাদ্যের সংখ্যা বাইশ। শাস্ত্রে এই রূপ আছে।

করতালঃ কংস্যবলো জয় ঘণ্টাথ শুক্তিকঃ।
কম্পকা ঘটবাদ্যঞ্চ ঘণ্টাতোদ্যঞ্চ ঝর্ঝরম্॥
ঝল্লাতালশ্চ মঞ্জীরঃ কর্ত্তুর্ঝঝুর এব চ।
দ্বাদশৈতে মুনীন্দ্রেণ কথিতা ঘন সংজ্ঞকাঃ॥

এই চতুর্ব্বিধ বাদ্যের অধিকার ভেদ এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—তত বাদ্য দেবতাদিগের, শুষির বাদ্য গন্ধর্ব্বগণের, আনদ্ধ রাক্ষসবৃন্দের এবং মানব-মণ্ডলীর বাদ্য ঘন অর্থাৎ করতালাদি।

নৃত্য—নাট্য, নৃত্ত এবং নৃত্য ভেদে নিত্য তিন প্রকার। অঙ্গের অভিনয়কে নাট্য কহে। দেশ রীত্যনুসারে তালকে আশ্রয় করিয়া বিলাসের সহিত অঙ্গের বিক্ষেপকে নৃত্য বলে। অন্য প্রকার অভিনয় বর্জ্জিত হইয়া কেবল মাত্র গাত্রবিক্ষেপকে নৃত্ত কহে। এই নৃত্য পুনর্ব্বার দেশী ও মার্গ ভেদে দুই দুই প্রক'র, সুতরাং নৃত্য ছয় প্রকার। যে নৃত্য শম্ভুর নিকট হইতে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেন এবং ভরতমুনি কর্তৃক প্রচারিত হয়, তাহাকে মার্গনৃত্য বলে, এবং দেশে দেশে রাজাদিগের আহ্লাদকর যে নৃত্য, তাহাকে দেশী কহে। সেই মার্গনাট্য নাটক, প্রকরণ ভাণ প্রভৃতি ভেদে বিংশতি প্রকার। কেহ কেহ বলেন উহা দশ প্রকার। যাহাহউক পূর্ব্বে যে নৃত্য, নৃত্য, এইরূপ দুইবার বলা হইয়াছে; তাহার অর্থ তাণ্ডব ও লাস্য বুঝিতে হইবে। পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইয়া যে নৃত্য হয়, তাহাকে লাস্য বা তাণ্ডবলাস্য বলে।

নারদ সংহিতায় লিখিত আছে—

পুং নৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রী নৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।

অর্থাৎ পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রী নৃত্যকে লাস্য কহে। তাণ্ডব-নৃত্য প্রেরণী ও বহুরূপ ভেদে দুই প্রকার।

অঙ্গবিক্ষেপের বহুলতা এবং অন্য অভিনয়-শূন্যতাকে প্রেরণী বলে। বাক্যগত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাণ্ডবকে বহুরূপ কহে। লাস্যও আবার স্ফুরিত ও যৌবত ভেদে দুই প্রকার। নায়ক নায়িকা উভয়ে মিলিত হইয়া নানাবিধ আদিরস জনিত চেষ্টার সহিত আলিঙ্গন ও চুম্বন পূর্ব্বক নৃত্যকে স্ফুরিত এবং অত্যন্ত মধুর ও লীলাযুক্ত নৃত্যকী কর্তৃক নৃত্যকে যৌবত কহে।

নৃত্ত—এই নৃত্য তিন প্রকার যথা—বিষম, বিকট ও লঘু। রজ্জুর উপরে

ভ্রমণ পূর্ব্বক নৃত্যকে বিষম নৃত্য, বেশ ও অবয়বের বৈরূপ্য সম্পাদন পূর্ব্বক নৃত্যকে বিকট এবং ভাণিকা-উক্ত নৃত্য বিশেষকে লঘু নৃত্য কহে। সাধারণ নৃত্যের বিষয় শাস্ত্রে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাই লিখিত হইল। এক্ষণে অঙ্গাভিনয় পূর্ব্বক নৃত্যের ভেদ বলা যাইতেছে—

তত্রাঙ্গানামুপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং নিরূপণম্।

যথামতীহ ক্রিয়তে শার্ঙ্গদেবাদি সম্মতম্॥

শার্ঙ্গদেব সম্মত অঙ্গাভিনয়, উপাঙ্গাভিনয় এবং প্রত্যঙ্গাভিনয় যথামতি বর্ণিত হইতেছে—

"সপ্তাঙ্গানি শিরোংসোরঃ পার্শ্ব হস্তকটী" পদম্। শিরঃ, স্কন্ধ, বক্ষঃ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি ও পদ এই সাত স্থানের অভিনয়কে অঙ্গাভিনয় কহে। গ্রীবা বাহু, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা, জানু এবং ভূষণ এই নয় স্থানের অভিনয়কে প্রত্যঙ্গাভিনয় কহে। মস্তক, দৃক্, তারা, ভ্রূকুটী, মুখ, নাসা, নিশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ডস্থল, দন্ত এবং অধর এই দ্বাদশ স্থানের অভিনয়কে উপাঙ্গাভিনয় বলে। কেহ কেহ বলেন অঙ্গ ছয়টী, প্রত্যঙ্গ দশটী এবং উপাঙ্গ তেইশটী। যাহাহউক নৃত্য-শাস্ত্র অপার সমুদ্র, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন কোন স্থানের নৃত্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

ধুত, বিধুত, আধুত, অবধুত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ এবং লোলিত এই চতুর্দ্দশ প্রকার শিরোনৃত্য। অংস অর্থাৎ স্কন্ধনৃত্য পাঁচ প্রকার, যথা—একোচ্চ, লগ্নকর্ণ, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত ও লোলিত। বক্ষোনৃত্য—সম, আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, কম্পিত ও উদ্বাহিত ভেদে পাঁচ প্রকার। পার্শ্ব-নৃত্যও পাঁচপ্রকার যথা—বিবর্ত্তিত, অপসৃত, প্রসারিত, নত এবং উন্নত। হস্তাভিনয় তিন প্রকার যথা— "অসংযুতা সংযুতাশ্চ নৃত্যহস্তা ইতি ত্রিধা।" অর্থাৎ অসংযুতা, সংযুতা ও নৃত্যহস্তা, ইহাকে হস্তকনৃত্যও বলে। এক হস্তে নৃত্যক্রিয়াকে অসংযুতহস্তক, দুই হস্তে নৃত্যকে সংযুতহস্তক এবং দুই হস্তই স্থির-ভাবে রাখিয়া কেবল মাত্র হাব প্রকাশ করাকে নৃত্য-হস্ত কহে। সেই হস্তের আবার তিন প্রকার সঞ্চার। যথা—উত্তান, পার্শ্বগ এবং অধোমুখ। পূর্ব্বে যে অসংযুতহস্তক-নৃত্য বলা হইয়াছে, তাহার চব্বিশ-প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ বা আরও চারিটী অধিক কহি-

যাছেন। সংগীত দামোদরে অসংযুতহস্তক-নৃত্য ত্রিংশৎপ্রকার কথিত হইয়াছে। সেই অসংযুতহস্তক নৃত্যের নাম যথা—

পতাক স্ত্রিপতাকো হর্দ্ধচন্দ্রাখ্যঃ কর্ত্তরী মুখঃ

অরালমুষ্টিঃ শিখর কপিথ খটকা মুখাঃ ॥

শুকতুণ্ড কাঙ্গুলশ্চ পদ্মকোষোহথ পল্লবঃ।

সূচীমুখঃ সর্পশির শ্চতুরো মৃগশীর্ষকঃ।

হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ ভ্রমরো মুকুল স্তথা।

ঊর্ণনাভশ্চ সংদংশ স্তাম্রচূড়োহপরকবিঃ ॥

কোন মতে এই চব্বিশ প্রকার হস্তক এবং অন্যমতে আরও চারি প্রকার দৃষ্ট হয়। যথা—

উপধানঃ সিংহ মুখঃ কদম্বশ্চ নিকুঞ্জকঃ।

এই যে অষ্টাবিংশতি প্রকার হস্তকনৃত্যের কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে দুই একটীর কথা এখানে বিশেষ রূপে বলা যাইতেছে—

অঙ্গুষ্ঠো যস্য বক্রঃসন্ তর্জ্জনীমূলসংশ্রিতঃ।

ঋজবোহঙ্গুলয়ঃ শ্লিষ্টাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ ॥

অঙ্গুষ্ঠ বক্র করিয়া তর্জ্জনী-অঙ্গুলির মূলে বিন্যাস পূর্ব্বক অন্য অঙ্গুলিগুলি সরলভাবে রাখিলে, তাহাকে পতাক-অসংযুতহস্তক কহে। এই পতাক-হস্তক-নৃত্য কালে উহা বক্ষঃস্থলে উদর প্রভৃতিতে স্পর্শ করিবার বিধি আছে। এই প্রকার সর্পশিরঃ, শুকতুণ্ড ও হংসাস্য প্রভৃতি তদাকার হস্তভঙ্গী দ্বারা নৃত্য বুঝিতে হইবে। সংযুতহস্তক-নৃত্যের অঞ্জলি, কপোত ও কর্কট প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ আছে।

পতাকহস্তৌ তলয়োঃ সংশ্লিষ্ট শ্চেত্তদঞ্জলিঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পতাক-হস্তকের মত দুইহস্ত একত্র করিলেই অঞ্জলি হইল, দেবতাদিকে নমস্কার কালে যে রূপ হস্তভঙ্গী করিবার বিধি আছে, তাহাকেই অঞ্জলি বলে।

হস্তকে নৃত্যের উপযোগী করাকেই নৃত্যহস্ত কহে, চতুরস্র উদ্বৃত্ত প্রভৃতি তাহারও ত্রিশ প্রকার ভেদ আছে, মতান্তরে বত্রিশ প্রকার।

কটি নৃত্য পাঁচ প্রকার—কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত্ত ও রেচিত।

পদ নৃত্য—সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, প্রভৃতি পদ নৃত্য ত্রয়োদশ প্রকার। স্বভাবতঃ পদস্থাপন পূর্ব্বক নৃত্যকে সম বলে।

সাধু গৌরদাস।

জেলা ময়মনসিংহ সহর সেরপুরের সন্নিকটে লছমপুর গ্রামে সূত্র-কুলোৎপন্ন গৌরদাস নামে এক বালক ছিল। সে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ত্রিসন্ধ্যা শ্রীতুলসী সমীপে নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকিত, এবং হরি হরি ধ্বনি পূর্ব্বক নৃত্য করিত। তদ্দর্শনে লোকে অনুমান করিত ইহা বৃদ্ধ জনের অনুকরণ মাত্র, ফলত এই সদ্ভাব তাহার স্বভাবসিদ্ধ।

এক দিন সায়ংকালে সেই ভক্তবালক ঐকান্তিক চিত্তে "গৌর আয় আয়" বলিয়া গান করিতে করিতে হঠাৎ তুলসী দেবীকে স্বর্ণবর্ণা দেখিল, দেখিয়া মনে ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! সোনার তুলসীগাছ কোথা হইতে আসিল? এই বলিতে না বলিতেই দেখিল তুলসীর নিম্নভাগে সবংশীবদন গৌর-গোবিন্দ-মূর্ত্তি, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমরূপ ও স্মেরাস্য, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ জ্যোৎস্না ধক্‌ধক্ রূপে বহির্গত হইয়া বেদীসহ তুলসীকে আলোকিত করিতেছে। তন্নিবন্ধন বৃন্দাদেবী স্বর্ণপ্রতিমা সদৃশী লক্ষিতা হইয়েছেন। দেখিতে দেখিতে সেই প্রেমামৃত-সিন্ধুর জোয়ার ছুটিয়া বালকের হৃদয়-সরোবর পূরিয়া গেল। বালক অভূতপূর্ব্ব প্রেমমাখা কৌতূহল-রসে পুলকিত হইয়া সেই মদন-মনোমোহিনী শ্রীমূর্ত্তিকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে ধাবিত হইল। মহা কৌতুকী গোরাচাঁদ ক্ষণ-প্রভার ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। বালক অন্ধকারময় দেখিয়া, হায়! হায়! কোথায় সে হিরণ্ময় নবচন্দ্রমা, হায়! হায়! কোথায় সে নিখিল জগতের প্রীতির বস্তু, হায়! হায়! কোথায় সে মহা মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি! এই বলিতে বলিতে ভক্তজগতের শীর্ষস্থানীয় প্রেমাসবে বিহ্বল হইয়া প্রলাপোচ্চার করিতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-মধুরিমা-পানে যে, তাহার তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে তদীয় বন্ধুগণ সংপূর্ণ অপরিজ্ঞাত বলিয়া তাহাকে বায়ু রোগের চিকিৎসা করিয়াছিল।

অহো! গৌরমাধুর্য্য-সুধাকরের আলোক যাহার চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সেই মাত্র তচ্চিন্ময় সুধার স্বাদ অনুভব করিতে পারে। তাহা দৈবরাজ্যের উচ্চাসনে আসীন, বিদ্বরাজের লেখনী-কল্পবৃক্ষের ফলেও প্রতিফলিত হয় না। শ্রীগৌরগোবিন্দের রূপ-বস্তু-শক্ত্যে ক্রমে কৌমার বৈরাগ্যপ্রাপ্ত বালকের সংসার বিষয়ে নিস্পৃহা, আমিষ দ্রব্য ভোজনে বিমুখতা, গৌরহরি নামে রুচি, শ্রীতুলসীতে ভক্তি, হরিবাসরে নিষ্ঠা, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও সদাচার প্রভৃতি সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর গৌরদাসের বয়স যখন প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ, তৎকালে উক্ত সের-পুরের জমিদার গৌরগতপ্রাণ পরমবৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর মহোদয় "শ্রীশ্রীরাধাপ্যারীমোহন জীউ" শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কার্য্যত, আমি সেই ব্যাপারে উপস্থিত হই। ভাগ্যক্রমে ভক্তবর গৌরদাসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তৎপর পূর্ব্বাঞ্চলে চলিলাম। ভক্তবর বোধহয় জীবসংস্কারের জন্য আমার সঙ্গে চলিলেন। আমি তাঁহাকে কহিলাম, আমার সঙ্গে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, সুদুর্গম পথ বিশেষতঃ বহুল ঝাড় পাড় অতিক্রম করিতে হইবে, সুতরাং এতদ্দ্বারা সাধন ভজনের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। ভক্তবর বলিলেন, আমি ক্ষুদ্র কীট, উন্মত্ত বিশেষ, সাধন ভজনের বিন্দুবিসর্গও জানিনা, কেবল গৌরহরিনাম বড় মিষ্ট লাগে বলিয়া নিরন্তর কহিয়া বেড়াই এবং ঐ নামে অচিন্ত্য একটী শক্তি দেখিতে পাই, নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়, তদ্দ্বারা ক্ষুৎ পিপাসা তাপ কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূত হয় না, এবং স্বর্গীয় সুখ তুচ্ছাতি-তুচ্ছ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অহো! সত্য সত্যই নাম মহাপ্রভুর স্বয়ংরূপ। সাধুর একহস্তে বৃন্দাদেবী সংস্থাপিত মৃণ্ময় পাত্র, অপর হস্তে করোঁয়া, "মুখে একবার গৌরহরি বল, বল, বল এইত পথের সম্বল, শ্রীগৌরগোবিন্দ, বল।" অবচ্ছিন্ন এই পদ মাত্র গান করিতেছেন। আহা সে যে কি অপূর্ব্ব মধুর তাহাবর্ণন করা যায় না। ক্রমে পার্ব্বতীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। সকলেই ভীত, কিন্তু সাধুবর নির্ভীক চিত্তে "গৌরসিংহ গৌরসিংহ" বলিয়া গভীর সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে মনে প্রত্যয় হইল, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ নৃসিংহবেশে অভয় দান করিতেছেন। তৎপর সুসঙ্গে পৌছিলাম।

বর্ষণ করকাদি নানা অলঙ্কার ভূষিতা বর্ষাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার প্রিয়-সহচরী নব যৌবন প্রাপ্তা সোমেশ্বরী নাম্নি স্রোতস্বিনী প্রখরতর স্রোত-স্বিনী ভৈরবীর ন্যায় ধূলীধূসরিত কলেবরা হইয়া পর্ব্বতরাজকে ছিন্নভিন্ন করত তৎপ্রজা বৃক্ষ লতা পাতা জীব জঙ্গম লইয়া বিজুলীর ন্যায় স্বকান্ত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। অহো! ভয়ানক দৃশ্য, আমাদের তরণী টলমলায়মানা, সকলে ভয়েব্যতিব্যস্ত। সর্ব্বভয়বিনির্মুক্ত ভক্তবর, জয় গৌরবিশ্বম্ভর 'জয় গৌর-বিশ্বম্ভর' বলিয়া গভীর হুঙ্কার করত প্রেমবৈচিত্রে বলিলেন, কৃষ্ণদাসি সোমে-শ্বরি! তুমি বুঝি কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছ? দয়াময়ি! দয়া-স্বভাবে ভল্লুক শাবককে বক্ষে লইয়া, বোধহয় ভক্তিযোগ শিখাইতে পাতালপুরে

দ্বিজবর জাম্ববানের সমীপে যাইতেছ ? (প্রকৃতিস্থ হইয়া) হায় হায় ভল্লুক শিশু নদীগর্ভে পতিত হওত হাবু ডুবু খাইয়া মুমূর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ? হা দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্য ! হা পতিতপাবন ! তুমি যা কর, এই বলিয়া গৌরদাস সেই তরঙ্গিত তরঙ্গিণী মাঝে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। প্রকাণ্ড উর্ম্মি দ্বারা ভক্তবর ক্ষণে জলের নিম্নে, ক্ষণে উর্দ্ধভাগে যাইতে লাগিলেন। সেই শোচনীয় ব্যাপারে সকলে হাহাকার করিতে লাগিলাম। তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ চিন্ময়ী কৃপারূপা তরণীতে বুঝি ভক্তকে উঠাইলেন। তাই অগ্রভাগে দেখিলাম ভক্তবর নিরাপদে ঋক্ষ বালককে বক্ষে লইয়া পারে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং গৌরগদাধরের জয় হউক বলিয়া অট্টহাস ভেদ করিতেছেন। অহো সত্য সত্যই জীবোপকারে সাধুদিগের জীবন সংকল্প যথা—

"জীবোপকৃতয়ে সাধোঃ প্রাণ সঙ্কল্পিতঃ স্বতঃ।" ইতি পুরাণ।

পাঠক ! এই ব্যাপারে সন্দিহান হইবেন না। তাঁহার কৃপাবলে দুর্গমা নদী পার অল্প কথা কুক্কুরও সুখে মহাসাগর সন্তরণ করিতে পারে।

যথা, শ্রীগ্রন্থে—

"তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগৎগুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥"

অহো ! সাধুসঙ্গের অচিন্ত্য অপূর্ব্ব প্রভাবে, জন মাত্রের হৃদয়ে বিশুদ্ধ চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। সেই ভল্লুক শিশু শুদ্ধ ভক্তের ন্যায় তুলসী ঘট মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইত, সাধু আজ্ঞায় তুলসী, শ্রীবিগ্রহ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণাদিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিত এবং হরিসংকীর্ত্তনে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিত। সাধু মুখে শুনিয়াছি, অন্তকালে তাহার জিহ্বায় গৌর-গোবিন্দের নাম স্ফুরিত হইয়াছিল। অতএব শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া তাহাকে ভববন্ধন হইতে মোচন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বলেন যথা—

"সৎকৃপাকল্পবল্ল্যাং হরি কৃপা ফল মিত্যুপনিষৎ।"

অর্থাৎ সাধু কৃপারূপ কল্পবৃক্ষে হরিকৃপারূপ ফল ফলিত হয়। যেমন বৃক্ষে ফল স্বভাবতই ফলে, তেমনি সাধু কৃপাতে কৃষ্ণকৃপা অবশ্য হয়।

অনন্তর মহকুমা নেত্রকোণা উপস্থিত হইলাম, সে স্থানে শ্রীসম্প্রদায়ের এক জন বৈষ্ণব বাস করিতেন। ভক্তবর শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থে তাঁহার আশ্রমে গমন করত জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া গভীর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ এক বিষয়ী শূদ্রাধম বিরক্ত হইয়া, অরে ! চিৎকার করিয়া লোককে ত্যক্ত

করিস কেন? ভগবানের নাম মূলমন্ত্রস্বরূপ, তাহা হৃদয় হইতে বাহির করা সঙ্গত নহে। ভক্তবর বলিলেন, মহাশয়! আমি বিজ্ঞমুখে শুনিয়াছি, মন্ত্রের অতীবলঘু উচ্চারণের নাম জপ। "মন্ত্রস্য সুলঘুচ্চারোজপ ইত্যভিধীয়তে।" এবং হরিনাম লীলা গুণাদি উচ্চৈঃস্বরে বলার নাম কীর্ত্তন কহে। যথা—

"নামলীলা গুণাদীনা মুচ্চৈ র্ভাষাতু কীর্ত্তনং"

জপের বহু উপকরণের প্রয়োজন, তাহার একটী জিনিষের অভাব হইলেই জপ নিষ্পন্ন হয় না। কীর্ত্তনের বাধকতাভাব যথা—

"নদেশ নিয়ম স্তত্র ন কাল নিয়ম স্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোস্তি হরের্নামনি লুব্ধক॥"

অর্থাৎ হরিনাম সংকীর্ত্তনে স্থানের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, অপবিত্রাদিতে নিষেধ নাই। অতএব জপ অপেক্ষা কীর্ত্তন কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজ উপায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নাম গুণাদি কীর্ত্তন পূর্ব্বক মৎ স্বরূপ শ্রীবিগ্রহাদি সমীপে বিচরণ করে, আমি তাহার স্থানে বিক্রীত হই। যথা, আদিপুরাণে—

"গীত্বাচ মম নামানি বিচরেন্মমসন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তস্য চার্জ্জুন॥"

মহাশয়! শুনিয়া থাকিবেন, ব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর মননে ও জিহ্বায় দুই লক্ষ, উচ্চৈঃস্বরে এক লক্ষ এই তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। অহো শ্রীচৈতন্যের কৃপায় স্বতঃই ভক্তহৃদয়ে সুসিদ্ধান্ত স্ফুরিত হয়। ভক্তবাক্যে শূদ্রাধম ঈষৎ সংরম্ভে বলিল, অরে গণ্ডমূর্খ! শুকপাখীর মত দুই একটী বচন আওড়াইলেই কেবল হয় না, সারগ্রাহীকে বিজ্ঞ বলে মহাত্মা হরিদাস এক জন ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন, তাই তিনি মায়া-শয্যায় অনন্ত নিদ্রাভিভূত জীবগণকে সুগোপ্য ভগবানের নামরূপী মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধি পান করাইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যদান করিয়াছেন। তুই কি সেই ব্রহ্ম হরিদাস? সাধু বলিলেন, মহাশয়! আমাকে আর অপরাধ-অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিবেন না আপনার সৎপ্রকৃতির পরিচয় পাইলাম।

শূদ্রাধম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া—"অরে নরাধম চণ্ডাল! তোকে সম্পূর্ণ পরিচয় দেই", এই বলিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ উৎপীড়িত সাধুর মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রুধির-স্রোত বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জ্ঞানিগণ হাহাকার করত কহিলেন, হায় হায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, নির্দ্দোষে নিরীহ ব্যক্তির

ভয়ানক দণ্ড। বিচারালয়ে বিজ্ঞাপন করিলে বিশেষ ফল ফলিতে পারে। সাধুবর কহিলেন, এই অসদ্‌যুক্তি, আত্মাভিমানীর অবস্থা এই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। অহো সত্যসত্যই সাধুগণের তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা। তত্রস্থ শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর সেই হৃদয়বিদারক ব্যাপার দর্শনে শূদ্রাধমকে কহিলেন, অরে পাষণ্ড! তোর আর নিস্তার নাই। তুই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্ব অমঙ্গলময় হলাহল গরল পান করিয়াছিস। এই জ্বালায় অনন্তকাল জ্বলিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন—

"আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

ভাবার্থ। সাধকদিগের বিদ্বেষ যে কেবল মৃত্যুমাত্র হেতু তাহা নহে, কিন্তু বহু অনর্থকারী। এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, যে ব্যক্তি সাধুকে উৎপীড়ন করে, তাহার আয়ু, সম্পদ, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গ, আশীর্ব্বাদাদি সর্ব্বমঙ্গল বিনষ্ট হয়। তাহা নির্ম্মৎসরসাধু কর্ত্তৃক হয় না। সাধু-সেবন-বিরাজ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। তৎপর ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, এই ক্ষত পরিতপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে ন্যূনকল্পে একপক্ষে উপশম হওয়া সম্ভব। সাধুবর তাহা অস্বীকার করিয়া গৌরহরি নাম-মহৌষধি শ্রীতুলসীবেদী-মৃত্তিকা অনুপান লেপন পূর্ব্বক একদিনেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন অহো! শ্রীগৌরগণের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। বস্তুতঃ তদ্দর্শনে সকলেই এক বাক্যে গৌরদাসের দৈববল স্বীকার করিয়াছিল। মহৎ অতিক্রমের আশুফল বিপক্ষে সেই শূদ্রাধম খঞ্জ হইয়াছিল। পশ্চাৎ জানিয়াছি সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছে। পাঠক! এখন দেখুন মহদাতিক্রম সর্ব্বশুভ-বিদ্রাবক কি না।

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস-দাসাভাস—শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী। উথলী।

— *:*:* —

নিবেদন।

১

কেন মোরে দিল বিধি রমণী জীবন,
পুরুষ হ'তেম যদি, সেবিতাম নিরবধি,
পরাণ ভরিয়া মোর শ্রীগুরু চরণ।
গুরু পদে হ'য়ে দাস, পুরাতেম যত আশ,
দেখিতাম কোথা মিলে গোপীকা-রমণ।

২

গুরু কৃপা বিনা নাহি মিলে সে রতন,
তাই গো বাসনা মনে, প্রাণ ভ'রে সযতনে,
সে রাতুল পদযুগ করিতে সেবন।
কি কব মরম ব্যথা, সেবন দূরের কথা,
না পাই বাসনা মত হেরিতে চরণ।

৩

সংসার অনলে যবে পুড়ে এ জীবন,
তখন কেবল হায়, মরমে বাসনা যায়,
শ্রীগুরু-চরণ সেবি পেতে শান্তিধন।
গুরু কি অমূল ধন, বুঝে শুধু সেই জন,
গুরু পদে রতি মতি ঢেলেছে যে জন।

৪

যদিও আমার গুরু গোবিন্দ-কিঙ্কর,
যদিও গোবিন্দ পায়, তাঁর চিত সদা ধায়,
তবু আমি জানি তাঁরে তাঁরি রূপান্তর,
* কালিন্দী দাসের প্রায়, কবে তাঁর পদে হায়,
প্রাণের ভকতি সহ ঢালিব অন্তর!

৫

মাঝেতে জাহ্নবী শুধু আছে ব্যবধান,
ও পারেতে গুরু মোর, এ পারেতে আঁখি লোর
ঢালি আমি ল'য়ে নিতি দগধ পরাণ।
এত কাছে তবু হায়, বালা সদা নাহি পায়,
রমণী বলিয়া তাঁর দরশন দান।
(না জানি কতই পাপে মাখা এ পরাণ!)

* পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত পৈপাড়া নিবাসী কালিন্দীদাস একজন শ্রেষ্ঠ গুরু-ভক্ত ছিলেন, গুরু সাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দেহত্যাগ করিয়াও লিঙ্গ শরীরে গুরু সেবা করিয়াছিলেন।

৬

তাই বলি কেন হেন রমণী জীবন,
পুরুষ শরীর হ'য়ে, প্রকৃত প্রকৃতি ল'য়ে,
করিতাম যদি ভবে জনম গ্রহণ,
তবে গো জগতে মোর, রহিত না সুখ ওর,
গুরুমুখে ব্রজলীলা করিয়া শ্রবণ,
(প্রেম সরসীতে চিত হইত মগন !)

৭

গুরু গো ! করুণা তুমি করিও আমায়,-
আমিগো ! দুর্ব্বল অতি, তোমা বিনা নাহি গতি,
সকলি ত জান তুমি কি কব তোমায় !
যেথানে সেথানে রই,- যেন আমি নাহি হই,
ও পূত চরণ ছাড়া রেখ রাঙ্গা পায়।

৮

যদিও অযোগ্য আমি তোমার দয়ার,
তবু গো করুণা করে, দেছ ঠাঁই পদে মোরে,
যেন গো চরণ ছাড়া নাহি হই আর !
যাইবে জলধি পার, প্রাণ করে হাহাকার,
কি জানি চঞ্চল চিতে কি ঘটে আমার।

৯

অথবা,—

মোর সম ক্ষুদ্র তুমি নহ দয়াময়,
কাতর হইয়া প্রাণ, চাহিলে দর্শন দান,
অলক্ষ্যে দর্শন দিবে তবে কেন ভয় !
আমার বাসনা এই, আর কোন সাধ নেই,
ভকতি কুসুমে যেন পূজি পদদ্বয়।

১০

রাখিও আমারে দেব ওই পূতপায়,
এ অবোধ চিত হায়, বিপথেতে যদি ধায়,
কেশে ধরি পদে টেনে নিও করুণায়।

নাহি জানি কোন তত্ত্ব, কেবলি অসারে মত্ত,-
ভরসা পাইব পার তোমারি দয়ায়।

১১

তোমার চরণে দেব! মিনতি আমার,-
ভুলে যেন শত দুখ, আমার আমিত্ব টুক,
দাসীত্বে মিশাতে পারি ইষ্টদেবতার।
গুরু গো করুণা করে, প্রেম ভক্তি দেহ মোরে,
পাই যেন ব্রজে কৃষ্ণ সেবা অধিকার,
বৈষ্ণবজন-সেবিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী। হুগলী।

বৈষ্ণবধর্ম্ম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে মন্ত্রগুরু সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুটি কথা লিখিয়াছিলাম। ভগবান কৃপা করিয়া গুরুরূপে জীবকে শিক্ষা দেন, জীব গুরুপদাশ্রয় করিবামাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার ভাবদেহ প্রাপ্ত হয়। সময় পূর্ণ হইয়া আসিলে ভগবান স্বয়ং আকর্ষণ করেন, কি যেন তড়িৎ বেগে আসিয়া শ্রদ্ধাবেশে হৃদয়ে প্রবেশ করে, সমস্ত মলিনতা কুতর্করূপ আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া পিপাসার উদয় হয়। সমস্ত ধর্ম্মে গুরুকরণ আছে। একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টানের মুখে শুনিয়াছি, তিনি গদ্‌গদ ভাবে বলিলেন, "আমাকে যে দিন প্রভু যীশু কৃপা করিয়াছেন, সেই দিন হইতে অন্ধকারে আলো পাইয়াছি" এইরূপ সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বিদিগের দীক্ষাপ্রণালী আছে।

কেবল মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কোন ফল হয় না, সে মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র নহে, তাহার শক্তি কিছুমাত্র নাই। সে লৌকিক স্বার্থপূর্ণ ব্যাপার। সিদ্ধমন্ত্রের এমনি মাহাত্ম্য যে, জীব তাহা পাইবামাত্র উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। লৌকিক গুরুদেব মন্ত্র দিলেন আর অমনি বৈকুণ্ঠের পথ পরিষ্কার হইল, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। বিনা সাধনে কি বিনা ভগবানের কৃপায় কিছুই হয় না। এ সাধনের ধন, অমূল্য রতন, ভবপারের সম্বল। জীবের ভাগ্যোদয় হইলে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বাজারে পাওয়া যায় না।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয় কায়স্থ ছিলেন, সেবা দ্বারা লোকনাথ গোস্বামী বাধ্য হইয়া মন্ত্র দিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে, লোকনাথ তাঁহার গুরু, তাই কত সাধন করিয়া কত সেবা করিয়া গুরু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান নরোত্তম ঠাকুরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "নরোত্তম, তোমার গুরু লোকনাথ, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিভৃত কুঞ্জে ভজন করিতেছেন" ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দ মুঞি সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে।
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
নিত্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম ভক্তি যাহা হতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

অধিকাংশ লোক মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। বংশপরম্পরা শ্রীপাদ প্রভু-সন্তানগণ এবং গুরুজন মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিতেছেন, যাহারা মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে মহামন্ত্র হৃদয়ে রক্ষা করিলেন, তাঁহাকে একদিন না একদিন শ্রীচৈতন্যের মহিমায় প্রেমসাগরে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ইহাকে "আশাবন্ধ" কহে। যখন মেঘ সরিয়া যায়, তখনি পূর্ণচন্দ্র নয়নপথে পতিত হয়। মেঘে চাঁদ ঢাকিতে পারে না; কেবল চক্ষুর শক্তি আচ্ছাদন করে। শ্রীগুরু কৃপা করিয়া চক্ষু ফুটাইলে, দর্শন হয়। আমরা পশু হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। কি গুণে যে শ্রেষ্ঠ তাহা বিচার করিলে অবশ্য দেখিতে পাইব। শ্রীগুরু মনুষ্য হইলেও তিনি গুরুরূপী শ্রীভগবান্, ইহা একাদশস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রদাতা গুরু যাহার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন সেই প্রকৃত মনুষ্য। আজ একটী প্রেমিক বৈষ্ণবের কথা মনে হইল। ময়মনসিংহ ছত্রপুর গ্রামে ইহার জন্ম। যিনি লক্ষ্মীনাথ যোগী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি স্বচক্ষে এই মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছি। মহাত্মা লক্ষ্মীকান্ত যুগী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভায় বিদ্বান্ হইয়া গণ্যমান্য মোক্তার হইয়াছিলেন। কিশোরদাস বাবাজী যে দিন তাঁহাকে মন্ত্র দিলেন, ঠিক সেই দিন হইতে মল মূত্রের ন্যায়

সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া ভেক পরিচ্ছদ কৌপীন পরিধান করিলেন। বাসগৃহে আখড়া হইল, বিবাহিতা স্ত্রী বৈষ্ণবী হইলেন, একদিনে সমস্ত পরিবর্ত্তন। অসার সংসারে অনিত্য বিষয়ে থাকিয়া লক্ষ্মীকান্ত যে অবস্থায় ছিলেন, আজ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধহয় এই তাঁহার সুখের অবস্থা। কেমন উৎসাহ, কত আনন্দ হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইতেছে; কখন হাসি, কখন ক্রন্দন, কখন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম, নামের হুঙ্কারে নগর কম্পিত। ক্রমে ক্রমে যে যে নরনারী লক্ষ্মীকান্ত বাবাজীর নিকট মন্ত্র লইলেন তাঁহারাও ঐ ভাবে তৎক্ষণাৎ পরিণত হইলেন কি যেন আকর্ষণ; কি আশ্চর্য্য তড়িৎ ক্রিয়া। যেন উগ্রবীর্য্য মদিরায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল, ক্রমে ক্রমে বহু শিষ্য হইল। একদিন ব্রহ্মপুত্র তটে বিদ্যালয়ের চারিশত ছাত্র লইয়া হরিনামের "কাওয়াদ" করাইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া ছিলেন। চারিশত বালকেরা কণ্ঠ স্বীয় কণ্ঠে যোগ করিয়া গগনভেদী স্বরে 'বল জয় জয় গৌরাঙ্গ" "বল হরি, হরিবোল" রবে ব্রহ্মপুত্র নদের তরঙ্গসহ নগর তোলপাড় করিয়াছিলেন, এ দাস সেই চারিশত বালকের মধ্যস্থিত একজন মিষ্টান্ন ভোক্তা।

কত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ অষ্টাঙ্গে বাবাজীকে প্রনাম করিয়াছেন। এই জন্য আমি আমার পিতা ঠাকুরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ঐ যুগীকে (বস্ত্র নির্ম্মাণকারী) ব্রাহ্মণ প্রণাম করে কেন? পিতাঠাকুর মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" আজ ৩০ বৎসর হইল যে নাম শুনিয়াছিলাম, যাঁহাকে একবার দেখিয়া ছিলাম, যাহার শ্রীমুখের কথা, উপদেশ শুনিয়াছিলাম, আজ সেই হাসি হাসি প্রেমমাখা মুখখানি মনে পড়িল, ঘন ঘন ওষ্ঠকম্পিত হইতেছে, কখন উদাস নয়ন, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। বড়ই দয়া, সকলকেই ধরিয়া ধরিয়া কোল দেন। এতদিনে বুঝিলাম বাবাজির ঐ ভাবগুলি কোথা হইতে আসিল, কিসে হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠে দেখিলাম, বাবাজী ঐ ভাবগুলি কোথায় পাইলেন। শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত পাঠ করিয়া বুঝিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তিনিও তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। পরশমণির গুণে সকলেই সোণা হয়, কিন্তু এ পরশমণির গুণ আরো তীব্র। সোণা হয় মণির গুণে, আবার সেই সোণা অন্য ধাতুকেও সোণা করিতে পারে। ধন্য প্রভুর দয়া, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা উপলব্ধি করিলাম। এইরূপ মহামন্ত্র যাহার হৃদয়ে আছে, একদিন না একদিন সেই মন্ত্র

চৈতন্য হইয়া মনুষ্য জন্ম সফল করাইবে, এবং তিনি যাহাকে মন্ত্র দিবেন তিনিও সেই ভাব প্রাপ্ত হইবেন।

মন্ত্রসাধন করিতে হইলে মন্ত্রের দেবতা শ্রীভগবানকে স্মরণ মনন করা উচিত হা গৌরাঙ্গ, হা নিত্যানন্দ ও বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দয়ার ঠাকুর সমস্ত গুলি ভাব স্ফুরণ করিয়া দিবেন। সদাচার, গৌর, দয়া ও প্রীতি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। গুরু পাদাশ্রয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ, ভক্তি ও প্রেম উপাদান, মহামন্ত্র হরিনাম বীজ এস ভাই প্রাণভরিয়া হরিনাম করি। এমন সুযোগ কোন যুগে ছিল না। ইহা কলির দুর্ব্বল কাঙ্গাল জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় হরিনাম সাধনের কোন ক্লেশ নাই, যজ্ঞ নাই, ক্রিয়া নাই নাম লইতে লইতেই প্রেমধন লাভ হয়। অনেকেই আজকাল বৃথা তর্ক বিতর্ক করিয়া সময় নষ্ট করেন। মন্ত্রের অর্থ কি, হরি বলিলে কি হয়, এ বিষয় মীমাংসা করিতে চাই না। হরিনামের সঙ্গেই মীমাংসা গাঁথা আছে, নাম লইতে লইতে বিশ্বাস হইবে, শ্রদ্ধা হইবে। হরিনামে এমনি শক্তি মাখা আছে যে পান করার ন্যায় নাম সুধাপান করিতে করিতে ভবব্যাধি আরোগ্য হইয়া যাইবে। বিচার করিয়া বা প্রত্যক্ষ করিয়া নাম মন্ত্র সাধন করিতে গেলে আঁধারেই থাকিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে অন্য ধর্ম্মের ন্যায় অনুষ্ঠান, যাগ যজ্ঞের প্রয়োজন করে না। "হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। অন্যান্য ধর্ম্মে মনঃস্থির, যোগ জ্ঞান প্রভৃতি কত কঠোর সাধন করিতে হয়, এ ধর্ম্মে আর কিছু নাই কেবল হরিনাম। একবার দুইবার নাম করিলে ক্রমে ক্রমে মন নির্ম্মল হইবে আনন্দময় ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে। লোকলজ্জা অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া ফেলিবে। এমন সুযোগ হারাইও না। একদিন এ কথা মনে পড়িবে, একদিন জানিবে যে, হরিনাম ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু সে দিন মনে হইলে কি হইবে সে যে অন্তিমকাল, তখন আর বলিবার সময় পাইবে কোথায় অনেক বন্ধুলোক আসন্ন কালে বলিয়াছেন, ভাই, কিছুই করিলাম না। তাই বলি, সময় থাকিতে এস ভাই একবার হরিনাম মহামন্ত্র সাধন করি। দয়ার ঠাকুর কাঙ্গাল সাজিয়া জীবের দুঃখ দূর করার জন্য দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইয়াছেন, সেই দয়াল প্রভুর কৃপাপাত্র আমাদের গুরু, আমরা তাঁহাদের পাদাশ্রয় করি, তাঁহারাই সিদ্ধমন্ত্রদাতা গুরু।

শ্রীমুকুন্দলাল দাস

পৌরাণিক গৌরলীলা।

(চৈত্রসংখ্যা ১৩০ পৃষ্ঠার পর।)

বৃহস্পতির আজ্ঞায় দেবরাজ ইন্দ্র ফাল্গুন মাসে সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া নিজমণ্ডল হইতে একটী চতুর্ভুজ রক্ত-বর্ণ ব্রাহ্মণকে ইন্দ্রদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র অযোনিজ ব্রাহ্মণ হইলেন ও তৎপত্নী শচী তিনিও ব্রাহ্মণী হইয়া তাঁহারা দুই জনে গঙ্গাকূলে রমণ করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যের আরাধনা করিয়া ও সূর্য্যাংশ লইয়া যে জগন্নাথমিশ্র পুরন্দরের জন্ম ইহা সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধও নহে। এ বিষয়ে আমি আর একটী প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৪৬৬ শকে চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতেও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের সূর্য্যাংশ লইয়া জন্ম গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি,
বন্দহ ন্যাসী চূড়ামণি।
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ কন্দ,
পতিতেরে লওয়ায় শরণী॥
ভুবনে বিখ্যাত নাম, সুধন্য সুপুণ্য গ্রাম,
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ।
জন্ম কলি একাকারে, শ্রীচৈতন্য অবতারে,
প্রকাশিলা শ্রীহরি সঙ্গীত॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবন অবতংস, হইয়া মিহির-অংশ,
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥

এই গ্রন্থ খানি ৩৫৩ বৎসরের প্রাচীন। গ্রন্থকার যে রাজার আশ্রয়ে থাকিতেন, অবশ্যই তিনি সেই রাজ-পুস্তকালয়স্থ ভবিষ্য পুরাণ দেখিয়াই জগন্নাথের সূর্য্যাংশ লইয়া জন্ম গ্রহণ এই কথা লিখিয়াছেন। যে হেতু শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে জগন্নাথ মিশ্রের সূর্য্যাংশত্ব

লিখিত হয় নাই, সুতরাং ভবিষ্যপুরাণ ব্যতীত এ সন্ধান আর তিনি কোথায় পাইবেন।

ইহার পরে শচীদেবীর গর্ভাধান বর্ণন এইরূপ—

ভাদ্রেশুক্লে গুরৌবারে দ্বাদশ্যাং ব্রহ্মমণ্ডলে।
প্রাদুর্বাসীৎ স্বয়ং বিষ্ণুর্ধৃত্বা সর্ব্বকলাং হরিঃ॥

এই শ্লোকের সার অর্থ—ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী গুরুবারে সকল কলার সহিত অর্থাৎ পূর্ণরূপে বিষ্ণু শচীদেবীর শরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এই কথাটী আপাতত শুনিতে কিছু বিরুদ্ধ বোধহয়, কিন্তু বিচার করিলে সে বিরোধ থাকে না। শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় লিখিত আছেঃ—

গতে দেবর্ষি বর্য্যেতু স্বাশ্রমে ভগবান্ পরঃ।
জগন্নাথস্য বিপ্রর্ষে র্মনস্যাবিশদচ্যুতঃ॥
তেনাহিতং মহত্তেজো দধার সময়ে সতী।
এতস্মিন্নন্তরে সাধ্বী শচী পতিপরায়ণা॥
লেভে গর্ভং * * *

অর্থ—দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠ হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলে, পরম পুরুষ ভগবান্ অচ্যুত শ্রীজগন্নাথবিপ্রের মনে প্রবেশ করিলেন। সেই জগন্নাথ মিশ্রের শরীরস্থ তেজ; সতী অর্থাৎ শচীদেবী সময়ে ধারণ করিলেন। ইহার পরে পতি পরায়ণা সাধ্বী শচীদেবী গর্ভ ধারণ করিলেন।

এই কথা গুলির মধ্যে জগন্নাথ মিশ্রের শরীরস্থ বিষ্ণু-তেজ শচীদেবীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালটীই ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশী বুঝিতে হইবে। ইহার পরে মাঘ মাসে শচীদেবীর গর্ভধারণ ইহা শ্রীচরিতামৃতে প্রসিদ্ধই আছে।

ভবিষ্যপুরাণে ইহার পরে দেবগণের স্তুতি বর্ণন আছে। সেই শ্লোক গুলির মধ্যে কয়টী শ্লোকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—

"নমস্তে শচনন্দন-নন্দ কারিন্ মহৎ পাপ সন্তাপ দুর্দাপ হারিন্"

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

"নমস্তে" এই শ্লোকাংশের বিষয় কিছু বলিবার নাই। "অনর্পিতচরীং" এই শ্লোক লইয়াই কথা, বৈষ্ণব মাত্রেই জানেন এই শ্লোকটী

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় নান্দী। এই শ্রীরূপ কৃত শ্লোক পুরাণের মধ্যে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল, হয়ত ভবিষ্য পুরাণে আধুনিক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়া গৌরলীলার পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা কখনও মনে করিতে পারি না।

পৌরাণিক শ্লোক লইয়া নিজকৃত কোন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করার প্রথা আরও দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমসন্দর্ভ নামক গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" এই শ্লোক লইয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী যে পৌরাণিক শ্লোক লইয়া মঙ্গলাচরণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এখানে আরও একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর, রামানন্দ রায় প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীরূপ-কৃত বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব নাটক আস্বাদন করিতেছেন, সেই সময়ে প্রথমতঃ বিদগ্ধমাধবের প্রথম নান্দী পঠিত হইল, পরে দ্বিতীয় নান্দী। এই দ্বিতীয় নান্দীই "অনর্পিতচরীং" এই শ্লোক। তবে ইহার শেষভাগে— "স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ" এইরূপ যুষ্মৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, পুরাণে কিন্তু "স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ" এইরূপ অস্মৎশব্দ বিন্যস্ত আছে। যাহা হউক প্রভু যখন এই নান্দী শ্রবণ করিলেন তখন কেবল বলিলেন ইহা অতিস্তুতি হইল। ইহার পরে যখন ললিতমাধবের দ্বিতীয় নান্দী শ্রবণ করিলেন তখন মহাপ্রভু রোষাভাস পূর্ব্বক কহিলেন—

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তাহার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি-ক্ষার বিন্দু॥

মহাপ্রভু ইহার পূর্ব্বে বিদগ্ধমাধবের নান্দী শুনিয়াছেন, তাহাতে এরূপ রুষ্ট হয়েন নাই, কেবল মাত্র বলিলেন যে, ইহা অতিস্তুতি। কিন্তু ললিত মাধবের নান্দী শুনিয়া বিশেষ রূপে ক্রুদ্ধ হইলেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানিতেন পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী পৌরাণিক, সুতরাং ক্রোধের কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় নাটকের শ্লোকটী শ্রীরূপের নিজকৃত। যাহা হউক আমরা আর একখানি গ্রন্থে এই শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে তাহা দর্শন করিয়াছি। তাহার নাম "প্রেমপত্তন," গ্রন্থকারের নাম রসিকোত্তংস, তিনি এই শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীরূপকৃত শ্লোকের স্ফুরতু বঃ স্থানে পুরাণোক্ত স্ফুরতু নঃ এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী অন্যত্র লঘুভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণেও শ্রীদশমস্কন্ধীয় শ্লোকগ্রহণ করিয়াছেন। যথা—নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে। ইত্যাদি

ইহার পরে ভবিষ্য পুরাণের এই স্থানে আর একটী শ্লোক আছে—মাধুর্য্যৈর্দ্ধুতিঃ সুগন্ধিভজনঃ ইত্যাদি।

এই শ্লোকটীও শ্রীকবিকর্ণপুর নিজগ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, ইহার সিদ্ধান্তও পূর্ব্বানুরূপ বুঝিতে হইবে।

এখানে আর একটু শাস্ত্রীয় বিষয় জানা আবশ্যক। বেদের কল্পাঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে,—

যস্য বাক্যং স ঋষির্যয়াতেন স্তূয়তে সা দেবতা যদ্যাক্ষরপ্রমাণং তচ্ছন্দঃ।

ইহার অর্থ—বেদের প্রত্যেক মন্ত্রে ঋষি, ছন্দ ও দেবতা আছেন, যে মন্ত্রটি যাহার বাক্য হয়, সেই তাহার ঋষি। মন্ত্র দ্বারা যাহাকে স্তব করা যায়, সেই তাহার দেবতা। মন্ত্রে যে প্রমাণে অক্ষর বিন্যাস করা যায়, সেই তাহার ছন্দঃ। সমস্ত বেদ যখন ঈশ্বরবাক্য, তখন তাহাতে আর কি প্রকারে ঋষি হইতে পারে? উদাহরণ স্বরূপে এখানে গায়ত্রীর কথা বলা যাইতেছে—গায়ত্রী বিশ্বামিত্র ঋষি। এই বিশ্বামিত্রের জন্ম কুশিক রাজবংশে, সেই রাজবংশ বৈবস্বত মন্বন্তরের সূর্য্যবংশের অনেক অর্ব্বাচীন। গায়ত্রী নিত্যসিদ্ধ বেদ মন্ত্র, তিনি কি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে ছিলেন না? তবে তাহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। তবে যাঁহারা বেদবেত্তা তাঁহারা জানেন যে বেদ নিত্যসিদ্ধ, বেদের মন্ত্র সকলও নিত্যসিদ্ধ, সময়ে সময়ে তপোনিষ্ঠ ও সমাধি-বিশুদ্ধহৃদয় মুনিগণের হৃদয়ে সেই মন্ত্র সকলের স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। পুরাণ সকলও বেদের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ, পৌরাণিক বচন সকলও নিত্য। যদি বা এই শ্লোকদ্বয় শ্রীরূপ গোস্বামী ও কবিকর্ণপুর মহাশয়ের গৌরভজনবিশোধিত হৃদয়ে পুনর্ব্বার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও যে ইহা ভবিষ্যপুরাণে ছিল না, কিংথাকিতে পারে না, এ বিষয়ে যুক্তি বা প্রমাণ কিছুই নহে।

এই স্তব করণের পরে দেবগণ শচীদেবীর গৃহ হইতে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পুষ্টি জন্য পৃথিবীতে কোন্ কোন্ রূপে জন্মগ্রহণ করিব। তাহা শ্রবণ করিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি কলিযুগের দেবাংশে অবতরণ বর্ণন করিলেন।

এই দশমাধ্যায়ের শেষে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বর্ণন। তাহার পরে আনন্দ গিরি, ধনশর্ম্মা ও পুরীশর্ম্মার বিবরণ।

দ্বাদশাধ্যায়ে ভারতীশ, গোরক্ষনাথ, ক্ষেত্রশর্ম্মা ও চুণ্টীরাজের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঘোরপন্থী, ভৈরব, হনুমান ও বাণশর্ম্মার বৃত্তান্ত। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে রামানুজ স্বামীর বৃত্তান্ত; পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রিলোচন বৈশ্যের কথা, ষোড়শাধ্যায়ে রঙ্কণ বৈশ্যের কথা, সপ্তদশাধ্যায়ে কবির, নরশ্রী, পিপা ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম বৃত্তান্ত। অষ্টাদশাধ্যায়ে সুধনভক্ত ও রোহিদাস ভক্তের কথা। ঊনবিংশাধ্যায় হইতে আবার শ্রীচৈতন্যলীলা আরম্ভ হইয়াছে।

ভগবানের লীলা মাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী এবং মাধুর্ৰ্য্যৈশ্বর্য্যময়ী ভেদে ত্রিবিধ। যে ভক্ত যে রূপ অধিকারী সেই ভক্ত সেই প্রকার লীলাই দর্শন করিয়া থাকেন ও সেই রূপই বর্ণন করেন। ললিতমাধব, বিদগ্ধ মাধব নাটক ও পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা, মহাভারতাদিতে ঐশ্বর্য্য লীলা এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে মাধুর্ৰ্য্যৈশ্বর্য্যময়ী লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপ গৌরলীলাও ত্রিবিধ। শ্রীগৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী লীলার গ্রন্থ ও উপাসকগণের নাম প্রকাশ করিব না। কারণ সে আমাদের অত্যন্ত রহস্য। প্রভুর মাধুর্ৰ্য্যৈশ্বর্য্যময়ী মিশ্র লীলার গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি। প্রভুর ঐশ্বর্য্য লীলার গ্রন্থ ভবিষ্য পুরাণাদি, ইহার উপাসক সর্ব্ব সাধারণ বহিরঙ্গ লোক, সুতরাং ভবিষ্য পুরাণে কেবল ঐশ্বর্য্যময়ী লীলাই পাওয়া যায়। এ প্রস্তাবে তাহার বিস্তার করিলাম না, সঙ্ক্ষেপে তালিকা মাত্র প্রদত্ত হইল।

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর, শ্রীধরস্বামী, রামানন্দ, নিম্বাদিত্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন ও শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচার ও শেষে প্রভুর আনুগত্য স্বীকার বর্ণন করা হইয়াছে। বিংশাধ্যায়ে ভট্টজীদীক্ষিত, বরাহ-মিহির, বাণীভূষণ, ধন্বন্তরি, জয়দেব প্রভৃতি মহানুভবগণের শ্রীপ্রভুর সঙ্গে মিলন, বিচার ও প্রভুর আনুগত্য স্বীকার বর্ণিত হইয়াছে। পরে প্রভু এই সকল নিজ পরিকরগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়া সপরিকরে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণরূপী জগন্নাথ দেবকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। তখন প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব নিজে

শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাভিষেক করিলেন। সেই অবধি লোক সকল মহাপ্রভুর সঙ্গী হইল।

এই সকল লীলার মধ্যে কয়েকটী বিষয় বিচার্য্য। পুরাণের প্রক্রিয়া এই যে, দুইটী কালের পৃথক পৃথক লীলাকে এক কালে বর্ণন করা হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী বরাহ লীলা এক করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই দুই বরাহ দুই পৃথক কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একটী নীল বরাহ ও একটী শ্বেত বরাহ। নীল বরাহ চতুষ্পদ ও ব্রহ্মার নাসিকা হইতে আবির্ভূত, আর শ্বেত বরাহ জল হইতে আবির্ভূত, ইনি নরাকার বরাহ, ইহার সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয় মুনি দুইটী লীলা এক স্থানে বর্ণন করিয়াছেন, কারণ নীল বরাহ কল্পারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে প্রচেতা ও দক্ষ ছিলেন না, তবে দিতি ও হিরণ্যাক্ষ কোথায়?

যেরূপ শ্রীভাগবতে বরাহ দেবের দুইটী লীলা একত্র বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ ভবিষ্যপুরাণে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা একত্র বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, জয়দেব, শ্রীধর প্রভৃতি মহাত্মাগণ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কিরূপে মিলিত হইলেন, সাধারণের মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী তাঁহারা এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান। যে হেতু শ্রীগৌরলীলা নিত্য, শ্রীগৌরধাম নিত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলার পূর্ব্বে ভরদ্বাজ, সুরভি ও ইন্দ্রাদি যেমন তপশ্চর্য্যা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—

ভূতোপ ভবিতাথবা ভবতি বা কস্যাপি যৎ কোপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎ পদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎ সর্ব্বং নিজ ভক্তি বৈভব মহৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়িত
শ্চৈতন্যস্য কৃপাবিজৃম্ভিত তয়া জানন্তু নির্ম্মৎসরাঃ॥

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যে সমস্ত মহাজনগণ শ্রীহরিভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা গৌর-কৃপারই বিলাস। গৌর-কৃপা ব্যতীত ত্রিকালেও কাহারও ভক্তিলাভ সম্ভব নহে। সুতরাং

পূর্ব্বকালীন মহাজনগণেরাও যে শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহার অলন্ত প্রমাণ ভবিষ্যপুরাণ।

এখন আমি আর একটী কথার বিচার করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, ইহাও একটী মধুময়ীলীলা। শ্রীভাগবতে দেখা যায় গোবর্দ্ধনের উপরেও শ্রীকৃষ্ণ এক রূপে বিরাজমান, আর এক রূপে নিয়ে দাঁড়াইয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। ইহা নিজেই নিজের পূজা এবং নিজেই নিজকে প্রণাম করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ দারুব্রহ্ম, শ্রীগৌর নরব্রহ্ম, অতএব এই উভয়ে একতত্ত্ব হইয়াও শিষ্যত্ব স্বীকার, ইহা নিজেই নিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ মাত্র। আর একটী কথা যে,—শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য হইয়াছিলেন, ইহাও একটী বিলাস মাত্র। সেই ভাব লইয়াই শ্রীঅচ্যুতানন্দ—

চৈতন্য গোসাঞীর গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্‌গুরু ঐছে কর তুমি উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হব দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞী।
তাঁর গুরু আছে অন্য কোন শাস্ত্রে নাই॥

এই পদ্যের "কোন শাস্ত্রে নাই" এই বাক্যটী ভবিষ্য পুরাণই লক্ষ্য করিতেছে। যে সময়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ এই কথা বলিয়াছিলেন, সে সময়ে চৈতন্ত ভাগবত, চৈতন্ত চরিতামৃতাদি গ্রন্থ সকল অপ্রকাশিত, সুতরাং তাহা বলিবেন কেন? আর যদি বা কষ্ট কল্পনা করিয়া শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের পরে এই কথা ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলেও চরিতামৃত গ্রন্থাদিকে লক্ষ্য করিতে পারে না। কারণ তাহাতে শ্রীঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীর নাম স্পষ্ট লেখা আছে। তাহা হইলে কোন শাস্ত্রে নাই এরূপ বলিবেন কেন? অতএব এই পদ্যে শাস্ত্র শব্দে ইতিহাস পুরাণাদিকে লক্ষ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভবিষ্যপুরাণে পুরী গোস্বামী ও ভারতী গোস্বামীর কথার উল্লেখ নাই। তাই শ্রীঅচ্যুতানন্দ সদর্পে বলিলেন, "তাঁর গুরু আছে অন্ত কোন শাস্ত্রে নাই"। ভবিষ্যপুরাণে ইহার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সমস্ত আচার্য্যগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ম্লেচ্ছবিপ্লাবিত সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন,

ইহার পরে আবার দুইবার ধর্ম্মবিপ্লব দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ নবদ্বীপ আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে প্রার্থনা করিলেন ও শ্রীপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। এইরূপ প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা এক যোগ করিয়া শ্রীভবিষ্য মহাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী—শ্রীবৃন্দাবন।

—*:*:*—

জঙ্গলীপ্রিয়া ও গৌরমন্ত্র।

শ্রীশান্তিপুর সন্নিকটে হরিপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়কুলে নন্দরাম ও দ্বিজকুলে যজ্ঞেশ্বর নামক সমবয়স্ক দুই ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের একত্র বাস, একত্র শয়ন ভোজনাদি। পরস্পরে ঈদৃশ প্রগাঢ় প্রণয় ছিল যে, মুহূর্ত্তকালের জন্যও কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। যেন অভেদাত্মা দেহমাত্র পৃথক্। জন্মান্তরীণ সংস্কার প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ইহাঁদের ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল। গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরিচর্য্যাদি করেন, ইহাই একমাত্র ইহাঁদের বাসনা। এক দিন নন্দরাম কহিলেন, ভাই যজ্ঞেশ্বর! আমরা যাহা চাই সে আশা কিন্তু গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রে আছে—

"স্বপ্রাগল্ভ্যবলাৎ বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতাং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপা পীযূষদৃষ্টিং বিনা॥
অম্বু প্রাঞ্জলিনা নিরস্তজলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা। শ্রীধরস্বামী।

অতএব আমাদের গুরুপদাশ্রয় করিয়া গুরু কৃপা লাভ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

যজ্ঞেশ্বর কহিলেন, ভাই নন্দরাম! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তিকে গুরু করিলেই যে অভিলাষ পূর্ণ হইবে, এ কথায় আমার বিশ্বাস নাই। সাধনাভিলাষী জনগণের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সদ্গুরু চাই। কেন না—জ্ঞানদ বৈষ্ণবচূড়ামণি মহাদেব কহিয়াছেন যে,—

গুরুং বিনা তু শাস্ত্রেঽস্মিন্ নাধিকারী কথঞ্চন।
অতঃ সদ্গুরুমালভ্য গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।

বেদে আছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ইত্যাদি।

কিন্তু সদ্‌গুরু লাভ করা সহজ নহে—উহা অতি দুর্ল্লভ পদার্থ—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ।

দুর্ল্লভং সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

ভ্রাতঃ! তাই বলিতেছিলাম গুরু করিতে হইলে চক্ষুষ্মাণ গুরু করা আবশ্যক। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে গুরু করিয়া ফল কি? অন্ধব্যক্তি কি অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে পারে? তাদৃশ অহম্মুখ ব্যক্তির কথায় বিশ্বা করিয়া তন্নির্ব্বাচিত পথের পথিক হইলে যে পরিশেষে কণ্টকপূর্ণ গর্ত্তে পতিত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

নন্দরাম কহিলেন, ভাই যজ্ঞেশ্বর! তুমি কি ব্রহ্মশাপে আত্মবিস্মৃত হইয়াছ? তাই গুরুযোগ্য লোক দেখিতে পাইতেছ না। একবার জ্ঞান বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেখ। আমাদের যে নিত্যসিদ্ধগুরু আছেন সেই জগজ্জননীই আমাদের জননী, আমরা তাঁহারই নিত্য সহচরী—সেবাদাসী। তিনি যখনই কোন প্রয়োজন অনুসারে পুণ্যভূমি ভারত ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন, সেবা পরিচর্য্যাদি সম্পাদন জন্য আমরাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া থাকি। লৌকিকাচারে তিনিই আমাদের দীক্ষা শিক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন। এ জন্মেই বা তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলে তিনি নিত্যদাসী বলিয়া কৃপা না করিবেন কেন? ভাই চল! শ্রীপাট শান্তিপুরে আমাদের পিতা শ্রীল মহাযোগেশ্বর সদাশিব শ্রীঅদ্বৈত রূপে বিরাজ করিতেছেন, আর আমাদের মাতা কৈলাসবাসিনী শ্রীমতী যোগমায়া ভগবতী সেই শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের গেহিনী সীতাদেবীরূপে বিরাজিতা। সেই শান্তিপুরাধিশ্বরীর শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবশ্যই পরম শান্তি-সুখ লাভ করা যাইবে। ভাই রে! চল! আর কালবিলম্ব করিও না—শ্রীপাট শান্তিপুরে চল। শান্তিদায়িনীর চরণাশ্রিতা হইলে আর বিভীষিকা-ময়ী-বিরাটবদনা অশান্তি-নিশাচরীর মুখ দেখিতে হইবে না। বাসনা পরিপূর্ণ হইবে।

মন্ত্রণা স্থির হইল। সাধকদ্বয়, শ্রীশান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত-পদে প্রণতিপূর্ব্বক স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী প্রভু সীতানাথ, তাহাদিগেক শ্রীসীতাদেবীর নিকটে যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীসীতাদেব সেই পুরাতন দাসীদ্বয়কে পাইয়া পরমানন্দে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিলেনা। এবং শিষ্যদ্বয়ের অভিলাষানুসারে সাধনতত্ত্ব কহিতে লাগিলেন—

সীতা কহে শুন তুই শিষ্য প্রিয়তম। কহিব নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥
আগে গুরুমূর্ত্তিধ্যান অন্তরে করিহ। বস্ত্রমালা আদি করি পদে সমর্পিহ॥
তবে গুরু গায়ত্রী জপিয়া দশবার। শ্রীপাদ পদ্ম পুজিবে বিবিধ প্রকার॥
তবে বিশ্বম্ভর ধ্যান করিহ মানসে। শ্রীচৈতন্য গায়ত্রী জপিহ বারদশে॥
পদ্য অর্ঘ্যে পূজিহ তাঁকে নানা উপহারে। যাহার প্রসাদে প্রেম বাড়য়ে বিস্তরে॥
তবে ধ্যান করিহ ব্রজে কিশোর কিশোরী। রত্নসিংহাসনে বৈসে কুঞ্জের ভিতরি॥
প্রবাল মুকুতা তাহে গুঞ্জা সারি সারি। চামর বাতাসে উড়ে মকমল মসারী॥
কল্পতরুর ছায় অমল কুঞ্জ খানি। অপরূপ শ্রীকুঞ্জের চারি দ্বার জানি॥
সর্ব্বমুখ্য পশ্চিম দ্বার আপন উপাসনা। সেহি দ্বারে রাধাকৃষ্ণ করিহ ভাবনা॥
কুঞ্জ মধ্যে অষ্টদিগে অষ্টসখীশ্বরী। কৃষ্ণবামে দাঁড়াইয়াছে নবীনা কিশোরী॥
আপনার সিদ্ধদেহ মনেতে ভাবিয়া। শ্রীগুরুকে শ্রীকুঞ্জের দ্বারে বসাইয়া॥
গুরু স্থানে কৃষ্ণ সেবা করিয়ে ভাবন। সহর্ষে বিলাসামৃত করিবে ধ্যায়ন॥
এই মত ধ্যানকরি কৃষ্ণের সেবন। মহাকাম গায়ত্রী যে করিহ সাধন॥
রাধিকার কাম-গায়ত্রী করিবে সাধন। রাধাবীজ জপ করি রাধার পূজন॥
কৃষ্ণবীজে করিবেক কৃষ্ণের পূজন। সংক্ষেপে কহিল সাধ্য স্মরণ মনন॥

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী কৃত শ্রীসীতা-চরিত।

এস্থলে মিতভাষী পাঠকদিগের মধ্যে কেহ মনে করিতে পারেন:— তোমরা জঙ্গলীপ্রিয়ার পরিচয় দিতে বসিয়াছ। "শ্রীজঙ্গলী—শ্রীসীতাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন" এই কথা বলিলেইত চুকিয়া যায়, তাহাতে তোমরা নিরর্থক বত্রিশ পংক্তি সাধন-তত্ত্ব লিখিয়া বিরক্ত জন্মাইতেছ কেন? এতদুত্তরে আমরা বিনীত ভাবে বলিতেছি;—এই শ্রীসীতা দেবী-বদন-কমল-নিঃসৃত সংক্ষেপে সাধন তত্ত্বামৃতবাহিনী কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিবার তিনটী রহস্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য এই যে—পত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িপাঠক মহাত্মারা ইহা পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৪৭৮। ৭৯ শকে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ে কিরূপ সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য;—যে সকল সদাশয় বৈষ্ণবগণ, স্বেচ্ছাপরতন্ত্র না হইয়া প্রাচীন মহাজনগণের অনুষ্ঠিত সাধন প্রণালীর বিশিষ্ট প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা এই বেদবৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন এবং প্রগাঢ় চিত্তে

এই সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবেন। ভাবিয়া দেখিলে এই সংক্ষেপ সাধন তত্ত্ব অতীব মূল্যবান সামগ্রী, বৈষ্ণব সাধকের আদরের জিনিষ বটে।

শ্রীসীতা-চরিত্রোক্ত কেবল এই সাধন-তত্ত্ব কেন, দিগন্তব্যাপি সৌরভ-বাসিত শ্রীবৈষ্ণব-প্রমোদকাননের ফুটন্ত পারিজাত পূজ্যপাদ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী কৃত বলিয়া এই শ্রীসীতা-চরিত্র গ্রন্থখানিকেই বৈষ্ণব সমাজে পরম আদর করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রমাণ এই, যে দেশে অনুসন্ধান করিবেন সেই দেশেই এ গ্রন্থ দুই চারি খানি পাইবেন। শ্রীপত্রিকার পাঠকগণের সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীমান্ রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, মুর্শিদাবাদ হইতে ১২২৮ সনের লেখা একখানি সীতা চরিত্র আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে আমার একজন জ্ঞাতি ভ্রাতা ১৫০শত বৎসরের লেখা একখানি গ্রন্থ দৃষ্টে তাহার নকল আনিয়াছেন। অভ্যাগত বৈষ্ণবগণের পরিচিত মাণিকগঞ্জ মহকুমার এলাকায় মেলেঘি গামের পরম ভাগবত ব্রজগত পদ্মনাগ মহাশয়ের নিকট প্রায় দুইশত বৎসরের লেখা এক খানি গ্রন্থ ছিল, তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ বৈরাগীর আখরায় দুইশত বৎসরের লেখা একখানি গ্রন্থ ছিল, আমি প্রত্যক্ষে দেখিয়াছি। ঐ গ্রন্থ দৃষ্টে শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা সম্পাদক শ্রীরাধাবিনোদ দাস বৈরাগী, ১২৭০ সনে একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। আমাদের গৃহেও ১১০০ সনের লিখিত একখানি পচা পুথির এখনও কিয়দংশ আছে। ফলতঃ শ্রীসীতা-চরিত্র গ্রন্থ বিবরণ অপ্রচার নহে, চেষ্টা করিলে এখনও উহার শত শত গ্রন্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। নিরপেক্ষ পাঠক! ভাবুন, যে সমস্ত পুস্তকের সমাজে আদর নাই সে সকল পুস্তক কি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ফুল চন্দনে পূজিত হইয়া বিরাজ করিতে পারে? তাই আমরা বলিতে ছিলাম শ্রীসীতা-চরিত্র গ্রন্থ খানি বৈষ্ণব সমাজের অতিশয় আদরের জিনিষ বটে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য এই—বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব সমাজে একদল লোক আছেন, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ত্র ও গায়ত্রী স্বীকার করেন না, প্রত্যুত যে সকল গ্রন্থে গৌর মন্ত্র ও গৌর গায়ত্রী আছে, তাহা আধুনিক বলিয়া উড়াইতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা কহেন যদি স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রই থাকিবে তবে শ্রীঅদ্বৈত

প্রভু দশাক্ষরী গোপাল মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিলেন কেন? আবার অনেকেরই বিশ্বাস, শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাসই গৌরমন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। সেই সকল বৈষ্ণব-কুল-কলঙ্ক অবিশ্বাসিসম্প্রদায় এই সাধনতত্ত্ব পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল। কেন না এই সাধনতত্ত্বে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-পত্নী শ্রীসীতাদেবী শ্রীজঙ্গলীপ্রিয়াকে শিখাইতেছেন যে,—শ্রীচৈতন্য গায়ত্রী জপিহ বারদশে।

শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়িবৈষ্ণবগণের পক্ষে এই বৈষ্ণবকুলচন্দ্রমা শ্রীলোক-নাথ গোস্বামী কৃত শ্রীসীতা-চরিত্র গ্রন্থখানি যে বেদতুল্য, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। তৎ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তবে বিপক্ষ পক্ষ স্বপক্ষ ঠিক রাখিবার জন্য বলিতে পারেন যে, সত্য বটে, গ্রন্থে গৌরগায়ত্রীর উল্লেখ আছে, তাহাতে আসিয়া যায় কি? মূল কথা গৌরমন্ত্রেরত উল্লেখ নাই। সুতরাং মন্ত্রের প্রামাণাভাব। পাঠক! এতদুত্তরে শাস্ত্রজ্ঞ মহত্তমেরা বলেন, এ স্থলে শ্রীচৈতন্য গায়ত্রীর উল্লেখ থাকাতেই শ্রীচৈতন্য মন্ত্রের অস্তিত্ব জানা যাই-তেছে। কেন না তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায়, যে দেবতার মন্ত্র আছে তাঁহারই গায়ত্রী আছে, যাঁহার মন্ত্র নাই তাঁহার গায়ত্রীও নাই।

পক্ষান্তরে কোন কোন হস্ত লিখিত শ্রীসীতা চরিত্র গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত পদ্যে নিম্নলিখিত মত পাঠ আছে—

গৌর বীজ গায়ত্রী জপিহ বারদশে।

সুবিজ্ঞ পাঠক' দেখুন! বীজ এবং মন্ত্র একই কথা। তবে অধিকাংশ পুস্তকেই "শ্রীচৈতন্য গায়ত্রী জপিহ বার দশে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে "গৌরবীজ গায়ত্রী" পাঠই সমীচিন বলিয়া বোধহয়, কেন না আমাদের এই শ্রীজঙ্গলীপ্রিয়ার শিষ্য শ্রীহরিপ্রিয়া কৃত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিত্র গ্রন্থে এই সাধনতত্ত্ব বিশদ রূপে বর্ণিত আছে। তাহাতেও দীক্ষাগ্রহণান্তর শ্রীসীতাদেবী বক্তা শ্রীনন্দ ও যজ্ঞেশ্বর শ্রোতা। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিত রচয়িতা শ্রীহরিপ্রিয়া, স্বীয় গুরু শ্রীজঙ্গলী (যজ্ঞেশ্বর) প্রিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণমিশ্রাত্মজ শ্রীদোলগোবিন্দ প্রভুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছেন এবং যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই নিজ গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন। তৎ কপোল কল্পিত কিছুই নাই।

শ্রীজঙ্গলী গুরু আর শ্রীদোলগোবিন্দে।
যাহা কহে তাঁহা লিখি পয়ার প্রবন্ধে॥" শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিত।

শ্রোতৃগণ! সেই শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিতোক্ত সাধনতত্ত্ব প্রকরণে শ্রীগৌরমন্ত্র এবং শ্রীগৌর গায়ত্রীর কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিতের ঐ অংশ সমস্তই উদ্ধৃত করিলাম. প্রণতি পূর্ব্বক সকলেই শ্রবণ করুন্।

তবে নন্দ যজ্ঞেশ্বর দৈন্য করি কয় কৃপা করি কহ সাধ্য সাধন নির্ণয়।
সীতা কহে সাধকের অনন্ত সাধন। সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ॥
প্রত্যূষে চৈতন্য কৃষ্ণ নাম সঙরিয়া। উঠি শুচি হঞা শুদ্ধ আসনে বসিয়া॥
প্রথমে শ্রীগুরু রূপ করিয়া চিন্তন। মানসোপচারে তাঁনে করিহ পূজন॥
তবে গুরু গায়ত্রী জপিয়া দশবার। জপিহ শ্রীগুরু বীজ সাধনের সার।
জপ বিসর্জিয়া তবে করিহ প্রণাম গুরু কৃপার্ণবে জীবের পূরে মনস্কাম॥
তবে প্রাতঃকৃত্য সারি বিধি অনুসারে। মাধ্যাহ্নিক কার্য্য করিবেক তারপরে॥
গন্ধপুষ্প ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি লঞা। বসিবেক শুদ্ধাসনে শুদ্ধাচারী হঞা॥
আচমি করিহ আগে নবদ্বীপ ধ্যান। তাহে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌর ভগবান॥
ভক্তি করি দুহুঁ রূপ করিয়া চিন্তন করিহ চৈতন্য মন্ত্রে চৈতন্য অর্চ্চন॥
চৈতন্য গায়ত্রী জাপ শ্রীচৈতন্য বীজ। জপিলে পাইবা শুদ্ধ ভক্তিলতা বীজ॥
বিনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরণ আশ্রয়। কোটী জন্মে প্রেমভক্তি নাহি উপজয়
এত শুনি যজ্ঞেশ্বর কহে যোড় করে। কিবা ধ্যান মন্ত্র পূজা গৌরবিশ্বম্ভরে।
সীতা কহে গৌরার্চ্চনা অতি গুহ্য হয়। ভক্তভেদে মত ভেদ অনেক আছয়॥
মুনি ভেদে শাস্ত্র ভেদে আছে আদি অন্ত অধিকারী ভেদে শাস্ত্রে কহয়ে সিদ্ধান্ত
তেঞি সর্ব্ববিধ শাস্ত্র বাক্য সত্য সার। অবিশ্বাসী জনে ভুঞ্জে নরক অপার।
গৌর গৌরতত্ত্বে মতভেদ যেবা হয়। সংক্ষেপে কহিব কিছু তাহার নির্ণয়॥
কেহ কৃষ্ণমন্ত্রে যজে কেহ রাম মন্ত্রে। কেহ নৃসিংহাদি মন্ত্রে কেহবা স্বতন্ত্রে॥
বস্তুতত্ত্বে সর্ব্ব অবতারী গোরা রায়। যে যৈছে ভজয়ে তাঁরে তৈছে পায়॥
মোর প্রভু কহে নিমাই শ্রীনন্দনন্দন। শুক্লাম্বর কহে নিমাই স্বয়ং নারায়ণ॥
মুরারি কহয়ে নিমাই মোর রামচন্দ্র। শ্রীনৃসিংহ বুলি গাই শ্রীনৃসিংহানন্দ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ গৌরভক্ত শূর। কাশী মিশ্র নরহরি সরকার ঠাকুর॥
শ্রীরঘুনন্দন আর ত্রিলোচন দাস। পুরুষোত্তম বাসুঘোষ আদি কৃষ্ণদাস॥
গদাই পণ্ডিত আর দাস গদাধর। শিবানন্দ বৈদ্য কর্ণপুর প্রেমাকর॥

এ সব মহান্ত গৌর বিনে নাহি জানে। তেঞি গৌরমন্ত্রে পূজে স্বতন্ত্র বিধানে
রুদ্রযামলোক্ত ধ্যান মন্ত্র অনুসারে। বিধিমতে পূজয়ে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরে ॥
জানো মুঞি তো সভার গৌর গত প্রাণ। তেঞি তুহে কহি গৌর সাধন সন্ধান
অতি গুহ্য অপ্রকাশ্য ভক্ত কণ্ঠহার। অবিশ্বাসী পাষণ্ডের নাহি অধিকার ॥

তথাহি— অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি চৈতন্যমন্ত্র মুত্তমং।
যেন বিজ্ঞান মাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি ॥
তন্মন্ত্রং শৃণু দেবেশি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপকং।
কামবীজং সমুদ্ধৃত্য ছাদ্যবর্ণং সমুদ্ধরেৎ॥
দক্ষিণাক্ষি সমাযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং।
চৈতন্যায় ততঃ পশ্চাৎ পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ॥
সপ্তাক্ষরোমহামন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপকঃ।
জীবানাং মুক্তিদোমন্ত্রো ধর্ম্মকামার্থ দায়কঃ॥
একোচ্চারেণ দেবেশি কিংপুনর্ব্রহ্ম কেবলং।
আদ্যবীজেন দেবেশি! ষড়ঙ্গাদীন্ প্রকল্পয়েৎ॥
ধ্যানং শৃণু মহামায়ে যথা তন্ত্রানু সারতঃ।
যং ধ্যাত্বা পামরো লোকঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়োভবেৎ।
দ্বিভুজং গৌরবর্ণঞ্চ বরদাভয় পাণিকং।
হরিনামাঙ্কিত তনুং বনমালা বিভূষণং।
আনন্দাশ্রুকণাপূর্ণং পুলকাবলি বিহ্বলং।
কৈবল্যদায়কং শান্তং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরং।
ইতিধ্যাত্বা মহেশানি পুষ্পং দদ্যা ত্তু মস্তকে।
মানসৈঃ পূজনং কৃত্বাততোহর্ঘস্থাপনঞ্চরেৎ।
পুনরঙ্গন্ত সংযোজ্য পুনর্ধ্যাত্বাতু সাধকঃ।
আবাহ্য পূজয়েৎ ভক্ত্যা ষোড়শৈকপচারতঃ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সাধ্য নাম ততোচ্চরেৎ।
চতুর্থ্যন্তেন সংযোজ্য পূজয়েচ্চ যথা বিধিঃ।
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা গীতাদ্যৈঃ প্রণমঞ্চরেৎ।
প্রদক্ষিণঞ্চ গানাদ্যৈ শ্চৈতন্যস্য বিশেষতঃ।
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যোজপেন্মনুমেকতঃ।
ভবাব্ধিং দুস্তরং তীর্ত্ত্বা সাক্ষান্নারায়ণোভবেৎ।

হরিকীর্ত্তন মধ্যেতু যদি মন্ত্র পরায়ণঃ।
জিত্বাখিলান্ ষড়্বর্গ্যাদীন্ অন্তে বিষ্ণুস্বরূপকঃ।
ইতিমন্ত্রং মহেশানি তবপ্রীত্যা ময়োদিতং।
সন্ন্যাসিনা মুপাদৈ্যনং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় শিববিষ্ণু রতায় চ।
জিতেন্দ্রিয়ায় সত্বায় নির্ম্মলায় মহাত্মনে।
বিষ্ণুভক্তায় শৈবায় সংযমাদি রতায়চ।
দদ্যাদ্ভক্তায় শান্তায় নদদ্যাৎ নিন্দকায়চ।

ইতি রুদ্রযামলে শিব পার্ব্বতীসংবাদে—শ্রীচৈতন্য মন্ত্রোদ্ধারোনাম।
দ্বাত্রিংশৎ পটলঃ।

এইত কহিনু বিধি রুদ্র যামলোক্ত। ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে আছে ভিন্নধ্যান মাত্র॥
বাহুল্যের ভয়ে তাহা নারিনু কহিতে এবে শুন কৃষ্ণার্চ্চনা কহোঁ সংক্ষেপেতে
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ধ্যান করি। কল্পবৃক্ষ মূলে রত্নবেদীর উপরি॥
রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত রাধাকানু। নবঘন কোরে থিরসৌদামিনী তনু॥
দুহুঁ রূপ গুণলীলা করিয়া ভাবনা। আত্ম মন্ত্রে করিহ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা।
জপিহ কাম গায়ত্রী কামবীজ আর। যে প্রভাবে বশীভূত শ্রীনন্দকুমার।
তবে রাধা মন্ত্রে পূজা করিহ রাধার। জপিহ রাধাগায়ত্রী রাধাবীজ আর॥
অষ্টদলে অষ্ট সখী পূজিহ সাদরে। উপদলে মঞ্জরীবর্গের পূজা পরে॥
কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট রাধিকারে করিহ প্রদান। সখীগণ আদি যত অন্য নাহি খান॥
জপ সারি প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া। তবে শ্রীতুলসী পূজি তাহে জল দিবা॥
অনন্ত সাধনতত্ত্ব সীমা নাহি তার। সংক্ষেপে কহিনু এই সাধনের সার॥
ভক্তি করি এই মতে সাধিবেক যেবা। অবশ্য পাইবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা॥

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিত।

ফলতঃ শ্রীসীতাচরিত্র গ্রন্থোক্ত পদ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের যে কোন পাঠই থাকুক, তাহাতেই "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর হইতেই যে তৎ সম্প্রদায়ে অন্যত্র প্রচলিত হইয়াছিল," এ কথা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে এতদ্বিষয়ে বিপক্ষ পক্ষের আরও কতকগুলি কুতর্ক অবশ্য আছে, আমরা অবকাশ মতে শ্রীগৌর ও তদ্ভক্তগণের কৃপা হইলে প্রবন্ধান্তরে তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া নিরপেক্ষ পাঠকগণের উপর বিচার ভার সমর্পণ করিব। মূল শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসানুদাস—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী। উখলী।

শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য।

চিঙ্গলপত জিলার মধ্যে শ্রীভূতপুরি (শ্রীপ্রেমবদর) নামে এক জনপদ আছে। ইহা মান্দ্রাজ শহরের ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ৪১১৮ কলিগতাব্দে (১০১৭ খ্রীষ্টীয় অব্দে) চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে মধ্যাহ্নকালে কর্কটলগ্নে কেশব-সোমযাজীর ঔরসে ও কান্তিমতী দেবীর গর্ভে রামানুজাচার্য্যের জন্ম হয়। রামানুজ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্বীয়শাখাধ্যায়ী হারীত গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরম বৈদান্তিক শেষনাগ বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম বিবৃত করিবার জন্য রামানুজ রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা রামানুজ-সম্প্রদায়ীদিগের ধারণা।

গর্ভাষ্টমে উপনয়ন সংস্কার ও দশমবর্ষে দারপরিগ্রহ হইলে রামানুজ পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃদেবের নিকট বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কেশব-সোমযাজী নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিলে রামানুজ যথাবিধি পিতৃকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। অতঃপর তিনি কাঞ্চীপুরে (কঞ্জিবরামে) গমন করিয়া অধ্যাপকাগ্রগণ্য সংসারত্যাগী যাদবপ্রকাশ-মিশ্রের নিকট পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাদবপ্রকাশ-মিশ্র পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন ; পরে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী হন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের জনৈক টীকাকার। কিছু দিন পরেই গুরুশিষ্যে বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবল তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রামানুজ মনে করিতেন যে, যাদবপ্রকাশ-মিশ্র পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতবিরুদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; সুতরাং রামানুজ যাদবপ্রকাশ-মিশ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্বোধায়ন, দ্রামিড়াচার্য্য, ব্রহ্মনন্দি (তঙ্কাচার্য্য), গুহাদেবাচার্য্য, আচার্য্যভারুচি, আচার্য্যকপর্দ্দী, শ্রীনাদমুনি ও যামুনাচার্য্যের প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতমত গ্রহণ করিলেন। যামুনাচার্য্য রঙ্গক্ষেত্রে (শ্রীরঙ্গপত্তনে) বাস করিতেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামানুজ যামুনাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন ; কিন্তু ইহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে উক্ত আচার্য্য মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন ; কাজেই তদীয় প্রধান শিষ্য মহাপূর্ণাচার্য্যকে (পেরিয়া নম্বিকে) গুরু অঙ্গীকারে চিঙ্গলপথ জিলার মধ্যস্থ মধুরন্তক নামক স্থানে বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর রামানুজ গুরুসমভিব্যাহারে কাঞ্চীপুরে গমন করিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮শ বর্ষ হইয়াছিল। যৌবনের প্রথমেই তিনি স্বেচ্ছাক্রমে

সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধ্যা নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন এই বয়সে এতদ্রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্ভাবিত নহে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে কিছু দিন কাঞ্চীতে থাকিয়া রামানুজ শিষ্য গণকে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিপতিতে যাইয়া তত্রত্য শ্রীবেঙ্কটেশ দেবের মন্দিরে কিয়দ্দিন বেদান্তের উপদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীবেঙ্কটেশ বিগ্রহের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দক্ষিণাপথের বহু স্থানে গমন করত প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহ সকল দর্শন করিতে করিতে অবশেষে রঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন।

রঙ্গরাজ কৃমিকণ্ঠ-চোল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারের বিরোধী হওয়াতে রামানুজ রঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মহিশূররাজ জৈনপন্থী বল্লালের রাজধানী দ্বোরসমুদ্রে গমন করেন। অনেক জৈনপন্থী পণ্ডিত রামানুজের সহিত বিচারে পরাস্ত হওয়াতে রাজা বল্লাল জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবৰ্দ্ধন নাম গ্রহণে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তত্রত্য গিরিদেশে রামানুজ তিরুনারায়ণপুর (মেলকোঠ) নামে নগর ও শ্রীনারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ১২শ বর্ষ বাস করেন। রাজকীয় সাহায্যে মেলকোঠে অনেক বৈষ্ণবের বাস হইল। রাজা কৃমিকণ্ঠ-চোল পরলোকগত হইয়াছেন শুনিয়া রামানুজ মেলকোঠ হইতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করেন ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

অতঃপর রামানুজ ত্রিপতি, অহোবালম্ ও মহারাষ্ট্র দেশের মধ্য দিয়া উত্তরাপথে গমন করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার করাই তাঁহার এই রূপ প্রব্রজ্যার প্রধান কারণ। তিনি দত্তাত্রেয়ক্ষেত্র (গিরিনার) দ্বারকা, প্রয়াগ (এলাহাবাদ) কাশীধাম (বনারশ) মথুরা, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম (বদরিনাথ) প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজয় করিয়া কাশ্মীরে যাইয়া উপস্থিত হন। কাশ্মীর রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজধানী শ্রীনগরস্থিত সারদাপীঠ পূর্ব্বাপরই বিদ্যন্মণ্ডলীর আবাসস্থান। এই সারদাপীঠে বহুদিন হইতে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী যে সে গ্রন্থ ইহাতে রক্ষিত হইতে দেন না। যে গ্রন্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্য অক্ষুণ্ণ না থাকে সেই গ্রন্থ তথায় গৃহীত হয় না। রামানুজ স্বকৃত শ্রীভাষ্য বেদার্থসংগ্রহ ও গীতাভাষ্য নামে তিনখানি গ্রন্থ তত্রত্য পুস্তকাগারে রক্ষার জন্য প্রদান করেন। গ্রন্থা-

গারের কর্তৃপক্ষ পণ্ডিতদিগের নিকট বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অভিনব মত ও বেদার্থ-বিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়াতে তাঁহারা রামানুজকে গ্রন্থত্রয় প্রত্যর্পণ করিলেন। গ্রন্থগুলি যে গৃহীত হইবে না তাহা রামানুজ পূর্ব্বেই জানিতেন। সেই স্থানের পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহা সম্মুখবর্তী দেখিয়া রামানুজ পণ্ডিতদিগকে গ্রন্থপ্রতি-পাদ্য বিষয়ের ভ্রম প্রদর্শনার্থ আহ্বান করিলেন। ইহাতে উভয়পক্ষে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিল; পরিশেষে রামানুজেরই জয় হওয়াতে গ্রন্থত্রয় পুস্তকাগারে সাদরে রক্ষিত হইল।

যে কারণে রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সমাজ শ্রীসম্প্রদায় নামে কথিত হন এই সারদাপীঠেই তাহার সূচনা হয়। রামানুজ চরিতাখ্যায়কগণ বলেন, মাতা সরস্বতী আবির্ভূত হইয়া রামানুজকে বেদান্ত সম্বন্ধে কতিপয় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। রামানুজ ক্রমে ক্রমে সকল প্রশ্নেরই সদুত্তর প্রদান করেন। দেবী ভারতী ইহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া রামানুজকে "শ্রীভাষ্য-কার" উপাধি ও হয়গ্রীব-মূর্ত্তি প্রদান করেন। এই সময় হইতেই রামানুজ শ্রীভাষ্যকার" নামে এবং তাঁহার শিষ্যগণ "শ্রীসম্প্রদায়ী" নামে প্রসিদ্ধ হন।

রামানুজ সাত খানি গ্রন্থ লিখেন। তন্মধ্যে (১) শ্রীভাষ্য, (২) বেদান্ত-প্রদীপ এবং (৩) বেদান্তসার, এই তিন খানিই বাদরায়ণ-বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য টীকা বা বিবৃতি। প্রথম খানিতে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ও অন্যও কতিপয় দার্শনিক মতের সমালোচনা আছে। (৪) বেদার্থসংগ্রহ, উপ-নিষদ্ বিষয়ে লিখিত। (৫) গীতাভাষ্য, ভগবদ্গীতার ভাষ্য গ্রন্থ। (৬) গদ্যত্রয়, পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তুতি বিষয়ে গদ্যে লিখিত। (৭) নিত্য-গ্রন্থ, দেব নারায়ণের নিত্য সেবাবিধি বিষয়ক।

রামানুজ শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া কুরুক্ষেত্র অযোধ্যা ও গয়াধাম দর্শন পূর্ব্বক বাঙ্গালায় আগমন করেন। বাঙ্গালায় সুন্দরবনের মধ্যস্থিত কপিলা-শ্রম তীর্থ দেখিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথা হইতে পূর্ব্বঘাট দিয়া রঙ্গক্ষেত্রে যান। এইরূপে তিনি দুইবার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। এই রঙ্গক্ষেত্রেই তিনি ৪২৩৮ কলিগতাব্দে (১১৩৭ খৃঃ অব্দে) ১২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অপ্রকট হন।

রামানুজের শিষ্যসঙ্খ্যা অত্যধিক ছিল। কোন এক সময়ে রঙ্গক্ষেত্রে তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বিচার শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ৭০০ সন্ন্যাসী ১২, ০০০

গৃহস্থ (পরমৈকান্তী), ৫০০ কষ্টী, এবং অনেক বৈরাগী উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই শ্রীসম্প্রদায়ী।

শ্রীসম্প্রদায়ে মঠধারী বা মোহান্ত নাই। তাহার পরিবর্ত্তে পীঠাধিপতি বা আচার্য্যপুরুষ পদের সৃষ্টি হয়। রামানুজ আপনার ৭৪ জন পণ্ডিতাগ্রগণ্য শিষ্যকে পীঠাধিপতি করেন। ইহাঁরা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন। অদ্যাপি ইহাঁদের বংশীয়গণ পীঠাধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রামানুজের অপ্রকটের পর ইহাঁরাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। মতভেদেও সম্প্রদায় ভেদ হইয়া থাকে। শ্রীসম্প্রদায়িগণও দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। তিলক ধারণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা কে কোন্ দলের লোক তাহা চিনিয়া লওয়া যায়। এই দল দুইটি বেদাকলাই ও তেনকলাই নামে প্রসিদ্ধ। বেদাকলাই ও তেনকলাই তামিল ভাষার শব্দ। বেদাকলাই শব্দে উত্তরস্থ বা সংস্কৃত সাহিত্য বুঝায়। তেনকলাই শব্দে দক্ষিণস্থ বা তামিল সাহিত্য বুঝায়। বেদাকলাই দলের লোকেরা সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-দর্শনের প্রতি অতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বেদান্তাচার্য্যকৃত তামিল ভাষায় লিখিত রহস্যগ্রন্থের মত অনুসারেই ইহাঁরা চলিয়া থাকেন। তেনকলাই দলের লোকেরা দিব্য-প্রবন্ধ-গ্রন্থকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু ইহাঁরা লোকাচার্য্যকৃত রহস্য ও উহার মনবাল-মহামুনিকৃত তামিল ভাষ্যোক্ত মত অনুসারেই চলিয়া থাকেন। লোকাচার্য্য রঙ্গক্ষেত্রে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দিতে এবং মনবাল-মহামুনি তিনাবেলি জিলায় খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দিতে প্রাদুর্ভূত হন।

রামানুজের শিষ্যদিগের মধ্যে শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র ও তাঁহার পুত্র ভট্টপরাশর, বরদাবিষ্ণুমিশ্র, সেনেশ্বরাচার্য্য এবং শ্রীবিষ্ণুচিত্তাচার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাঁদের মধ্যে ভট্টপরাশর ও শ্রীবিষ্ণুচিত্তাচার্য্য অনেক গ্রন্থ লিখেন। শ্রীভাষ্যের টীকাকার ভাষ্যাচার্য্য ও দার্শনিক গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দিতে, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহুগ্রন্থলেখক ও কবি মহাচার্য্য খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দিতে প্রাদুর্ভূত হন।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

—*:*:*—

কাম্যবন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কাম্যবনে শ্রীবৃন্দাদেবী বড়ই জাগ্রত। শ্রীল রূপসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যখন লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধার করেন সেই সময় শ্রীবৃন্দাদেবীকে তাঁহারা পাইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীবজ্রনাভের স্থাপিত। আরঙ্গজেব বাদসাহ যখন দেবমন্দিরাদি ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করে, তাহার কিছু পূর্ব্বে জয়পুরের মহারাজা শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোবিন্দ, গোপিনাথ, মদনমোহন এবং আরও কতিপয় শ্রীবিগ্রহ আপন রাজধানীতে লইয়া যান, সেই সঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবী লয়েন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহারাজা আর সকল শ্রীবিগ্রহ গুলি নিরাপদে স্বভবনে লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেম কিন্তু শ্রীবৃন্দাদেবীকে শ্রীব্রজধামের বাহির করিতে সমর্থ হন নাই।

তখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুর যাইতে হইলে কাম্যবনের উপর দিয়া যাইতে হইত। সে রাস্তা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তবে রেল হইয়া সে রাস্তায় আর বড় একটা লোকের গতাগতি নাই। কাম্যবন শ্রীব্রজমণ্ডলের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। যখন মহারাজা শ্রীবিগ্রহগুলি লইয়া গমন করেন তখন কাম্যবনের উপর দিয়া উক্ত পথে গিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহ গুলি রথে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, শ্রীবৃন্দাদেবীর রথ সর্ব্ব পশ্চাৎ-ভাগে থাকে। ঐ রথ কাম্যবন পর্য্যন্ত গিয়া আর চলে নাই; রথ চালাইবার জন্য বহু চেষ্টা, বহু অর্থব্যয় এবং বহু উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, এমনকি হস্তী আনিয়া রথে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই রথ চলে নাই; তখন সকলে ভগ্নোদ্যম হইলেন। পরে শ্রীবৃন্দাদেবীর এই প্রত্যাদেশ হইল যে "আমাকে ব্রজের বাহির করিও না।" যেখানে আমার রথ থামিয়াছে, এই স্থানেই আমাকে স্থাপিত কর। এই স্বপ্নে বিস্মিত হইয়া মহারাজা পরম ভক্তি সহকারে শ্রীবৃন্দাদেবীকে কাম্যবনে স্থাপিত করিলেন এবং সুবৃহৎ এক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, আর তাঁহার সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চারি খানি গ্রাম 'শ্রীবৃন্দাদেবীর' নামে প্রদান করিলেন। অদ্যাবধি ঐ জমিদারির আয় হইতে তাঁহার সেবা চলিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেবাইতের দোষে সেবার যারপর নাই বিশৃঙ্খলতা।

শ্রীবৃন্দাদেবীর অসীম মহিমা। এখনও ইঁহার অনেক অলৌকিক কার্য্য

দেখা যায়। বড় অধিক দিনের কথা নহে একদা রাত্রিকালে শ্রীদেবীর বাড়ীতে দুইজন চোর চুরি করিবার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে; বাড়ীটী সুবৃহৎ; তাহাতে অনেকগুলি মহাল উপর নিচে কোথায় কত ঘর তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্ব মধ্যস্থলে শ্রীমন্দির। চোরদ্বয় প্রথমে বাটীর প্রথম মহলে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া আর পথ দেখিতে পায় না অন্ধের ন্যায় সারারাত্রি কেবল বাহির মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, না পাইল মন্দির প্রবেশ দ্বার, না পাইল বহির্গমনের পথ। এইরূপে সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রভাত হইয়া গেল, আর মন্দিরের লোকজন তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া ফেলিল। পরে তাহারা সমস্ত ঘটনা বলিলে সকলে বিস্ময়ান্বিত হইয়া চোরদ্বয়কে ছাড়িয়া দিল। এইরূপ আরও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। আমিও স্বচক্ষে একটী ঘটনা দেখিয়াছি। ক্রমশঃ।

অকিঞ্চন—শ্রীআশুতোষ বসু দাস।

—০:*:০—

যমুনা সলিলে রাই কমলিনী।

গীত।

হংস গমনে সখীগণ সনে, উপনীত রাই যমুনা পুলিনে;
নিরমল ভানু উজল ভাতি, মৃদুল মারুত তাহার সাথ,
উলসিত জলে হংসিনী পাতি, প্রেমে মাতি মাতি হংস সনে॥
মনোমত কত পাখী করে গান, কোকিলা কুহরে পঞ্চম তান,
থর থর কাঁপে বিরহিণী প্রাণ, জর জর স্মর কুসুম বাণে।
উনমত শিখী শিখিনী সঙ্গে, উল্লাসে বিলাসে মদন রঙ্গে,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গুঞ্জে, মধুর গুঞ্জে মধুপ গণে॥
কুসুম সঙ্গিনী সরস রাশি, সুবাস মিশিল পবনে আসি,
অধরে মৃদুর মধুর হাসি ছুটা ছুটী করে বধুয়া সনে।
চমকি চপলা ঝলসি আঁখি, ছুটীছে হরিণী পুলক মাখি,
সন্ সন্ রবে কুসুমিত শাখী, গোপন কাহিনী গোপীর কাণে॥
অমল প্রকৃতি বিমল হাসিনী, বহিছে যমুনা মধুর ভাষিণী;
বাজিছে নূপুর গাহিছে গোপিনী, হরি গুণ গান ললিত তানে॥
পশিল সলিলে ব্রজেরি বালা, বিকসিত নব কমল মালা,
আনন্দ বিভোলা করে কত খেলা, ত্রিতাপ নাশিনী যমুনা সনে॥

কুলু কুলু রবে ধায় তরঙ্গিণী, ভাবে ঢুলু ঢুলু রাধা বিনোদিনী,
ক্ষণেক অম্বর ক্ষণেক বেণী, চাহে ঘন পুনঃ যমুনা পানে॥
কভু হাসি ধরে সখিনী গলে, কভু ভাসে রাই নয়নেরি জলে,
কি জানি কি বলে আধ আধ বোলে, কি ভাব রাধার প'ড়েছে মনে॥

(২)

হেন কালে আচম্বিতে, (বলে) দেখ গো দেখ ললিতে,
চেয়ে দেখ কদম্বেরি বনে।
(আর) দেখ গো যমুনার জলে, আপন হৃদি কমলে,
কেলিকদম্ব-মূল স্থানে॥
(কিবা) শীতল শ্যামর কাঁতি, কোটি চন্দ্র জিনি ভাঁতি,
মধুর মূরতি মধু নামে।
(কিবা) মধুর মধুর হাসি, মধুর অধরে বাঁশী,
মধুর চাহনি নয়ন কোণে॥
(কিবা) মধুর ত্রিভঙ্গ ঠাম, মধুময় নিত্যধাম,
মধুরতা মধুর মিলনে॥

শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্ত। গোফ্‌ডা।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার গণ।

বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে ইস্‌লাম, (বা মুশলমান) খৃষ্ট, বৌদ্ধ ও হিন্দু মতই প্রবল। ইহার মধ্যে হিন্দু মত আদি ও সনাতন, বৌদ্ধ মত হিন্দু ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। তাহার পর খৃষ্ট ও ইস্‌লাম মত। বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুশলমানগণ অবতারবাদ স্বীকার করেন না, অর্থাৎ শ্রীভগবানচন্দ্রের লৌকিক দেহ জগতে প্রকট হওয়া তাঁহারা মানেন না বটে, কিন্তু কার্য্যত তাঁহারা অবতারবাদ মানেন। মহম্মদ ভগবানের "দোস্ত" বা বন্ধু। এবং ইসু ভগবানের "পুত্র"। কিন্তু এই মহম্মদ ও ইসু বাদ দিলে খৃষ্ট ও মুশলমান মতের বা সমাজের আর বন্ধন থাকে না। উপরোক্ত ধর্ম্ম সমাজের মধ্যে আবার শাখা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই মূল বিশ্বাস এক, অর্থাৎ মহম্মদের প্রতি ও ইসুর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর।

হিন্দুদিগের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় আছেন। ইহার মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারাই অবতারবাদ মানেন, আর যাঁহারা শাক্ত বা অপর সম্প্রদায়-ভুক্ত তাঁহারা অবতার মানেন না। কিন্তু অবতারবাদ ত্যাগ করিলে সমাজ-বন্ধন দৃঢ় বা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি হয় না যে তাহা নহে, তবে কম হয়। যদি কেহ ভারতের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাহাতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

আমি শাক্ত বা অন্য সম্প্রদায়িদিগের সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না, কারণ আমাদিগের পক্ষে তাহা অনধিকার চর্চ্চা হইবে। যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন বা বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত যে, সমস্ত ভারতে না হউক অন্তত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা একত্রিত হইয়া এক মত ও এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে পারেন কি না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি অবতার-মত বাদ দিলে জীবন্ত ধর্ম্ম হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা, শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি মিথিলা, অযোধ্যা প্রভৃতি। সুতরাং বাঙ্গালি সে লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন তাহার আশা কম। তাহার পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার কেহ ত্রেতা কেহ দ্বাপরে প্রকট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কলিকালে, এই বাঙ্গলাদেশে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েন। তিনি অপর বাঙ্গালির ন্যায় ধুতি পরিতেন, ভাত খাইতেন, মোচার ঘণ্ট ও শাক ভাল বাসিতেন এবং বাঙ্গ-লায় কথা বলিতেন। সেই গৌরচন্দ্রকে কি সমগ্র বাঙ্গালি চিনিবেন না? ও তাঁহার পদাশ্রয় করিবেন না?

এক গৌরচন্দ্র ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালীর গৌরবের আর কি কিছু আছে? এই গৌরচন্দ্রের কৃপায় বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিগণের অভ্যুত্থান ও তাঁহারাই বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালির আদি কবিগণ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরণাশ্রিত। সুতরাং এক গৌরচন্দ্র ছাড়া বাঙ্গালির আপনার বলিতে আর কিছুই নাই।

যদি বাঙ্গালিগণ একত্র হইয়া সেই গৌরচন্দ্রের চরণাশ্রয় করেন, তবেই বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি হইবে, তবেই বাঙ্গালি একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

আর এক কথা—এক গৌরপ্রবোধিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া অপর কোন

হিন্দু সম্প্রদায় অহিন্দুকে শীতল ধর্ম্ম ছায়া দান করেন না। পূর্ব্বে অনেক মুসলমান নিজ নিজ ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের হিন্দু-সমাজ ক্ষীণ হইতেছেন যাঁহারা বিলাত গেলেন তাঁহারা পুনরায় ইচ্ছা করিলেও আর সমাজে আসিতে পারিলেন না। যাঁহারা খ্রীষ্টান হইলেন তাঁহারা সমাজে স্থান পাইলেন না। এইরূপ করিয়া হিন্দু-সমাজ দিন দিন হীনবল হইতেছেন। যদি ইঁহারা প্রকৃত শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করেন তাহা হইলে ইঁহাদিগের ইহকাল পরকাল উভয়েরই উপকার হইতে পারে।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

যুগল রূপ।

এমন মধুর রূপ, কভু না হেরিনু গো
কিবা আজি দেখি ভাগ্যক্রমে।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম তনু, ঈষৎ হেলায়ে গো,
দাঁড়ায়েছে রাধা ল'য়ে বামে॥
তমাল তরুর পাশে, কনক ব্রততী গো,
কিম্বা নব জলধর কোলে।
চঞ্চলা চপলা আজি, স্থির হ'য়ে আছে গো,
আস্বাদ লভিতে প্রেম ফলে॥
শ্যামের চাঁচর কেশে, চূড়ার বলনী গো,
তাহে চারু শিখি পাখা উড়ে।
রাধার শিরেতে বেণী, যেন কালফণী গো,
শিখি সঙ্গে রঙ্গে ক্রীড়া করে॥
শ্যামের ললাটে শোভে, চন্দন অলকা গো,
যেন নবমেঘে বকপাঁতি।
রাধার সিঁথির পরে, সিন্দুরের বিন্দু গো,
কত কোটী সূর্য্য জিনি দ্যুতি॥
ভুরুযুগ সুবলনী, কামধনু জিনি গো,
মুখরুচি শুচি সম শোভে।

দোঁহার সুন্দর রূপ, ভুবন ভুলান গো,
কেবা কোথা দেখিয়াছে কবে ?
বনজ কুসুম দাম, শ্যাম গলে দোলে গো,
মধু লোভে মধুপ ঝঙ্কারে।
শ্রীমতীর কণ্ঠদেশে, নানা আভরণ গো,
কানু মন ভুলাবার তরে॥
পীতবাস কটি'পরে, শোভে পীত ধটী গো,
আর বাজে মধুর কিঙ্কিণী।
রাধারে সেজেছে ভাল, নীল পাট সাড়ী গো,
যেন মেঘে ঝাঁপল দামিনী॥
শ্যামের কমল করে, মোহন মুরলী গো,
যাহা সদা সাধা রাধা নামে।
কনক কমল শোভে, শ্রীরাধার করে গো,
ভুলাইতে কত কোটী কামে॥
দোঁহার চরণ'পরে, মণির মঞ্জীর গো,
রুনু ঝুনু বাজে বার বার।
শ্রবণে পশয়ে যার, বড় ভাগ্যবান্ গো,
সত্য সত্য বিমুক্ত সংসার॥
এমন সুন্দর করি, কোন কারিগরে গো,
কুঁদিল এ পিরীতি মূরতি।
অমৃত ছানিয়া কেবা, অমৃত ঢেলেছে গো,
তনু যুগ চিকণ তেমতি॥
শশীরে নিঙাড়ি কেবা, বদন মাজিল গো,
বিম্বফল কে দিল অধরে।
মরি কি মধুর হাসি, সে যে সুধারাশি গো,
যোগী জনে যোগভঙ্গ করে॥
করি শুণ্ড জিনি কেবা, ভুজ নিরমিল গো,
কেশরী জিনিয়া ক্ষীণ কটি।
দরপণ জিনি আহা, বক্ষ পরিসর গো,
নীলোৎপল সম আঁখি দুটী॥

পদনখে প'ড়ে যার, কোটী চন্দ্র আছে গো,
অনুপম যুগল মূরতি।
দোঁহার উপমা স্থল, এ মহীমণ্ডলে গো,
খুঁজিলেও না পাইবে কতি॥
উভয়ের রূপ রসে, উভয়ে ভাসিছে গো,
কি আনন্দ না যায় কহনে।
এ হেন মুরতি দেখি, (যার) চিত না গলিল গো,
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবনে॥
যুগল চরণ ভিন্ন, অন্য গতি নাই গো,
ভজ মন হয়ে সুসংযত।
পাবে সেবা অধিকার, যাতনা না রবে গো,
ব্রজে বাস হবে অবিরত॥
শুন শ্যাম গুণধাম, নিবেদি চরণে গো,
যবে মম যাইবে জীবন।
মানস কদম্ব মূলে, রাধা বামে ল'য়ে গো,
কৃপা করি দিও দরশন॥

শ্রীপঞ্চানন কবিরাজ। শ্রীখণ্ড, ঠাকুর পাড়া।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ।

অনুষ্ঠানপত্র।

ভারতবর্ষের কোথায় কত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন, কোথায় কত গৌরভক্ত বিরলে বসিয়া সাধন ভজন করিতেছেন, কোথায় কত স্থান আমাদের প্রভুর শুভ পদার্পণে তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, কোথায় কত উপাদেয় অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোথায় মহাজনদিগের কত সুমধুর পদ ক্রমে লোকের স্মরণপথের অতীত হইয়া পড়িতেছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

যিনি জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য, দীনের দীন হইয়া, জাতি বিচার না করিয়া, আচণ্ডালকে হরিনাম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন; অধম পতিতজনের প্রতি তাঁহার করুণার সীমা ছিল না; জীবে সহজে দুর্লভ হরিনাম পাইবে

বলিয়া যিনি খোল করতাল, গোলকচ্যুত সুর ও উন্মাদকারী কীর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; যাঁহার কৃপাবলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শ্রীভগবান করুণাময়, তিনি আমাদের নিজ জন আর তাঁহার প্রাপ্তির জন্য সাধন ভজনা করিতে সকলেই সমান অধিকারী; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবান বলিয়া যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন,—আমাদের সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের এই অমূল্য চিহ্ন গুলি কি এইরূপে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে? যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য এত কঠোর করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কি আমরা কিছুই করিব না? আমরা মনে করিলে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, নিস্বার্থভাবে চেষ্টা করিলে, আমাদের প্রভুর অনেক প্রিয় কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু ইহা দুই এক জনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে সকলের এক মন এক প্রাণ হইতে হইবে, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি স্থাপন করিতে হইবে।

এই কার্য্য উদ্ধারের জন্য একটী সমাজ সংগঠনের প্রস্তাব হইতেছে। ইহার নাম—

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ।

এই সমাজের মোটামুটি উদ্দেশ্য গুলি নিম্নে বিবৃত করিতেছি:—

১। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ সংস্থাপন।

২। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের মঙ্গলের জন্য যে সরল ও সহজ ধর্ম্ম-পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সাধারণে তাহার প্রচার করা। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করা যাইবে। যথা:—

(ক) নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার। এই নাম-সংকীর্ত্তন আমাদের প্রভুর একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহার শক্তিও অসাধারণ। তাপিত হৃদয় শীতল করিবার, অশান্ত মনে শান্তি দিবার, এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই। যদি নগরে নগরে, পল্লিতে পল্লিতে, গৃহে গৃহে, এই নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারিত হয়, তবে জীবের অনেক দুঃখ দূর হইবে।

(খ) সুলভ গ্রন্থ প্রকাশ। সরল ভাষায় প্রভুর লীলা, ভক্তদিগের জীবনী, কিম্বা বৈষ্ণবধর্ম্মের সারমর্ম্ম লিখিয়া প্রকাশ করিলে যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে, শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত, শ্রীকালাচাঁদ গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। সুলভ মূল্যে নানা ভাষায় এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা যদি

প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে যে ইহা ঘরে ঘরে পঠিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

(গ) বক্তৃতা প্রদান। মর্ম্মগ্রাহী ভক্ত যখন হৃদয় খুলিয়া গদ্গদ স্বরে প্রভুর মধুর লীলা বর্ণন করেন, কি তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝাইয়া দেন তখন কে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে?

(ঘ) সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ প্রকটন। সাময়িক পত্র ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এদেশবাসীগণ সাময়িক পত্রের আদর করিতে শিখিতেছেন। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ ও রসজ্ঞ ভক্ত, বৈষ্ণবধর্ম্ম কি প্রভুর লীলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিলে, সকলেই উহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন।

৩। অনেক অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থ ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহাও রক্ষা করিতে পারিলে, কেবল বৈষ্ণব সাহিত্য বলিয়া নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যের ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ উপকার হইবে। এই সমাজ এই সকল যথাসম্ভব উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিবেন।

৪। মহাজনদিগের অনেক সুমধুর পদ মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। আমরা শৈশবাবস্থায় যে সকল পদ গান করিতে শুনিয়াছি এখন তাহার অনেক শুনিতে পাই না। আবার, এখন যাহা শুনিতে পাই, আর কিছু দিন পরে তাহাও হয়ত শুনিতে পাইব না। সমাজ এই সকল লুপ্ত পদের পুনরুদ্ধার ও অলুপ্ত পদের রক্ষা বিধানের চেষ্টা করিবেন।

৫। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির বদন নিঃসৃত সেই সুমধুর সঙ্গীত এখন আর প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীত দেশ হইতে ক্রমে লোপ পাইতেছে। এই সমস্ত ও পূজ্যপাদ মহাজনদিগের সুর-তাল-লয়-সম্বলিত সঙ্গীত উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিবার জন্য, এই সমাজের একটী সঙ্গীত বিভাগ থাকিবে। এই বিভাগ হইতে ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়া দ্বারা প্রাচীন মহাজনী সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৬। ভক্তদিগের জীবনী পাঠে যেরূপ শিক্ষা লাভ করা যায়, এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আমরা অনেক গৌরভক্তের কথা শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাদের জীবনী বিশেষ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমস্ত ভক্তদিগের জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা সমাজের একটী প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে।

৭। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে ভারতের অনেক স্থানে গমন করেন। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কোন না কোন চিহ্ন রহিয়াছে; এমন কি সেই স্থান একটী তীর্থস্থান রূপে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অনেক স্থানই আমরা জ্ঞাত নহি। এই সকল স্থান উদ্ধার করিতে এবং লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থান গুলি রক্ষা করিতে এই সমাজ বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

৮। সমাজের সভ্যগণের মিলিত হইবার জন্য ও কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিবে। এই স্থানে সময় সময় গ্রন্থ পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা এবং কীর্ত্তনাদি হইবে।

৯ এই সমাজের একটী পুস্তকাগার থাকিবে। এখানে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠানপত্র খানি প্রকাশ করিলাম। পাঠ করিলেই পাঠক মহোদয়গণ ইহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ একটী সমাজের অভাব আমাদের বরাবর রহিয়াছে। এই সমাজ সংগঠিত হইলে আমাদের যে বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক প্রভু সন্তান, গোস্বামী সন্তান, মহান্ত সন্তান এবং কৃতবিদ্য ভদ্র মহাশয়গণ বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাতে যোগদান করিতেছেন। যাঁহারা ইহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীপ্রিয়াজীর গণের বন্দনা।

প্রথমে বন্দিব আমি ঠাকুরাণীর ভাই।
বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই যাদব গোঁসাই॥
বিবাহের পর দিন মিশ্র সনাতন।
নিমায়ের হাতে কৈলা যাদবে অর্পণ॥
সনাতন কহে নিমাই রাখিবা এই কথা।
মোর এই পুত্রটীকে পালিবা সর্ব্বথা॥
তথাস্তু বলিলা গোরা শ্বশুর কথায়।
যাদবের গণে তাহে অন্ন দুঃখ নাই॥
মহিমা যাদব-গণের কহিতে জানিনে।
গৌরে বাটা দেয় প্রতি ষষ্ঠি-বাটা দিনে॥
তাপরে বন্দিব আমি শ্রীবংশীবদন।
শাশুড়ী বধূর দুঃখ যে কৈলা বর্ণন॥
প্রসাদ মাগিল বংশী জাহ্নবার ঠাঁই।
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস বলি না দিলা গোঁসাই॥
যখন ভুবন-বন্ধু হৈলা অদর্শন।
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে ভাবেন ত্যজিব জীবন।
তবে বংশী শ্রীগৌরাঙ্গ ঠাকুর গড়িলা॥
সেই ঠাকুর দেখি দেবী পরাণ রাখিলা॥
স্বর্ণ সীতা গড়ি রাম জীবন রাখিলা।
এই অবতারে দেবী সেই শোধ দিলা॥
তাপরে বন্দিব আমি ঠাকুর কানাই।
সব ত্যজি পড়ি রহে দেবী-রাঙ্গা পায়॥
মা ব'লে ডাকেন কানাই দেবীর সেই পুত্র।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যেই করিলা একত্র॥
যতনে বন্দিব আমি গদাধর দাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া লাগি যেবা নদে কৈলা বাস॥
গদাধর গৌরনিতাই উভয়েরি গণ।
দুঁহে ত্যজিলেন, পাই দেবীর চরণ॥

দেবী অদর্শনে তবে ছাড়িলা নদীয়া।
কাটোয়ায় গিয়া শেষে রহিলা পড়িয়া॥
মনসুখে বন্দি আমি দামোদর পণ্ডিত।
প্রভু-সংবাদ দিয়া দেবীর পরাণ রাখিত॥
তাপরে বন্দিব আমি দুঃখিনী কাঞ্চনা।
সখীগণ মাঝে যার ললিতা গণনা॥
কৃষ্ণ-পাগলিনী নাম দিল ন'দেবাসী।
বিষ্ণুপ্রিয়া সনে যেই কান্দে দিবানিশি॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়।
বলরামে দেখ দেবি তব রাঙ্গা পায়॥

—*:*:*—

মহাপ্রভুর চিত্রপট।

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিবার সময় যখন আমি মুর্শিদাবাদ প্রদেশ ভ্রমণ করি, সে সময় কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্রেয় বংশের বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কাছে গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার কাছে যে সকল প্রাচীন বস্তু দর্শন করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে মহাপ্রভুর একখানি অপূর্ব্ব চিত্র দর্শন করি। ভগবান গৌরাঙ্গদেব যে সময় নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সময়ে ইহা চিত্রিত হইয়াছিল। আচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহারাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। তিনি মহারাজার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বংশপরম্পরাগত চিত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই অবধি ইহা অতি যত্নের সহিত বয়োবৃদ্ধা রাণীমাতার কাছে অন্তঃপুরে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। চিত্র খানিতে দেখিলাম, মহাপ্রভু বসিয়া আছেন, বোধহয় যেন মহারাজা প্রতাপরুদ্র দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন, একজন, বোধহয় গদাধর, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" এই শ্লোকটী লিখিত আছে। অপর ৪।৫ জন ব্যক্তিপাঠ শ্রবণ করিতেছেন। ছবি খানি অত্যন্ত জীর্ণ একটি বাক্সের ভিতর সুরক্ষিত। এরূপ কথিত হয় যে, রাধামোহন প্রভু ঐ বাক্স সহিত ছবি খানি মহারাজ নন্দকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীসত্যচরণ শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য সম্বন্ধিনী বক্তৃতা।

ইতিপূর্ব্বে ভাগলপুরের শ্রীশ্রীহরি সভায় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গুপ্ত মহাশয় "প্রকৃতির লীলা" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, লালিত্য লীলায় বক্তৃতাটী শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করিলেও, কেহ কেহ কোন কোন স্থল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল অংশ বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ। সুতরাং বৈদান্তিক জ্যোতির সাহায্য লইয়া দেখিলেই তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় উদ্ভাসিত হইবে।

"প্রকৃতির লীলা" শীর্ষিকা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বক্তৃতাটী শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধিনী। এবং বোধহয় ভাগলপুরের ধর্ম্ম-সভায়, হয়ত সমগ্র বেহার প্রদেশের মধ্যে, শ্রীচৈতন্য বিষয়িণী বক্তৃতার এই প্রথম অবতারণা।

বক্তা বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীত্রিভঙ্গ মুরলীধরে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয় বিভূতিই বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যে নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান যখন প্রকৃতির প্রধান শক্তিত্রয়ে, অর্থাৎ সন্ধিনী শক্তি, চিৎ বা সম্বিৎ শক্তি ও হ্লাদিনী শক্তি, এই শক্তিত্রয়ে উপস্থিত হইয়া ত্রিভঙ্গ সচ্চিদানন্দ রূপে বিরাজ করেন, তখন চিদংশে ঐশ্বর্য্য, হ্লাদিনী বা আনন্দাংশে মাধুর্য্য, এই উভয় বিভূতিই সেই সন্ধিনীশক্তি সম্পন্ন সৎ পুরুষে বর্ত্তমান থাকে।

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্ব সংশ্রয়ে।"—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

> "সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
> অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
> আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
> চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"—শ্রীচরিতামৃত।

কিন্তু যখন তিনি অনুপহিত-চৈতন্য বা তুরীয় রূপে অবস্থিত, তখন তাঁহাতে কেবল মাত্র মাধুর্য্য উপলব্ধ।

"আপনার মাধুর্য্য হেরে আপনার মন" ইত্যাদি। শ্রীচরিতামৃত।

প্রবিবুক্ত ভুগিত্যাদি শ্রুতেঃ।

বিলোম বা ব্যুৎক্রমণ প্রথানুসারে বিশ্লেষণ করিলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ এক মহাশক্তি মাত্রে পরিণত হয়। ন্যায়, বৈশেষিক ও অধুনাতন দার্শনিকদিগের পরমাণু, বৌদ্ধদিগের ধাতু, সাংখ্যের তন্মাত্র ও বেদান্তের সূক্ষ্ম ভূতগ্রাম ইত্যাদি জড় জগতের উপাদান কারণ বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে, তৎ সমুদায়ই এক মাত্র ব্রহ্ম-শক্তিতে লয় পায়। সুতরাং ব্রহ্ম-শক্তি ভিন্ন জড় জগতের অন্য জড়োপাদান নাই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু দেখিতে গেলে ঐ শক্তি অগ্রে ইচ্ছা করিয়া পরে তদনুসারে কার্য্য ও তজ্জন্য সুখ দুঃখাদি বোধ করেন বলিয়া উপলব্ধ হয় না। প্রত্যুত, সে শক্তি তামসী বা অবিদ্যা শক্তি, চিচ্ছক্তিনামা কুঞ্জরপৃষ্ঠে চালকবৎ শক্ত্যন্তরের অধিষ্ঠানে চালিত। সেই চিচ্ছক্তি যাঁহার তিনিই ব্রহ্ম।

"জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায়তামসীং।
নিমিত্তং সত্ত্ব শুদ্ধাংশ্চ উচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা॥"—পঞ্চদশী।

ব্রহ্মই চৈতন্য। সেই চৈতন্যের শক্তি যখন বিক্ষিপ্তা হন, তখনই জগত সৃষ্টি হয়।

"বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।"—ইতি শ্রুতেঃ।
তমঃ প্রধান বিক্ষেপশক্তি মদজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশরিত্যাদি বেদান্তসারঃ

মনুষ্য প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ, কৃমি প্রভৃতি স্বেদজ ও তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জীব দেহ যে স্থানে পচিয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে, তথাকার একমুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া বিশ্লেষণ করিলে পাঁচ প্রকার অমিশ্র পদার্থে বিভক্ত হইয়া পড়ে। (১) গন্ধের অণু; (২) জলের বা তাহার কারণীভূত জলযান ও অম্লযান প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থের অণু; (৩) উক্ত বায়বীয় পদার্থের অন্তর্গত তাপ; (৪) চঞ্চল সূক্ষ্ম বায়ু বা সামান্য ইথার নামক পদার্থ; (৫) স্থির ইথার বা ব্যোম। সুতরাং ব্যোমই কোন শক্তি কর্তৃক প্রচালিত বা প্রকম্পিত হইয়া ঐ চঞ্চল ইথরে বা মরুৎ প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থে পরিণত হইয়াছে। যথা, শক্তি কর্তৃক প্রচালিত হইলেই স্থির ইথার বা ব্যোমের কিয়দংশ মরুৎ বা চঞ্চল ইথারে পরিণত হয়। সেই প্রকম্পনের গতি বৃদ্ধি হইলেই সেই মরুৎ হইতেই তাপ বা তেজ উৎপন্ন হইয়া ঐ মরুতের অংশ বিশেষকে অম্লযান ও জলযান ও দীপক প্রভৃতি বায়ুতে পরিণত করে। শক্তির প্রভাবে তাপ হইতে বিযুক্ত হইলেই জলযান প্রভৃতি বায়ু, বায়বীয় অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলীয় ও তৎপরে কঠিন অবস্থাও ধারণ করে। এই কঠিন অবস্থা অর্থাৎ তুষার শিলা এবং কস্তুরি অর্থাৎ সমুদ্রের ফেণ-পুঞ্জ ও গন্ধক, (ক্লোরিন) শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্র জলে দ্বীপাদির সৃষ্টি করে। এই দ্বীপাদিরই নামান্তর মেদিনী এবং পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ জীব

শরীর সেই মেদিনীর বিকার মাত্র। অতএব ব্যোম হইতে মরুৎ; মরুৎ হইতেই তেজ, তেজ হইতেই জল, জল হইতেই পৃথিবী। শক্তি সংঘাতে স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব জগত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই ব্যোমও শক্তির এক প্রকার বিশেষ বিকাশ মাত্র। তাহা হইতে কোন বিভিন্ন পদার্থ নয়। ফলতঃ ব্রহ্মশক্তি হইতে প্রসূত।

"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যোষধয়ঃ ওষধিভ্যোঽন্নং, অন্নাদ্রেতঃ, রেতসঃ পুরুষ" ইত্যাদি।—শ্রুতেঃ।

ফলিতার্থ, বিবিধ শক্তির যে সাম্যাবস্থা বা সর্ব্বশক্তিমত্তার যে স্থির ভাব, তাহাই "প্রকৃতি"। এবং সেই প্রকৃতি যাঁহার তিনিই পুরুষ বা চৈতন্য। যেমন "আমি" এইটি অনুভব করিতে গেলে, কোন এক প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট আমি বলিয়া বুঝিতে হয়, সেই প্রকৃতির সহিত আমিত্বের পার্থক্য বোধ হয় না, উভয়ই এক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ পুরুষ ও তাঁহার প্রকৃতি অস্বতন্ত্র ও এক। সেই প্রকৃতি চৈতন্যের ইচ্ছায় কার্য্যশীলা হইলেই চৈতন্য ঈশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। সুতরাং ঐ কার্য্যশীলা প্রকৃতি বা শক্তিই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য।

"মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।"—পঞ্চদশী।

প্রকৃতি উক্ত প্রকার কার্য্যশীলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে লীনা হইলেই, সেই প্রকৃতিই মাধুর্য্য। বক্তা বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিই সকল পদার্থের উপাধি। প্রাতিপদিক বা ধাতুনিষ্পন্ন সমস্ত পদ ও সমস্ত পদার্থই প্রকৃতিমূলক। শব্দ শাস্ত্রাদি হইতে তাহার উদাহরণ দিয়াও তিনি বুঝাইয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্য বা তুরীয় ব্রহ্ম পদার্থের উপাধিও প্রকৃতি। কিন্তু সেই উপাধি অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম পদার্থের প্রকৃতি পরমাত্মপ্রকৃতি ঈশ্বরের কার্য্যশালিনী প্রকৃতির ন্যায় লীলাময়ী নহেন। পরমাত্মপ্রকৃতির শক্তি বাহ্য বিকশিতা নহে। বীজান্তর্গত বিপুল বট বৃক্ষের ন্যায় সেই প্রকৃতির সর্ব্ব ব্যাপার সম্পাদন পটীয়সীশক্তি সেই প্রকৃতিতেই নিহিতা। এবং সেই প্রকৃতিও স্বয়ং অদ্বয় ভাবে তুরীয় পদার্থে বা চৈতন্যে নিহিতা। এই অবস্থায় প্রকৃতি সমস্ত বহির্ব্যাপার অর্থাৎ বহির্মুখত্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পরম রস তুরীয় রূপ অমৃত-সিন্ধুতে আত্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ও সেই রসাস্বাদনে আত্মবিস্মৃতা। নিজ অস্তিত্বের উপলব্ধি পর্য্যন্ত হারাইয়া সেই

রসময়ের সরস বক্ষঃস্থলে শয়িতা। প্রকৃতির এই যে ভাব ইহাই মধুর ভাব। এবং প্রকৃতিকে যে এই ভাবে স্বীয় মধুময় ক্রোড়ে স্থান দেন, তাহাই সেই মধুময়ের মাধুর্য্য। এই মিলনেই প্রকৃতি ও পরমাত্মার পরমানন্দ ভোগ হয় ও প্রকৃতির এই পরমানন্দদায়িকা শক্তিকেই হ্লাদিনী শক্তি কহে। ইহা বুঝিবার জন্ত অন্য স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। সাধন বলে আত্মতত্ত্ব বোধ হইলেই মানুষ ইহার অপরোক্ষানুভূতি পাইতে পারেন। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্দৃষ্টি রোধ করিয়া, অচলভাবে সেই পরমাত্মাতে আত্মনিবেদন অর্থাৎ বেদনা বা উপলব্ধি শূন্য হইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া দেন তিনিই এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ।

প্রযহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতা'ন্। আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্ট, ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য ও শ্রীপ্রহ্লাদের নববিধা ভক্তি লক্ষণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান যে আত্মনিবেদন, তাহাই এই মাধুর্য্য ভাবের পরিচায়ক। এই মাধুর্য্যই বক্তা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এবং শ্রীচৈতন্য অর্থাৎ কেবল মাত্র তুরীয় পদার্থে এই মাধুর্য্যের অবস্থিতি বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন।

বেদান্ত প্রতিপাদ্য মহাবাক্য সকলের ন্যায় এই চৈতন্য শব্দটিও বক্তা দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটি বাচ্যার্থ ও অপরটি লক্ষ্যার্থ। যেরূপ "অয়োদহতি" অর্থাৎ তপ্ত লৌহ হস্ত পোড়াইতেছে, এই কথা যদিও বাচ্যার্থে তাপানুপ্রবিষ্ট পরমাণু-সমষ্টি লোহার তালটিকে বুঝায়, তথাপি লক্ষ্যার্থে তন্নিহিত দাহিকা শক্তি মাত্র বুঝাইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য শব্দে *যদিও বক্তা বাচ্যার্থে প্রেমের অবতার মনুষ্য বেশধারী—মহাপুরুষের উল্লেখ* করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য তদধিষ্ঠিত তুরীয় পদার্থ।

"আধার ভূতানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞান তদুপহিতচৈতন্যয়ো·

রাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তৎ তুরীয়ং ইত্যুচ্যতে:—বেদান্তসারঃ।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, চৈতন্য প্রসুপ্তা প্রকৃতি গুণক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া লীলা অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেই, সেই প্রকৃতিই ঐশ্বর্য্য। প্রকৃতি লীলাবতী হইবামাত্রই সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং সেই সর্ব্বাতীত তুরীয় পদার্থ (যাহাকে বক্তা শ্রীচৈতন্য বলিয়া বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন) ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তার ভাব গ্রহণ করেন। প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রসবিনী এই যে শক্তি তাহারই নাম চিচ্ছক্তি। সুতরাং এই চিচ্ছক্তিকে বক্তা ঐশ্বর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

"সোঽকাময়ত্তো বহুস্যাং" ইতি শ্রুতেঃ। সৃষ্টির কামনারূপ ঐশ্বর্য্য অবলম্বন করিয়া চৈতন্য ঈশ্বর নামে, সূক্ষ্ম সৃষ্টিরূপ ঐশ্বর্য্য অবলম্বনে হিরণ্যগর্ভ নামে ও স্থূল সৃষ্টি রূপ ঐশ্বর্য্য অবলম্বনে বিরাট নামে অভিহিত হন। আর এই তিন ভাবের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ত্রয়ের অতীত হইলেই, মাধুর্য্য ভাবাপন্ন তুরীয় বা চতুর্থ বলিয়া উক্ত হন। শ্রীচৈতন্য নিজ শক্তিতে অভিমান বা নিরভিমান বশতঃই এই চারি প্রকার অবস্থা ধারণ করেন। অর্থাৎ "বিরাট" "হিরণ্যগর্ভ" "ঈশ্বর" অবস্থা অভিমান বশতঃ ও তুরীয় অবস্থা নিরভিমান জন্য। এই অবস্থা চতুষ্টয়ই বৈষ্ণবশাস্ত্রোল্লিখিত যথাক্রমে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ ও বাসুদেব নামাভিহিত চতুর্ব্যূহ।

"একা ভগবতা মূর্ত্তির্জ্ঞানরূপাশিবামলা। বাসুদেবাভিধানা সা গুণাতীতা সুনিষ্কলা।

দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামসী শেষ সংজ্ঞিতা। নিহন্তি সকলাংশ্চান্তে বৈষ্ণবী পরমা তনুঃ।

সত্ত্বোদ্রিক্তা তৃতীয়ান্যা প্রদ্যুম্নেতি চ সংজ্ঞিতা। জগৎ স্থাপয়তে সর্ব্বং সা বিষ্ণুপ্রকৃতিধ্রুবা।

চতুর্থ বাসুদেবস্য মূর্ত্তি র্ব্রাহ্মী সুসংজ্ঞিতা বাজসী অনিরুদ্ধাখ্যা প্রাদ্যুম্নী সৃষ্টিকারিকা।

বাসুদেবো হ্যনন্তাত্মা কেবলো নির্গুণোহরিঃ॥—কূর্ম্মপুরাণ।

এই বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ, এই বাসুদেবই পরমাত্মা, এই বাসুদেবই তুরীয়, বাসুদেবই গোলকপতি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত দ্রব্যগুণ কর্ম্মাদি সমস্ত পদার্থেরই পতি। এই বাসুদেবই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দানন্দবর্দ্ধন, এই বাসুদেবই নিকুঞ্জবনে নব কিশোর আত্মনিবেদিতা মোহিতা প্রসুপ্তাহ্লাদিনী শক্তিকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে যুগলমিলনে এক তনু হইয়া বিলাস মূর্ত্তিতে বিরাজিত, এই বাসুদেবই শ্রীচৈতন্য শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রেমরূপ মাধুর্য্যের আধার।

সেই জন্যই বক্তা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের উপাধি বা শক্তি তাহা চিচ্ছক্তি, কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে শক্তি তাহা হ্লাদিনী শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি জগদাদি ঐশ্বর্য্য প্রসবিনী, শ্রীচৈতন্যের শক্তি কেবলমাত্র শ্রীপ্রেমরূপা—মধুর ভাবে আত্মহারা। সংসারী ঈশ্বরের প্রকৃতি লীলাময়ী সংসারত্যাগী শ্রীশ্রীচৈতন্যের প্রকৃতি অকৃতি অপ্রসবিনী লীলাবর্জ্জিতা আত্মবিসর্জ্জিতা

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।" সংসারাবস্থায় শ্রীভগবানের কেবল ঐশ্বর্য্য সংসারাতীত অবস্থায় কেবল মাধুর্য্য। সংসারাবস্থায় সাক্ষীরূপে কর্ম্মফলাদি প্রদান, শিষ্ট পালন, দুষ্ট দমন, কংশাদি বিধ্বংসন রূপ তাঁহার ক্রিয়া সংসারাতীত অবস্থায় ক্রিয়া কলাপ, তন্ত্রমন্ত্র বিবর্জ্জিত কেবলমাত্র প্রেম।

জড়াত্মক মানুষ ভগবানের মধুর ভাব, অর্থাৎ মাধুর্য্য বুঝিতে পারিল না বলিয়া, স্বয়ং মনুষ্যরূপে শ্রীশ্রীনবদ্বীপে অভিনয় দ্বারা সেই ভাব স্পষ্টীকৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যই অখণ্ডৈকরস, অদ্বয়, পরিপূর্ণ আনন্দ এবং পরম প্রেমের আস্পদ। সেই জন্যই উপসংহারে বক্তা বলিয়াছিলেন যে, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই স্থানেই নিত্যানন্দ ও সেই স্থানেই অদ্বৈত ও সেই স্থানেই ভক্তবৃন্দের অর্থাৎ অবিদ্যামুক্ত জীবের আনন্দধ্বনি অর্থাৎ—দিগন্ত-ব্যাপি—নিরবচ্ছিন হরিধ্বনি এবং এই জন্যই ভক্তানুদাস বলেন—

নিত্যানন্দং সদদ্বৈতং চৈতন্যং কৃষ্ণসংজ্ঞকং। শুভ্র-প্রকৃতি বিষ্ণং তত্ত্বরীয়ং পরমং ভজে॥

শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত—শ্রীগৌরীপদ দেবশর্ম্মণঃ। বারকোপ।

গোড্ডায় শ্রীশ্রীনামোৎসব।

গোড্ডা নামক জনপদ, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত। অনেকেই অবগত আছেন যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ও তৎসন্নিহিত স্থান ভিন্ন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অর্পিত উন্নত উজ্জ্বলরস অর্থাৎ (পরমাত্মার প্রতি পরম প্রেম-শিক্ষা) আদৌ প্রচার নাই। এমন কি, এই বেহার অঞ্চলে সাধারণ লোকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত জানে না। শ্রীশ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত প্রচার হওয়া অবধি, এই শোচনীয় অবস্থার একটি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে, এবং তদনুসারে এ বৎসরও গোড্ডায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রীশ্রী চব্বিশ প্রহর নাম-কীর্ত্তন মহোৎসব সমাপন হইয়া গেল। শুভ ফাল্গুন পৌর্ণমাসী দিবসে অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিন হইতেই এই মহোৎসব আরম্ভ হইবার সংকল্প ছিল। কিন্তু যে পরম পুরুষ সর্ব্ব সংকল্পের সিদ্ধি, তাঁহারই ইচ্ছায় সময় পরিবর্ত্তিত হয়।

বিষয় কার্য্যোপলক্ষে কতকগুলি বাঙ্গালী মহাত্মা নিজ গোড্ডায় ও তৎসন্নিহিত কয়েক খানি গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত এবং পৈত্রিক সেই প্রেম, যাহা প্রেমময় স্বয়ং অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা

আজ এই ভাবে প্রকাশ পাইল। ভক্তগণ প্রেমবিহ্বল হইয়া হৃদয়ের পরমোচ্ছাসের সহিত নিরবচ্ছিন্ন চতুর্ব্বিংশতি প্রহর উদ্দণ্ডভাবে শ্রীশ্রীভগবানের অস্ত তনু এবং অনন্ত তনু সম্বন্ধীয় বিবিধ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিতে থাকায়, এতৎ স্থানীয় পশু পক্ষী প্রভৃতিও মুগ্ধ হইয়াছে। আজ আবাল বৃদ্ধ বনিতা, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী, হিন্দু, মুসলমান, সভ্য অসভ্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী, এমন কি কোল সাঁওতাল পাহাড়িগণ পর্য্যন্ত মুক্তামুক্ত কণ্ঠে হরিধ্বনি করিতেছেন। কোন কোন স্থানীয় মহাত্মা সজল নয়নে এরূপ ঘোষণাও করিয়া বেড়াইতেছেন যে, এস্থান ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম বা বৃন্দাবন ক্ষেত্রে আর যাইবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু বৎসরত্রয় ক্রমান্বয়ে হরিনাম মহামন্ত্রের মহাক্ষেত্র হওয়ায়, অযোধ্যা, মথুরা, গয়া তুল্য এই স্থানটিও মোক্ষধাম মধ্যে গণ্য হইল। ধন্য ভক্তের চক্ষু!!

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীবের দশা মলিন দেখিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হওতঃ যে প্রেমভক্তি মানব হৃদয়ে রোপণ করিয়াছেন, এই চারিশত বৎসরের মধ্যে এই প্রেমামৃত স্রোত পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে যে প্রবাহিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং মহাত্মাগণও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহার প্রেরণায় তাঁহারা এই মহাকার্য্যে ব্যাপৃত তাঁহারই আশীর্ব্বাদে তাঁহারা যে অচিরাৎ সিদ্ধকাম হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্ত। গোঁড্ডা।

বাদ বা কলঙ্ক।

সংসারে আমরা যে অবধি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে অবধি আমাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষার বিশাল পুস্তিকা প্রকৃতি, আমরা যত উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি সকলেরই আরম্ভ প্রকৃতি হইতে, লোকমধ্যে কলঙ্ক বলিয়া একটী জিনিষ আছে তাহা আমরা জানি, তাহাও আমরা প্রকৃতি হইতে শিক্ষা করিয়াছি। পূর্ণমাসীর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে চন্দ্রমা পূর্ণবিম্বে উদয় হইয়া সমস্ত জগতকে আহ্লাদিত করিতেছেন। মনঃপ্রাণ ভরিয়া বিধুমণ্ডলকে দেখিতে লাগিলাম; দেখিলাম, চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ বস্তু, সমুজ্জ্বল সুধাকরের শুভ্রমণ্ডলে একটী বিজাতীয় কাল বস্তু কেন? এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার নাম রাখিলাম কলঙ্ক। চন্দ্রমা কলঙ্কী, শুভ্রমণ্ডলে একটী বিজাতীয়

কাল রং দেখা যায় তাহারই নাম হইল কলঙ্ক, এই সূত্রতাতে মালিন্যের নাম হইল কলঙ্ক, এই হইল কলঙ্কের আদ্যসৃষ্টি। দেখিলাম রূপার দিব্য-পাত্রে আমলকী লবণ সংযোগে একটি কাল দাগ হয়, সেই উদাহরণে তাহারও নাম রাখিলাম কলঙ্ক, সতী গুণবতীর—সতী কুলবতীর চন্দ্রিকার ন্যায় দিব্য সমুজ্জ্বল চরিত্র, তাহাতে কোন প্রকার একটু বিজাতীয় বস্তুর যোগ হইলেই বলিলাম ইহার চরিত্র কলঙ্কিত। প্রকৃতির আদ্যবর্ণমালা চন্দ্রমণ্ডল হইতে কলঙ্ক শিক্ষা করিয়া এক্ষণ আমরা প্রতিবস্তুতে কলঙ্ক আরোপণ করিয়া থাকি। এই কলঙ্কের ন্যায় ঘৃণিত বস্তু ত্রিজগতে আর নাই, যে কলঙ্কিত, যাহার চরিত্র কলঙ্কিত, সে আর সংসারে মুখ দেখাইতে পারে না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, যে চন্দ্রমা হইতে আমরা কলঙ্ক শিক্ষা করিলাম, সে সর্ব্বদা কলঙ্ককে বুকে করিয়া আনন্দে হাসিতে থাকে। আমি কলঙ্কী বলিয়া মনে উদয় হইলে আর আমাদের রক্ষা নাই। কিন্তু আমি যদি চন্দ্রমার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইতাম, তাহা হইলে কলঙ্ক আমার দূষণ না হইয়া বরং ভূষণ হইত। প্রেমময়ী ব্রজনাগরীগণ কৃষ্ণ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া ত্রিজগতকে আলোকিত ও আহ্লাদিত করিতেছেন। জীবে সে সৌভাগ্য ঘটে না, যদি হয় তবে সে প্রভুর কৃপা। বলিতে ভয় কি, আমাদেরও একটী কলঙ্ক আছে, কিন্তু সে কলঙ্ক কৃষ্ণ নয়, সে কলঙ্ক গৌর। কৃষ্ণ-কলঙ্কে যদি শোভা পাইয়া থাকে, তবে গৌর-কলঙ্কে শোভা পাইবে না কেন? আমরা যে গৌর-কলঙ্কে কলঙ্কী হইব সেরূপ আমাদের ভাগ্য নয়, তবে যাঁহারা আমাদিগকে কলঙ্কী করেন, সে তাঁহাদিগের কৃপার গুণে। বিষয়টী কিছু বেশী নয় ও অনেকবার আলোচনাও হইয়াছে, তবু আজ আবার লিখিতে উদ্যুক্ত হইলাম কেন,—কারণ এই রসটী নিত্য নূতন, যত আস্বাদন করা হয় ততই সুখ হয়।

কলঙ্কটী বাদ লইয়া, অনেক লোকেরা আমাদিগকে বলেন গৌরবাদী। তাঁহারা অবশ্যই এ শব্দটা ঘৃণা করিয়া প্রয়োগ করেন, কিন্তু বিচার করিতে গেলে এইটী বড় উৎকৃষ্ট টাইটেল, কারণ বাদ শব্দের অর্থ সিদ্ধান্ত, যেমন মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদী। শঙ্করাচার্য্যের নাম মায়াবাদী, মাধ্বাচার্য্যের নাম তত্ত্ব-বাদী; শঙ্করাচার্য্য মায়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মাধ্বাচার্য্য তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আহা যিনি গৌর বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন বাস্তবিক তিনিই গৌরবাদী, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান এ জগতের ভিতরে কে?

যাঁহারা গৌরবাদীকে ঘৃণা দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন তাঁহাদের একটী ভুল আছে, তাঁহারা যে কৃষ্ণতত্ত্বের অনভিজ্ঞ তাহা আমরা হঠাৎ বলিতে পারি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, পরতত্ত্ব কৃষ্ণবিগ্রহ মাত্র, সেই কৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীরাধা-অঙ্গে আবৃত হইয়া গৌর-বরণ প্রতীতি হয়। যেমন কোন একটি বস্তুকে সুবর্ণের গিলটি দিলে, সে সুবর্ণের ন্যায় প্রতীতি হয়, কিন্তু আবার একটু আগুনের তাপ দিলেই সে সুবর্ণের গিলটি উড়িয়া যায়, সে যে বস্তু সেই বস্তুই থাকে, সুতরাং গিলটিকে পাকা বলিতে পারা যায় না, যে কৃত্রিম তাহাকে কি প্রকারে স্বাভাবিক বলিব। কৃষ্ণেরও ঠিক সেইরূপ দশা; গৌরকান্তি তাঁহার গিলটি মাত্র, তত্ত্বজ্ঞানরূপ তীব্র সন্তাপে আর সে গৌরকান্তি থাকিতে পারে না, আবার কৃষ্ণ কৃষ্ণই হইয়া যান।

এ বিষয়ে তাঁহারা রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রভুর যে মিলন তাহা দ্বারাই প্রমাণ করিয়া থাকেন। প্রথমে রায় রামানন্দ গৌরকান্তি দর্শন করিলেন, যখন তিনি তত্ত্ব বুঝিলেন তখন আবার কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, এই কৃষ্ণমূর্ত্তিই পরতত্ত্ব—তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে।

> পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
> এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
> তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
> তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
> তাতে এক প্রকট দেখি সবংশীবদন।
> নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
> এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
> অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

রায় রামানন্দ এই গৌরকান্তি সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, এইটী কপট মূর্ত্তি, তাই তিনি কহিলেন "অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার"। এইখানে একটু বিবেচনা করিতে হইবে,—ইহার মধ্যে কপট কি? কৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিয়াও রায় কেন কহিলেন ইহা কপট, ইহার মর্ম্ম আর কাহার বুঝিবার সাধ্য? তিনি নিজে বিশাখা, বিশাখা ভিন্ন কৃষ্ণের কপটতা কেহ বুঝিতে পারেন না। তিনি নিকুঞ্জে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে গৌররূপ দর্শন করিতেন। স্বাভাবিক গৌরত্ব সেত কাঞ্চন পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে গৌর নয়। এখন কাঞ্চন পঞ্চালিকার গৌর

কান্তিতে গৌর দেখাইতেছেন বলিয়াই তিনি বলিলেন যে কপট? তখন প্রভু এই তত্ত্বজ্ঞানের দিকে টানিয়া বলিলেন,—"রাধাকৃষ্ণে তোমায় মহা প্রেম হয়। যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥" কিন্তু রায় রামানন্দ ইহাতে ছাড়িলেন না। "রায় কহে প্রভু মোরে ছাড় ভারি ভূরি। মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥" যখন রায় রামানন্দ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন তখন আবার বলিতেছেন, "না করিহ চুরি।" তবে সেই কি চুরি? রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ দর্শন করিয়াও বলিতেছেন যে, ওরূপ চুরি করিবেন না, সে রূপটা কি? গ্রন্থকার ইহার পরেই সেই রূপের কথা প্রকাশ করিলেন,—"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥" এইটি হইল স্বরূপ, এই স্বরূপ দেখিবার সর্ব্বসাধারণের ক্ষমতা নাই, ব্রজপরিকর ভিন্ন আর কেহ এরূপ দেখিতে পায় না, ব্রজপরিকর কেন, কেবল আহ্লাদিনী শক্তির সার স্বরূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার অন্তরঙ্গা সহচরী ভিন্ন আর কেহ এরূপ দেখিতে পান না। ইহার একটু আভাস শ্রীগোবিন্দদাসের রসোদ্গারের পদে আমরা দেখিতে পাই ;—

আধ কি আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে, যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি, কুসুম শরে জর জর, রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানিল বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই, তছুপায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়না কহত, কানু ঘন শ্যামর, মোহে বিজুরী সম লাগি।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সেই নবনীরদ বরণের বিদ্যুৎ বর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমভরে প্রিয় নর্ম্ম-সহচরীকে বলিতেছেন, সখি, সকলে শ্রীকৃষ্ণকে বলেন নীরদ শ্যাম, কিন্তু আমি আমার চক্ষে দেখি বিজুলীর বর্ণ। আহা এই যে রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ স্বরূপ, যাঁহাকে বৃষভানুনন্দিনীও বিদ্যুৎ বর্ণ দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ না দেখিয়া রায় রামানন্দ বলিয়াছেন যে, মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি। কি দুঃখের বিষয় এই রূপকে যাঁহারা মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে চাহেন, তাঁহাদের কতদূর সাহস। আমরা যদি এই গৌরকে লইয়া গৌরবাদী নামে কলঙ্কিত হই তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে?

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তার মীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বানে পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জন পরমং সাম্য মুপৈতি॥—ইতি

—০:*:০—

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী।

ব্রহ্মপুরে কীর্ত্তনোৎসব।

এই ঘোর দুঃসময়ে কলি-হত জীব মোহাচ্ছন্ন হইয়া কেবল বিষয় লালসা তৃপ্তির জন্য দিবারাত্র ক্ষিপ্ত কুক্কুরবৎ ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সুখ কোন স্থানেই পায় না এবং পাইবার সম্ভাবনাও নাই। দৈহিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিতে সুখ আছে বলিয়া, সকলেই তাহারই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যদি অদৃষ্ট-নিবন্ধন কাহারও সমস্ত বিষয়-বাসনাই পূর্ণ হয় এবং অভিলষিত ভোগ লব্ধ হয়, সেই বাসনা পূর্ণ না হইতেই পুনরায় নূতন বাসনার উত্তেজনায়, সেই ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ অশান্ত ভাবে বস্তন্তর লাভের জন্য দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। অপ্রাকৃত সুখ লাভ ভিন্ন তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সেই অপ্রাকৃত সুখ কোথায়, কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহা ত কেহই অনুসন্ধান করে না। সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীব নিয়তই ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে।

ইন্দ্রিয়চর্চ্চায় যদি সুখ থাকিত, তাহা হইলে ধনবান ব্যক্তি মাত্রেই পরম সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, যিনি যত বড়, তিনি ততই দুঃখ ভোগ করেন, তাহার শান্তি ততই কম। কাঙ্গাল দুঃখীরা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষা করে এবং তাঁহাদের অবস্থা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু মন্দাগ্নি ও অরুচি পীড়াগ্রস্ত বড় মানুষের বহুবিধ সুখাদ্য উপভোগ অপেক্ষা, তাহার শাকান্ন সেবন যে অতিশয় তৃপ্তিকর তাহা যদি তাহারা জানিত ও বুঝিত এবং পথে পথে মর্দ্দল-বাদন পূর্ব্বক ভগবল্লীলা গানে তাহারা যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করে, তাহা ধনবান্ ব্যক্তিরা সুরম্য প্রাসাদে নানাবিধ যন্ত্রাদি সমন্বিত বিলাসিনী কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সংগীতে কখনই পান না, তাহা যদি জানিত, তাহা হইলে কখনই তাহাদের ঐরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হইত না। সুখ মনে, উহা বিষয়ে নাই, ইহা যদি লোকে বুঝে, তাহা হইলে তাহারা বিষয় ভোগে অনাসক্ত হইয়া মনকেই তল্লাভের উপযোগী করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মোহান্ধ জীব বুঝিয়াও বুঝে না। পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মরীচিকা পানে ধাবিত হইতে থাকে এবং অবশেষে অবসন্ন হইয়া শুখাইয়া মরে।

এই মোহ-তিমির বিদূরিত করিবার জন্য করুণাময় শ্রীভগবান্, তাঁহার জীবের দুঃখ আর সহিতে না পারিয়া, স্বয়ং শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া

ছিলেন এবং যে উপায়ে তাঁহারা জীবের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা কৃতঘ্ন জীব একবারও অনুসন্ধান করিয়া দেখে না। তিনি যে কীর্ত্তন রূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র ভারত-ভূমি আনন্দ স্রোতে ভাসাইয়াছিলেন, সে অনুষ্ঠান ত এখন কেহ করে না। জীব এতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে, ভগবল্লীলাদির আলোচনা করিয়া অপ্রাকৃত সুখ লাভের চেষ্টা করা ত দূরের কথা, এই বিশ্বসংসারের সহিত শ্রীবিশ্বম্ভরের যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহাও ভাবিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন দুর্দ্দিনে যদি শ্রীগৌরাঙ্গের কোন কৃপাপাত্র প্রভুর পদাশ্রিত পথ এবং তাঁহার অনুমোদিত উপায় অবলম্বনে সুপ্ত জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন, তিনি নিশ্চয় ভক্ত মাত্রের ধন্যবাদের পাত্র এবং আদরের সামগ্রী।

বিগত ১৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার শ্রীহরিবাসরে ব্রহ্মপুরে, (যাহা সাধারণে এখন বহরমপুর নামে খ্যাত) জমীদার শ্রীযুক্ত সেন বাবুদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অঙ্গনে অষ্টপ্রহর-ব্যাপী যে কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছিল, তাহার একটী সামান্য বিবরণ ভক্ত মহাত্মাদের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকটিত হইল। ইহা পাঠে অবশ্যই তাঁহারা আনন্দ লাভ করিবেন।

বহরমপুরের সেন বাবুরা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবার। এই বংশে খ্যাতনামা ডাক্তার রামদাস সেন জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। গোলোকগত বাবু বিশ্বম্ভর সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাচরণ ও শ্রীমান বিষ্ণুচরণ সেন পরম বৈষ্ণব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র। এই অষ্টপ্রহরী কীর্ত্তনোৎসবের অনুষ্ঠাতা শ্রীমান বিষ্ণুচরণ। অদ্য তিন বৎসর হইতে দশহারা গঙ্গাস্নানের পর একাদশীতে তিনি এই সদনুষ্ঠান করিয়া ভক্তদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের উৎসবে তিনি বঙ্গদেশীয় বহুতর বৈষ্ণব মহাত্মগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ভক্তগণ-মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করতঃ অনুষ্ঠাতা ও তদীয় আত্মীয় স্বজনকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয় অস্বাস্থ্য নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় সকলেই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। রসিক-ভক্তচূড়ামণি অতিবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় উৎসবের কোন অংশই অসম্পূর্ণ থাকে নাই। এই মহাত্মা জেলা মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে রাঢ়

দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৪ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত গর্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং শ্রীব্রজধামে চলিয়া যান। তথায় ১০।১২ বৎসর বাস করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং শ্রীভাগীরথী তীরে জঙ্গিপুর নামক স্থানে বৈকুণ্ঠ-গত ভক্তপ্রবর রাখাল দাস বসুর শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী ঠাকুর বাটীতে অনেক সময় অবস্থান করেন। এরূপ রসিক-ভক্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে ৺ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহরমপুরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে সাধিখাঁর দিয়াড় নিবাসী শ্রীপ্রভুচরণ দাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা গান করিয়া শ্রোতাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের আরতি, শেষে বড়কান্দরা নিবাসী ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তনাধিবাস গান করিয়া বৈষ্ণবামন্ত্রণ করেন। তৎপরে শেষরাত্রে নিশান্তলীলা গান আরম্ভ করিয়া বুধবার বেলা ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের স্নান ভোজন লীলা পর্য্যন্ত গান করেন। ৯টার সময় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় গায়ক শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস বাবাজী গোষ্ঠলীলা গান আরম্ভ করেন। এ রূপ গান এখন প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিতেছিলেন। এমন সময় বৃদ্ধ বাবাজী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কোন সমাগত ব্যক্তি আকিঞ্চন গোপী গোষ্ঠ গান করিয়াছিলেন। সে গান শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী সুখী হইয়াছিলেন কিনা তাহা লেখক বলিতে পারেন না। তৎপরে পুনরায় পণ্ডিত বাবাজী শ্রীভগবানের তীরবিহার লীলা গান অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত গাহিয়াছিলেন। ৩টার পর শ্রীনবীন দাস নামক একজন রাঢ়দেশীয় গায়ক ৭টা পর্য্যন্ত দানলীলা গান করেন। উপস্থিত ভক্তগণের কৃপায় ও উৎসাহে ঐ গান এতই মধুর হইয়াছিল যে, তেমন সুমিষ্ট গান পূর্ব্বে শুনিয়াছি কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। এই দান গানের পর ৭টা হইতে ৯টা রাত্রি পর্য্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "উত্তর গোষ্ঠ" গান করেন। এই গান শেষ হইলে পরমভাগবত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতীয় * একা-

* শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশী মাহাত্ম্য না একাদশস্কন্ধ? বিং সং।

দশী মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুরাণ পাঠ শেষ হইলে, শ্রীভূষণ দাস নামক একটী সুকণ্ঠ যুবক গায়ক অভিসারিকা, বাসরসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা গান করিয়া রাত্রি শেষ করেন। তৎপরে বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীবিপিন দাস নামক একটী গায়ক খণ্ডিতা গান করিয়া সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন। খণ্ডিতা গান শেষ হইলে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেলা ১টা পর্য্যন্ত কলহান্তরিতা গান করিয়া শ্রোতাগণকে পরম পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে বৃদ্ধ রামচন্দ্র দাস বাবাজী ভক্তগণ লইয়া নৃত্য আরম্ভ করেন। ভক্তের নৃত্যে যে কি মোহিনী শক্তি আছে, যিনি বৃদ্ধ বাবাজীর নৃত্য দেখিয়াছেন তিনিই কথঞ্চিৎ তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। নৃত্য শেষে স্নানাদি সমাপন পর ভক্তগণ এবং সহরস্থ বহুতর ভদ্রলোক মহোৎসবে মহাপ্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রাত্রি দশটার পর মহোৎসবের সঙ্গে এই অষ্টপ্রহর ব্যাপী কীর্ত্তনোৎসবের সমাপ্তি হয়।

শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ সমীপে এই দীনের প্রার্থনা যে তাঁহারা এই কীর্ত্তনের অনুষ্ঠাতা শ্রীমান বিষ্ণুচন্দ্র সেনের প্রতি সকলেই কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বৎসর বৎসর ভক্তগণকে এই রূপ আনন্দ প্রদান করিতে থাকুন এবং প্রকৃত বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সুস্থাবস্থায় অপ্রাকৃত সুখ উপভোগে নিমগ্ন হউন।

ভক্তকৃপাকাঙ্ক্ষী—শ্রীপরমানন্দ দাস।

—:*।*:—

উপ মহান্তগণ।

শ্রীগৌরাঙ্গগণের মধ্যে দ্বাদশ গোপাল দ্বাদশ উপগোপাল, চতুঃষষ্ঠী মহান্ত এবং দ্বাত্রিংশৎ উপ মহান্ত বর্ণিত হইয়াছে, দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মহান্তগণের নাম ধাম অনেকটা পরিচিত, কিন্তু বত্রিশ উপমহান্তের কথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিরলপ্রচার। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও জন্ম কর্ম্মের কথা অনেকের অপরিজ্ঞাত বলিয়াই আমরা সেই বত্রিশ মহান্তের নাম ধাম প্রকাশ করিতেছি, যদি কোন মহাত্মা কোন মহান্তের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হয়, ভরসা করি কোন না কোন মহাত্মা উপমহান্ত গণের কাহারও কাহারও পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

১ম। সুলোচন ঠাকুর, পূর্ব্বলীলায় কলাবতী। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শাখা, বাসস্থান শ্রীখণ্ড, জেলা বর্দ্ধমান।

২য়। ভাগবতাচার্য্য, পূর্ব্বলীলায় সৌরসেনী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুঃ শাখা, বাসস্থান বরাহনগর, কলিকাতার উত্তর ৩ মাইল। ইহাঁর বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষ লীলায় বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতাচার্য্য উপাধি, ইহাঁর নাম রঘুনাথ।

৩য়। জীব পণ্ডিত, পূর্ব্বলীলায় ইন্দিরা সখী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা, বাসস্থান আকাই হাট, কাটোয়ার নিকট, জেলা বর্দ্ধমান।

৪র্থ। কবিচন্দ্র, পূর্ব্বলীলায় মনোহরা সখী, শ্রীচৈতন্যের শাখা, বাসস্থান আকনা, জেলা হুগলী, শ্রীরামপুরের নিকট। কবিচন্দ্র ইহাঁর প্রকৃত নাম নহে বলিয়া বোধহয়, ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার উপাধি

৫ম। শ্রীকান্ত সেন পূর্ব্বলীলায় কাত্যায়নী, শ্রীচৈতন্যের শাখা, বাসস্থান গরিফা, হুগলীর পর পার চব্বিশ পরগণা জেলা।

৬ষ্ঠ। বংশীদাস, পূর্ব্বলীলায় বংশী সখী, শ্রীচৈতন্যের শাখা, বাসস্থান স্বরগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান বা বীরভুম।

৭ম। কাশিমিশ্র, পূর্ব্বলীলায় কুব্জা, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শাখা, বাসস্থান শ্রীক্ষেত্র।

৮ম। যদুনাথ আচার্য্য, পূর্ব্বলীলায় মালতী সখী, শ্রীগৌরাঙ্গের শাখা, বাসস্থান চন্দ্রপুর।

৯ম। মুকুন্দ ঠাকুর, পূর্ব্বলীলায় কমলা সখী, শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা, বাসস্থান রামচন্দ্রপুর।

১০ম। পরমানন্দ গুপ্ত, পূর্ব্বলীলায় চন্দ্রিকা সখী, শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা, বাসস্থান অম্বিকা।

১১শ। মাধবাচার্য্য, পূর্ব্বলীলায় সুধীরা। ইনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এবং শাখা, বাসস্থান শ্রীনবদ্বীপ।

১২শ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর, পূর্ব্বলীলায় কস্তুরীমঞ্জরী, শ্রীনিত্যানন্দশাখা, বাসস্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার সন্নিকট।

১৩শ। শুভানন্দ দ্বিজ, পূর্ব্বলীলায় নাগরী সখী, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শাখা, বাসস্থান শ্যামপুর।

১৪শ। শ্রীধর ব্রহ্মচারী, পূর্ব্বলীলায় সুরঙ্গিণী, শ্রীগৌরাঙ্গের শাখা, বাসস্থান পাঁচড়া, জেলা বর্দ্ধমান।

১৫শ। রঘুনাথ দ্বিজ, পূর্ব্বলীলায় কলহংসী, শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা, বাসস্থান ত্রিবেণী।

১৬শ। জগন্নাথ, পূর্ব্বলীলায় সুমুখী, শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা, বাসস্থান ন'পাড়া।

১৭শ। সুবুদ্ধি মিশ্র, পূর্ব্বলীলায় শশিমুখী, শ্রীচৈতন্যের শাখা, বাসস্থান অম্বিকা। কেহ বলেন জয়ানন্দ নামক জনৈক শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচক এই সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র, তাঁহার বাসস্থান বর্দ্ধমান।

১৮শ। শ্রীহর্ষ, ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বলীলায় সুরঙ্গিণী সখী, শ্রীগৌরাঙ্গ-শাখা বাসস্থান শান্তিপুর। শান্তিপুরে ইহাঁর কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

১৯শ। কৃষ্ণদাস সরখেল, পূর্ব্বলীলায় সম্মোহিনী সখী, শ্রীনিত্যানন্দের শাখা, বাসস্থান অম্বিকা।

২০শ। পুরন্দর পণ্ডিত, পূর্ব্বলীলায় বিলাসিনী সখী, শ্রীগৌরাঙ্গ-শাখা, বাসস্থান আ ড়ুপুর, জেলা চব্বিশ পরগণা।

২১শ। *গোপাল আচার্য্য, পূর্ব্বলীলায় গোপালিকা সখী। ইনি শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র এবং শাখা, বাসস্থান শান্তিপুর।*

২২শ। শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য, পূর্ব্বলীলায় গৌরকান্তি সখী, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখা, বাসস্থান ঘাটাল। ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরু।

২৩শ। শ্রীরাম ঠাকুর, পূর্ব্বলীলায় বিমলা, শ্রীগৌরাঙ্গের শাখা, বাসস্থান চট্টগ্রাম। শুনা যায় ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগদাধর-চৈতন্য-বিগ্রহ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছেন।

২৪শ। গোবিন্দ দত্ত, পূর্ব্বলীলায় সুশীলা, শ্রীগৌরাঙ্গ-শাখা, বাসস্থান সুখচর, এই গ্রাম পাণিহাটীর অব্যাহিত উত্তর।

২৫শ। বিহারিকৃষ্ণ দাস, পূর্ব্বলীলায় বিদ্যুল্লতা সখী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা, বাসস্থান আঁটপুর।

২৬শ। হরিদাস হোড়, পূর্ব্বলীলায় রত্নাবলী, শ্রীচৈতন্যের শাখা, বাসস্থান এঁড়েদহ। এই গ্রাম পাণিহাটির দক্ষিণ।

২৭শ। শ্রীনাথ পণ্ডিত, পূর্ব্বলীলায় চিত্রাঙ্গী, শ্রীগৌরাঙ্গ-শাখা, বাসস্থান কাঁচড়াপাড়া। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ কাচড়াপাড়ায় বর্ত্তমান আছেন। এই শ্রীনাথ পণ্ডিত কৃত শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা নাম্নী শ্রীভাগবতের একখানি টীকা আছে।

২৮শ। গাঙ্গুলি জগন্নাথ, পূর্ব্বলীলায় শুকপালী সখী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা, বাসস্থান বাকলা চন্দ্রদ্বীপ।

২৯শ। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, পূর্ব্বলীলায় আহ্লাদিনী সখী, শ্রীঅদ্বৈত-শাখা, বাসস্থান জয়নগর।

৩০শ। মধু পণ্ডিত, পূর্ব্বলীলায় সুখময়ী, শ্রীনিত্যানন্দের শাখা, বাসস্থান খাড়িবনা, জেলা চব্বিশ পরগণা। ইঁহার স্থাপিত নন্দদুলাল শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান।

৩১শ। কাশীশ্বর ঠাকুর, পূর্ব্বলীলায় রসবতী, শ্রীচৈতন্যদেবের শাখা, বাসস্থান বল্লভপুর। সেখানে শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

৩২শ। শঙ্করারণ্য, পূর্ব্বলীলায় প্রেমবতী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা, বাসস্থান চাতরা, জেলা হুগলী।

শ্রীকৃষ্ণলীলাস্বাদন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত গোপাল চরিত্র গ্রন্থ অতি উপাদেয়। এই গ্রন্থোক্ত লীলাস্বাদন করা পরম ভাগ্যের কথা। শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলা আস্বাদন করা জীবের ভাগ্যে বড়ই দুর্ঘট। পাণ্ডুবংশাবতংস রাজা পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের নিকট এই সকল অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ করত ব্রহ্মশাপ মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব রাসলীলা বর্ণনান্তে তাহার একটী ফল শ্রুতি শ্লোক দিয়াছেন।

> বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি বিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
> শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়া দথবর্ণয়েদ্‌যঃ।
> ভক্তিপরাং ভাগবতি প্রতিলভ্য কামো
> হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বিষ্ণু—ব্যাপনশীল অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ভগবানের ব্রজবধূর সহিত রহঃ ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ বা বর্ণন করে তাহার হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ দুর্ব্বাসনা সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া শ্রীভগবানে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

এই সকল কারণেই শ্রীমহাপ্রভু সাধারণের জন্য নাম আস্বাদন, আর নিগূঢ় ভক্তের জন্য লীলা আস্বাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র লেখকগণও লিখিয়াছেন, শ্রীমহাপ্রভু সাধারণ ভক্তের সহিত নাম আস্বাদন করিতেন এবং স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত লীলা আস্বাদন করিতেন। লেখকগণ সেই লীলা আস্বাদনের গ্রন্থ গুলিরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ণা-

মৃত, জগন্নাথবল্লভ নাটক এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পদ। শ্রীমহাপ্রভু নিজজনের আস্বাদনের জন্য যে শ্রীগোপাল চরিত্র রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিগূঢ় ভক্তের কণ্ঠহার। একাল পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থের কোন তত্ত্বই কেহ লইতে পারেন নাই। এখন তাঁহারই ইচ্ছায় আমরা উথলী নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী দ্বারা একখানি গোপাল চরিত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে যে সকল অপূর্ব্ব ভগবল্লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তগণ অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিবেন বলিয়াই শ্রীপত্রিকায় তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ভক্তগণ এই অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গ্রন্থ খানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম বসনকেলি দ্বিতীয় খণ্ডের নাম ভারখণ্ড, তৃতীয় খণ্ডের নাম পারখণ্ড এবং চতুর্থ খণ্ডের নাম দানখণ্ড।

প্রথম খণ্ডের শ্লোক সংখ্যা ২৮, দ্বিতীয় ভারখণ্ডের শ্লোক সংখ্যা ১৬, তৃতীয় পারখণ্ডের শ্লোক সংখ্যা ৩৬ এবং চতুর্থ দানখণ্ডের শ্লোক সংখ্যা ১৪। প্রতি খণ্ডের শেষ ভাগে "ইতি শ্রীচৈতন্যদেব বিরচিতে গোপাল চরিত্রে" এইরূপ লিখিত আছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা সমুদায়ে ৯৪টী মাত্র। প্রত্যেক শ্লোকের প্রথমে শ্লোকাভাস আছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক দুইটী, প্রথমটী দ্বাদশস্কন্ধোক্ত "যং ব্রহ্ম বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত ইত্যাদি" শ্লোক। দ্বিতীয়টী শ্রীদশমোক্ত "জয়তি জন নিবাস ইত্যাদি" শ্লোক। এজন্য তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। গ্রন্থাবস্তু এইরূপ—

তত্র তাবদেকদা রাধা যমুনা গন্তুকামা রামাঃ সমাহ।

কর্পূরমঞ্জরি কলাবতি চন্দ্ররেখে, মুগ্ধাননে সুমুখি সুন্দরি কম্বুকণ্ঠে।

আগচ্ছতাম্বুহরণায় গৃহীত কুম্ভাঃ সত্বর মন্দপবনাং যমুনাং ব্রজামঃ॥

শ্রীরাধা সখীদিগকে এইরূপ বলিলে গোপী সকল--

এতন্নিশম্য বচনং মৃগলোচনায়া দূরে বিহায় গৃহকর্ম্ম গৃহীতকুম্ভাঃ।

দামোদরানন বিলোকন লোল চিত্তা গোপ্যো জলায় চলিতা ললিতাভিবৃ পাতাঃ॥

গোপীগণ জলাহরণ ব্যাজে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ যমুনাতীরে গমন-পূর্ব্বক জলাহরণ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করত মনে মনে বলিতেছেন—

ইহৈব কন্দর্প কলাহু কুলে, কদম্ব মূলে নিভৃতো ভবামি।
কূলে দুকূলং বিনিধায় নীরে, গোপাঙ্গনা মজ্জন মাচরন্তু।

ইহা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোন নিভৃত স্থানে গমনপূর্ব্বক আত্মগোপন করিলেন ও শ্রীরাধা যমুনা কূলে দুকূল স্থাপন পূর্ব্বক জলে নিমজ্জন করিলেন। এই সময়ে কোন সখী বলিতেছেন—

মামজ্জ মামজ্জ জলে মৃগাক্ষি গৃহাণ চেলং সহসা বিবুধ্য।
আয়াতি সোঽয়ং ব্রজসুন্দরীণাং নিচোল চৌরঃ পুরতঃ কিশোরঃ॥

সখীর এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, দেখ! দেখ! কোন স্থানে কেহ আছে কি না? দেখিলেন কোনদিকেই পুরুষ নাই, শ্রীকৃষ্ণও তখন যোগমায়া প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না।

সখীগণের সহিত শ্রীরাধা জল প্রবাহে নিমজ্জিতা হইয়া জলকেলি করিতে লাগিলে কৃষ্ণ গোপিকাদিগকে দর্শন করিবার জন্য কদম্ব বৃক্ষোপরি বাহু মূলকে উপাধান করিয়া কপট নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণ জলবিহারে ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদের বদন বিকসিত কমল-তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের জলক্রীড়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের বসন চুরি করিতে ইচ্ছা হইল। তাই—

লঘু লঘু নবনীপান্নীপ পুষ্পাবতংসঃ স্মরতসমরসিংহঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ।
চকিত চকিত মাশাং শশ্বদুদ্বীক্ষমানো ব্রজ যুবতি নিচোলং চোরয়ামাস কৃষ্ণঃ।

শ্রীরাধা বস্ত্র অপহৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, আক্ষেপ শ্লোকটী ভগবানের মানব লীলার পরম উপযোগী। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর সাররূপা শ্রীরাধিকা মানবীরূপে লীলা করিতেছেন সুতরাং তাঁহার মুখে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী ভক্তের কর্ণে বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়।

আগন্তু মাত্র গুরুণা বহুধা নিষিদ্ধা
হাহা তথাপি যমুনাং যদুপাগতাস্মি।
প্রাপ্তং ময়া তদনুরূপ ফলং ন জানে
কিংবা ফলান্তর মুপৈমি গৃহে গুরুভ্যঃ॥

শ্রীরাধা এইরূপ অনুতাপ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। তাহা শুনিয়া পরিহাস বিশারদ কৌতুকার্ণব শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

আহূয় গোপী ররধূর পাপী স্মরাসনোঽনঙ্গ-মুতোজগাদ।
উত্থায় কূলে ব্রজনাথ মূলে গতো দুকূলং সমতাং দুকূলং॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথায় সম্মত হইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার কাছে প্রথমত কৃপা প্রার্থনা করিলেন, আবার কিছু ভয়ও দেখাইলেন। যথা—

আগত্য কূলে বসনং প্রদেহি সর্ব্বাস্থ দাসীষু দয়াং বিধেহি।
তীব্রপ্রতাপায় নৃপায় যাবৎ ভবচ্চরিত্রং ন নিবেদয়ামঃ॥

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কথা শ্রবণ করিয়া সদর্পে অনেক কথা বলিলেন। তাহা শ্রবণে গোপীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কূলে উঠিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বসনকেলির এই স্থানেই পরিসমাপ্তি এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটী এই—

আলিঙ্গনানি নিবিড়ানি চ চুম্বনানি তস্মাদবাপ্য যদুনন্দনতোঽহং শুকানি।
সাঙ্কেতিকং কিমপি কুঞ্জগৃহং নিধায় সানন্দ মিন্দু বদনা স্বগৃহাণি জগ্মুঃ॥

ক্রমশঃ

বিশ্বাস।

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

এ বাক্যটী অতি সারগর্ভ—খাটী সত্য, যাঁহার বিশ্বাস যত গাঢ়, তিনি তত শক্তিশালী পুরুষ। শ্রীভগবান একান্ত বিশ্বাসীকে বিস্মৃত হইতে পারেন না। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার বা পরীক্ষা করিবার অবকাশ পান না। বিশ্বাসীর প্রতি ভগবানের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিশ্বাসী অতি সহজে ভগবানের হইয়া পড়েন।

প্রহ্লাদ কোন যাগযজ্ঞ করেন নাই, কোন জপতপ করেন নাই, কেবল বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। প্রহ্লাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার প্রভু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র অবস্থিত। যখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিল,—রে পাপাত্মন্! তোর হরি কি এই সম্মুখস্থ স্ফটিক-স্তম্ভে আছে? প্রহ্লাদ বলিলেন—হাঁ, আছেন বই কি? অসুররাজ যাই স্তম্ভে খড়্গাঘাত করিল, অমি ত্রিভুবন বিকম্পিত করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ। ভক্তের বিশ্বাসে ভগবান স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ধ্রুব-জননী নিজ বালককে বলিলেন,—বাবা! শ্রীহরিকে ভজনা করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। মায়ের এই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বালক ধ্রুব

তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৈকুণ্ঠ-বিহারী ভগবান তাঁহাকে কৃপা না করিয়া পারিলেন না।

হরিদাস ঠাকুরের একান্ত বিশ্বাস—নাম জপ কীর্ত্তন করিলে অবশ্যই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, আর কষ্ট মাত্রও থাকে না। দুর্দ্দান্ত যবনগণ যে সময় তাঁহাকে নিদারুণ বেত্রাঘাত করিল, তখন তিনি নাম জপনে বিভোর। ভগবান্ হরিদাসের বিশ্বাস সফলীকৃত করিবার জন্য তাঁহার প্রহার যন্ত্রণা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর হরিদাস পিপীলিকা দংশনের কষ্টও পাইলেন না।

একান্ত বিশ্বাসী শ্রীভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বলিতে কেবল ভগবানের নামকীর্ত্তন ও লীলা ধ্যান। ভগবান্ "অন্তর্য্যামী" ও "সর্ব্বদ্রষ্টা"। এখন ত আর অবৈধরূপে চলিবার পথ রহিল না। কারণ, মনে মনে যে কোন চিন্তা কর, ভগবান্ জানিতেছেন, তিনি অন্তর্য্যামী। অতি গোপনে কার্য্য করিলেও ভগবান্ দেখিতেছেন—তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা। এখন স্পষ্টত বুঝা যাইতেছে, আমাদের সুকাজ কুকাজ, সুচিন্তা কুচিন্তা, ভগবান্ সমস্তই জানিতে ও দেখিতে পারিতেছেন। আমরা ইহা জানি, জানিয়াও পাপকার্য্যে, বিশেষতঃ অন্যায় রূপে * রিপু চরিতার্থ করিতে; অকুণ্ঠিত, নিলর্জ্জ কেন? ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস হয় নাই বলিয়া, অবিশ্বস্ত চিত্তে ভক্তিরাজ্যের ত কোন কার্য্যও সুফলপ্রদ হয় না; এমন কি বিশ্বাসহীন হৃদয়ে সাংসারিক কর্ম্ম করিতে গেলেও পদে পদে বিড়ম্বনা লাঞ্ছনা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের মত করুণাময় পতিত-পাবন অবতার নাই। গৌরভগবান্ কলিযুগের প্রভু। গৌরাঙ্গচন্দ্রে যথার্থ বিশ্বাস জন্মিলে দিন রাত আনন্দ-পাথারে ডুবিয়া থাকিতাম; দুঃখের বাতাসও গায় লাগিত না, না লাগিবারই কথা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

শ্রীভগবানে তেমন বিশ্বাস না থাকায় ত্রিতাপে জ্বলিয়া মরিতেছি। একান্ত বিশ্বাসের একটী সত্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এ প্রস্তাব পূর্ণ করিতেছি।

কয়েক বৎসর হইল, আমাদের বাসস্থান মৈনায় আমার কুটুম্ব বাড়ীতে একটী নূতন পুষ্করিণী কাটান হয়। হাড়ি জাতীয় কয়েক জন লোক এই

পুকুর কাটিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কটাই নামক ব্যক্তি পাঁচ হাত নীচে মাটি কাটিতে কাটিতে আন্দাজ ৪।৫ সের ওজনের একটা বেঙ্ পায়। পরিপুষ্ট বেঙ্টী গর্ত্তে ছিল। গর্ত্তটী আবার বেঙের আকারে নির্ম্মিত। সে তাহাতে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। সকল হাড়ি একত্রিত হইয়া খুব মনোযোগ সহকারে দেখিল, গর্ত্তটী উই কি কোন জন্তুর তৈয়ারি নহে। উপরের বা পার্শ্বের মাটির সহিত গর্ত্তের কোন সংস্রব নাই। অত প্রাচীন বিশুষ্ক মাটির নীচে বেঙ্ কিরূপে আসিল এবং কি খাইয়া জীবিত আছে, এই বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। শেষে মীমাংসা হইল, যে সৃজনকর্ত্তা সেই থাকিবার স্থান ও খাদ্য দিয়া রাখিয়াছে। কাটাই বলিল, তবে কেন খাবার জন্য মাটি কাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছি। আর সংসারে থাকিব না। যে ঠাকুর পাঁচ হাত মাটির নিম্নে বেঙের আহার দিয়াছেন, তিনি অবশ্য আমাকেও খাইতে দিবেন। এই বিশ্বাস দৃঢ়তর রাখিয়া কয়েক দিন পর কটাই বৈরাগী হইয়া গেল। দেখুন, কটাই লেখাপড়া জানে না; প্রভুসন্তান, গোস্বামী কি মহান্ত সন্তানের সঙ্গ ফিরেন নাই, গীতা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃতের উপদেশ শুনে নাই; উপস্থিত বেঙের ঘটনা চিন্তা করিয়া একান্ত বিশ্বাসে শোক দুঃখময় সংসার ত্যাগ করিতে পারিল। এখন তাহার নাম, শ্রীকিঙ্কর দাস বৈরাগী। পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার বৈষ্ণবাচার ও বৈষ্ণববেশ দেখিলে, অন্তঃকরণে ভক্তির উদ্রেক হয়।

শ্রীরাজীবলোচন দাস।

—*:*:*—

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা।

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চাই শ্রীগৌরলীলার আদি গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রচার নাই বলিলেই হয়। শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, শ্রীলোচন দাস প্রভৃতি প্রভুর চরিত্র লেখকগণ এই আদি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে মুরারিকৃত শ্রীরামাষ্টকের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহার মঙ্গলাচরণেও দুইটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি বা ঘনশ্যাম এই কড়চার অনেক গুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজ বাক্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

অদ্য আমরা সেই আদিগ্রন্থের সূচীপত্র মুখ্য মুখ্য বিবরণ ভক্তগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি, ভরসা করি তাঁহারা ইহা শ্রবণে আনন্দাংশ লাভ করিবেন।

এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ খানি বহু দিন পূর্ব্বে আমরা উথলী নামক গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া ছিলাম সেই গ্রন্থ খানি বর্ণাশুদ্ধি দোষে দূষিত বলিয়া এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমরা মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি নাই। সম্প্রতি শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাধিকারী শ্রীমধুসূদন গোস্বামী পাদ নাগরাক্ষরে লিখিত অতি বিশুদ্ধ এক খানি গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা পূর্ব্ব সংগৃহিত গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম আদ্যোপান্ত সমস্তই উত্তম মিল আছে। তাই আমরা এই গ্রন্থ খানি যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছি, অর্থাৎ ইহা সংস্কৃত দেবাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

এই গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত,—এই ভাগের নাম প্রক্রম অধ্যায়ের নাম সর্গ। প্রথম প্রক্রমের অধ্যায়-সংখ্যা ষোড়শ, এই ষোল অধ্যায়ে ৪৩৮টী শ্লোক আছে। প্রথমাধ্যায়ে অবতারানুক্রম, দ্বিতীয়ে নারদানুতাপ, তৃতীয়ে নারদ প্রশ্ন, চতুর্থে অবতারের কারণ, পঞ্চমে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব, ষষ্ঠে জন্মলীলা, সপ্তমে বাল্যলীলা, অষ্টমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সংসিদ্ধি, নবমে লক্ষ্মীউদ্বাহ, দশমে বৈবাহিক কার্য্য, একাদশে লক্ষ্মী বিজয়, দ্বাদশে শচীশোকাপনোদন, ত্রয়োদশে সনাতনমিশ্র সান্ত্বন, চতুর্দ্দশে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ, পঞ্চদশে শ্রীমদী-শ্বরপুরী দর্শন ও ষোড়শে গয়া গমন।

দ্বিতীয় প্রক্রমের অধ্যায় সংখ্যা আঠার, এই আঠার অধ্যায়ে ৪৮০টী শ্লোক আছে। প্রথম অধ্যায়ে ভাব প্রকাশ, দ্বিতীয়ে শ্রীবরাহ আবেশ, তৃতীয়ে মেঘ নিবারণ, চতুর্থে হ্রদনদীমজ্জন, পঞ্চমে ভাব কথন, ষষ্ঠে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যানুগ্রহ, সপ্তমে ভক্তানুগ্রহ, অষ্টমে অবধূতানুগ্রহ, নবমে ভক্ত পূজাগ্রহণ, দশমে নৃত্য বিলাস, একাদশে জাহ্নবী পতন, দ্বাদশে মহাপ্রকাশাভিষেক, ত্রয়োদশে ব্রহ্মশাপ-বর, চতুর্দ্দশে শ্রীবলভদ্রাবেশ, পঞ্চদশে গোপীভাব বর্ণন, ষোড়শে সর্ব্বশক্তি প্রকাশ, সপ্তদশে সন্ন্যাসোপক্রম এবং অষ্টাদশে সন্ন্যাস সূত্র।

তৃতীয় প্রক্রমেও আঠারটী অধ্যায়। এই আঠার অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৪০৯। ইহার প্রথমাধ্যায়ে কণ্টকনগর-নাগরী বচন, দ্বিতীয়ে সন্ন্যাসাশ্রম পবিত্র করণ, তৃতীয়ে রাঢ়দেশ ভ্রমণ, চতুর্থে অদ্বৈত বাটী বিহার, পঞ্চমে

দণ্ড ভঞ্জন, ষষ্ঠে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ, সপ্তমে বিরজা দর্শন, অষ্টমে মহাদেব দর্শন, নবমে শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণ ব্যবস্থা, দশমে পুরুষোত্তম দর্শন, একাদশে মহাপ্রসাদ মহিমা, দ্বাদশে সার্ব্বভৌমানুগ্রহ, ত্রয়োদশে সার্ব্বভৌম সান্ত্বনা, চতুর্দ্দশে জিয়ড় নৃসিংহ প্রসঙ্গ, পঞ্চদশে পরমানন্দপুরী সঙ্গোৎসব, ষোড়শে শ্রীজগন্নাথ দর্শন, সপ্তদশে দেবানন্দানুগ্রহ, অষ্টাদশে গৌড়দেশ দর্শনানন্তর গোপীনাথ দর্শন।

চতুর্থ প্রক্রমের অধ্যায় সংখ্যা ছাব্বিশ, এই ছাব্বিশ অধ্যায়ে ৫৯৫ শ্লোক আছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে বৃন্দাবন গমন ও তপন মিশ্রাদি অনুগ্রহ, দ্বিতীয়ে মথুরা মণ্ডল দর্শন, তৃতীয়ে দ্বাদশবন প্রসঙ্গ, চতুর্থে মথুরা ষষ্ঠ কূপাদি দর্শন, সপ্তমে বস্ত্রহরণাদি লীলাস্থলি দর্শন, অষ্টমে শ্রীগোবর্দ্ধনাদি দর্শন, নবমে মহারাসস্থলী দর্শন, দশমে শ্রীকুঞ্জ যমুনাদি দর্শন, একাদশে অক্রূরাগমনাদি লীলা শ্রবণ, দ্বাদশে কংসবধাদি সূত্র, ত্রয়োদশে গোপানুগ্রহ, চতুর্দ্দশে বৃন্দাবন হইতে গৌড়াগমন পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে বিহার, পঞ্চদশে পুরুষোত্তম দর্শন, ষোড়শে প্রতাপ রুদ্রানুগ্রহ, সপ্তদশে ভক্তানুগ্রহ, অষ্টাদশে নরেন্দ্রসরোবিহার, ঊনবিংশে শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ কীর্ত্তন, বিংশে গুণ্ডিচামন্দির বিলাস, একবিংশে রামদাসানুগ্রহ, দ্বাবিংশে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত সঙ্গোৎসব, ত্রয়োবিংশে শ্রীনিত্যানন্দ বিলাস, চতুর্ব্বিংশে ভক্তমণ্ডল বিলাস, পঞ্চবিংশে গ্রন্থানুক্রম বর্ণন, ষড়বিংশে গ্রন্থানুক্রম বর্ণন এবং গ্রন্থ সমাপ্তি।

স জয়তি বিশুদ্ধ বিক্রমঃ কমলাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানু বিলম্বিত সদ্ভুজো বহুধা ভক্তি রসাভি নর্ত্তকঃ॥

এইটী মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক, ইহার পরে কয়েকটী শ্লোকে শ্রীগৌরলীলার সূত্র অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রশ্ন যথা :—

ভক্তঃ শ্রীবাস নামা দ্বিজকুল কমল প্রোল্লসচ্চিত্রভানুঃ
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদহরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনং।
তস্যাজ্ঞা মাকলয্য প্রকট করপুটে তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ
শ্রীমচ্চৈতন্য মূর্ত্তেঃ কলিকলুষ হরা কীর্ত্তিমাহ স্বয়ং সঃ।

দ্বিজকুল কমলের উল্লাসকারি সূর্য্যস্বরূপ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমুরারি গুপ্তকে বলিলেন, এই শ্রীহরির নূতন অবতারের নবীন চরিত্র সকল তুমিই আমাদিগকে বল। মুরারি শ্রীবাস পণ্ডিতের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া করজোড়

পূর্ব্বক বারম্বার নমস্কার করিয়া শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তির কলিকলুষহরা কীর্ত্তি স্বয়ংই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার পর শ্রীমুরারি গুপ্ত অনেক চিন্তা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, যাহা স্বয়ং বৃহস্পতি বলিতে সমর্থ নহেন তাহা তিনি কেমন করিয়া বলিবেন। এই প্রকার অনেক দৈন্যের পর পুনরায় মঙ্গলাচরণ করিলেন। যথাঃ—

নমামি চৈতন্য মজং পুরাতনং চতুর্ভুজং শঙ্খ গদাব্জ চক্রিণং।
শ্রীবৎস লক্ষ্মাঙ্কিত বক্ষসং হরিং সন্তাল সংলগ্নমণিং সুবাসসং॥

এই মঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বিবাহ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণান্তর স্বধাম গমন পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন।

ইহার পরে শ্রীদামোদর পণ্ডিতের প্রশ্ন আরম্ভ এইরূপঃ—

এতচ্ছ্রুত্বাদ্ভুতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রীচৈতন্য-কথামত্তঃ. শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ॥

এইরূপ পাঁচটী শ্লোকে দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্ন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পরে মুরারির উত্তর আরম্ভ। যথাঃ—

তৎশ্রুত্বা বচনং তস্য পণ্ডিতস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ বচনং প্রীতো মুরারিঃ শ্রূয়তামিতি॥

এই স্থান হইতে কথা আরম্ভ হইয়া প্রভুর গয়াধাম গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানেই প্রথম প্রক্রম সম্পূর্ণ। প্রথম প্রক্রমের শেষ শ্লোক এইঃ—

শ্রুতাচ তীর্থস্য বিধিক্রিয়া হরে র্গভেদগয়াতীর্থ ফলং মহত্তমং।
দেহাবসানে বিমলাং গতিং নরঃ শ্রদ্ধান্বিতোগচ্ছতি পূর্ণিমাচ॥

দ্বিতীয় প্রক্রমারম্ভ শ্লোক—

ততঃ প্রোবাচ তৎশ্রুত্বা শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ।
নবদ্বীপে কিমকরোল্লীলাং লীলানিধিঃ প্রভুঃ॥

দ্বিতীয় প্রক্রমে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। তৃতীয় প্রক্রমের প্রথম শ্লোক—

শ্রুত্বাহরেঃ কথনমদ্ভুত মপ্রমেয়ং দামোদরঃ পুনরুবাচ ভিষগ্‌মুরারিং।
তৎ কথ্যতাং কথমসৌ ভগবাংশ্চকার ন্যাসং বিদেশ গমনং পুরুষোত্তমঞ্চ॥

চতুর্থ প্রক্রমের আরম্ভ শ্লোক—

এবং জগৌরাসিরসান্নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন পূর্ণ মানসঃ।
স্বরূপ মুখ্যৈশ্চ গদাধরাদ্যৈঃ সমং ননর্ত্ত স হি নাম কেত্তৌকী॥

চতুর্থ প্রক্রমের শেষ শ্লোক—

চতুর্দ্দশ শতাব্দেহস্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে।
আষাঢ় সিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ চতুর্দ্দশশত পঁয়ত্রিশ শকাব্দায় আষাঢ়ী শুক্ল সপ্তমী তিথিতে এই গ্রন্থ সংস্পূর্ণ হইয়াছে। এই গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ১৯২২ প্রায় দুই সহস্র

রামকেলি।

ভগবৎ কৃপায় আজ কাল অনেক মাসিক পত্রিকায় শ্রীগৌরচরিত্র ও গৌরভক্ত চরিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ইহা কলি জীবের কল্যাণপ্রদ বলিতে হইবে। আমরা 'সৎসঙ্গ' নামক মাসিক পত্র হইতে নিম্ন-লিখিত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

অতীতস্মৃতি যখন ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার স্পর্শে যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। যখন কোন পুরাতন স্থান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং কোন প্রাচীন কাহিনী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন হৃদয় যেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়; তখন যেন অতীতের সম্মোহন চিত্র আমরা দেখিতে পাই, সে চিত্র অস্ফুট হইলেও অতি মধুরতাময়। আমরা তখন বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া অতীতের সহিত মিশিয়া যাই। সেই অতীতের মধুর স্মৃতিতে আপনাকে সিক্ত করিয়া কি এক প্রফুল্লতায়, কি এক কোমলতায়, কি এক মধুরতায় চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। চারিদিকে তখন ভাবের পারিজাত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার পবিত্র সৌরভে হৃদয় আত্মহারা করিয়া দেয়। রাম-কেলির গৌরব-কাহিনী—গুপ্ত-বৃন্দাবন নামের সার্থকতা গৌড়ের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। রামকেলীর বারদুয়ারী প্রভৃতি রাজপ্রাসাদ গৌড়ের শেষ বাদসাহ হোসেনসাহের রাজত্বের স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। হোসেনসাহ বাদ-সাহের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী (দবিরখাস ও সাকর মল্লিক) সনাতন ও রূপের লীলাস্থান যে রামকেলি, রামকেলি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। সেই কেলি-কদম্ব মূলে শ্রীগৌরাঙ্গের ভোজন স্থান—সেই রূপসাগর, সনাতন-সাগর—সনাতনের স্থাপিত সেই শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ মূর্ত্তি—সেই রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি এখনও অতীতের কথা স্পষ্টরূপে স্মৃতিপটে উদয় করিয়া

দিতেছে। রামকেলি একদিন অনেক অভিনয়ের রঙ্গভূমি ছিল। যদিও পূর্ব্বের ন্যায় রামকেলীর অবস্থা তেমন সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নহে, কিন্তু ইহার বর্ত্তমান দৃশ্য অবলোকন করিলে হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। এককালে যাহা রূপ সনাতনের লীলাস্থান ছিল, আজ তাহারই ভগ্ন ধ্বংসাবশেষ অতীত রমণীয় দৃশ্যগুলিতে আমাদের মনঃ প্রাণ মুগ্ধ করিতেছে। আমরা সেই অতীতের রমণীয়তা বর্ণন করিতে অক্ষম।

রামকেলির অবস্থা জানিতে হইলে গৌড়েরও সংক্ষেপ পরিচয় কতকটা দিতে হয়। তাই আমরা সংক্ষেপে পাঠকগণকে গৌড়ের অবস্থা কিছু জানাইতেছি।

গৌড়ের উত্তরে পিছলি নামে এক নগরছিল। এই নগরে লোকপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল প্রভৃতি পালবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার কোন চিহ্ন মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পালবংশীয় নৃপতিগণের পরে সেনবংশীয় নৃপতিগণ গৌড়ের মধ্যস্থলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতি বীরসেন বারক্রোশ দীর্ঘ এবং তিন ক্রোশ প্রশস্ত স্থান বেষ্টন করিয়া বাহিরগড় নামে এক মৃত্তিকার গড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বাহিরগড়ের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটী দ্বারছিল। উত্তর দিকের দ্বারের নাম চণ্ডীদ্বার, আর দক্ষিণ দিকের দ্বারের নাম জহরদ্বার। দুই দিকের দুই দ্বারে দুই দেবী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। চণ্ডীদ্বারে প্রবেশ করিতে যে দেবী প্রতিমা, তাহাকে পূর্ব্বে সকলে চণ্ডীদেবী বলিত এবং দ্বার রক্ষা করিতেছেন বলিয়া কেহ কেহ দ্বারবাসিনীও বলিত। এই দ্বারের পার্শ্বে যে গ্রাম আছে, তাহার নাম চণ্ডীপুর। আর জহর দ্বারে এক কালী মূর্ত্তি ছিলেন, তাঁহাকে সকলে জহরবাসিনী দেবী বলিত। ভাগীরথী নদীর ভাঙ্গনে বিলয় প্রাপ্ত হইলেও কিঞ্চিৎ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তথায় লোক জনের আবাসস্থল হইয়া জহরপুর নামে গ্রাম হইয়াছে। প্রশস্তে ক্রোশত্রয় এবং দীর্ঘে দ্বাদশ ক্রোশব্যাপী এই বাহিরগড়ের মধ্যে আবার আর চারিটী গড় আছে। তাহার নাম সুলতান গড়, লোহাগড় ফুলবাড়ীর গড় এবং সকল গড়ের ভিতর দক্ষলের গড়। চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশব্যাপী দক্ষলের গড়ের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ছিল। এই দক্ষলের গড়ের আবার দুইটী দ্বার। পূর্ব্ব দ্বারের নাম লুকোচুরী দরজা, আর উত্তর দ্বারের নাম দক্ষলের দরজা। এই দ্বার দুইটী এখনও বর্ত্তমান

থাকিয়া কালের অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রাজপ্রাসাদ প্রবেশ করিবার দক্ষলের দ্বারে গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির। মন্দির ভগ্ন হওয়ায় রাশিকৃত ইষ্টকের স্তূপ হইয়া রহিয়াছে। দক্ষলের গড়ের মধ্যে বাইশগজ নামে প্রাচীর। এরূপ প্রশস্ততা ও উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাচীর আর কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। বাইশ গজ প্রাচীব এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান। বাইশ গজ প্রাচীরের নিকটেই ইন্দ্রজিৎ নামে অন্দরমহল। ইহার পূর্ব্বে (Bath Room) স্নানের ঘর। এই স্নানের ঘর পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে নির্ম্মিত। ইহা ভিন্ন আর দ্বাদশটী চক ছিল, চকের প্রাঙ্গণে চতুষ্পার্শ্ব সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তাহা আর বর্ত্তমান নাই, কেবল স্থানটীতে অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। সেনবংশীয় রাজগণের পর মুসলমানগণ গৌড়ের বাদসাহ হইয়া এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতিগণের বেচাবাড়ী নামে যে বিচারালয়ের স্থান ছিল, মুসলমানগণ তথায় আর বিচার কার্য্য না করিয়া এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বেচা মস্‌জিদ্‌। এখনও তাহা বর্ত্তমান থাকিয়া বাদসাহ কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। হোসেনসাহ বাদসাহ লুকোচুরী দরজার নিকট কদমরোসুল নামে এক দরগা এবং জলগড়ের নিকট "পীরুসা মন্দিরা" নামে আশী হাত উচ্চ একটী মনুমেণ্ট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাও এখন বর্ত্তমান।

এই রাজপ্রাসাদের অত্যল্প ব্যবধানে রামকেলি গ্রাম। রামকেলির মধ্যে বাদসাহের নির্ম্মিত বারদুয়ারী নামে এক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ বর্ত্তমান। যদিও ইহার স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া ধ্বংসাবশেষ মাত্র রহিয়াছে, তথাপি ইহাতে যে সৌন্দর্য্য খেলিতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সাহের রাজত্বকালে সনাতন মন্ত্রী এবং রূপ উপমন্ত্রী —পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সনাতনের দবিরখাস এবং রূপের সাকর মল্লিক আখ্যায় বাদসাহী উপাধি ছিল। সনাতনের মত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন গভীর গবেষণা পূর্ণ বিজ্ঞ, বহুদর্শী ব্যক্তিকে মন্ত্রী পাইয়া বাদসাহ হোসেনসাহ আর রাজকার্য্যের ভাবনা ভাবিতেন না। সনাতনের উপর রাজকার্য্যের সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। অধিকন্তু সনাতনের কার্য্যে রাজ্যের কর্ম্মচারী ও প্রজামাত্রেই বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। সকলেই সনাতনকে গৌড় দেশের মুকুটমণি বলিয়া জানিত এবং বাদসাহ একদণ্ড সনাতনকে দেখিতে না পাইলে অস্থির হইতেন। সনাতন সাধারণের নিকট বিশেষ যশস্বী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

যখন মানুষের প্রাণ কাঁদে—যে আপনি আপনাকে চিনিতে পারে, তখন বিষয়-বৈভব, স্ত্রী, পুত্র, টাকা কড়ি কোথায় লাগে? সকলই তুচ্ছ বোধ হয়। সহস্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাহা অতল জলে ভাসিয়া যায়। কি এক ভাব উপস্থিত হইয়া সনাতনের মনে সংসারাসক্তিতে বৃশ্চিক দংশন জনিত যন্ত্রণা অনুভূত হইত—তখন কিছুই ভাল লাগিত না—সংসার "ছাড় ছাড়" বোধ হইত। সনাতনের মনের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ছোট ভাই রূপ আসিয়া একদিন বলিলেন, "দাদা আপনার মনের অবস্থা এরূপ দেখিতেছি কেন? গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীত্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনার তীর্থপর্য্যটনাদি কার্য্য হইতেছে না, তজ্জন্য যদি মনের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই রামকেলিতেই আপনি শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভাবের উদ্দীপন জন্য রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, অষ্টসখী-কুণ্ডাদি প্রকাশ করিয়া ব্রজের ভাবে হৃদয়কে বিভোর করিয়া দেন।" ছোট ভাই রূপের এই কথা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া সনাতন শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি স্থাপন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডাদি খনন করিয়া ব্রজের ভাবে রামকেলিকে পূর্ণ করিয়া হৃদয়ের বেদনা কতকটা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। সেই শ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি এবং রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডাদি এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া সনাতনের লীলায় বিশেষ পরিচয় দিতেছে।

বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠার কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, এক দিন রাত্রিতে সনাতন স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক অসামান্য-লাবণ্যবিশিষ্ট পুরুষ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই বিরাট পুরুষের অলৌকিক রূপে সনাতনের মনঃ প্রাণ সুশীতল হইল—হৃদয়ের মধ্যে এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল—তখন তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন; সেই মহাপুরুষ যেন সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সনাতন আর কেন? জীবের উদ্ধার জন্য ব্রজের মঞ্জরী দেহ পরিত্যাগ করিয়াছ, শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান কর; আর বিলম্ব করিও না। তোমরা দুই ভ্রাতায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন কর, আর ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জীবের সদ্গতির সোপান কর," এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ! সনাতন এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রূপের নিকট প্রকাশ করেন; পরে দুই ভ্রাতায় এক দৈন্য পত্রিকা লিখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ রাজমহল হইতে কানাইর-নাটশালা দিয়া গৌড়ের রামকেলি গ্রামে উপনীত হইয়া কেলিকদম্ব মূলে

উপবেশন করেন। দর্শনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য অসংখ্য লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া অত্যুচ্চ রবে হরি হরি ধ্বনি করেন। সেই হরি ধ্বনির প্রতি-ধ্বনিতে বাদসাহ হোসেনসাহ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "মন্ত্রী, যাঁহাকে পাইয়া এই অসংখ্য অসংখ্য লোক হরিধ্বনি করিতেছে, ইনি কে?" সনাতন বলিলেন, "ইনি কলিযুগের ভাবাত্মকারী গূঢ়াবতার"

পরে সনাতন ও রূপ গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্মুখীন হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহাদিগের দুই ভাইকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—

"গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে
সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সনাতন ও রূপের এবং সমাগত ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিনে সেই কেলিকদম্ব মূলে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবার্থ প্রসাদ লইয়া মহোৎসব হইয়াছিল। পরদিন ১লা আষাঢ় বাসি মহোৎসব হইয়াছিল, ইহাই রামকেলীর গুপ্ত বৃন্দাবন নামের সার্থকতা। এই শ্রীগৌরাঙ্গের মহোৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে হওয়ায়, এখনও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি এবং তাহার পরদিন গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের মহোৎসব হইয়া থাকে। এই মহোৎসব উপলক্ষে রামকেলি গ্রামে এক প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। এই মেলাতে শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত অনেক নরনারীর সংমিলন হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের পর হইতে সনাতন ও রূপের সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন হয়। সংসার তুচ্ছ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপবর্ত্তী হন। যখন মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মে—যখন মানুষ আপনি আপনাকে চিনিতে পারে—আপনি আপনাকে জানিতে পারে—মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে—সংসারাসক্তিতে বিষ বোধ হয়, তখন সহস্র প্রতিবন্ধক কোথায় ভাসিয়া যায়। সনাতনকে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া রাখিবার জন্য বাদসাহ হোসেনসাহ কত কৌশল অবলম্বন করিলেন, সমস্তই ব্যর্থ হইল, অবশেষে বাদসাহ সনাতনের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সনাতনকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সনাতন "সাধু যার সংকল্প ঈশ্বর তার সহায়" এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; কিছুতেই তাঁহার

মন বিচলিত হইল না। কৌশলে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন; কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ধর্ম্মের জন্য মন যাহার পাগল হইয়াছে, শ্রীভগবানকে দেখিবার জন্য হৃদয় যাহার উন্মত্ত হইয়াছে, সংসারের সামান্য বন্ধন কি তাহাকে বাধা দিতে পারে? সনাতনের বৈরাগ্য অবলম্বন করার পর হইতেই বাদসাহের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

সনাতন ও রূপ বাদসাহের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকা কালে তাঁহাদের দুই ভাইয়ের বাসা পৃথক পৃথক স্থানে ছিল। সনাতনের বাসার নাম বড়বাড়ী; তথায় তাঁহার রাজপ্রাসাদের তুল্য অট্টালিকা ছিল; এখন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তাহার পার্শ্বে তাঁহার খোদিত একটী জলাশয় আছে, তাহাই সনাতন সাগর—যে সনাতন সাগরের নির্ম্মল জলে পঙ্কজ-কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত, ভ্রমর গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিয়া সেই সকল প্রসূনে উপবিষ্ট হইয়া মধুপান করিত—যাহা দর্পণের ন্যায় শোভা পাইত, আজ কালের গতিতে সেই সনাতন সাগর শৈবাল, দাম ও পঙ্ক পরিপূর্ণ, তাই স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যেখানে কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন হইত, আজ তাহা কেবল সৌন্দর্য্য আকর্ষণের পরিচয় মাত্র। রূপের বাসার নাম গির্দ্দাবাড়ী। তাহার পার্শ্বেও রূপসাগর নামে এক জলাশয় এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া রূপের কীর্ত্তি-বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। রামকেলি মালদহ হইতে ৮ ৯ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। মেলার সময় অনেক জেলার নরনারী আসিয়া মহোৎসবে যোগ দিয়া থাকেন।

—*:*:*—

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব।

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠের ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকায় দেখিলাম যে "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় গ্রন্থোক্ত কোন কোন কথায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন। সমালোচক মহাশয়ের যে হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার নাই, ইহা বলিতেছি না। হিন্দু শাস্ত্র কত বিস্তৃত, কত গভীর, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার পরিমাণ হয় না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। হিন্দুধর্ম্মের বা মহাজন প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থের সমালোচনা করা তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়, যিনি শাস্ত্র সাগরের পারগামী। অন্যের সে চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

আমার শরীর ও মন ভাল নহে, পীড়িত দেহ লইয়া সুদীর্ঘ প্রতিবাদ লিখি এ শক্তি নাই; তথাপি পাঠক মহাশয়কে সমালোচনার একটু নমুনা না দেখাইয়া পারিতেছি না। সমালোচক বলেন—

"অদ্বৈত প্রভু শিবের অংশে আবির্ভূত বলিয়া কোন কোন লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে ইহা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভাব্য নহে। কিন্তু এরূপ অংশাবতারে শিবের পৃথক ঈশ্বর রূপে অস্তিত্ব লোপ পায় না; এবং তাঁহার অংশ মনুষ্যাদি রূপে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা-শালী হইতে পারে না।"

সমালোচক মহাশয়ের মতে যদিও "শিবের অংশে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভাব্য নহে," তথাপি তাঁহার বিশ্বাস যে, মহাদেব "সমস্ত জগতের কার্য্য বন্ধ রাখিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে।" অর্থাৎ কষ্টে স্রষ্টে অংশাবতার স্বীকার করিলেও তিনি পূর্ণাবতার মানেন না। তাঁহার কথার ভাবে বোধহয়, যে, ভগবান পূর্ণতম রূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, তাহা হইলে "সমস্ত জগতের কার্য্য বন্ধ" হইয়া যায়। বোধহয় সমালোচক মহাশয় মনে করেন যে, আমরা যেমন এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে পূর্ব্বস্থান শূন্য থাকিয়া যায়; ভগবানের পক্ষেও তদ্রূপ। কিন্তু এরূপ কল্পনা না করিয়া যদি মনে করিতেন যে, যে পূর্ণতম মহাদেব স্বীয় আত্মা হইতে স্বীয় অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবলে তুল্য ক্ষমতাপন্ন অবতার আবির্ভূত করিতে পারেন, তিনি ঐ অবিচিন্ত্য শক্তিতেই কৈলাশ পর্ব্বতের রাজ্যে ও শান্তিপুরে একই সময়ে সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেও পারেন। যদি মনে করিতেন যে, ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহার ধামও বিভু, সর্ব্বগ; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় ধামও পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। তবেত আর কথা থাকিত না, সন্দেহ হইত না, তবেই তাঁহার মত শাস্ত্র-সঙ্গত হইত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্র বাক্য দ্বারা কখনই তাহা সমর্থিত করিতে পারিবেন না। তবে অনর্থক শাস্ত্রের দোহাই কেন? বস্তুতঃ ভগবান অবতীর্ণ হইলে তদীয় পূর্ব্বধাম শূন্য পড়িয়া থাকে না; ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। শিব "ঈশ্বর," তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বত্রই তদীয় সত্তা বিরাজিত রহিবে, আশ্চর্য্য কি? ক্ষুদ্র প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ জ্বালাইয়া লইলে উভয় দীপই সমশক্তিমান, সমপ্রভান্বিত হইয়া থাকে; আর অবিচিন্ত্য শক্তিমান মহাদেবের কৈলাশ

হইতে পূর্ণরূপে আর কোথায়ও যাইবার ক্ষমতা নাই, ইহা কেবল সমালোচক মহাশয়ই বলিতে পারেন। ইহা যে কদাপি "সম্ভবপর নহে, শাস্ত্রে এরূপ কোনও কথা নাই। ভগবানের পূর্ণাবতারের কথা থা'ক, মহাদেবও যে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন না, এ কথা বলিবার পূর্ব্বে সমালোচক মহাশয়ের, অগ্নিসংহিতা (১৪ অঃ) সুরতরুতন্ত্র (৫ পটল) অনন্ত সংহিতা প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্র গুলি দেখিলেই ভাল হইত। (ঐ সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিলাম না।) আর অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থেরই বা দোষ কি? এ কথা বলা যদি দোষ হয়, তবে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থই এ দোষে দূষণীয়। প্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবতের ইহাই মত; মুরারিকৃত চৈতন্যচরিত গ্রন্থেও তাহাই লিখিত আছে। কর্ণপুরের দীপিকা গ্রন্থে লিখা রহিয়াছে—

"ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।"

অতএব এ সকল মত অদ্বৈত-প্রকাশে "প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না" ভাবিবার আবশ্যক নাই। ইহা গ্রন্থকারেরই মত, এবং ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও মত।

ইহাও সামান্য কথা, বিশেষ কথা এই যে,—"শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশে শুধু সেই শিবকে অদ্বৈতপ্রভু করা হয় নাই; শিব ও মহাবিষ্ণু উভয়ে মিলিয়া একটী মাত্র অদ্বৈত হইয়াছিলেন, বলা হইয়াছে।" আমরা বলি যে, এ গুরুতর দোষটা ক্ষুদ্র অদ্বৈত-প্রকাশের নহে—এক খানি প্রসিদ্ধ মহাপুরাণেরও, তাহার নাম পদ্মপুরাণ। তাহাতে লিখিত আছে যে, ভগবান মহাদেবকে এই তত্ত্ব স্বয়ং বলিয়াছিলেন, যথা পদ্মপুরাণে—

"ত্বঞ্চ কলিযুগে প্রাপ্তে মমাজ্ঞাচ সদাশিবঃ।
ভূত্বা চাদ্বৈত নামাসৌ তাং সীতাং প্রাপ্স্যতি ধ্রুবং॥"

অদ্বৈত-প্রকাশ এই শাস্ত্রবাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, যথা—

"মহাবিষ্ণু কহে তুমি নহ আর কেহ।
তোর মোর এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ॥
এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন।
দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন॥"

অদ্বৈত যে শুধু শিব—মহাবিষ্ণু নহেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে অবিসংবাদী রূপে এ কথাও লিখিত নাই। কোন কোন গ্রন্থে তাঁহাকে শিবাবতার বলা গিয়াছে; আবার বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাকে স্পষ্ট

রূপে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রকাশ এ দুই মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, অথচ তাহা কল্পিত মত নহে, শাস্ত্রানুগত সৎসিদ্ধান্ত। সমালোচক মহোদয় ইহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিলেও বৈষ্ণবগণ এরূপ সিদ্ধান্তের যথেষ্ট গৌরব করেন।

ইহাও যা'ক, সমালোচক প্রবরের মতে ততোধিক "শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিশেষ কথা এই যে, মহাবিষ্ণুর উপরেও একজন ভগবানের কল্পনা করা হইয়াছে; এবং তিনিই আসিয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" এ কথা শুনিয়া আমার বিজ্ঞতম পাঠক মহোদয় বলিতে পারেন—'আর আবশ্যক নাই, সমালোচকের বৈষ্ণব শাস্ত্রে কতদূর জ্ঞান আছে বুঝিয়াছি।' এই খানে শেষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু তাঁহাদিগকে আরও অল্পদূর অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের নাম করিয়া প্রয়োজন নাই, সমালোচক মহাশয় যদি ভাষাগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত খানি দেখিতেন, তাহা হইলেই এ কথাটা অত সহজে বলিতে পারিতেন না; তাহা হইলেই বোধহয় বুঝিতে পারিতেন যে, মহাবিষ্ণুর উপরেও ভগবান একজন আছেন, সৃজন, পালন, সংহারাদি কার্য্য তাঁহার নহে, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত হইয়াও গুণময়, এ বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহারই মায়া। ঋষিগণ তাঁহাকেই 'বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ী' জগৎপতি নামে আখ্যাত করেন. ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাঁহারই স্তুতি এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"সগুণো নির্গুণো যশ্চ গুণাতীতো গুণাধিকঃ।
নিরাকারঃ সাকারশ্চ তং নমামি জগৎপতিং।"

মহাবিষ্ণুর উপরেও একজন কর্ত্তা আছেন, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহার ভূরি নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যদি সমালোচক অস্বীকার করেন, তবে আমরা আর কি বলিতে পারি? শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিব—

"নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোক সাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপিসত্যং ন তবৈব মায়া॥"

চরিতামৃতে একটা কথা দেখিতে পাই—

"নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥

সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।”

পূর্ণে অংশ বিদ্যমান, অংশ সমস্তের সমষ্টিই পূর্ণ। এ কথাটা সহজ, কিন্তু ইহা বুঝিলেই কৃষ্ণ ও বাসুদেবের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। বৈষ্ণব-গণ বলেন, দ্বারকাদি লীলা নন্দ-নন্দনের নহে,—বাসুদেবের। কৃষ্ণ নির্লিপ্ত, পরিপূর্ণ; মহাবিষ্ণু বা নারায়ণাদি তাঁহারই অংশ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী বলেন—

“স্বয়ং র্হাস্তোঽতি পরম মহত্তম তয়াস্মৃত’:।
তে পরব্যোম নাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসু সংখ্যকাঃ।
বাসুদেবাদয়োব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষা ভাজোমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ।
ইত্যেতে.পরমব্যোমনাথ ব্যূহৈঃ সহৈক্যতাং।
সবিলাসৈরিহাভোত্য প্রাদুর্ভাব মুপাগতাঃ।
অংশস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ নৃসিংহ ক্রোড় বামনঃ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাঽজিতাদয়ঃ।
এভির্যুক্তঃ সদাযোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ।
অতো বৃন্দাবনে তত্ত লীলা প্রকটৈক্ষতে।
বৈকুণ্ঠেশ্বর লীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে।
শেষত্বানামন্নাণ্ডানাং কোটী বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা।
সৈব জ্ঞেয়াযতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা।
বাসুদেবাদি লীলাস্তু মথুরা দ্বারকাদিষু।
তত্তদ্রূপৈ র্ব্রজাস্তস্তু বাল্যোক্তাভিশ্চ দর্শিতা।”

বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে মহাবিষ্ণু পূর্ণতম ভগবানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ মাত্র। শ্রীচরিতামৃতও বলেন—

“তাঁর অংশ পুরুষের কলা যে গণন ॥
যাহাকে ত কলা কহি তেহোঁ মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তেহোঁ সর্ব্বজিষ্ণু।” ইত্যাদি।

অতএব "মহাবিষ্ণুর উপরেও আর একজন ভগবানের কল্পনা" করার অপরাধ অদ্বৈত-প্রকাশের নহে যদি ইহা অপরাধ হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবত এবং তৎকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এই অপরাধে অপরাধী; সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র, সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থ এই অপরাধে অপরাধী। সমালোচক প্রবর কেবল অদ্বৈত-প্রকাশকে দোষ দেন কেন? আমরা প্রচুর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সমালোচকের কথা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব না, কেননা তিনি অতি স্থূল বিষয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; বৈষ্ণব পাঠক তাহার মতবাদ পাঠে হাস্য করিবেন মাত্র। বহির্ম্মুখ জনের জন্যও আমার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা যাহা বুঝেন, তাঁহাদের মতে তাহাই অভ্রান্ত; তদুত্তর কোন কথাই তাহারা শুনিবেন না।

অতঃপর সমালোচক কৃষ্ণের শিবদুর্গা প্রভৃতিকে স্তুতি করার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যদি কৃষ্ণ শিবকে স্তুতি করেন, তবে তিনি বড় হইলেন কিরূপে?—এই ভাব নাকি? যদি তাহাই হয় তবে ত শাস্ত্রে শত শত স্থানে শিবেরও কৃষ্ণকে স্তুতি করার—প্রণাম করার কথা পাওয়া যায়? তাহা হইলে বড় কে? এত বিষম সমস্যা দাঁড়াইল? এ সকল তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা মদ্বিধ পল্লবগ্রাহীর কার্য্য নহে। সমালোচকপ্রবর যদি এ রহস্য ভেদ করিতে প্রকৃত ইচ্ছুক হন, তবে শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ লইবেন, শাস্ত্র অবিরত আলোচনা করিবেন।

সমালোচক বলেন, গৌরাঙ্গদেব শিবদুর্গাকে প্রণাম করিয়াছেন—জানা যায়। সেই গৌরভক্ত অদ্বৈত কালীমূর্ত্তি প্রণাম করিলে, সে মূর্ত্তি ফাটিয়া যায়, ইহা অসঙ্গত। এ কথা "বিশ্বাস যোগ্য" কি না, তাহা ভগবানের লীলাতত্ত্বে যাহার প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহাকে বুঝাইব কিরূপে? পুরাণে এইরূপ কত কথাই আছে। ভৃগুমুনি পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যদি নারায়ণ তাহা হইতে ছোট হন, তবে "যে কালীর পদতলে স্বয়ং শিব" পড়িয়াছিলেন, সেই কালী তাঁহার পতি মহাদেব হইতেও বড় বলা যাইতে পারে। যদি অদ্বৈতকে শিবাবতার বলা যায়, তবে ন্যায়তঃ কালীকে তিনি প্রণাম করিতে পারেন না। কেন না কালী তাঁহারই পত্নীস্বরূপা মহাশক্তি। এবং তাহা হইলে শিবরূপী অদ্বৈতের প্রণামে দেবীর অন্তর্দ্ধান হওয়ায় মূর্ত্তি ফাটিয়া যাওয়া রূপ লীলা অসঙ্গত হইল কিরূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের লীলাতত্ত্বের ন্যায় গম্ভীর বিষয় আর কিছুই নাই; সকলেই যদি পাঠ

মাত্র তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, তবে জগতে অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বা-পেক্ষা কঠিন না হইয়া সহজই হইত।

এ সকল কথার পরও ঢাকা প্রকাশে অনেক কথা লিখা হইয়াছে, যে সকল আলোচনার অযোগ্য, পাঠককে আমি আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না তুমি শাক্ত বা বৈষ্ণব অথবা শৈবই হও, অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করার তোমার অধিকার কি ? আবার সে নিন্দা যদি ভিত্তিবিহীন হয়, তবে ইহাতে তোমারই অন্তরের হেয়ত্ব উপলব্ধি হইবে।

যাহা বলিলাম, তাহাতেই পাঠক সমালোচকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি-বেন। এ প্রবন্ধটিকে কেহ যেন, ঢাকাপ্রকাশের "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ মনে না করেন, ইহাই অনুরোধ। আমি সে মহাপ্রবন্ধোক্ত কথা গুলির খণ্ডন করি নাই, নমুনা দেখাইবার জন্য কিছু উদ্ধৃত মাত্র করিয়াছি, এবং আনুসঙ্গিক দুই একটি কথা বলিয়াছি। ইতি

শ্রীবৈষ্ণবদাসস্য—শ্রীহট্ট।

—*※*—

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে মতামত।

টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন ;— "সমাজের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানপত্র পাঠে অবগত হইলাম। উহার সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে এবং আমাদ্বারা যদি ঐ সমাজের সামান্য মাত্রও উপকার হয় তাহার চেষ্টা যথাসাধ্য করিতে যত্নবান হইব। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই আপনার প্রস্তাবে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম।"

শ্রীহট্ট মৈনা নিবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়া-ছেন ;—"অনুষ্ঠান পত্রে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সকলই অতি উপযুক্ত ; সে সকলই সুযুক্তির সহিত লিখিত হইয়াছে। এ অনুষ্ঠান পত্র বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যাহাতে প্রচারিত হয়, অগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের যেখানে যত হরিসভা বা চৈতন্য সভা আছে গৌরাঙ্গ সমাজের অগ্রে তাহাদের সহিত যোগদান করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি।"

রঙ্গপুর জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ বাগচি মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা এবং তাঁহার ভক্তগণের কীর্ত্তি জগতে যত প্রকাশ হয় ততই জীবের মঙ্গল আশা করা যায়। এই মহদুদ্দেশ্য

সংসাধন করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং ঐ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে আমার নাম দিলে আমি যথাসাধ্য তাহার উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টা করিব।"

বীরভূম কীর্ণাহারের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন;—"সমাজের উদ্দেশ্য অতি মহৎ তাহাতে সন্দেহ কি? আমার নাম কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে লিখিবেন কি না জানিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে আপত্তি করা দূরে থাকুক আমি এরূপ সমাজের সভ্য গণিত হইলে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিব। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই সদুদ্দেশ্য সফল হউক"

চট্টগ্রাম কক্স্‌বাজার হইতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ অতি উপাদেয় উত্তম অনুষ্ঠান।"

বাঁকুড়া গদাড্ডিহি নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর চট্টরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন;—"যে শুভ সম্বাদ পাইলাম তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হইলে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ঐ কার্য্যে আমি জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।"

চট্টগ্রাম হইতে কমিসনারের পারশনার আসিষ্টেণ্ট কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "আমার ইহাতে যোগদান করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য।"

শ্রীহট্ট পুটিজুড়ি ভগবান ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সংস্থাপন বার্ত্তা শ্রবণে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ইহার অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন এই প্রার্থনা। এই সদনুষ্ঠানে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে ও আমি ইহার উন্নতি কল্পে আমার ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব।"

মুর্শিদাবাদ শ্রীরামপুর নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু দৈবকীনন্দন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন;—"শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পাঠ করিলাম। অনুষ্ঠিত বিষয় প্রভুর কৃপায় কর্ম্মে পরিণত হইলে অতীব আনন্দের কথা। ইহাতে যে, সকল বৈষ্ণব মহাত্মাই অকপটে যোগদান করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের এ প্রদেশে যে যে স্থান হইতে যাহা সংগৃহীত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিব ইত্যাদি।"

শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রবাসী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীল পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুবর লিখিয়াছেন ;—"আমারে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত। শারীরিক পরিশ্রমে আমার দ্বারা যতদূর সম্ভবে যত্ন করিতে ক্রটী করিব না। অনুষ্ঠান পত্র একশত পাঠাইয়া দিবেন, শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং অন্যত্র পরিচিত ভক্তগণের নিকট বিলি করিব।"

ভাঙ্গামোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ;—শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া বড়ই অনুগৃহীত বোধ করিলাম। আমাকে সভ্য নিয়োগের অভিপ্রায় করিয়াছেন শুনিয়া সৌভাগ্য জ্ঞান করিলাম। যদিও আমার এরূপ কোন গুণ নাই যাহাতে এই মহৎকার্য্যে যোগদান করিতে সাহসী হই, কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহ বলে কিছুই আটকাইবে না এরূপ আশা আছে কতকগুলি অনুষ্ঠান পত্র আমার নিকট পাঠাইবেন, আমি জাহানাবাদ সবডিবিসনের গ্রামে গ্রামে তাহা বিলি করাইবার ভার লইতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠার ন্যায় সৎকার্য্য আর নাই ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে আপনাদের সাধু উদ্দেশ্য তিনি সফল করেন"

বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ ভাগবতাধ্যাপক ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। এই উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ মহদনুষ্ঠানের সামান্য কার্য্য সাধিত হইলেও আপনাকে ধন্য মনে করিব।"

ঢাকা উথলী নিবাসী শ্রীমদদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীল পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন ;—"সমাজের অনুষ্ঠান পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। সমাজের উদ্দেশ্য মহৎ, সুসম্পন্ন হওয়া এক মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপার উপর নির্ভর। তবে যে টুকু হয় তাহাই জগতের মঙ্গলকর বটে।"

শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রবাসী ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত গোলোকনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র পঠিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এরূপ একটা সমাজের যে নিতান্ত প্রয়োজন এ কথা বলাই বাহুল্য। উহা দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ শ্রেয়ঃ সাধন হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমাকে এই সৎ সমাজের সভ্য শ্রেণি-

ভুক্ত করিয়াছেন, ইহা শ্লাঘনীয় বিষয়। ভগবৎ সন্নিধানে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি তিনি এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধি করুন্।"

ময়মনসিং বাণীগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কাব্যতীর্থ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"গৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমাকে যে সভ্য পদে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে আহ্লাদিত হইলাম।"

কুচবিহার নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপায় উক্ত সমাজ সংগঠিত হইয়া সম্যক্ রূপে পরিচালিত হইলে আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিসম্বর্দ্ধনের একটী নূতন ভাবেব প্রীতিকর ব্যাপার হইবে।"

গোড্ডা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"অনুষ্ঠান পত্রের লিখিত প্রস্তাব গুলি অতি আরামদায়ক। আমরা তাহার কোন কোন অংশের পুষ্টিসাধন করিতে ইচ্ছা করি। যথা,—

(ক) নামসংকীর্ত্তন প্রচার। ইহাতে নাম, রূপ ও গুণ এই তিনের কীর্ত্তন সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া কীর্ত্তিত হইবে। (খ) গ্রন্থ রক্ষা ও প্রচার। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি এই সমাজের দ্রষ্টব্য বিষয় হওয়া উচিত বলিয়া বোধহয়। যে হেতু সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক অমূল্য গ্রন্থ আছে যাহা সাধারণে প্রচার নাই, সুতরাং বিলুপ্ত হইতে চলিল। সেগুলি রক্ষিত ও প্রচারিত হইলে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা উভয়েরই প্রচুর উন্নতি করা হইল। (গ) প্রাচীন ও ভূতপূর্ব্ব প্রেমিক কবিগণের গান গুলির যথাযথ তাৎপর্য্য জন সমাজের হৃদয়ে যাহাতে স্থান পায় ও তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা। (ঘ) ভক্ত জীবনী প্রকাশ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌরভক্তগণের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ। (ঙ) গৌরাঙ্গ তীর্থ। এই প্রস্তাবের ফলে যদি "গৌর তীর্থমালা" বলিয়া যতদূর সম্ভব বিশেষ বিবরণের সহিত গৌর-ভক্তের কণ্ঠহার স্বরূপ একটী পুস্তক প্রচারিত হয় তাহা প্রার্থনীয়। আর একটী কথা। পূর্ব্বকালে ন্যায়, বেদান্ত, বৈশেষিক প্রভৃতি বিদ্যার শিক্ষা বিধান ছিল, বর্ত্তমান কালেও ৺কাশীধামে বেদ বিদ্যালয় যেমন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্থানে স্থানে উপযুক্ত প্রেমিক

ভক্ত পণ্ডিত দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষাবিধান হওয়া উচিত। যে হেতু শ্রীশচীনন্দন জগতে যে ধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা অতি সূক্ষ্ম— ন্যায়, বেদান্ত গীতাদির সিদ্ধান্তের উপর। তাহার পরিচয় বা আভাস প্রভু নিজেই স্পষ্টই দিয়া গিয়াছেন। যে হেতু ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্র যাহা পাঠ করিয়া মানুষ আপনাকে ধন্য মনে করেন, তিনি বিদ্যার সাগর হইয়াও সে সমস্ত প্রেম-গঙ্গায় ভাসাইয়াছিলেন। অতএব প্রেমধর্ম্ম-বৈষ্ণবধর্ম্মের যথাবিধি শিক্ষা ও অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।”

পাবনা মালঞ্চি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন;—“শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলাম; এ দিনে প্রভুর লীলা এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষিত সমাজে বিশেষ রূপে প্রচারিত হইবে। আমি অতি দীন, আমাদ্বারা কি হইতে পারে, তবে প্রিয়াজী আমার প্রতি দয়া করিয়া যাহা আদেশ করিবেন, শেষ জীবনে তাহাই করিব। আমি প্রভুর চরণে সব দিয়াছি। যে আয়োজন করা হইয়াছে, প্রভু তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবেন। আর ভয় কি, এখন আমরা প্রাণ ভরিয়া প্রাণ গৌরাঙ্গের জয় ঘোষণা করিব, আর দয়াল নিতাইচাঁদের পতিত উদ্ধারের জয় পতাকা উড়াইব।”

শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবন নিবাসী শ্রীশ্রীরাধারমণ-সেবাধিকারী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন;—“শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র দেখিয়া বড় সুখী হইলাম; আমার চিরদিনের ইচ্ছা ছিল যে, একটী সমাজ সংগঠন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করা হয়; তাহার জন্য আমি চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কত নিয়ম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলাম, ইচ্ছা ছিল সর্ব্বত্র প্রচারের সুবিধার জন্য ইংরাজীতে সেই সকল কার্য্য আরম্ভ করিব। কিন্তু এই সমাজ দ্বারাই সেই কার্য্য শেষ হইবে। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে কেহ যাহা করিতে স্বীকৃত হইবেন না, তেমন নীচকার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। বিজ্ঞাপনাদির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী থাকিলে বড় ভাল হয়, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেক লোকেরা বাঙ্গালা কি হিন্দী কাগজ পত্র পাঠ করেন না। দ্বিতীয় নিয়মের (খ) চিহ্নিত অন্তর্নিয়মের কিম্বা তৃতীয় নিয়মে কিম্বা নবম নিয়মে আর একটু পরিবর্দ্ধন করিলে ভাল হয়। তাহা এই যে—একটী পাঠশালা স্থাপন করা হইবে, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকরের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল শিক্ষা দেওয়া হইবে ও

পরীক্ষা করা হইবে। এই উত্তীর্ণ পণ্ডিত সকল ভক্ত পণ্ডিত কিম্বা বৈষ্ণব পণ্ডিত ভাবে সম্মানিত হইবেন ও কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহার বিচার করিয়া গৌরাঙ্গ সমাজের পক্ষ রক্ষা করিবেন। আর বর্ত্তমান সময়ে যত বৈষ্ণব ধর্ম্মসমাজ আছেন, তাঁহারা সকলে এই সমাজের শাখা রূপে পরিগণিত হইবেন। এই মহাসভা এক স্থানে না হইয়া সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। কখন শ্রীনবদ্বীপ, কখন শ্রীনীলাচল, কখন শ্রীবৃন্দাবন কখনও বা অন্যান্য প্রভুর লীলা স্থলে গঠিত হইবে।"

ঢাকা বান্ধব কুটীর হইতে শ্রীযুক্ত রায় কালিপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়াছেন;—"পত্র খানি পড়িয়া একান্ত সুখী হইয়াছি। ভক্তিই অনন্তজীবি মানব হৃদয়ের এক মাত্র সম্বল এবং মনুষ্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়ার জন্য যিনি যাহা কিছু করিবেন তাহাই দেব কার্য্য এবং তাহাতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। আমাকে এই সভার সহৃদয় সেবক কিম্বা সহৃদয় সুহৃৎ বলিয়া মনে করিবেন। সভায় আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে।"

প্রসিদ্ধ মহাজনি পদাবলীর সংগ্রহকর্ত্তা ও ফরিদপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্রখানি প্রাপ্ত হই নাই। তবে এই সমাজ দ্বারা যদি আমার প্রাণবল্লভের ধর্ম্মের কোন সহায়তা হয়, তবে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি অবশ্যই থাকিবে।"

দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন;—"এইরূপ একটি সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব আমি করিব করিব মনে করিতেছি, এমন সময় অনুষ্ঠান পত্রাদি পাঠ করিয়া যেন আকাশের চাঁদ ভূতলে অবতীর্ণ, মনে হইল। প্রভুর কি কৃপা! আপনাদের দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য করাইতেছেন, আরও করাইবেন। আমি সভ্য হইলাম এবং সাধ্যমত সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করিতে প্রাণপণে যত্ন করিব।

সম্বলপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম বহিদার মহাশয় যে ইংরাজী পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই;—"আমি অতীব আহ্লাদের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলাম। আমি আমাদের প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কমলপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। প্রভুর নাম প্রচার সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

ঢাকা—তেঁওতার জমীদার শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের" কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রেণী মধ্যে আমার নাম সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহাতে আমি যথেষ্ট সম্মানিত মনে করিতেছি। অনুষ্ঠান পত্রে যে সমস্ত উদ্দেশ্য লিখিত আছে তাহা অতি মহৎ ও যথেষ্ট পরিমাণে আয়াস সাধ্য। এই সমাজের উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা কেবল সভ্যগণের চাঁদার প্রতি নির্ভর না করিয়া স্থানে স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু লোক যে মহাজনি ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের সাহায্য লইতে পারিলে সহজে অর্থ সংগ্রহের উপায় হয়। প্রতি বন্দরেই মহাজনদিগের ৵ বিত্তি বলিয়া একটী ফণ্ড আছে। ঐ ফণ্ড হইতে বারয়ারি ইত্যাদি হইয়া থাকে। তাহারই কিয়দংশ এই সমাজের জন্য পাইবার চেষ্টা করা আমার বিবেচনায় একান্ত কর্ত্তব্য এ বিষয় সমিতির অন্য সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া যথা-বিহিত করিবেন।"

—:*।*:—

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত	রাধিকানাথ গোস্বামী।	বৃন্দাবন।
,, ,,	মধুসূদন গোস্বামী।	ঐ
,, ,,	শ্যামলাল গোস্বামী।	কলিকাতা।
,, ,,	বলাইচাঁদ গোস্বামী।	ঐ
,, ,,	নীলমণি গোস্বামী।	ঐ
,, ,,	অতুলচন্দ্র গোস্বামী।	ঐ
,, ,,	জয়গোপাল গোস্বামী।	শান্তিপুর।
,, ,,	শ্রীনাথ গোস্বামী।	উথলি, ঢাকা।
,, ,,	মধুসূদন গোস্বামী।	ঐ ঐ
,, ,,	নবচন্দ্র গোস্বামী।	গদাড্ডিহি, বাঁকুড়া।
,, ,,	রাধিকানন্দ ঠাকুর।	শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।
,, ,,	গৌরগুণানন্দ ঠাকুর।	ঐ ঐ
,, ,,	সৃষ্টিধর চট্টোরাজ।	গদাড্ডিহি, বাঁকুড়া।
,, কবিবর	নবীনচন্দ্র সেন।	কমিসনারের পার্শনাল এসিষ্ট্যান্ট, চট্টোগ্রাম

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীময় ঘটক। রাণাঘাট।

,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। এম এ, বি এল, জমিদার, টাকি।

,, ,, প্রাণশঙ্কর রায়। জমিদার, ভেওতা, ঢাকা।

,, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এম এ, বি এল, এটর্ণি, কলিকাতা।

,, ,, বরদাচরণ বাগচী। উকিল, রংপুর।

,, ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। বিএল, উকিল, ছোটআদালত, কলিকাতা

,, ডাক্তার রামযাদব বাগচী। ঐ

,, বাবু কুঞ্জলাল রায়। রাজবল্লভপাড়া, ঐ

,, ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। হাটখোলা, ঐ

,, বাবু মুকুন্দলাল সরকার। মালঞ্চি, পাবনা।

,, ,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি। মৈনা, শ্রীহট্ট।

,, ,, রাজীবলোচন রায়। ঐ ঐ

,, পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি। বদনগঞ্জ, হুগলী।

,, ,, কালিদাস নাথ। বাগবাগান, কলিকাতা।

,, বাবু গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী। পড্ডা।

,, ,, শম্ভুচন্দ্র গুপ্ত। ঐ

,, ,, বলরাম বহিদার। সম্বলপুর।

,, ,, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। ম্যানেজার, চট্টোগ্রাম।

,, ,, সৌরেশচন্দ্র সরকার। জমীদার, কীর্ণাহার, বীরভূম।

,, ,, নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বারাসত।

,, ,, রামচন্দ্র দাস। দিনাজপুর।

,, ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। হাটখোলা, কলিকাতা।

,, ,, রসিকলাল ঘোষ। বসুপাড়া, কলিকাতা।

,, ,, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। ঝাটপাল, ঢাকা।

,, ,, নীলমণি দে। সবডিপুটি কালেক্টর, মজঃফরপুর।

,, ,, রামকুমার বিশ্বাস। হেডমাষ্টার ভগবান্ ইন্ষ্টিটিউসন, পুটিজুড়ি, শ্রীহট্ট।

,, ,, নগেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্বকোষ সম্পাদক, শ্যামপুকুর কলিকাতা

,, ,, বিরাজকৃষ্ণ দত্ত। জমিদার, মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

,, ,, বিহারীলাল শূর। হেডমাষ্টার, মডেলস্কুল, শ্যামবাজার কঃ

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঘোষ।	দরজিপাড়া,	কলিকাতা।
,, ,, মদনমোহন দত্ত।	বসুপাড়া,	কলিকাতা।
,, ,, রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।	পোষ্টমাষ্টার,	দানাপুর।
,, ,, গোলকনাথ মজুমদার।		নবদ্বীপ।
,, ,, দেবকীনন্দন সেন।	শ্রীরামপুর, ভগীরথপুর,	মুর্শিদাবাদ।
,, ,, গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র।	খাগড়া,	বহরমপুর।
,, ,, নন্দকুমার গোস্বামী।	বাণীগ্রাম,	ময়মনসিংহ।
,, ,, সদাশিব শুক।		সম্বলপুর।
,, ,, বালমুকুন্দ বেথরা।		ঐ
,, ,, মৃণালকান্তি ঘোষ।	বাগবাজার,	কলিকাতা।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, কিম্বা এই সমাজ সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা আপাততঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদকের নামে লিখিবেন।

প্রাচীন দাক্ষিণাত্য।

বিশ্বকোষ নামক বৃহদভিধানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের একখানি মানচিত্র মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিত্র দেখিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের স্থানগুলি সুন্দর রূপে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরামলীলার ঋষ্যমূক পর্ব্বত পম্পা সরোবর কিস্কিন্ধ্যা নাসিক পঞ্চবটী প্রভৃতি দেখিয়া ভক্তের মন দ্রবীভূত হয়। এই চিত্রের পশ্চিম প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণ লীলার দ্বারকাপুরী, রৈবতক পর্ব্বত দর্শন করিলে প্রেমরসের সঞ্চার হয়। শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যে সকল নদ, নদী, পর্ব্বত ও গ্রাম বিদ্যমান আছে তাহার প্রাচীন নামসহ চিত্রখানি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, তবে রামানন্দ রায়ের বাসস্থান বিদ্যানগর গোদাবরী নদী তীরে অবস্থিত বলিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ, কিন্তু চিত্রখানিতে ঋষিকুল্যা নদীর পর পারে মহেন্দ্র পর্ব্বতের সন্নিকর্ষে বিদ্যনগর দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলাম, চিত্রখানিতে এই প্রকার কোন কো স্থানে ভ্রম বলিয়া বোধ হইলেও মানচিত্রের সঙ্কলয়িতা মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ব্রজবিলাস।

শ্রী কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

১

সখার প্রতি,—যমুনাকো তীরে সখে
পহিলে পেখনু রাই,
কি রূপ হেরিনু
পাগল হইনু
যেন দেখিলাম আহা
শত চাঁদ এক ঠাঁই।
অথবা বিজুরী
হইয়া বাউরী,
প'ড়েছে ধরায় লুটি,—
কিবা নিরমল,
স্বরগ কমল,
সখে হের আছে ফুটি।
মধু আশে অলি
হইয়া আকুলি,
মুখপদ্ম পাশে ধায়,-
(তুলনা মিলে না তায়।)

২

হেরই আমারে ধনী
অম্বরে ঝাঁপল মুখ,—
ভরিয়া পরাণ
না পারিনু পান—
করিতে দরশ সুধা,—
মরমে বাড়ল দুখ।
কাম-ধনু ঘায়,
বিঁধিয়া আমায়,—
দূরে স'রে গেছে চোর,—
হৃদয় আসনে,
একা নিরজনে
বসেছে করিয়া জোর।
বিহি করুণায়
কত দিনে হায়,
মিলায়ব হৃদি চোর,
(নতু) ত্যজিব জীবন মোর।

৩

ধরিয়া কানুকো পাণি—
কহে যত সখাজন,—
শ্যামসে পিয়'রি রাজার ঝিয়ারি
তাহে কুলবতী তারে
পেতে সাধ এ কেমন!
ছিছি ছি, কানাই,
লাজে ম'রে যাই
পীরিতে হইলে ভোরা,—
কহিতে যে দুখ, বরজে এ মুখ
কেমনে দেখাব মোরা!
দূরি লোক লাজ, কহে রস রাজ,
পীরিতি গরলে মোর,—
জ্বলইত দেহা
নাহি পাই থেহা
বিহনে সে চিত চোর।

৪

মরম জ্বলিছে মোর
বিষম মদন ঘায়,—
নিবাতে জ্বলন,
করিয়া যতন
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া
কত না লেপিনু গায়,—
লেপিতে তা গায়,
আরো জ্বলে যায়,
বিহি কি করল হায়!
রাইকো মিলিতে,
উপায় তরিতে,
কর সখে করুণায়!
দূতী কি বোলল,
জ্বলনী বাড়ল
জীউ না ধরণে যায়।

বৈষ্ণবজন সেবিকা,—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

ক্রমশঃ।

প্রভু-প্রেরিত সাড়ী।

কোথা গেলি বিষ্ণুপ্রিয়া,
শীঘ্র আয় মা চলিয়া,
ক্ষেত্র হতে সমাচার এলো।
নিমাই মোর স্মরিয়াছে,
কত কি না পাঠায়েছে,
শচী পাছে বধূ দাঁড়াইল॥
দামোদর শচী আগে,
শ্রীমহাপ্রসাদ রাখে,
আর রাখে বহুমূল্য সাড়ী।
নন্দোৎসব দিনে রাজা,
বস্ত্রে করে প্রভু পূজা,
প্রভু উহা পাঠায়েছেন বাড়ী॥
শচী বলে বিষ্ণুপ্রিয়া,
ধর সাড়ী পর গিয়া,
পাঠায়েছে নিমাই তোর লাগি।
বাড়ীতে আসিতে নারে,
সদা তোমা মনে করে,
সে তোমার সুখ দুঃখ ভাগী।
দেবী সাড়ী করি বুকে,
বলিলেন জননীকে,
সাড়ী তুমি বিলাইয়া দাও।
বলে বলরাম দাস
ছাড় গো দুঃখিনী বেশ,
সাড়ী পরি আগেতে দাঁড়াও॥

নাম সংকীর্ত্তন।

কলিযুগে সংকীর্ত্তন অপেক্ষা জীবের পক্ষে ভজন সাধনের অনায়াস-সুলভ সদুপায় আর নাই। অন্য অন্য যুগে যাগ, যজ্ঞ, ধ্যানাদির দ্বারা ভজন সাধন হইতে পারিত এবং তাহাতে প্রত্যক্ষ মহৎ ফল ভগবৎ প্রসাদেরও উপলব্ধি হইত। কিন্তু:—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

কলিযুগে যে কোনও প্রকারে শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিতে পারিলে সমস্ত যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলি-জীবের নামই ভজন, নামই পূজন, নামই সাধন, নামই সর্ব্বস্ব। অধিকন্তু কলিযুগে হরিনামের আশ্রয় ব্যতিরেকে জীবের সংসার মুক্তির অন্য উপায় আর নাই। কঠোর সংযত একাগ্রচিত্ত হইয়া নামব্রত গ্রহণ করণানন্তর নির্জ্জন কুটীরে উপবেশন করতঃ শ্রীহরির নাম স্মরণ করা সাধারণতঃ কলির জীবের সাধ্যায়ত্ত নয় জানিয়া পরম কারুণিক পতিত-পাবন ভগবান্ শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভু জীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া জীব শিক্ষার্থে এই হরিনাম সংকীর্ত্তন স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। যে সঙ্গীত দ্বারা শ্রীশ্রী৺ভগবানের রূপ, গুণ, ও লীলাদি সম্যক রূপে কীর্ত্তিত হয়, তাহাকে সংকীর্ত্তন বলে। এই সংকীর্ত্তন আমাদের গৌড়দেশের এক মাত্র সম্পত্তি এবং এই গৌড় ভূমেই ইহার উৎপত্তি; পুষ্টিসাধনও এই স্থানেই হইয়াছিল। তবে কখন কোন্ সময়ে যে ইহার প্রবর্ত্তন হয় তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবেরা "সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক" বলিতেন এবং বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার প্রকট সময়েই এই জগমন-মুগ্ধকর সংকীর্ত্তনের বিশেষ রূপ বিস্তার ও প্রচার হইয়াছিল, নতুবা "সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক নামই" বা প্রচারিত হইবে কেন?

সংকীর্ত্তনের এমনি শক্তি যে ইহা দ্বারা মনোবৃত্তি সমূহ নির্ম্মল ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়, পরে ভগবদ্ভাব বিকাশিত হয়। সংকীর্ত্তনের আচরণে ভব-তাপ-তাপিত জনের হৃদয় মধ্যেও অভূতপূর্ব্ব শান্তিরসের সঞ্চার হয়, ভক্তিরস প্রকটিত ও সর্ব্বাঙ্গ প্রেমে পুলকিত হয়। ইহার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, সকলের চিত্ত (যাহা নিরন্তর অকূল চিন্তার্ণবে ভাসমান) কিয়ৎ ক্ষণের জন্যও আকর্ষণ

মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গ এবং যোগ প্রচার হইবে তজ্জন্য কত প্রকার চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু আজ আপনাদের এই প্রকার শুভানুষ্ঠানে ব্রতী দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনাদের এ হেন শুভব্রতে যোগদান করিলাম। আধুনিক অনেক সভ্য বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিয়া অনেক সময় অনেক তথ্য জানিতে চাহেন না, তজ্জন্য আমি মধ্যে মধ্যে ইংরাজি পছন্দ করি। অনুষ্ঠানপত্রের প্রস্তাব গুলি অতি মনোরম হইয়াছে, কিন্তু নামসংকীর্ত্তন প্রচার হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

উখড়া বৈদ্যনাথপুর আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়ের কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র রায় কবিভূষণ লিখিয়াছেন ;—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা ও তাঁহার ভক্তগণের কীর্ত্তি জগতে যত প্রকাশ হয় ততই জীবের মঙ্গল। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই সমাজের উদ্দেশ্য সাধন যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

শ্রীহট্ট কাঞ্চনধারা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস লিখিয়াছেন ;—বর্ত্তমান সময়ে এরূপ একটী সমাজের বিশেষ দরকার হইয়াছে। আমাকে যদি দয়া করিয়া উহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন, তবে এই অধমের দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি বিবেচনা করি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এই সভার মর্ম্ম জানান আবশ্যক, এবং প্রতি গ্রামেই ইহার সভ্য থাকা উচিত।

কলিকাতা চাসাধোবাপাড়া লেন হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ইংরাজি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই ;—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের নিমিত্ত "গৌরাঙ্গ সমাজ" গঠনের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আমি পরম আনন্দানুভব করিয়াছি। এই সমাজের উদ্দেশ্য গুলি এত মহৎ এবং এতাদৃশ একটী সমাজ সংগঠনের আবশ্যকতা এত অধিক যে এতদ্বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ী লোকেরই আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য। আমি বোধ করি, যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহাদের কেহই এই অনুষ্ঠানের সহকারী হইতে ও ইহার প্রবর্ত্তকদিগের সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ঈদৃশ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, নিজের ও সমাজের হিতসাধন করিতে হইলে, এই অনুষ্ঠানের যিনি নেতা ও যাঁহারা প্রবর্ত্তক তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক।

থাকিলে যেন রাজনীতি বা সংসার বিষয়ের কথা আনিয়া পড়ে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সংসারের অতীত এবং বিধি ধর্ম্মের বহির্ভূত, তাহাতে জাগতিক সম্বন্ধের কথা না থাকিলেই যেন অধিক মিষ্ট বোধহয় এবং বান্ধব পক্ষ ঠিক হয়।

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন;—আপনারা যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা হিন্দু মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য এবং পরম্পরা সম্বন্ধে ভগবৎ শাস্ত্রালোচনাতে পর্য্যবসিত। অতএব এ বিষয়ে আমাকে যে সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা আমি পরম প্রীতি ও আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। প্রস্তাবিত বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন;—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এবং তাঁহার ভক্তগণের কীর্ত্তি জগতে যতই প্রকাশিত হইবে, জীবগণেরও ততই মঙ্গলের আশা করা যাইবে। এক্ষণে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই মহতী সমিতি অত্যুদ্দমের সহিত কার্য্য করিয়া শীঘ্রই শ্রীগৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করুন। আমাকে এই সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচিত করায় কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। আমার দ্বারায় এ স্থানে যতগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টান্বিত আছি।

পটুয়াখালি হইতে গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন;—শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের অমানুষিক কীর্ত্তি এবং তৎপ্রদর্শিত ভক্তিমার্গ এই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয় তজ্জন্য আমি আজীবন বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতেছি। ছোট বড় ভেদাভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়া, সোণামুখি, শ্রীখণ্ড, শ্রীনবদ্বীপধাম, মায়াপুর, গোয়াড়ি, কৃষ্ণনগর, পিরিজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি প্রভৃতি স্থানে নামসংকীর্ত্তন পূর্ব্বক সকলের হৃদিপটে মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত করিতে যত্নবান হইয়াছি। চন্দ্রনাথ পাহাড়, চাটগাঁ, বালেশ্বর, রেমুনা, কটক, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, নীলাচল মহাপ্রভুর আশ্রম, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবনধাম, হরিদ্বার, হৃষিকেশ এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থানে পর্য্যটন করিয়া মহাপ্রভুর কীর্ত্তিকলাপ এবং নাম কীর্ত্তনে লোকদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কি প্রকারে

ভাই! যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্য কথার অনুষ্ঠান হইবে, সেখানে সকলেই সরল প্রাণে যোগদান কর, ইহাই আমাদের নিবেদন। শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ার অবতার, বিনয়ের অবতার, ভক্তির অবতার, প্রেমের অবতার। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের চিরসহচর, সদাশিব শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গেরই প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সমস্ত জগতে এই শুভ সমাচার প্রচার করিতে, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাভিক্ষা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। জগতের হিতসাধনে যাঁহাদের হৃদয়ে বিন্দু মাত্রও যত্ন আছে, প্রার্থনা করি তাঁহারাই এ ক্ষেত্রে যোগ দিয়া শ্রীগৌর-ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। সেবারাম—রসিকমোহন।

(মতামত।)

সেরপুর টাউনের জমিদার পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন ;—শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিশির বাবু মহাশয় যে কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব জগতের একমাত্র আচার্য্য ও নেতা পরমারাধ্যতম শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদ যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা যে শ্রীশচীনন্দনের আদিষ্টকর্ম্ম তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এবং তৎসম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই।

প্রস্তাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং আমি ইহার সভ্য হইতে স্বীকৃত হইলাম; শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের পরিচর্য্যা করিতে পারি এমত শক্তি আমার নাই, তবে ইহা হইতে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারিব এরূপ আশা আছে। নানা কারণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় সনাতন ধর্ম্মের বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহার উন্নতিকল্পে এবং জগতকে এই সৎধর্ম্মের আলোক প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাবিত সমাজের ন্যায় কোনও অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে ; এবং প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিজ জনের হৃদয়ে এই সদিচ্ছা উদয় করাইয়াছেন।

সমাজের উদ্দেশ্য গুলি সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই, তবে প্রথম বিষয়টী সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জন সর্ব্বত্র সমপ্রেমা হইবেন ইহাই অবধারিত। তাহাতে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ "সংস্থাপনের" কথা

জন্য। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সুখের বাসনা। কিন্তু শ্রীগৌরের চরণ শরণ গ্রহণ বা তাঁহার ভাবে চিত্ত ভাবত না হইলে সুখের আশা মরীচিকা মাত্র। যদি স্বার্থ ভুলিয়া সেবা না বুঝিয়া মানুষ আত্মসুখের জন্য পথ দেখিতে চাহে, সে স্থলেও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করা মানব সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, জৈন হও, আর শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য কিম্বা বিষ্ণু ভক্ত বৈষ্ণব হও, যদি তোমার উপাস্য দেবতাকে ভজিতে তোমার সাধ থাকে, তবে একবার শ্রীগৌরাঙ্গকে চিন্তা কর, ভজনার রাজপথ দেখিতে পাইবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি পদার্থ যদি না জানিয়া থাক, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়, শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ কর, যদি এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে তোমার সুবিধা ও সময় না ঘটে, একবার শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত পাঠ কর; দেখিবে শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার হৃদয়ের চিরসুহৃদ—সে মূর্ত্তি পৃথিবীর অথচ পৃথিবীর নহে—সে অমানুষিকী মূর্ত্তি, সে অমানুষিক জ্ঞান, সে অমানুষিকী বিদ্যা, সে অমানুষিক বিনয়, ভক্তি ও প্রেম পার্থিব পদার্থে সম্ভবে না। সে চল চল প্রেম চাহনি অনন্ত পবিত্রতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া তোমার হৃদয় জুড়িয়া বসিবে। তখন তুমি আর তোমাতে থাকিবে না। তোমার ক্ষুদ্র ভাব অন্ততঃ সে সময়ের তরে দূরে সরিয়া পড়িবে। প্রেমের মহাভাব তোমার হৃদয়ে মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিবে। তুমি নাস্তিক, পরকাল বুঝিতে পারিতেছ না, আত্মা বুঝিতে পারিতেছ না, ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার জ্ঞানের অতীত তোমাকেও আমি একবার শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। পরকাল তোমার জ্ঞানের অতীত, থাক্ উহা ঐরূপই থাক্। তাহাতে কিছু আসিয়া যাইতেছে না তুমি সামাজিক জীব, সমাজের দুঃখ যাতনা হিংসা দ্বেষ দূর করিতে হৃদয়ে টান আছে তো? সমাজে শান্তির সিংহাসন—প্রেমের সিংহাসন স্থাপন করিয়া জীবের ক্লেশ বিমোচন করিতে তোমার যত্ন আছে তো? যদি থাকে, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার চিরসুহৃদ্। তুমি নিঃসঙ্কোচে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজে যোগদান করিতে পার। হিন্দু হও, খ্রীষ্টান হও, বৌদ্ধ হও, মুসলমান হও, বা নাস্তিক হও, যে জাতি বা যে দেশবাসী হও, এই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সকলের জন্য। প্রেমময় দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ সমস্ত ধর্ম্মের মীমাংসা ও সমতুল্য স্থল।

এসহে গৌরাঙ্গ এস একবার। ঘুচাও ভারত ভুবন-আঁধার॥
প্রকাশিত হও পূর্ণ শক্তি লয়ে। দাও দাও প্রেম হৃদয়ে ঢালিয়ে॥
"গৌরাঙ্গ সমাজ" পরিপূর্ণ কর। ভকত হৃদয়-আশা পূর্ণ কর॥

শ্রীমুকুন্দলাল সরকার।

—:***:—

শ্রীগৌরের ভক্ত মণ্ডলীর একত্রিত হওয়া প্রকৃতই এক আনন্দের ব্যাপার। শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়, ভক্তিময়, আনন্দময় ও প্রেমময়। তাঁহার ভক্তগণ জগতে দয়া, ভক্তি, আনন্দ ও প্রেমের বিস্তার করেন। সুতরাং তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীর সম্মিলন জগতের এক মহা উপকার। যাহাতে মানুষ হিংসা দ্বেষ ও স্বার্থের প্ররোচনা ভুলিয়া মিলিয়া এক হইতে পারে, যাহাতে মানব সমাজে শান্তি আসিতে পারে, যাহাতে মানব সমাজ ধীরে ধীরে গোলকের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, যাহাতে মানব সমাজ পাপতাপপূর্ণ ধরায় থাকিয়া প্রেমময়ের প্রেমামৃত পানে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যপ্রেমের চিরসুখ সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ মানব সমাজের জন্য সেইরূপ শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন ও নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সরল প্রাণে সাধু অন্তঃকরণে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন, সুতরাং ইহা জগতের পক্ষে এক শুভ সমাচার। শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্য পবিত্রতা ও প্রেমের মূর্ত্তি। তাহাকে স্মরণ করিলে হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল হয় এবং প্রেমে প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার লীলা অতি মধুর গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী। প্রেম পবিত্রতার খনি শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন;—

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

আমরা বেদবেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল লইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারি,—বাদবিচার করিতে পারি;—মানুষের জ্ঞানের বড়াই করিতে পারি, কিন্তু হৃদয়ের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতে একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের চরণামৃতই সমর্থ। এমন ভাদ্রের ভরাগঙ্গার মত ভরপূর প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস আর তো কোথাও নাই। মানুষ আমরা চাই কি? ধনের গৌরব বল, পদের গৌরব বল, রূপের গৌরব বল, এ সমস্তের মূলে ত সুখ প্রাপ্তির চরম বাসনা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। মুক্তি চাই কেন, না, অনন্ত দুঃখ হইতে চরম শান্তি লাভের

৩

একদিন প্রভু যাঁহার হুঙ্কারে। এসেছিলা জীব দুঃখ হরিবারে॥
দিয়ে হরিনাম মুখিলা হৃদয়। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে আসি নদিয়ায়॥
শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম করিলা প্রচার। উদ্ধারিলা কত পাপি-দুরাচার।
দুঃখী তাপি যত কৃতার্থ হইল। হরিনাম বলে জগত মাতিল॥
রূপ সনাতন শ্রীজীব গোসাঞি। গদাধর আদি দয়াল নিতাই॥
ঘরে ঘরে তারা যাচিয়া যাচিয়া। হরিনাম ধন দিল বিলাইয়া॥

৪

নয়ন খুলিয়া দেখ একবার। বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে যুগলাবতার॥
সোণার ঠাকুর সোণার প্রতিমা। সোণার কমল বদন চন্দ্রিমা॥
হাসি ভরা মুখ প্রেমের মহিমা। ত্রিভুবনে যার নাহিক উপমা॥
নাহি কোন ক্লেশ ভজিতে তাঁহারে। ডাকিলেই দেখা দিবেন তোমারে॥
সরল হইয়ে বিশ্বাস করিবে। সোণার পুতুল নয়নে হেরিবে॥
ঐ দেখ হাতে প্রেমামৃত লয়ে। প্রেমদাতা গৌর আছে দাঁড়াইয়ে॥
মূর্খ নীচজাতি পতিত পামর। সব তরাইবে দয়ার সাগর॥

৫

কলির পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। পূর্ণব্রহ্ম হরি উদি নদীয়ায়॥
জীব শিক্ষা দিল নিজে আচরিয়া। সাধনা শিখাল নাচিয়া গাইয়া॥
হেন প্রভু পূজা ধ্যান মন্ত্র ছাড়ি। মুখে মুখে বলি কাজে নাহি করি॥
যে যুগের যাহা ভজন সাধন। কুতর্কে পড়িয়া করেছি গোপন॥
আজ প্রাণ খুলে ভজিব সকলে। "শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ" পেয়েছি বলে॥

৬

আছে আমাদের ভক্ত চূড়ামণি। রাধিকা, শ্রীনাথ, শ্যাম, নিলমণি॥
শ্রীমধুসূদন যাহার কৃপায়। প্রকাশিল ব্রজে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা। লিখিয়া লিখিয়া সব প্রকাশিলা॥
বঙ্গের সুকবি শ্রীনবীন চন্দ্র। লিখিবে কবিতা শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র॥
রসিক মোহন গাইবে এখন। মধুর সঙ্গীতে চৈতন্যমঙ্গল॥
পুরি আর্য্য দেশ ভাসিবে আনন্দে। চিনিবে সকলে গৌর নিত্যানন্দে॥
বিবিধ ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ গান জগতে গাইছে॥

এইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে। অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত পরিশ্রম করিবার সমুচিত কার্য্যই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমি এই কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; সুতরাং আপনারা আমাকে যদি ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন, তবে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

সম্বলপুর, বিজয়পুর হইতে বাবু নারায়ণ বহিদার একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠার সংবাদ শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসে কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেক দিন হইতে আমার বড়ই ইচ্ছা বাঙ্গলা দেশ হইতে আমার প্রিয়তম গৌর সম্বন্ধে কিছু শুনি। এত দিন পরে "গৌর" আমার বাসনা পূরণের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। অনেকে হয়ত আমার কথা শুনিয়া হাসিবেন। বস্তুতঃই উড়িয়া ভাষায় গৌর নাম ছাড়া আমি মধুর গৌরের আর কিছুই জানি না। এখন আপনাদের কৃপা ভিন্ন আমি আর কি প্রকারে আমার গৌরের লীলা সকল জানিতে পারিব। আমি উপযুক্ত না হইলেও আশা করি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গৌরাঙ্গ সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

অধিবেশন ও নিয়মাবলী।

গত ২২শে ও ২৯শে শ্রাবণ তারিখে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে সভা আহুত হইয়াছিল।

সভার প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে;—

১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ নামক একটী সমিতি সংস্থাপন করা সাব্যস্ত হইল।

২। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের উদ্দেশ্য এইঃ—

(ক) কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন; (খ) শ্রীগৌর প্রচার; (গ) জীবে দয়া।

৩। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে সমাজ দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হইবে। যথা, উৎসব, মেলা, পুস্তিকা বিতরণ, বক্তৃতা, নগর-কীর্ত্তন, দান, সবিগ্রহ শ্রীমন্দির সংস্থাপন ও শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা ও পর্ব্বাহ প্রতিপালনাদি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্য গুলি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের শ্রীপত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

৪। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই এই সমাজের সভ্য হইবার উপযুক্ত।

৫। সভ্যদিগকে মাসিক চাঁদা কিছু দিতে হইবে না। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং তদ্দ্বারায় সভার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

৬। আপাততঃ সভার একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক, এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন।

৭। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ সহকারী সম্পাদক, এবং টাকির বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

৮। আপাততঃ সমাজ এই কয়েকটী কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন ;—

(ক) ভারতবর্ষের যেখানে যত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ আছেন, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করা।

(খ) ভারতের যেখানে যত গৌরভক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নাম ও ধামের তালিকা প্রস্তুত।

(গ) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করা।

(ঘ) কলিকাতার স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট দিবসে বক্তৃতা ও শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করা।

(ঙ) কলিকাতায় সমাজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য একটী বাড়ী স্থির করা।

(চ) শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সংস্থাপন সম্বন্ধে সত্বর একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত করা।

—০:*:০—

সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি নির্ণীত হইয়াছে ;—

১। শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায় ; শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র এম এ, বি এল ; এবং শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল ; মহাশয়দিগকে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পুস্তিকা লিখিবার ভার অর্পণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দিয়া দুই কর। আঁখি মুদি বহে ব্যথিত অন্তরে।
কহে ধীরে ধীরে শুন ন'দেবাসি। সংসার ত্যজিয়া হয়েছি সন্ন্যাসী।
সকল রমণী এবে মোর মাতা। জগতের নর সব মোর ভ্রাতা।

দামোদরের উক্তি।

ধর্য্য ধরি রহ সন্ন্যাসী ঠাকুর। এখন বলিতে আছে হে প্রচুর॥
বৈকুণ্ঠেতে গেল জগন্নাথ পিতা। নিমা'য়ে পালিল যত্নে শচীমাতা॥
সনাতন মিশ্র-দুহিতা আনিয়া। বামে বসাইল দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
নিমাই-নিঠুর দেবীরে লইল। সুখেতে রাখিবে প্রতিজ্ঞা করিল॥
এবে সেই বালা ধূলায় পড়িয়া। চেন তুমি তারে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উক্তি।

সন্ন্যাসী হইনু ত্যাজিয়া সংসার। নারী কথা কহ অন্যায় তোমার॥
নাহি হেরি নাহি শুনি নারী কথা। কেন ন'দেবাসি মনে দাও ব্যথা॥
কে কাহার মাতা কে কার কলত্র। সকল সংসারে সত্য কৃষ্ণ মাত্র॥

কহি দামোদর, কহিছে উত্তর, শুন ন্যাসী চূড়ামণি।
কৌপিন পরেছ, ধার্ম্মিক হয়েছ, আমি তোমা বেশ জানি।
বসন লইয়া, গাছেতে উঠিয়া, নারীগণে দুঃখ দিতে।
তোমার ভয়েতে, যাইত নারিতে, নারীগণ ব্রজপথে॥
আমি ন'দেবাসী, হে ভক্ত সন্ন্যাসী, জানি তব ভারিভুরি।
মোরে শাপ দিবে, কি ভস্ম করিবে, তোমা নাহি ভয় করি॥

ওহে সরূপের সখা! আর কি নদে মাঝে পাব তোমা দেখা॥
ওহে রামানন্দ মিত্র! দুঃখি ন'দেবাসীর প্রতি একবার মেল নেত্র॥
শচী পাঠায়েছে মোরে! পথ চাহি বসি আছে সুরধুনী তীরে॥
শুন গদাধর-নাথ! বিষ্ণুপ্রিয়া পাঠায়েছে কোটি প্রণিপাত॥
একি আদর আরতি! তোয় কৌপিন পরায়েছে কেমন পিরীতি॥
বলরাম দাস কয়! বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞায় তোমায় নিব নদীয়ায়॥

প্রভু ও দামোদর পণ্ডিত।

নবদ্বীপ ছাড়ি, নীলাচল পুরী, ধায় দামোদর বেগে।
কত দিন পরে, কাশীমিশ্র ঘরে, দাড়াল প্রভুর আগে॥
গদাধর বামে, সরূপ দক্ষিণে, বড় বড় ভক্ত ল'য়ে।
সভা করি বসি, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী, বড় বড় কথা কহে॥
দেখি দামোদরে, ভাবেন অন্তরে, দামোদরে না চিনিব।
সভার মাঝারে, দামোদর দ্বারে, নদে-মান বাড়াইব॥
কহে দামোদর, শুন ন্যাসীবর, আমা' কি চিনিতে পার।
কহে গৌরহরি, চেন চেন করি, কহ নাম কোথা ঘর॥
দামোদর কহে, ঠাকুর শুনহে, মোর ঘর নদে'পুরে।
অতি দীন হীন, সহায় বিহীন, থাকি জগন্নাথ ঘরে॥
শচী জগন্নাথ, নদীয়া-বিখ্যাত, অতি পবিত্র চরিত্র।
অষ্ট কন্যা মরে, শচীর উদরে, হলো বিশ্বরূপ পুত্র॥
কিছু দিন পরে, শচীর উদরে, আর এক হলো ছেলে।
আদর করিয়া, মাতা আর পিতা, ডাকিত নিমাই ব'লে॥
নিমাই যখন, বৎসর পঞ্চম, বিশ্বরূপ বর্ষ ষোল।
পিতা মাতা গলে, তীক্ষ্ণ ছুরী দিলে, সন্ন্যাসী হইয়া গেল॥
শচী জগন্নাথ, করে শীরে ঘাত, নিমাই মূর্চ্ছিত হলো।
নিমাইর দুঃখ, দেখি ফাটে বুক, শচী তারে কোলে নিল॥
নিমাই তখন, প্রবোধ বচন, কহে পিতা মাতা আগে।
পিতা মাতা শুন, কর সম্বরণ, মোর মাথা দিব্য লাগে॥
আমি চিরদিন, করিব পালন, তোমাদের কাছে র'ব।
যতন করিয়া, চরণ সেবিয়া, দুঃখ আমি ঘুচাইব॥
সেই ত নিমাই, ন্যাসী ধর্ম্ম লই, পুরী এলো মায়ে ফেলে।
তুমি কি সে জন, দেখেছ কখন, (সেই) শচী জগন্নাথ ছেলে॥
তুমি ত ধার্ম্মিক, ভক্ত ও প্রেমিক, লোকে ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।
...মন, ধার্ম্মিক সুজন, আমাকে বুঝা'য়ে কহ॥
...মাতা আগে, করিল প্রতিজ্ঞা, সেই ধর্ম্ম নষ্ট ...
সন্ন্যাসে কি ফল, বল সাধু বল আমি ছুটী পায়ে ...

মধ্যে অনেক ধনী আছেন, তাঁহারা মনে করিলেই একজনেই সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিতে পারেন তাহার পর, সমস্ত গৌরভক্ত যদি কোন সৎকার্য্যের জন্ম একটী করিয়া পয়সা কি একমুষ্টি করিয়া চাউল প্রদান করেন, তবে আমাদের শ্রীপ্রভুর কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে

কলিকাতা ও মফঃস্বলে অনেক গৌরভক্ত মহাজন আছেন। ইহাঁদের প্রত্যেক গদীতে ৺বিত্তি সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত অর্থ হইতে বৎসরান্তে বারোয়ারী প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদ করা হইয়া থাকে। এই সকল গৌরভক্ত মহাজনদিগের নিকট আমাদের বিনীতভাবে প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন বৃথা আমোদ আহ্লাদে এই অর্থ ব্যয় না করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব দিবসে উৎসব, দান, বৈষ্ণব ও দরিদ্র ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ইহা ব্যয় করেন, এবং এই বৃত্তির এক অংশ শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের ভাণ্ডারে প্রদান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের প্রধানতঃ তিনটী উদ্দেশ্য ;—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীগৌর প্রচার, এবং জীবে দয়া। আমরা আশা করি প্রত্যেক গৌরভক্ত এই তিনটী বিষয় পালন করিতে যত্নবান হইবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিতে হইবে ;— শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক, ২৯নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকের নিকটেই অনেক দিনের মূল্য বাকি আছে। ৺পূজা নিকটবর্ত্তী, এ সময়ে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। অতএব সকলে স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন যাঁহারা এককালে মূল্য পাঠাইতে অসমর্থ, তাঁহারা যাহা পাঠাইবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু যাঁহারা তাহাও পাঠাইতে সময় প্রাপ্ত হয়েন না তাঁহাদের জন্য আগামী মাসের শ্রীপত্রিকা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যাইবে; এবং যাঁহারা ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা লইতে অনিচ্ছুক অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহকরিয়া এক এক খানি কৃপা-পত্রী পাঠাইবেন।

২। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সাহায্যার্থ মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আপাততঃ এই প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল যে, প্রত্যেক গৌরভক্ত মাত্রের বাড়ীতেই এক একটী "শ্রীগৌরাঙ্গ ভাণ্ডার" নামক বাক্স স্থাপিত করা হইবে। সেই বাক্সে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিতে পারিবেন। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বাটীতেই শ্রীগৌর-ভক্ত মাত্রেই এক একটী পাত্রে এক এক মুষ্টি চাউল রাখিয়া অন্যূন তিন মাস পরে তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু হইবে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সাহায্য জন্য পাঠাইয়া দিতে হইবে

৩। আপাততঃ প্রতি শনিবারে সভার অধিবেশন হইবে এবং সভার সমস্ত বিবরণই শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

গৌরভক্তমণ্ডলীর প্রতি।

সমস্ত ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক দশলক্ষ গৌরভক্ত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে জানা শুনা প্রায় নাই বলিলেই হয়। সেইজন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ দ্বারা সমস্ত গৌরভক্তের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। গৌরভক্ত মাত্রেই এই মহৎকার্য্যে সাহায্য করা উচিত। আমরা আশা করি গৌরভক্ত-মণ্ডলী এই সমস্ত নাম ধাম যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদকের নামে পাঠাইতে থাকুন।

ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার অনেক স্থানে, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। স্থানীয় ভক্তগণের নিকট আমাদের বিনীত ভাবে প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই সকল শ্রীবিগ্রহের তালিকা এবং প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। কোন ভক্তবিশেষের বাড়ীতেও যদি শ্রীবিগ্রহ থাকেন তাহাও ঐ তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

এই সমাজের সভ্যদিগের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট চাঁদা লওয়া হইবে ... শ্রীসমাজ যে সকল কার্য্য হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ও পরে ...েন, তাহাতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। আমাদের বি... সকল কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

করে; তখন সকলেই পরম রুচিকর নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া ভাবাবেশে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। নৃত্যকালে এমন কি আপনাকে আপনি স্থির রাখিতে পারেনা। তবে বল দেখি নাম সংকীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কি আছে?

যাঁহারা সংকীর্ত্তনের আচরণ করেন তাঁহারাই জানেন সংকীর্ত্তন কি? এবং যাঁহারা এই মধুর সংকীর্ত্তনকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ বিবরে স্থান দেন, তাঁহারাই জানেন সংকীর্ত্তন কি? সংকীর্ত্তনই যে ভক্তি সাধনের এক মাত্র প্রশস্ত উপায় এ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদকে ভক্ত জীবন ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

যিনি জীব শিক্ষার্থে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস প্রাঙ্গণে ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন রঙ্গে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন, সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর নীলাচলেও যিনি রায় রামানন্দ স্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া নিভৃতে লুক্কা্যিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা আস্বাদন করিতেন, সেই কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ দেব স্বয়ং বলিয়াছেন;—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্॥"

অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীবের মন রূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসার দাবাগ্নির নির্ব্বাণ হয়, যে সংকীর্ত্তন মঙ্গল রূপ কুমুদকুসুম প্রস্ফুটনকারি সুস্নিগ্ধ কিরণ দেয়, যাহা বিদ্যাবধূদিগের জীবন সদৃশ, যদ্দ্বারা জীবের আনন্দ সিন্ধু উচ্ছলিত হয়, যাহাদ্বারা জীব নিরন্তর সম্পূর্ণ রূপে অমৃত আস্বাদন করে এবং যাহা দ্বারা সকলের আত্মা সর্ব্ব প্রকারে পরিস্নাত হইয়া নির্ম্মল হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি কীর্ত্তন জয় যুক্ত হউন। নামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ও জীব শিক্ষার জন্য তিনি আরও বলিয়াছেন—

"নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈব মীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্‌। তুমি জীবপ্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় ভূরি ভূরি নাম প্রচার করিয়াছ এবং প্রতিনামেই সম্পূর্ণ শক্তি অর্পণ করিয়াছ; অধিকন্তু নাম স্মরণেরও কোন সময় নিরূপিত কর নাই। কিন্তু ভগবন্‌! আমার এমনই দুরদৃষ্ট, যে তোমার এতাদৃশী দয়া সত্ত্বেও সেই নাম লইতে অনুরাগ জন্মিল না।

সংকীর্ত্তন শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপার নিদর্শন স্বরূপ। তিনি কলি-জীবের ভাগ্যে সদয় হইয়া, জীব শিক্ষার্থে নিজ মুখে নিজ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। "নামে" এবং নামীতে প্রভেদ নাই, অন্তরের সহিত ভক্তি সহকারে নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে নামীকে অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় হরিনামে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, অজ্ঞান তিমিরান্ধজন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হয়, খঞ্জে অনায়াসে পর্ব্বত শিখর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, মূকমুখে বাক্য বিন্যাস শ্রুত হয় এবং বধিরের কর্ণ-পটাহে প্রতিঘাত হয়। নামে বিশুদ্ধ ভক্তি জন্মাইলেই প্রেমের সঞ্চার হইবে তাই বলি এস ভাই সবাই মিলে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করি। হরিনাম দুরিত-দূরকারী, দিনান্তে অন্তরের সহিত একবার শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিতে পারিলে যত পাপ নষ্ট হয়, পাপীর কি সাধ্য যে তত পাপ করিয়া উঠে। হরিনাম পরিণামের সম্বল দুর্ব্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়। আমরা সাংসারিক বিভ্রাটে সর্ব্বদাই আকুলিত, চিত্তে অণুমাত্র শান্তি নাই, তাই বলি প্রাণ ভ'রে বল দেখি—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

কোন ভয়ই রহিবে না, দুর্দ্দণ্ড মার্ত্তণ্ডতনয় তোমায় স্পর্শও করিতে পারিবে না। বল ভাই একবার হরিবল একবার গৌরহরি বল। নামের নিশান উত্তোলন কর, নামে গণ্ডগোল কর বড়ই সুখ পাইবে।

হা গৌরাঙ্গ! হা পতিত-পাবন। হা দীননাথ! হা ভক্তবৎসল! তুমি জীব নিস্তারিতে নিজ মুখে নিজ নাম ধরিয়াছ, জীবকে শিক্ষা দিয়াছ, কিন্তু কই জীব ত শিখিল না। প্রভু তুমি সর্ব্বান্তর্যামী সকলই জান, আর কত দিনে জীব তোমার অভয় নামের আশ্রয় লইবে।

শ্রীপঞ্চানন কবিরাজ। শ্রীখণ্ড, ঠাকুর পাড়া।

—:*|*:—

পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা।

১

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর কুমার। জগন্নাথ মিশ্র-সুত কৃপা-পারাবার॥
উপনিষদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম যাঁরে কয়। গৌরাঙ্গের অঙ্গ জ্যোতি জানিবে নিশ্চয়॥
সর্ব্বাত্মার অন্তর্য্যামী যোগী যারে বলে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-অংশ বলি জানিবে সকলে॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ যিঁহ ভক্ত মন চোর। সেই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ পহুঁ মোর॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য পূর্ণ যাঁর কলেবর। যিনি সর্ব্ব ভক্তপ্রাণ যিনি সর্ব্বেশ্বর॥
নাম প্রেম বিলাইতে যাঁর অবতার। সেই মহাপ্রভু-পদে প্রণাম আমার॥

২

জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর নন্দন। রাঢ়দেশ পবিত্রিলা যাঁর শ্রীচরণ॥
কাঙ্গালে করুণা হেন নাহি দেখি আনে।
প্রেম দিতে উচ্চ নীচ কিছু নাহি মানে॥
পূর্ব্ব অবতারে যিনি বলাই ঠাকুর ভ্রাতৃ ভাবে কৃষ্ণে স্নেহ করিলা প্রচুর॥
ত্রেতায় লক্ষ্মণ রূপে সেবিলেন যিনি। এবে অবধূত মহাপ্রভু সঙ্গে তিনি॥
অনন্ত রূপেতে ছত্র ধরিলেন শিরে। এবে ছত্র ধরিলেন শ্রীবাস মন্দিরে॥
নাম প্রেম প্রচারের যে জন সহায়। অনন্ত প্রণাম মোর তাঁর রাঙ্গাপায়॥

৩

জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নাভার কুমার। বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ যিনি জগতে প্রচার॥
কেহ মহাবিষ্ণু কহে সদাশিব কেহ। তত্ত্বের বিচারে হয় সেহ এক দেহ॥
অতএব তাঁর তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
ভক্তিতে বুঝয়ে কিছু নাহি পারে জ্ঞানে॥
জগতে নাহিক ভক্তি দেখিয়া নয়নে। জীবে দয়া করিবারে উপজিল মনে॥
হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণে কৈলা অবতার। নাম প্রেম দিয়া জীবে করিলা নিস্তার
তাঁহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি। সবংশে রহুক মোর তাঁর পদে মতি॥

৪

বন্দিব শ্রীবাস আদি ভক্তের প্রধান। চারি ভাই চারি দেহ এক মাত্র প্রাণ॥
পূর্ব্বেতে নারদ এবে পণ্ডিত শ্রীবাস। যাঁহার ভবনে মহাপ্রভুর প্রকাশ॥
প্রভুর বিলাস যত শ্রীবাসের ঘরে। কোথাও না হৈল হেন নদীয়া নগরে॥

গৌরাঙ্গে এমন প্রীতি নাহি দেখি আন।
শোক নাহি করে যিঁহ মরিলে সন্তান॥
যাঁর ভ্রাতৃ কন্যা-সুত বৃন্দাবন দাস। গৌরলীলা ভাগবত যাঁহার প্রকাশ॥
যে জন ভক্তের শ্রেষ্ঠ দাস্য-ভক্তি ধাম। তাঁহার চরণে মোর অনন্ত প্রণাম॥

৫

জয় জয় গদাধর মাধব-নন্দন। অনর্বচনীয় রূপ সাক্ষাৎ মদন॥
মাথায় চাঁচর কেশ সুকোমল অঙ্গ। সদা শ্রীগৌরাঙ্গ সহ যেঁহ করে রঙ্গ॥
রাধিকার প্রেমরূপ গদাই আমার। প্রভু প্রেম-পাত্র ইঁহা বই নাহি আর॥
ভাগবত পাঠ কালে নয়নের জলে। তিতয়ে সকল গ্রন্থ পাঠ নাহি চলে॥
কৃষ্ণভাবে যবে প্রভু রাধা বলি কান্দে।
প্রভু বামে গদাধর রহে রাধা ছান্দে॥
রাধাকৃষ্ণ সম হয় এ যুগল নাম। গদাই গৌরাঙ্গ পদে অসংখ্য প্রণাম॥

—***—

ভাঙ্গামোড়ার শ্রীশ্রী৺মদনমোহন জীউ।

ভাঙ্গামোড়া হুগলী জেলার একটী গণ্ডগ্রাম হুগলীর সদর ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ২৫। ২৬ মাইল পশ্চিম, প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর তীর্থের দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমদিকে দামোদর নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। অতি প্রাচীন-কাল হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সকলে ইহাকে "ছোট নদীয়া" বলিত। প্রবাদ এইরূপ যে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এখানে উপস্থিত হইয়া গ্রামস্থ পণ্ডিতগণের নিকট বিচার প্রার্থী হয়েন, তাহাতে এখানকার চল্লিশ পঞ্চাশ জন অধ্যাপক "বাঁকুড়া রায়" নামক ধর্ম্ম ঠাকুরের প্রাঙ্গণে একত্র হইয়া দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনারা তাঁহার সহিত বিচার না করিয়া উক্ত ধর্ম্ম ঠাকুরের সেবাইত ডোম জাতীয় পণ্ডিত দিগের এক জনের দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষ করাইয়া তাহারই পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ডোমও যেমন তেমন লোক ছিলনা, শাস্ত্রে তাহারও বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাভূত হয়েন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অধ্যাপক দিগের সহিত বিচার কর্ত্তা ডোমকে পৃথক আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া পরাভূত সন্ন্যাসী "সে কোন জাতীয়" এই কথা সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলে

সকলে মৌনাবলম্বন করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি স্বয়ং ডোমকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আপনার নীচত্ব গোপন করিতে পারিল না। সন্ন্যাসী তখন প্রজ্জ্বলিত বহ্নিবৎ ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আপনাদিগের এরূপ ব্যবহারে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আপনারা বিদ্যাগর্ব্বে বড়ই গর্ব্বিত; অচিরে এই গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে আমি অভিসম্পাত করিতেছি ভাঙ্গামোড়া শীঘ্রই অপণ্ডিতা হইবে। সন্ন্যাসীর বাক্য সফল হইয়াছে। যে গ্রামে ৩০।৩৫টী চতুষ্পাঠী ছিল, আজি ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার বিদ্যাও কাহার ছিলনা। ছিল কেবল একটী বৈদ্যের। ভগবানের কৃপায় বৈদ্য জাতীয়ের দুই তিনটী পণ্ডিত ভাঙ্গামোড়ার অঙ্ক আলোকিত করিয়াছেন। এত দিনে দুই একটী ব্রাহ্মণও অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। এই গ্রামেই সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টিপ্পনীকার স্বর্গীয় পঞ্চানন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলা কালে যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থ মহাপ্রভু অভিরাম গোস্বামী এই গ্রামে উপস্থিত হয়েন, তখন রজনী পণ্ডিত নামক জনেক অবধূতকে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভগবানের সেবা প্রকাশ জন্য তাঁহাকে উপদেশ করেন যে, তুমি দামোদরে স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইবে একখানি কাষ্ঠ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, ক্রমশঃ সেই কাষ্ঠ নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা জল হইতে তুলিবে, এবং তাহা দ্বারা মদনমোহন মূর্ত্তি গঠন করাইবে। এই গ্রামে অনেক বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা তোমার সহিত বিচার করিতে আসিলে কদাচ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিবে না, ঠিক নম্রভাবে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ অভ্যর্থনাদি করিবে। মদনমোহনের নামানুসারে গ্রামকে ভাঙ্গামোড়ার পরিবর্ত্তে মদনমোহনপুর বলা হইবে। গ্রামবাসী সকলকে লইয়া দামোদর স্রোতবাহিত কাষ্ঠে রজনী পণ্ডিত মদনমোহন বিগ্রহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেব সেবার জন্য দেবোত্তর ভূমি, বিবাহ অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে গ্রামস্থ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের সম্মতি ক্রমে সমস্ত যজ্ঞীয় অগ্রভাগ যাহা যজ্ঞেশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে, তাহা মদনমোহনের প্রাপ্য অবধারিত হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহার পৃথক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করা হইল।

সিদ্ধ মহাপুরুষ রজনী পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতার মাহাত্ম্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মহৎ সন্তান জানে মহতের গুণ।
প্রকাশ করিলা দেখ মদনমোহন ॥
শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলামৃত।

ভাঙ্গামোড়ায় গুণগ্রাহী ব্যক্তির সংখ্যা অনেকছিল। তাঁহারা সকলেই নব প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সেবার সাহায্য ক'রতে লাগিলেন। মদনমোহনের গৃহ ইষ্টক রচিত হইয়া, ইষ্টকের নাট বাংলা, চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের প্রাচীর গ্রথিত হইল এবং সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করণীও খনন করা হইল। তাহার উপরেই শ্রীশ্রীঅভিরাম গোপালের রোপিত বকুল বৃক্ষছিল, আজি ১০। ১২ বৎসর হইল শুকাইয়া গিয়াছে।

মদনমোহন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে:—

শুনহ রজনী তুমি পণ্ডিত উত্তম। সেবা ত্রুটী হৈলে দেখ বড়ই বিষম ॥
মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন। গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম ॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু সমাগমে। মদনমোহন পুর ঘুষিবে এক্ষণে ॥
যৈছে নাম তৈছে গ্রাম একই স্বরূপ। এই গ্রামবাসিগণ হয় রসকূপ ॥
মহৎ সন্তান জানে মহতের গুণ। প্রকাশ করিলা দেখ মদনমোহন ॥
এই গ্রামে আছে বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তোমারে আসিয়া আজি করিবে মিলন ॥
শাস্ত্র বিচার করিবে বহু তোমার সহিত।
তোমারে কহিয়ে শুন রজনী পণ্ডিত ॥ ১০৩। ১০৪ পৃষ্ঠা।

তুমি ভাগ্যবান হয়্যা জন্মিলে সংসারে। নদীর প্রভাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে ॥
সেই কাষ্ঠে হইলা এই মদনমোহন। পুনশ্চ বকুল বৃক্ষ করিলাম রোপণ ॥
ফল ফুলে সেবা কর মদনমোহন। যখন যেমন ভাব সেবিবে তেমন ॥
১০৪ পৃষ্ঠা।

হেনকালে কহে সেই রজনী পণ্ডিত। মদনমোহন পুরে করিলা স্থাপিত ॥
এই গ্রামবাসী চাহে তোমার দর্শন। ইহা শুনি অভিরাম বলেন বচন ॥
আগে গিয়া বল তুমি গ্রামবাসিগণে। চামচাতে যাইয়া আমি করিব মিলনে ॥
ইহা শুনি রজনী পণ্ডিত করিলা গমন।
শীঘ্রগতি গোসাঞি তথা দিলা দরশন ॥
দেখি গ্রামবাসিগণ করেন বিনয়। সাধু আগমনে গ্রাম সার্থক যে হয় ॥
রজনী পণ্ডিত তবে বলে যে বচন। মিষ্টান্ন সামগ্রী আনি করাহ ভোজন ॥

সে মর্ম্ম জানিয়া পুন কহেন গোসাঞি।
মদনমোহন সেবা করহ সবাই॥
সেই ত ব্রজের বস্তু মদনমোহন। পুলিন ভোজন দোঁহে করিব এখন॥
এত শুনি গ্রামবাসী সামগ্রী দিইলা। রজনী পণ্ডিত তথা পূজারী হইলা॥
নিজ শক্তি সঞ্চারিয়া বলেন গোসাঞি।
মদনমোহন সেব ব্রজ অনুযায়ী॥
ভাঙ্গামোড়া গ্রাম সেই বড়ই সুন্দর। রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা পুনর্ব্বার॥
এতেক বলিয়া গোসাঞি ভোজন করিলা।
আচমন করি পুন তাম্বূল খাইলা॥
রজনী পণ্ডিতে তথা করিয়া স্থাপন। পুনশ্চ গোসাঞি শীঘ্র করিলা গমন॥
শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ। অভিরাম লীলামৃত কহে রাম দাস॥
১০৮—১০৯ পৃষ্ঠা।

ভাঙ্গামোড়া গ্রাম শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীদাম গোপালের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শে যে ধন্য হইতে পারিয়াছিল, তাহা উপরোক্ত কবিতা পাঠে প্রতীত হইতেছে। শ্রীশ্রীঅভিরাম ঠাকুর ভাঙ্গামোড়ায় শুভাগমন করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উপরোক্ত কবিতার উত্তম রূপ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এক কথায় বুঝিতে হয় যে দ্বাপরাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদামসহ এই কলিযুগে পুণ্যভূমি ভাঙ্গামোড়ায় ব্রজের "পুলিন ভোজন লীলার" দ্বিতীয় অভিনয় করিয়াছিলেন।

সেইত ব্রজের বস্তু মদনমোহন।
পুলিন ভোজন দোঁহে করিব এখন॥

ভাঙ্গামোড়া একদিন ব্রজভূমির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অভিরাম গোপাল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলার সহচর। প্রায় চারিশত বৎসর হইল আমাদিগের ভাঙ্গামোড়া গ্রামের এই সৌভাগ্য সঞ্চার হইয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায় নানা স্থানে নানা বিগ্রহের সেবাক্রুটী ঘটিয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গামোড়ার মদনমোহনের পক্ষে তাহা অদ্যাপি সমভাবেই আছে, অর্থাভাবে সেবার সামান্য ক্রুটী হইলেও একবারে অঙ্গহানি ঘটে নাই। এখনও সেবার কোন কার্য্যে স্ত্রীলোকের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায় নাই, শ্রীমন্দির মার্জ্জন, পুষ্পচয়ন, ভোগরন্ধন প্রভৃতি সমস্তই পূজারী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পৌষী কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে মহোৎসব হয়। উহাই মুকুন্দরামের তিরোভাবের তিথি।

প্রাকৃত লোকের জ্ঞান এই যে সেই দিন মদনমোহন পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে—বাৎসল্য ভাবের সেবা। পুরোহিত প্রতিনিধি দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান মুকুন্দ পণ্ডিতের তিরোভাবের দিন শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া থাকেন। কথাটা যেন একটু অসংলগ্ন হইল। অভিরাম লীলামৃতের উদ্ধৃতাংশে জানা গেল মদনমোহন রজনী পণ্ডিতের যখন বাৎসল্য ভাবের সেবা, তখন রজনী পণ্ডিতেরই পিণ্ডদান হইবে, মুকুন্দ পণ্ডিতের কেন হইয়া থাকে বলা বাহুল্য যে মহোৎসব দিনে যে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে মুকুন্দরাম পণ্ডিতেরই গোত্র ও নামোল্লেখে জলপিণ্ড অর্পিত হয়, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এরূপ হইবার একটী গুহ্য কারণ আছে।

অভিরাম লীলামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মুকুন্দ পণ্ডিত সোনাতলা গ্রামে শ্যামরায় নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন;—

শ্যামরায় লয়্যা তিঁহো সেবা নিয়োজিলা।
গ্রামবাসী গণ আনি সামগ্রী দিইলা॥
দেখিয়া গোসাঞি জীউ হইলা উল্লাস।
শ্যামরায় কৈলা এই সেবার প্রকাশ॥
ব্রজের বান্ধব সেই হয় শ্যামরায়।
ব্রজলীলা প্রকাশিবা হইয়া সহায়॥ ১১০ পৃষ্ঠা।
সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পণ্ডিত।
সেবা দিয়া গোসাঞি তারে করিলা স্থাপিত॥ ১২০ পৃষ্ঠা।

সোনাতলার শ্যামরায়ের সেবাইত মুকুন্দরাম পণ্ডিত কিরূপে ভাদামোড়ার মদনমোহনের বার্ষিক জলপিণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার রহস্য জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মে।

ভক্তের সর্ব্বস্ব তাঁহার উপাস্য দেবতা। শয়নে স্বপনে তাঁহার জন্য চিন্তা থাকে। আহারে উপবেশনে সকল কাজেই তাঁহাকে না পাইলে ভক্তের প্রাণে ব্যথা প্রাপ্ত হয়। কার্য্যানুরোধেই হউক, বা সোনাতলাবাসী গণের অযত্ন প্রযুক্তই হউক, শেষোক্ত কারণই সঙ্গত বলিয়া অনুমান করিতে হয়। একদা মুকুন্দ পণ্ডিত স্বীয় বিগ্রহসহ ভাদামোড়ায় রজনী পণ্ডিতের আশ্রমে উপস্থিত হইলে শেষোক্ত মহাপুরুষ তাঁহার অভ্যর্থনাদি করিয়া তাঁহার আতিথ্য-সৎকারের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ছিলেন। তিনি স্বীয়

ভৃত্যকে অতিথি অবধূতের পাদ প্রক্ষালনের জল আনিতে আজ্ঞা করেন ভৃত্য কার্য্যান্তরে ছিল, পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়নে কাজেই বিলম্ব ঘটিল। রজনী পণ্ডিত কালবিলম্বে একটু অবসর গ্রহণে মুকুন্দরামের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া দেখিলেন ভৃত্য অভ্যাগত পণ্ডিতের জন্য জল আনিতেছে, রজনী তত বিলম্বে ভৃত্যকে জল আনিতে দেখিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগি-লেন, ভৃত্য কার্য্যান্তর গমন কথা জানাইয়া প্রভুর ক্ষমা প্রার্থনা করিল। প্রভু ও ভৃত্যের ব্যাপার দেখিয়া মুকুন্দরাম আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, রজনীকে বলিলেন কেন উহাকে ভর্ৎসনা করেন, আমি জল পাইয়া পাদপ্রক্ষালন করিয়াছি। "ভৃত্য বুঝিল অভ্যাগত পণ্ডিত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার জলে পাদপ্রক্ষালন করিবেন না, এজন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারও নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। মুকুন্দ বলিলেন কাঁদ কেন বাপু, তুমিই ত আমাকে জল আনিয়া দিলে, তোমারই জলে আমি পাদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রান্তিদূর করি-তেছি।" রজনী ভাবিলেন পণ্ডিত বুঝি ভৃত্যের নিগ্রহশঙ্কায় সত্যের অপ-লাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মহতের কর্ত্তব্য বটে অপরের নিগ্রহনিরাকরণ, কিন্তু ভৃত্য নীচ ব্যক্তি উহাতে তাহার কর্ত্তব্য পালনে ক্রটীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়।" মুকুন্দ উত্তর করিলেন—"পণ্ডিত সত্যের অপলাপ সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই পরিহার্য্য, আমি কল্পিত কথা বলিতেছি না।" ভৃত্যও সাশ্রুনয়নে আপনার ক্রটী স্বীকার করিলে উভ-য়েরই কৌতুহল জন্মিল। তখন রজনী মদনমোহনের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন তাঁহার শ্রীচরণকোকনদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা লাগিয়া রহিয়াছে। সম্মুখ-বর্ত্তী একটী পল্বলের জল উক্তবিধ পানায় আবৃত ছিল। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতযুগল অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগ-বান ভক্তের বিন্দুমাত্র ক্লেশ দেখিতে পারেন না। মুকুন্দ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন তাঁহার শ্রমাপনোদনে বিলম্ব সহিল না, রজনীর ভৃত্যের বেশ ধরিয়া তিনি পাদ প্রক্ষালনের জল আপনিই আনিয়া দিলেন। রজনী মুকুন্দ পণ্ডিতের ভগবদ্ভক্তির পরকাষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে সার্থক জন্মা জ্ঞান করিলেন, এবং বলিলেন—"আপনিই মদনমোহনের উপযুক্ত সেবক ; আপনার সেবাতেই তিনি পরিতুষ্ট, আমার দ্বারা তাঁহার সেবা-পরাধ সম্ভাবিতে পারে, অতএব আপনিই এই স্থানে থাকিয়া সেবা করুন, আমি আপনার পরিচর্য্যায় থাকি।" মুকুন্দরাম আপনার দৈন্য জানাইয়া

তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, কিন্তু ঠাকুরকেই সেই দিন প্রত্যাদেশ হইল রজনী যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই উপযুক্ত, রজনীও সেবার অনধিকারী নহে শ্যামরায়কে লইয়া সেবা করিলেই তাহার সিদ্ধি হইবে।" তদবধি মুকুন্দরাম পণ্ডিতই মদনমোহনের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রজনী শ্যাম রায়কে লইয়া তৎসমীপবর্ত্তী বাখরপুর গ্রামে অবস্থিতি করিলেন। সন্ন্যাসী অবধূতগণ সকলেই ভিক্ষাজীবী। গৃহস্থগৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই ভগবানকে অর্পণ করিয়া প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এজন্য অদ্যাপি সিদ্ধ চাউলেই মদনমোহনের ভোগ হয়, মসুর ডাউলও তাঁহাকে অদেয় নহে।

মুকুন্দরাম ভিক্ষা দ্বারা দেবসেবার সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেকালের রাজা জমিদার সকলেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, এজন্য মদনমোহনের দেবোত্তর জমি অনেক। পূজারী ব্রাহ্মণের, ভাণ্ডারীর, আরতির সময় যাহারা খোলকরতাল বাজায় ও বস্ত্র ক্ষালনকারী রজক সকলেরই জমি আছে। অদ্যাপি সে সমস্ত বন্দোবস্তই পূর্ব্ববৎ আছে। মদনমোহনের নামানুসারে সরকারী কাগজ পত্রে এমন কি হুগলী জেলার মানচিত্রেও শ্রীশ্রীঅভিরাম গোপালের রক্ষিত নাম মদনমোহন পুরই এই গ্রামের নাম বজায় আছে। মদনমোহনকে লইয়া মদনমোহন পুর ধন্য হইয়াছে। আমরা মদনমোহন পুরবাসী সকলেও দিনান্তে মদনমোহনের নাম করিয়া অভিরামের প্রতিষ্ঠিত ব্রজের মদনমোহনকে দর্শন করিয়া সার্থক হই। মদনমোহন পুরের মৃত্তিকায় দেহ মিশাইতে পারিলেও ব্রজ-মৃত্যুর পুণ্যের দাবী করিতে পারি। হে ব্রজেশ্বর! অন্তিমকালে ব্রজের মূর্ত্তি যেন হৃদয়কমলে বিরাজমান দেখিতে পাই।

ভক্তিভিক্ষু—শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত। ডাঙ্গামোড়া।

—*:*:*—

মুকুন্দ।

(১)

ইনি পদ্মনাভের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র, নিবাস কর্ণাট দেশে ছিল। ইহার পিতা পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার বাসনায় তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া নৈহাটী গ্রামে বাস করেন। তথায় এক পুরুষোত্তমের বা জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উহা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূজাও সেবা করিতেন। ইনি

ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্ব্বে কর্ণাট দেশে ইঁহাদের রাজ উপাধিছিল। মুকুন্দের পুত্র কুমার এবং কুমারের পুত্র তিন জন। যথা—জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপম। এই বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। মুকুন্দের উক্ত পুত্র ত্রয় এবং পৌত্র শ্রীজীব গোস্বামী মহা মহোপাধ্যায়, সুপণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি বা শিরোমণি ছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবনে যত গুপ্ত বা লুপ্ততীর্থ প্রকট করাইয়া ছিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামি দ্বারা গোবিন্দদেব প্রকটিত হয়েন, সনাতন গোস্বামি দ্বারা মদনমোহন ঠাকুর প্রকটিত হয়েন এবং শ্রীজীব গোস্বামি দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র বিরচিত হয়। তিনি নিম্নলিখিত তিন জনকে ভক্তি শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। যথা—শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, এবং শ্যামানন্দ। সনাতনের পিতা জ্ঞাতি বিরোধে নৈহাটী হইতে উঠিয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

(২)

মুকুন্দ সঞ্জয়। নিবাস নবদ্বীপ ইনি পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের পুত্র। ইহার বাড়ীতেই নিমাই প্রথম টোল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যখন নিমাই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে সচ্ছন্দ শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে আকর্ষিত হন। প্রথমতঃ মাতাকে প্রণাম করিয়াই পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা হইল। কারণ সেই বাড়ী তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিজনক ছিল এবং প্রত্যহ তিনি সেইখানে যাইয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। ঐ বাড়ীতে তিনি যাইবা মাত্র মুকুন্দের মাতা ও অন্যান্য স্ত্রালোকেরা হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টা, ঝাঝর, করতাল ও কাঁশর বাজাইয়া মঙ্গলাচরণ ও নিমাই পণ্ডিতের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের পুত্র মুকুন্দ সঞ্জয়, প্রভুনিমাই পণ্ডিতের সম্মুখে আসিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করিলেন; তখন নিমাই তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রেমভরে ও স্নেহভরে কোলে লইয়া প্রগাঢ় রূপে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া মুকুন্দকে উদ্ধার করিলেন ও মুকুন্দও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন সঞ্জয়ের বাড়ীতে আনন্দের আর সীমা রহিল না। এই মুকুন্দের পিতা পুরুষোত্তম সঞ্জয় ও বুদ্ধিমন্ত খান নিমাইয়ের দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার

অতি প্রিয়মর্ম্মী পারিষদ শ্রীমান্ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীমান্ পণ্ডিতকে এবং অন্যান্য প্রিয় পারিষদকে সঙ্গে লইয়া পর দিবস শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; কেননা, গয়াধামের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া বলিবেন

(৩)

সন্ন্যাসী উপাধিকারী মুকুন্দ সরস্বতী। ইনি বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি সনাতন গোস্বামীর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিজের একখানি বহির্ব্বাস পুরস্কার স্বরূপ সনাতনকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সন্ন্যাসিপ্রদত্ত বহির্ব্বাস খানি সনাতন মস্তকে বান্ধিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের বাসায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত ঐ বহির্ব্বাস খানি সনাতনের মাথায়বান্ধা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বহির্ব্বাস খানি তুমি কোথায় পাইলে, বোধহয় মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিত তোমাকে কৃপা করিয়াছেন." কিন্তু জগদানন্দ শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসী অর্থাৎ মুকুন্দ সরস্বতী পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন। সনাতন এবং অন্যান্য বৈষ্ণব দিগকে খাওয়াইবার জন্য জগদানন্দ তখন রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছিলেন, এবং যেমনি শুনিতে পাইলেন যে উপরোক্ত ঐ সন্ন্যাসী তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছে, তখনি রাগ করিয়া রন্ধনের সমস্ত হাঁড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে গেলেন। মহাপ্রভুর প্রতি জগদানন্দের হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি নিহিত ছিল। তিনি তজ্জন্য মনে করিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সনাতনকে বহির্ব্বাস খানি দিয়াছেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসিপ্রদত্ত বহির্ব্বাস মস্তকে বান্ধিয়াছেন তখন অত্যন্ত রাগ হইল।

সনাতনের ন্যায় লোকের প্রতি যে এই প্রকার জগদানন্দের রাগ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধহয়। কিন্তু তিনি এইরূপ গুরুতর ভাবে মহাপ্রভুর প্রতিও কখন কখন রুষ্ট হইতেন। জগদানন্দ সত্য ভামার প্রকাশ। প্রভুর সহিত ইহার কিরূপ প্রীতি ছিল, না, যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামায়। প্রভুর সহিত ইনি যে সর্ব্বদা কলহ করিতেন সে কলহ আর কোন বিষয় লইয়া নয়, তিনি প্রভুকে ভাল খাওয়াইবেন, আরামে শয়ন করাইবেন। কিন্তু প্রভু তাহা সহিতে পারিতেন না। জগদানন্দ তাহা দেখিয়া তখন প্রভুর প্রতি রাগ করিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রভুও তখন তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সাধনা করিয়া খাওয়াইতেন। একবার তিনি শচীমাতার নিকট

হইতে এক কলস চন্দনের তৈল প্রভুর জন্য নীলাচলে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রভু সময়ে সময়ে প্রিয়বিরহোত্তাপে অতিশয় ক্লেশ পাইতেন, তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই সুস্নিগ্ধ চন্দন তৈল মাথায় করিয়া গৌড়দেশ হইতে জগদানন্দ নীলাচলে লইয়া গিয়াছিলেন এবং প্রভুর মনোহর দেহে মাখাইবার জন্য গোবিন্দের নিকট দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন যে সন্ন্যাসীর চন্দনতৈলে কোনও প্রয়োজন নাই। এই তৈল জগন্নাথদেবের মন্দীরের প্রদীপের তৈল হইবে। তাহাহইলে জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হইবে। কিন্তু জগদানন্দ শুনিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। তিনি ত জগন্নাথ দেবকে ভালবাসেন না, তিনি কেবল মহাপ্রভুকেই ভালবাসেন। তিনি মহাপ্রভুকে তৈল মাখাইতে না পারিয়া গোবিন্দের নিকট হইতে তৈলের কলস আনিয়া প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিলেন।

জগদানন্দ যে প্রভুর প্রতি রাগ করেন কেবল ভালবাসার জন্য। মহাপ্রভুও জগদানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক দিন জগদানন্দ শুনিতে পাইলেন যে প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে আসিবেন। তাহা শুনিয়া জগদানন্দ শিবানন্দের বাড়ীর ঘাট হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত পথ সুসাজ্জত করিলেন। পথের দুই ধারে কদলী বৃক্ষ, প্রদীপ, কুম্ভ, ফুলের মালা, আম্রের পল্লব দ্বারা সুশোভিত এবং ঘাট হইতে সেনের বাড়ী পর্য্যন্ত বস্ত্র দ্বারা আবরিত করিলেন। এবং যখন শিবানন্দের বাড়ীতে সেই পথ দিয়া আসিবার সময় এই সকল সুরচনা দেখিলেন, তখন প্রভু শিবানন্দের লোকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ইহা জগাইয়ের কাজ, না?" তাঁহারা বলিলেন "হাঁ জগদানন্দ করিয়াছেন।" প্রভুর প্রতি জগদানন্দের এত প্রীতি ছিল এবং প্রভু বুঝিলেন যে জগদানন্দ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। অতএব জগদনান্দ শ্রীসনাতনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি এত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৪)

মুকুন্দ ওঝা বা হাড়াই পণ্ডিত। নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একচাকা গ্রাম। ঐ গ্রামের পথ সমূহ অশ্বথাদি বৃক্ষে সুশোভিত। তাহাতে অত্যন্ত নিবিড় ছায়া প্রদান করে। মন্দ মন্দ সুশীতল সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সুনির্ম্মল স্থানে অনেক সুব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। ঐই গ্রামে একচক্রেশ্বর শিব পার্ব্বতীর সহিত স্থাপিতছিলেন। নদীরকূলে

গণেশাদি মূর্ত্তি স্থাপিতছিলেন। কালপ্রভাবে সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; একচক্রা গ্রামে অনেক ধনাঢ্য লোক সকল পুণ্যকার্য্য করিতেন এবং মহাতীর্থ ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতিতেও অনেক সুপণ্ডিত ছিল। কিছু দিন পরে এক মহা জ্যোতিজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন যে, মথুরাধামের ঈশ্বর এই একচক্র অথবা একচাকায় অবতীর্ণ হইবেন। অর্থাৎ বলরাম এখানে শীঘ্র প্রকট হইবেন। এই একচক্রা গ্রামে মুরারি নামে এক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অতি পুণ্যবান্, সর্ব্বাংশে প্রাচীন ও অতি অর্থবন্ত ছিলেন। পূর্ব্বকালের ঋষির ন্যায় তাঁহার সকল কার্য্যকলাপ ছিল। তাঁহার যত যজমান ছিল তাহাদের উপর তাঁহার সাতিশয় স্নেহ ছিল। যদিও মুরারি ওঝা সুন্দরামল বন্দীঘাটী গাঁই ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি তিনি সকল স্থানে শ্রেষ্ঠ রূপে পূজনীয় ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার বণিতা প্রভাবতী সুশীলা, পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। প্রভাবতী পুত্রবতী হইয়াও দুঃখিতা ছিলেন। কারণ পূর্ব্বে যত পুত্র হইয়াছিল তাহা সকলই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। কেহই জীবিত ছিল না, অবশেষে শুভলগ্নে শুভক্ষণে এক পুত্র জন্মিল। পুত্রের মুখদেখিয়া মুরারি ওঝা হরিষে বিষাদান্তঃকরণ হইলেন। যাহা হউক এবার ঐ পুত্রকে পার্ব্বতী-শঙ্করের পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। মুরারি ওঝাও নিজ পত্নীসনে বিচার করিয়া পুত্রের হাড়ো নাম রাখিলেন, প্রতিবেশীরা ইঙ্গিতে মুকুন্দ নাম রাখিলেন, এ কারণ ইহাঁর দুই নাম হইল। মুকুন্দ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া রূপবান হইলেন। অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইল, যথোচিত বিধানে ও যথা রীত্যানুসারে অন্ন মুখে দেওয়া হইল। তার পর যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত হইলে যথাবিধানে কার্য্য সমাধা হইল। তদনন্তর বিবাহের বয়স হইলে নিজ মাতা বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানের নিকট কাজলা গ্রামের মহেশ্বর শর্ম্মার এক পরমাসুন্দরী পদ্মাবতী নাম্নী কন্যা ছিল, ঐ কন্যার সহিত মুরারি ওঝা মহা জাকজমকের সহিত মুকুন্দের বিবাহ দিলেন। তদনুষ্ঠানে সেই অঞ্চলে অত্যন্ত সুখ্যাতি হইয়াছিল। মুকুন্দ ও পদ্মাবতী পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন, মুরারি ওঝা ও প্রভাবতী দুই জনে অনেক পুণ্যকার্য্য করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরে উভয়ই এক সঙ্গে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিতৃ-ত্যক্ত বিপুল ধন এবং অনেক যজমান দত্ত অর্থ দ্বারা মুকুন্দ পিতা মাতার শ্রাদ্ধ কার্য্য অতি সুখ্যাতির সহিত সমাধা করিয়াছিলেন। এই

সময়ে মুকুন্দ বা হাড়ো সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হওয়াতে হাড়াই পণ্ডিত নামে বিদিত হন। আবার ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি হইয়া বিষ্ণুভক্তি-তত্ত্বজ্ঞ হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা পদ্মাবতীও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। ইঁহাদের দুই জনের বিষ্ণু আরাধনাতে অতিশয় প্রীতি ও অনুরাগ দেখিয়া ও তাঁহাদের শুদ্ধাচরণ দেখিয়া সকল লোকেই তাঁহাদিগকে জগতের পিতা মাতা জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাঁহাদের অপূর্ব্ব দুই সন্তান জন্মিল। জ্যেষ্ঠের নাম কুবের বা জয় পরে লক্ষ্মীপতি গুরু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন। তাহার কারণ কুবের সর্ব্বদাই আনন্দে নৃত্য করিতেন এবং নিরানন্দ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সকলে সত্যানন্দ রাখিলেন। কারণ সত্য বিষয়ে তাহার অত্যন্ত আনন্দ ছিল। নিত্যানন্দ জন্মিবা মাত্রই একচাকার চারিদিকে সুমঙ্গলের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সকল গৃহস্থই ধান্য প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াতে সে দেশের দুর্ভীক্ষ ঘুচিয়া গেল। তাহাতে সকলের মহা আনন্দ ও উৎসাহ হইল, প্রতিবেশী পুণ্যবতী স্ত্রীলোকেরা মুকুন্দ ও পদ্মাবতীর নব প্রসূত বালককে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া নবনীত পুত্তলিকার ন্যায় দ্রব হইল এবং দুই জনকে পরম ভাগ্যবান্ বলিতে লাগিল।

একচাকার বালকদের সঙ্গে বালকদ্বয় পূর্ব্ব লীলা শিখাইয়া সেই সকল খেলা করিতে লাগিল। এই রূপ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের সঙ্গে ঐরূপ লীলা খেলা করিয়া পিতা মাতাকে ও একচাকার লোকদিগকে যথেষ্ট আনন্দিত করিলেন। পরে মহাপ্রভুর ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিলেন। আহারান্তে ঐ বালকটীকে পিতা মাতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গেলেন। নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বরূপ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরে তাঁহার তেজ নিত্যানন্দকে প্রদান করতঃ বিশ্বরূপ অন্তর্ধান হইলেন। পরে ঐ নিত্যানন্দ মথুরাতে আসিয়া কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরী কহিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে মানুষী তনু গ্রহণ করিয়া বিহার করিতেছেন; তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। তুমি যাইবা মাত্র দেখিতে পাইবা। এই কথা শুনিবা মাত্র নিত্যানন্দ দৌড়িয়া নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্যের বাটীতে আসিয়া বসিলেন। তথায় প্রভু নিমাই পণ্ডিত ভক্তের সহিত মিলিত হইলেন, তাহার পর নিত্যানন্দকে শ্রীবাসের বাটীতে

রাখিলেন। নিত্যানন্দের এবং তাঁহার পুত্রের দুই একটী অলৌকিক ঘটনা এখানে ব্যাখ্যা করিব—প্রভু নিমাই পণ্ডিত নিত্যানন্দকে শ্রীবাসের ও তাঁহার স্ত্রী মালিনীদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন, যেন তাঁহার কোনও প্রকার কষ্ট না হয়। সেই দিনই মালিনী দেবীর একটী পিতলের ঘৃতের বাটী কাক পক্ষীতে লইয়া গেল; তখন মালিনী ও তাঁহার দাসী দুঃখী, অতি দুঃখিত ভাবে নিত্যানন্দকে বলিলেন। তাহাতে নিত্যানন্দ ঐ বায়সকে বাটী ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। বায়সও তৎক্ষণাৎ দুঃখী ও মালিনী দেবীর সম্মুখে বাটী আনিয়া দিল। তাহা দেখিয়া মালিনী অতিশয় বিস্মিত হইয়া নিত্যানন্দ পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই দুঃখী ঝির নাম পরে মহাপ্রভু সুখী রাখিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা এই যে, নিত্যানন্দ যখন পাণিহাটী রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী গিয়া ছিলেন, তখন রাঘব পণ্ডিত তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ কদম্ব পুষ্পের মালা পড়িতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন. তাহাতে রাঘব পণ্ডিত বলিলেন যে এ সময় কদম্ব পুষ্প পাওয়া যায় না। এ কথায় নিত্যানন্দ রাঘব পণ্ডিতকে কহিলেন যে "তোমার বাহিরের জম্বীর গাছে কদম্ব ফুল ফুটিয়াছে, যাইয়া দেখ।" তিনি আসিয়া দেখিলেন যে যথার্থই কদম্ব পুষ্প ফুটিয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে রাঘব পণ্ডিত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আনন্দ-সহকারে ঐ ফুল তুলিয়া তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। তৃতীয় অলৌকিক ঘটনা এই যে, নিত্যানন্দ অলঙ্কার পরিতে বড় ভালবাসিতেন। সেই জন্য তাঁহার পরমাত্মীয় ও প্রিয় শিষ্য বণিক উদ্ধারণ দত্ত তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। ঐ অলঙ্কার সকল কয়েক জন দস্যু অপহরণ করিতে আসিয়া তাঁহার কৃপায় পরম ভক্ত হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডে মহোৎসবে যাইয়া রামাই নামক অন্ধকে চক্ষু দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে যাইয়া অতি প্রাচীন ও প্রাচীনা ব্রাহ্মণীর সবে মাত্র একটী পুত্র মরিয়া গেল। তখন বীরচন্দ্র প্রভু তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ প্রাচীন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মহা ক্রন্দন শুনিয়া তাঁহার চিত্তে দয়ার উদ্রেক হইল। এবং ঐ মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়া দিলেন।

(৫)

শ্রীখণ্ড নিবাসী নারায়ণ সরকার নামে বিশুদ্ধ চরিত্রবিশিষ্ট পরম ধর্ম্ম-পরায়ণ জনৈক বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরহরি। নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, মুকুন্দ বাদসাহের চিকিৎসক ছিলেন, তিনিও বিবাহ করেন নাই কিন্তু মহাপ্রভুর নিজের কার্য্য সাধন নিমিত্ত শ্রীখণ্ডে যাইয়া মুকুন্দকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন; তাহাতে মুকুন্দ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীলোকের প্রতি আদৌ কোনও আসক্তি নাই। তাহাতে প্রভু কহিলেন যে "আমি তোমার নিকট এমন পরমাসুন্দরী মনোলোভা স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব, যে, তাহাকে দেখিবা মাত্রই তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইবে।" প্রভু ঐ রূপ, রূপবতী স্ত্রীলোক তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং মুকুন্দও প্রভুর ইচ্ছায় তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। মুকুন্দ প্রভুর নিকট ঐ সময় ইহাও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, একটী পুত্র অপেক্ষা অধিক সন্তান না জন্মে। তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে মুকুন্দের একটী সন্তান হইল, তাঁহার নাম রঘুনন্দন। রঘুনন্দন মহাপ্রভুর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। নীলাচলে মহাপ্রভু তথাকার মহোৎসবের পর সর্ব্বাগ্রে এই রঘুনন্দন বরপুত্রকে স্বকীয় গলার মালা ও চন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি এই বংশের ঠাকুরেরা সর্ব্বাগ্রে মালা চন্দন্ পাইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ নবদ্বীপের চৈতন্য দাস বাবাজি, অম্বিকা কালনার সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজি প্রভৃতি মহাত্মারা বরাবর এইরূপ মান্য করিয়া আসিয়াছেন।

এক দিন হোসেন খাঁ বাদসাহ এক উচ্চ টুঙ্গির উপরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য ময়ূরের পুচ্ছ নির্ম্মিত বিচিত্র ব্যজন আড় ভাবে ধারণ করতঃ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বাতাস দিতেছিল, ঐ সময়ে মুকুন্দ-চিকিৎসক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে, ঐ ময়ূরের পুচ্ছ বাদসাহের মস্তকে সংলগ্ন আছে। এই সুদৃশ্য মুকুন্দের মনে একটী উচ্চ ভাবের উদয় করিয়া দিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মনে পড়িল। সেই ভাবে বিভোর হইয়া তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। বাদসাহ তাঁহার ভাবের বৈভব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শরীরে কোনও আঘাত লাগে নাই ত?" তখন মুকুন্দ অতি সতর্কের সহিত নিজ মূর্চ্ছা দূর করতঃ কহিলেন" আমার মৃগী রোগ আছে সেই জন্য পড়িয়া

গিয়াছি। গাত্রে কোনও বেদনা প্রাপ্ত হই নাই" এই কথায় বাদসাহ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কোন বেদনা যে পাও নাই তাহা মঙ্গলের বিষয়। এই ঘটনার পরই মুকুন্দকে গৌরাঙ্গদেব আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে মুকুন্দ বাদসাহের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপ ধামে যাইয়া নিমাই প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরি পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গ পদ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মদন, কনিষ্ঠ বংশী। এক দিন মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, সেই জন্যে রঘুনন্দনকে ঠাকুরের সেবা করিতে আদেশ করিয়া গেলেন। রঘুনন্দন সেই আদেশ অনুসারে সেবার সময় উপস্থিত হইলে, ঠাকুর ঘরে যাইয়া বালকমতি রঘুনন্দন কান্দিয়া কান্দিয়া গোপীনাথ ঠাকুরকে সমস্ত খাওয়াইতেন। পরে মুকুন্দ স্থানান্তর হইতে আসিয়া গোপীনাথ ঠাকুরের নৈবেদ্যের প্রসাদ খাইতে চাহিলেন। তাহাতে রঘুনন্দন উত্তর করিলেন, "বাবা, ঠাকুর সব খাইয়া ফেলিয়াছেন।" মুকুন্দ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পর দিবস পুত্রকে পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইবেন বলিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য লাড়ু তৈয়ার করিয়া গোপীনাথের সেবাহেতু রাখিয়া গেলেন ও বাড়ীর বাহিরে কোনও এক স্থানে লুক্কাইত ভাবে রহিলেন। সেবার সময় উপস্থিত হইলে রঘুনন্দন ঐ লাড়ু হাতে করিয়া গোপীনাথের ঘরে প্রবেশ করিলেন। এবং জিদ করিয়া ঠাকুরকে ঐ লাড়ু খাওয়াইতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে এমন সময়ে মুকুন্দ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রঘুনন্দন তাহা দেখেন নাই, কিন্তু ঠাকুর দেখিয়া আর খাইলেন না। মুকুন্দ পুত্রের এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। সকলে রঘুনন্দনকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব ঘটনার বিষয় পদকল্পতরুর একটী পদে বর্ণিত হইয়াছে ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ সেই গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীঅভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর এক জন পরম তেজস্বী ভক্ত ছিলেন। ইনি প্রভু নিত্যানন্দের একজন প্রিয় শিষ্য। অভিরাম গোস্বামী পূর্ব্বকালে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদাম সখা ছিলেন।

একদা অভিরাম গোস্বামী নিত্যানন্দের ঔরষে জাহ্নবার গর্ভে যে সমস্ত

পুত্র জন্মিয়াছিল তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে, গুরু পুত্রগণ তাহার তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইল, কেবল ..নাম্নী কন্যা অভিরাম গোস্বামীর প্রণাম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের অপর একটী বনিতা বসুধার একটী পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র। তাঁহাকে অভিরাম প্রণাম করিলে তিনি সেই অত্যন্ত তেজস্বীর প্রণাম গ্রহণ করিয়া জীবিত ছিলেন। সুতরাং অভিরাম বলিলেন "এই কুমার যথার্থ গুরু পুত্র।

তাহার পর অভিরাম একদিন বেণু বাজাইতে বাজাইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া মুকুন্দ ও মুকুন্দের পত্নীকে মহাপ্রভুর বর পুত্র রঘুনন্দনকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাঁহারা জাহ্নবার সমস্ত পুত্র মরিয়াছে শুনিতে পাইয়া রঘুনন্দনকে গৃহের মধ্যে স্থাপন করতঃ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। এবং বলিলেন যে রঘুনন্দন বাড়ীতে নাই। তদনন্তর অভিরাম অতি সরোষে তথা হইতে প্রস্থান করতঃ বড়ডেঙ্গা পল্লীতে যাইয়া বেণু বাজাইয়া উচ্চৈস্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রঘুনন্দন তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া তথায় অভিরামের সঙ্গে নৃত্য করতঃ হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সেইখানে জল আনয়ন করিতে যাইয়া ঐ ঘটনা দর্শনপূর্ব্বক অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং বাড়ী আসিয়া সেই কথা মুকুন্দ এবং তাঁহার পত্নীর নিকট জানাইল। তাঁহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "রঘুনন্দনকে যে, গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি" কিন্তু গৃহে যাইয়া দেখেন যে, রঘুনন্দন গৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রঘুনন্দন মহাপ্রভুর বর পুত্র, তিনি হরি সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উন্মাদের মত হইয়া অর্গল ভঙ্গ করতঃ অভিরামের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন।

মুকুন্দ এবং তাহার পত্নী অতি ব্যস্ত সহকারে অভিরামের নিকট গমন করতঃ বলিলেন, "তুমি প্রণাম করিয়া আমার পুত্রটীকে কাল কবলে কবলিত করিও না"। অভিরাম বলিলেন রঘুনন্দন মহাপ্রভুর বর পুত্র এবং যথার্থ ভক্ত, রঘুনন্দন আমার প্রণাম অতি তেজ সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই অভিরামের এত বহুসংখ্যক বংশী ছিল যে, তাঁহার ৩২ জন বংশী বাহকের প্রয়োজন হইত। কিন্তু তাহা তিনি নিজেই বহন করিতেন। এবং তাঁহার ভক্তদের পরীক্ষার নিমিত্ত জয়মঙ্গল নামক চাবুক ছিল।

পরীক্ষার নিমিত্ত ভক্তদিগকে ঐ চাবুক দ্বারা প্রহার করিতেন। শ্রীনিবাস একদা এই অভিরামকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তিনি কিরূপ মহাপ্রভুর বর পুত্র তাহা পরীক্ষার্থে অভিরাম তাঁহাকে তিন বা চাবুক প্রহার করিলেন, পুনবায় মারিতে উদ্যত হইলে তাঁহার স্ত্রী মালিনীদেবী তাঁহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন। এই শ্রীনিবাসকে ৫ জন বৈষ্ণব সেবার্থে ৮ কড়া কড়ি প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাস তাহা সম্পন্ন করিলেন এবং অভিবামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

(৬)

মুকুন্দ দত্ত নিবাস নবদ্বীপ। পূর্ব্ব নিবাস চট্টগ্রাম চক্রশালা তাহার পর কাঞ্চরাপাড়া বাড়ী করিয়াছিলেন। মুকুন্দ অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; প্রভুকে গান শুনাইয়া আনন্দিত করিতেন। প্রভুর ভক্তগণও মুকুন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন একদিন মহাপ্রভু মহা ভাবাবেশে খট্টার উপর বসিয়া সকল ভক্তকে একে একে ডাকিয়া বর প্রদান করিতে লাগিলেন কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিলেন না। তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার ও আমাদের পরমপ্রিয় মুকুন্দকে কেন ডাকিলেন না তাহাতে প্রভু উত্তর করিলেন "ও বেটার মতের স্থির নাই, যেখানে যেমন সেই খানে সেই ভাবে কথা বলে, অদ্বৈতের নিকটে গেলে বলিত ভক্তি শ্রেষ্ঠ, আবার অন্য সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলে" তাহাতে মুকুন্দ পুনরায় শ্রীবাসের দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন যে, "আমি কখনও কোন জন্মে দর্শন পাইব কি না?" তাহাতে প্রভু উত্তর করিলেন, "কোটী জন্মের পর দর্শন পাইবে।" তখন মুকুন্দ আহ্লাদে গদগদ হইয়া নৃত্য করতঃ বলিয়া উঠিলেন, "পাবত, কোটী জন্ম আর কয় দিন?" প্রভু তাঁহার এরূপ গাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া পুনরায় ভক্ত দ্বারা ডাকাইয়া বর প্রদান করিলেন নীলাচলে যখন মহাপ্রভু ছিলেন, তখন এই মুকুন্দকে দ্বারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন কাটোয়ার ব্রহ্মানন্দ ভারতী চর্ম্ম পরিধান করিয়া দর্শন নিমিত্ত মুকুন্দকে সংবাদ দিতে কহিলেন, তখন মুকুন্দ প্রভুর নিকট যাইয়া সংবাদ দিলেন যে আপনার কাটোয়ার ভারতী গোস্বামী আসিয়াছেন। লইয়া আসিব কি? তাহাতে প্রভু কহিলেন, আমি নিজে যাইয়া তাঁহাকে আনিব। তখন তিনি নিজে ভক্তসহ দ্বারে আসিয়া গুরুর চর্ম্মাম্বর পরিধান দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুকুন্দকে বলিলেন, "কই আমার গুরু কই" তখন মুকুন্দ

কহিলেন "ঐ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।" তখন প্রভু কহিলেন, আমার গুরু কেন চর্ম্মাম্বর পরিবেন। তখন ভারতী গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন ও চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, প্রভু স্বরূপ দামোদরকে একখান নূতন বহির্ব্বাস দিতে আজ্ঞা করিলেন। সেই বহির্ব্বাস পরিলে তখন ভারতী গোঁসাইকে মহাপ্রভু প্রণাম করিলেন ও আশ্রমের ভিতর লইয়া গেলেন ভারতী গোঁসাই তখন প্রভুকে বলিলেন, "তুমি লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে প্রণাম করিলে, কিন্তু আমার প্রার্থনা, তুমি আমাকে কখনও আর প্রণাম করিও না, আমি এত কাল পর্য্যন্ত নিরাকারবাদী ছিলাম কিন্তু যখন তোমাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছি তখন আমার সেই ভ্রম দূর হইল। নীলাচলে অচল ব্রহ্ম দেখিতেছি। সেই অচল ব্রহ্ম জগন্নাথ দেব, সচল ব্রহ্ম তুমি, ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "মনুষ্যকে পরমেশ্বর ভাবা দোষের বিষয়। এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তৎপরে স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন।

এই মুকুন্দ বাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। এই বাসুদেব একদা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "সমস্ত পাপী উদ্ধার হইয়া যাউক আমি তাহাদের জন্যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করি" এই প্রার্থনা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বাসুদেবও অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। মহাপ্রভু এই বাসুদেব দত্তের বাড়ী গিয়া শিবানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বাসুদেব যদিও গৃহী তথাপি প্রভুর বড় প্রিয়, কেন না, তিনি জগতের জীবের সমুদয় পাপ লইবেন, এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রভু বাসুদেবের বাড়ী কিছুকাল বাস করিয়া মুকুন্দ ও বাসুদেবকে পরম কৃতার্থ করতঃ পুনরায় অন্যত্র গমন করিলেন।

মুকুন্দ দত্ত শিশুকাল হইতে প্রভুর প্রিয়পাত্র। যখন প্রভু নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করেন, তখন মুকুন্দ ঐ টোলে অধ্যয়ন করিতেন। মুকুন্দের সুকণ্ঠ সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া সেই সময়েই তাঁহাকে প্রভু আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ গান শুনাইয়া আনন্দ প্রদান করিতেন। মুকুন্দ যখন অলঙ্কার পড়েন, তখন নিমাই প্রভু ব্যাকরণ পড়েন। নিমাই প্রভু মুকুন্দকে পথে ঘাটে দেখিলেই বিদ্যার যুদ্ধ করিতেন, একদিন মুকুন্দ বলিলেন, নিমাই ব্যাকরণ অতি শিশুদের পাঠ্য, আজ তোমাকে অলঙ্কারের পরীক্ষা করিব" নিমাই বলিলেন, "আচ্ছা বেশ

আমাকে অলঙ্কারের ফাকি কর" মুকুন্দ অলঙ্কারের ফাকি জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই তাহা তন্ন তন্ন করিয়া মুকুন্দকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন মুকুন্দ নিমাই-য়ের এই প্রকার ধীশক্তি দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইলেন। মুকুন্দ সকল সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, যখন কাটোয়ায় সন্ন্যাসী হইতে গমন করেন, তখন মুকুন্দ সঙ্গে ছিলেন এবং যখন নীলাচলে গমন করেন, তখনও বরাবর সঙ্গে ছিলেন মুকুন্দের দাদা বাসুদেব এক দিন প্রভুকে বলিয়াছিলেন যে "মুকুন্দ যদিও আমার কনিষ্ঠ তথাপি আপনার সহবাসে থাকে বলিয়া আমার চেয়ে বড় হইয়াছে। বাসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছিলেন যে "আমার এই শরীর সমুদয় তোমার, ইহাকে তুমি যেখানে সেখানে বিক্রয় করিতে পার।" এই কথা মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীকেও নীলাচলে আসিলে বলিয়াছিলেন। মুকুন্দ ব্যতীত আর এই কয়জন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, যথা—সঙ্গীত রসময়-স্বরূপদামোদর, বাসুদেব, মাধব গোবিন্দ ব্রাহ্মণ, ছোট হরিদাস। ইহাঁদের গান শুনিবা মাত্র প্রভু নৃত্য করিতেন।

(৭)

ইনি মুকুন্দ গোস্বামী। বাড়ী মুলতান, পশ্চিম অঞ্চলে পঞ্জাবের মধ্যে। ইনি কৃষ্ণদাসের পাঁচ জন প্রিয় শিষ্যের মধ্যে একজন। যথা গোপাল ক্ষত্রীয়, দ্বিতীয় বিষ্ণুদাস মহাশয়, তৃতীয় বড় দয়াময় রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, ৪র্থ গোবিন্দ অধি-কারী, ৫ম। মুকুন্দ গোঁসাই। মুকুন্দের পিতা বিখ্যাত মহা সওদাগর ছিলেন, ঐ সওদাগরকে মহা ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে, কারণ মুকুন্দ হেন ধার্ম্মিক পুত্র পাইয়াছিলেন। মুকুন্দ গোস্বামী কিরূপে বৃন্দাবনে আসিলেন তাহার বিবরণ এই—একদা রজনী যোগে মুকুন্দ গোস্বামী নিজ বৈকুণ্ঠ সম অট্টালিকাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে শেষ রাত্রিতে গোবিন্দ দেব ঠাকুর বৃন্দাবননাথ তাঁহাকে শ্রীমুখে হাসিয়া স্বপ্নাদেশ করিলেন যে "তুমি শিঘ্র বৃন্দাবনে আইস, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ইহা বলিয়া বৃন্দাবন নাথ রাধা সখী সঙ্গে অন্তর্ধান হইলেন। মুকুন্দ গোসাই নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিকল হইয়া কহিতে লাগিলেন, "কি চমৎকার রূপ স্বপ্নে দর্শন করিলাম" তজ্জন্য হা হুতাশ করতঃ স্থির হইয়া শেষে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন ও পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে যাইবেন, তজ্জন্য করযোড়ে পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। পিতা তাঁহার ইচ্ছানু-সারে আজ্ঞা দিলেন। তখন মুকুন্দ তিনখানি নৌকা আনাইয়া নানাবিধ

সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি নৌকায় পূর্ণ করিয়া পিতার আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ নৌকাযোগে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন চারিদিন মধ্যে তাঁহার নৌকা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। মুকুন্দ সামান্য বাণিজ্যের অভিলাষী নহেন, যে বাণিজ্য দ্বারা পরকালের ধন সংগ্রহ না হয়, সেই বাণিজ্য মুকুন্দের নিকট বৃথা। তিনি পরমার্থ সংগ্রহ নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনধামে বাণিজ্যের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহার পিতা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনের শোভা দেখিয়া গদগদ মনে মুকুন্দের প্রেম উথলিয়া পড়িল। শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন, এই তিন ঠাকুর দর্শন করিয়া প্রেমে বিভোর হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শুভ দৃষ্টিতে পতিত হইলেন, এবং সকল বৈষ্ণবগণই তাঁহাকে কৃপা করিতে লাগিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের টীকা শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রস্তুত করিতে বলেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী অবহেলা পূর্ব্বক তাঁহার পুস্তক ভাণ্ডারে রাখিয়া দিলেন, ইহাতে কবিরাজের অত্যন্ত দুঃখ হইল। সে জন্য তিনি আহার বন্ধ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে ঐ পুস্তক গৌড়দেশে প্রচার হয়। পরে মথুরার বিশ্রাম ঘাটে সেন শিবানন্দের সন্তান কবিকর্ণপুরের সহিত শ্রীজীবের সাক্ষাৎ হইল। এবং শ্রীজীবের প্রমুখাৎ কবিরাজ গোস্বামীর বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কবিকর্ণপুর শ্রীজীবকে গোপনে কহিলেন, "কৃষ্ণদাস যাহাতে তুষ্ট হয়েন তাহার চেষ্টা করুন।" শ্রীজীব তখন এই গ্রন্থখানির মাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য যমুনার জলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু গ্রন্থ খানি স্রোতের প্রতিকূলে উজাইয়া মদনমোহন ঠাকুরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। এই প্রকার মাহাত্ম্য দর্শনে শ্রীজীব গোস্বামী ঐ পুস্তক নদী হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার পুস্তকাগারে সমস্ত পুস্তকের নিম্নে স্থাপন করিলেন। তৎপর কবিকর্ণপুরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের দরুণ গ্রন্থ আনিতে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই গ্রন্থ সমস্ত গ্রন্থের উপরে উত্থিত হইয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব মহাত্মাগণ এই অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আগ্রহ সহকারে প্রণম্য গ্রন্থ-রত্ন মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং সকলে বুঝিতে পারিলেন যে এই পুস্তকের প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা আছে। মহাপ্রভু কবিকর্ণপুরকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মথুরায় স্বপ্নাদেশে বলিয়াছিলেন যে, "তোমাদের দুই জনের হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বাস করিতেছি, বৃন্দাবনে যাও তোমাদের মনোরথ সফল হইবে।"

স্বপ্নানুসারে পুস্তকের অলৌকিক ঘটনা এবং বিশেষ আদর দেখিয়া তাঁহাদের মনস্কাম সফল হইল। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুকুন্দ গোস্বামী দ্বারা তাঁহার বাঙ্গালা চৈতন্য-চরিতামৃত গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মুকুন্দ গোস্বামী নবদ্বীপ আসিয়া সকল বৈষ্ণব মহান্তকে পুস্তকের অনুলিপি করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতামৃতাদি গৌড়দেশে আনেন নাই, তাহা বৃন্দাবনেই ছিল। মুকুন্দ সেই চৈতন্য-চরিতামৃতের পরম মাহাত্ম্য গৌড়দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। পটুয়াখালি।

—*:*:*—

চূড়াধারি-মোহান্তগণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি গৌড়ক্ষিতি অর্পণ করেন এবং তদনুসারে শ্রীমান্ নিত্যানন্দপ্রভু ও তৎ শাখানুশাখাভুক্ত গোস্বামী ও মোহান্তগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তি এ যাবৎকাল গৌড়-মণ্ডলে প্রচারিত করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও অন্যান্য গোস্বামী ও আচার্য্যগণের শাখানুশাখাভুক্ত বহুসংখ্যক ভক্তিভাজন গোস্বামী, আচার্য্য, অধিকারী ও মোহান্তগণ এই কলুষ-পূর্ণ কলিকালে হরিনাম প্রচার দ্বারা জীবগণের প্রতি অশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল গোস্বামী, আচার্য্য, অধিকারী ও মোহান্তগণের বংশ বা পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করিলে নানাবিধ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এ স্থলে চূড়াধারী নামক শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত মোহান্তগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

মহাপ্রভুর পারিষদ্‌গণ মধ্যে যাঁহারা শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, তাঁহারাই চূড়া-ধড়া-শৃঙ্গ-বেত্রাদি ধারণে রাখালবেশে সর্ব্বদা সজ্জিত হইতেন। কেন না তাঁহারা ব্রজের স্বতঃসিদ্ধ রাখাল ও একান্ত মাধুর্য্য প্রেমের অধিকারী ছিলেন। প্রমাণ যথা—

নিত্যানন্দে গণ যত সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥ চৈতন্য চরিঃ।
যার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সব নন্দ-গোষ্ঠী গোপ গোপী অবতার॥ চৈতন্য ভাগবত।

নিত্যানন্দ পারিষদ যতেক গোপাল।
চূড়া বাঁধা ধড়া পরা ব্রজের রাখাল॥ বৈষ্ণব আচার দর্পণ।
বেত্রবংশী শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ দড়ি।
ইহারা ধরেন কেন মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
কেহ বলে ভক্তি নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া অধিক সবার॥
গোপ গোপী ভক্তি সর্ব্ব তপস্যার ফলে।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকলে॥ চৈতন্য ভাগঃ।

এইরূপে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট সময়ে তদীয় গণস্থ পারিষদ মোহান্তগণ চূড়া ধড়াদি গোপবেশে সজ্জিত হইতেন। তাঁহার অপ্রকট হইলে তৎপুত্র বীরভদ্র গোস্বামী প্রভুর সময়েও তদ্রূপ বেশই ধারণ করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীগোপীজনবল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী প্রভুত্রয় তাঁহাদের গণের এইরূপ রাখালবেশ ধারণ করিতে নিষেধ করেন ও এইরূপ নিষেধ করার কারণ এই যে যাঁহারা শ্রীভগবানের অভেদ বেশে ইতি পূর্ব্বে চূড়া ধারণ করিতেন, তাঁহারা ব্রজের স্বতঃসিদ্ধ রাখাল; সুতরাং ঐ বেশ ধারণ করিতে তাঁহারা সক্ষম ছিলেন। এক্ষণে সাধ্যবস্তু শ্রীভগবানের অভেদ বেশ ধারণ করিতে পারেন, সাধকদিগের মধ্যে তেমন পাত্র নাই, অতএব শ্রীনিত্যানন্দ গণ মাত্র সে বেশ ধারণ করিতে সক্ষম নহেন।

এতদ্রূপ কারণ অনুবাদে প্রভুগণ চূড়া ধারণের নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, ঐ আজ্ঞা সকলেই শিরোধারণ পূর্ব্বক মান্য করিয়াছিলেন এবং চূড়াধড়াদি ব্যবহার করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবল মুরশিদাবাদের অধীন জঙ্গীপুরের নিকট বাজীতপুরের ৺শ্যাম সর্ব্বেশ্বর নামক বিগ্রহ সেবক মোহান্ত রামকৃষ্ণদাস ঐ নিষেধ আজ্ঞা প্রতিপালন না করার জন্য তিনি চূড়াধারী নামে অভিহিত হইয়া প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ত্যাজ্য হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের প্রণালী প্রদত্ত হইল।

শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী। তৎকৃপা পাত্র বীরভদ্র প্রভুপাদ। (১) তৎ শিষ্য রামকৃষ্ণ দাস মোহান্ত। (২) তৎ শিষ্য কৃষ্ণচরণ মোহান্ত। (৩) তৎ শিষ্য গোপালদাস মোহান্ত নামান্তর। মাধব দাস মোহান্ত। (৪) তৎ শিষ্য কৃষ্ণবল্লভ মোহান্ত। (৫) তৎ শিষ্য বালকানন্দ মোহান্ত। (৬) তৎ শিষ্য রামজীবন মোহান্ত। (৭) তৎ শিষ্য কৃষ্ণলাল মোহান্ত। (৮) তৎ শিষ্য

রামকৃষ্ণ দাস মোহান্ত। (৯) তৎ শিষ্য নবীনকৃষ্ণ দাস মোহান্ত। (১০) তৎ শিষ্য তিনকড়ি শর্ম্মণ মোহান্ত। (বর্ত্তমান)

এই প্রণালীটী ৺বৃন্দাবন ধামের মাধবাচার্য্য প্রভুর কুঞ্জের কামদার গৌর দাস বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। গোপাল দাস মোহান্তের নামান্তর মাধবদাস মোহান্ত। ইহা অত্রস্থ ৺বাবু পারশনাথ চৌধুরী জমীদার দিগের সদরের নায়েব উক্ত বাজীতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

ইঁহারাই চূড়াধারী; যিনি যখন প্রথমে গদীতে বসেন, তখন মাথায় চূড়া বাঁধিয়া বসেন। একাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নিয়মে চূড়াধারী বলিয়া চলিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা নিত্যানন্দ পরিবার।

এই চূড়াধারী মাধব ও কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবকে কেহ কেহ আজ কাল অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ চূড়াধারী মাধব কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা মাধব নহেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা মাধব আপনাকে পরাশর পুত্র মাধব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত চাঁন্দোরা যশোদল নিবাসী গোস্বামীগণের পূর্ব্বপুরুষ, রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ; এবং বাজীতপুরের চূড়াধারী মাধব শূদ্র জাতি ছিলেন।

চূড়াধারী মাধব নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভুর অনুশিষ্য কৃষ্ণচরণ মোহান্তের শিষ্য, এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের অন্ততঃ ১২৫ বৎসরের পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

বৈষ্ণব দাসানুদাসের অযোগ্য—শ্রীঠাকুরদাস দাস।

শুভ সংবাদ।

জলধির গভীর গর্ভে যে কত রত্ন আছে তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? সেইরূপ ভাবময় শ্রীভগবানের ভাব, জীব বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে না। মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সূচীটী যেমন কোথায় তলাইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিশাল বিশ্বরাজ্যের আলোচনা করিতে গিয়া আমরাও তেমনি আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিখানি হারাইয়া বসি যেহেতু ভগবান্ অনন্ত ভাবময়, এবং তাঁহার সৃষ্টি অনন্ত ভাবময়ী। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য নামাদি সবই অনন্ত। আবার ব্যষ্টি সমষ্টিভেদে, প্রত্যেক সৃষ্টি অনন্ত ভাবের লীলা-

ভূমি। এইরূপ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত বিহীন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের একাংশে বিরাজ করিতেছে। "ও তা ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে ভাবনা শেষে ভাবনা পায়" তিনি এক অখণ্ডৈক রস, পরমানন্দ, ইচ্ছা-ময় স্বেচ্ছায় বহু হইয়া, এই অনন্ত লীলারস তরঙ্গের অন্তরে বাহিরে, সচ্চিদানন্দ ত্রিভঙ্গিম শ্যামসুন্দর যে কত রূপে নৃত্য করিতেছেন, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব। শ্রী যাঁহার ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধা হইয়া পদসেবা করিতেছেন, যাঁহার বৈভবে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের দেহ ঢলিয়া মস্তক টলিয়া গিয়াছে, সেই বিশ্বমূলাধারকে তত্ত্বত বিচার করিয়া, সাধ্য কি দুর্ব্বল জীব খণ্ড বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারে। তবে যে সৌভাগ্যবান্ জীব, সাধু বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর কৃপায় তাঁহার এই রমণীয় ব্রজপুরের সৌন্দর্য্যে মোহিত—আত্ম-হারা হইয়া আপনাকে "তৃণাদপি সুনীচ" স্থির করিয়া সরল বিশ্বাসে, মনের উচ্ছ্বাসে, তাঁহার শ্রীচরণ কমলে আপন অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া, ভুবন সুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়ের অধিনায়কত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। এতাদৃশ প্রেমিক রসিক, বিরক্ত ভক্ত, মহাপুরুষেরা এই চৈতন্য-রসার্ণবে ভাবের হিল্লোলে নামের কল্লোল তুলিয়া আপনি মাতিয়া জগত মাতাইতেছেন। ভক্ত ভগবানের সহিত গৃহস্থলী পাতাইয়া, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাব বন্ধনে শ্রীনন্দকিশোরকে আপনার সহিত বাঁধিয়া, প্রেমের "কিকি কিনি" করিতেছেন। হরিনামের ভিক্ষা দিয়া হরিনামের ভিক্ষা চাহিতেছেন। নিত্য বৃন্দাবনের বিলাস নিকুঞ্জে নাম, রূপ ও গুণরসে হাবু ডুবু খাইতেছেন। অহৈতুকী গোপীপ্রেমে, অন্তঃ কৃষ্ণ বহি গৌর হইয়া, ফুল্ল প্রাণে অতুল্য তানে গাহিতেছেন, "কি দিব, কি দিব, নাথ, কিবা দিব আমি, যে ধন দিব হে তোমায় ;সেই ধন তুমি" এইরূপ কত সাধন সিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত মহাপুরুষেরা চিরকালই প্রেমময়ের প্রেমের হাটে ভাবের মহাজনি করিতেছেন। আমাদের পুঁজি পাটা নাই, কেমন করিয়া সে ভাব ক্রয় করিব। বিষয়ের কীট হইয়া, কেমন করিয়া বৈরা-গ্যের সুখ সুন্দর নির্ম্মল মূর্ত্তি দর্শন করিব। ভূচর হইয়া কেমন করিয়া খেচরের ন্যায় তারাপথে বিচরণ করিব। পরার্থপর মহাজনেরা ত অপর দ্রব্য সামগ্রী কিছু চাহেন না ; তাঁহারা কেবল মাত্র এক বিন্দু অশ্রু জলের বিনিময়ে ভাবনিধি দান করিতে চাহেন। বিতরণ তাঁহাদের কার্য্য। আবার প্রেমিক ভক্তগণের চূড়ামণি শ্রীনন্দদুলাল গৌরসুন্দর রূপে নিজে কাঙ্গাল

সাজিয়া, তাঁহার রসময়ী কিশোরীর ভাণ্ডারের প্রেম মাথায় লইয়া "আয়রে আয়রে জগাই মাধাই আয়, তোদের প্রেমের বাতাস লাগুক গায়।" বলিয়া জীবকে গৃহে গৃহে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন ও চিরকালই করিতেছেন। ভক্ত ও ভক্তের ঠাকুরের প্রাণ চিরদিনই ত বিষয়ি-জীবের জন্য কাঁদিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, আমরা যে শ্রীগুরুদত্ত পাত্রে বিশ্বাস মিশাইয়া শুদ্ধ ভক্তির অঞ্জনে চক্ষুর্দ্বয় রঞ্জিত করি নাই। নিত্য নিরঞ্জন গৌরহরিকে আমাদের অতি নিকট স্বজন বলিয়া কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব। ব্রজের ভাব লাভ না করিয়া, ব্রজেশ্বরকে কি ধরিতে পারা যায়? রাধাকুণ্ডের স্নিগ্ধ সলিলে দেহ মন পবিত্র না হইলে, কি শ্যামকুণ্ডের প্রেমামৃত পান ঘটিয়া থাকে? এই ভাবিয়া যখন মন প্রাণ অবসন্ন হয়, হতাশের প্রবল ঝটিকায় সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে—সুখরতী জীব দুঃখের পাথারে গা ঢালিয়া দেয়, অনুতাপ বহ্নি ধূধূ জ্বলিতে থাকে, দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া গোবিন্দ চরণারবিন্দের প্রেম-মকরন্দ পান করিতে পাইলাম না, চিন্তায় অঙ্গ জর জর হয়, তখন প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভক্ত সাধু বেশে অনুতাপীকে কোলে লইয়া, জলদ গম্ভীর স্বরে বলেন, "বৎস! ভয় নাই, যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ পদাম্বুজং।" এই শুভ সংবাদ সর্ব্বদা মনে রাখিও, আর মনে রাখিও হরের্নামৈব কেবলং। তুমি অনুরাগ ভরে আপন মনে, জগত ও জগৎপতিকে দেখিও। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যে কোন কামনা করিয়াই হউক, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কল্পতরুর আশ্রয় লইবে। একবার অটল বিশ্বাসের সহিত রসময়ের রসতরঙ্গিণীতে ঝাঁপ দিয়া দেখ, আর উঠিতে পারিবে না। দেখিতে পাইবে অচিরে মহাশ্মশানে নন্দনের পারিজাত হাসিবে। দেখিতে দেখিতে দীনবন্ধুর অহৈতুকী গোপী-প্রেম সিন্ধুতে ভাসিতে থাকিবে। "ভেসেছে আমার মন গৌর-প্রেমের বন্যাতে, উঠে না কোন মতে।" আর ভুলিও না প্রভুর নামটি। নামের বলে শ্রীহনুমান অপার পয়োধি, গোষ্পদের ন্যায় অবহেলে পার হইয়া, রক্ষপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন। যেমন বীজান্তর্গত বিপুল বৃক্ষ, তেমনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের মধুর হরিনামের অন্তর্নিবিষ্ট। নামে ভূলোক, ভুবলোক, জনলোক, তপলোক ঠাকুরের সাধের গোলোকটি পর্য্যন্ত অস্ফুটস্ত ভাবে বিরাজ করিতেছে। নামের মধ্যে সর্ব্বরূপে বিশ্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। জপিতে জপিতে নাম চৈতন্য কর, দেখিতে পাইবে রাই অঙ্গের জ্যোতি মাখিয়া

চিৎঘন শ্যামসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর সর্ব্বশেষ বিলাস মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন। আর চতুর্দ্দিকে হরের্নামৈব কেবলং ধ্বনি উঠিতেছে। "তথা তন্ত্র নাই মন্ত্র নাই, কেবল মাত্র হরিবোল।" তিনি আপনার নামে আপনি বিভোর, তাই গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন জগতে প্রচারিয়াছেন।

অতএব আমরা বুঝিলাম, নামই তপ, নামই জপ, নামই কর্ম্ম, নামই ব্রহ্ম, বিশ্বচরাচর নামে প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য ঠেলিয়া মধুর শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহেন, তাদৃশ মহাত্মা "নাম চিন্তামণির মালা" গলায় দিয়া, সাধু সঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করিতে থাকুন। নামের মহাত্ম্য স্মরণ করিতে গিয়া একটী আখ্যান মনে আসিল। আমরা তাহা নিম্নে বিবৃত করিয়া "শুভ সংবাদের" শেষ করিব। কোন এক ফকিরের, বাদসাহ আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইল। ফকির তদভিপ্রায়ে, অনেক দিন ধরিয়া সুযোগ খুঁজিলেন, তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। পথের ভিক্ষুক কেমন করিয়া এত ঐশ্বর্য্য ঠেলিয়া, বাদসাহের দরবারে গমন করিবে। রাজ পুরুষেরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফকির, অবশেষে নগর প্রান্তে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তথায় বাস করিয়া দিবারাত্রি উচ্চৈস্বরে "আকবর, আকবর" নাম জপিতে লাগিলেন। এই কৌতুকাবহ সংবাদ ক্রমে আকবরের কর্ণে প্রবেশিল। আকবর বিস্মিত হইয়া পারিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই ফকিরের আশ্রমে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। এবং আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সাশ্রুলোচনে ফকিরকে আলিঙ্গন দিলেন।

অতএব ভয় নাই ব্যষ্টি আমি, সমষ্টির ভাব ধারণ করিতে না পারিলাম, ক্ষতি নাই। পতঙ্গ কি কখন মাতঙ্গকে ধরিতে পারে, আমি যদি অটল বিশ্বাসের সহিত, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যে কোন ভাবেই হউক রসময়ের রসের পথে ধাবিত হইতে পারি, প্রেমপুলকিত চিত্তে ঘরে বাহিরে হরি, হরি, হরি, বলিয়া কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার অটল সিংহাসন টলিবে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আরাধ্য দেবতা তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া পরম মাধুর্য্য অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বিলাস মূর্ত্তিতে আসিয়া আলিঙ্গন দিবেন। তখন দিবাচক্ষে দেখিতে পাইব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখি সবই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। অতএব ভয় নাই যেন তেন প্রকারেণ

ভজ কৃষ্ণ পদাম্বুজং, আর প্রাণ ভরিয়া বল হরের্নামৈব কেবলং। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

হরিভক্তিপরো যশ্চ হরিনাম পরায়ণঃ।
সুবৃত্তোবা কুবৃত্তোবা তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্তস্য। গোড্ডা।

—:***:—

নিবেদন।

গত আষাঢ়ের শ্রীপত্রিকায় "শ্রীশ্রীচৈতন্য সম্বন্ধিনী বক্তৃতা" শীর্ষক প্রবন্ধটী একাধিক বার পড়িয়াছি। প্রস্তাব বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রবন্ধ পাঠে বোধ হইল, লেখক একজন বহু শাস্ত্রদর্শী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। আর জানিলাম,—তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত—ব্রাহ্মণ। কাজেই আমাদের পরম পূজ্য,—উপদেশ প্রদানের যোগ্য তিনি অন্য লোকের সংশয় নিরসনের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার মত গৌরভক্তের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই জীবাধমের প্রতি বিরক্ত হইবেন না তিনি গৌরভক্ত পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি অতিশয় পীড়িত, তথাপি হৃদয়ের উত্তেজনায় বলিতেছি,—উক্ত প্রস্তাবের কোন কোন অংশ বুঝিতে পারি নাই। বিশেষতঃ একটী অংশ পড়িয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। সে টুকু এই—

"এই বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ, এই বাসুদেবই পরমাত্মা, এই বাসুদেবই তুরীয়, বাসুদেবই গোলক পতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত দ্রব্য গুণ কর্ম্মাদি সমস্ত পদার্থের পতি। এই বাসুদেবই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দানন্দবর্দ্ধন, এই বাসুদেবই নিকুঞ্জ বনে নব কিশোর আত্ম নিবেদিতা মোহিতা প্রসুপ্তা হলাদিনী শক্তিকে অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে যুগল মিলনে এক তনু হইয়া বিলাস মূর্ত্তিতে বিরাজিত, এই বাসুদেবই শ্রীচৈতন্য শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রেমরূপ মাধুর্য্যের আধার।"

উদ্ধৃত লেখা পড়িয়া জানা যাইতেছে, বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবই গোলোক পতি, বাসুদেবই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু। আমাদের এরূপ জানা দূরে থাক্—কখন শুনি নাই। আর চিহ্নিত পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় দুর্ব্বোধ্য—ভাষাও কি রকমের। প্রবন্ধ লেখক মহাত্মা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পদ প্রমাণ স্থলে তুলিয়াছেন। অতএব চরিতামৃত তাঁহার দেখা নাই, একথা বলিতে পারি না

তিনি চরিতামৃত পড়িয়া কোন্ অভিপ্রায়ে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন,—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জানি—

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহ একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করে প্রকট বিহার॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দুঁহে হইলা এক ঠাই॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ। (বাসুদেব)
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
স্বয়ং রূপের গোপ বেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান॥
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ॥

বলা বাহুল্য উল্লিখিত পদগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তুলিয়া দিলাম। তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতের কথা সর্ব্বাগ্রগণ্য।

শ্রীরাজীবলোচন দাস।

গীত।

আমার মন মজেছে সখিরে গোরার পিরীতে।
ধরম ভরম বুঝি নারি রাখিতে।
গোরা রূপ সুধা-সার, চেখে যে পেয়েছে তার,

সে কি কভু পারে আর, স্থির থাকিতে।
দরশন যত বার, পান আশা অধিক তার,
তৃপ্তি নাই পিপাসার, পিয়ে আঁখিতে। (দুষ্ট)
বিধি বাদ সাধে তায়, পলক পড়িয়া যায়,
বিচ্ছেদ ঘটায় হায়, নারি বারিতে। (সখি)
অঙ্গ ভঙ্গি চমৎকার, কে হেন দেখেছে কার,
স্থান নাহি তুলনার, বসুমতিতে। (সখি)
রূপের মাধুরী হায়, চোঁয়ায়ে পড়িছে গায়,
বসনে বেধেছে তায়, ক্ষীণ কটিতে।
কটাক্ষে যখন চায়, শরীর চমকি যায়,
প্রাণ ইতি উতি ধায়, বা'র হইতে।
যথায় গৌরাঙ্গ রায়, উড়িয়া যাইতে চায়,
যদি সে পড়িয়া পায় পদ সেবিতে। (সখি)
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে জাগে, কিছুই না ভাল লাগে,
ছুটে যাই অনুরাগে, ভাগীরথীতে।
গোরা দেখি দূরে থেকে, পড়ুয়া বসেছে ঢেকে,
হাসিভরা মুখ দেখে, নারি ফিরিতে। (সখি)
হয়েছি তো মাতোয়ারা, জ্ঞানহারা দিশেহারা,
ভবন বন কি কারা, পার বলিতে ?
তা যদি হইয়া থাকে, থাকিব কাহার পাকে,
বল কি সে এ বিপাকে, তরি ত্বরিতে। (সখি)
গোরা ধ্যান গোরা জ্ঞান, গোরা সে প্রাণের প্রাণ,
গোরা গুণ করি গান, দিশি নিশিতে।
গোরা মোর চিতচোরা, প্রাণ করে গোরা গোরা,
গোরা রসে তনু ভোরা, নারি বুঝিতে।
ভেবে দেখিলাম ভাই, গোরা বিনা গতি নাই,
গোরাই আশ্রয় ঠাঁই, এ পৃথিবীতে।
কি আর করিবে লাজ, মাথায় পড়ুক বাজ,
চল যাই রসরাজ-পদ পূজিতে।
দরশ পরশ আশা, অঙ্গ গন্ধ লোভী নাসা,

শ্রবণ অমিয় ভাষা, চায় শুনিতে।
এ সাধ পূরিবে কবে, অসম্ভব কি সম্ভবে,
গৌরাঙ্গের কৃপা হবে, দাসী রক্ষিতে।
লোকে যদি কথা কয়, মোর মনে হেন লয়,
যেন সেই রসময় গুণ গণিতে।
মিলিয়াছে এক স্থানে, গুণ গণে নানা তানে,
আমার প্রাণকে টানে, তাহে মিশিতে।

শ্রীহীরালাল রক্ষিত।

খেমটা।

আসিবার কালে হায়, দেখে এলে শ্যামরায়, কহিতে বচন নাহি সরে।
কণক পুত্তলী রাধা, হয়ে তব প্রেমে বাধা, এবে তব বিরহেতে মরে॥
কালিন্দীর তীরে হরি, পড়িয়ে আছে কিশোরি, শ্বাস নাহি বহিছে নাসায়।
দৃষ্টি শূন্য নেত্রদ্বয়, ঝর ঝর বারি বয়, রাধা বুঝি নাহিক রাধায়॥
যত সব সখী কুল, কেঁদে সবে আকুল, কালিন্দীকূল ব্যাকুল করিছে।
সবার নয়নে জল, রাধিকার অন্তর্জ্জল, কালজলে রাধার গা ভাসিছে॥
শুনহে নিঠুর হরি, আর না কহিতে পারি, কহিতে পরাণ ফেটে যায়॥
বল বল দয়া করি, একবার ব্রজপুরী, শরৎ বলে এসো শ্যামরায়॥

ঝাপ।

শুন শঠ নটরাজ, কুব্জা হৃদি বিহারি, শুন শুন শুন সমাচার।
সোণার প্রতিমা রাধা, বিরহ-বিষে কাতরা, পড়ে ধনী যেন শবাকার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, সঘনে ধনী ফুকারে, অহরহ বহে বারি চক্ষে।
ধূলাতে ধূসরা কিবা, কোমল তনু কিশোরী, করাঘাত করে সদা বক্ষে।
তমাল তরু হেরই, দুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গন আশে ধনী ধায়।
তমাল নিকটে যাই, ভরম যবে ঘুচাই, অমনি ধনী ভূমেতে লুটায়॥
নবীন নীল মেঘে হেরি, জানি না কি ভাবয়ে, চেয়ে থাকে আকাশের পানে।
শিখি নীলপুচ্ছ হেরি এক দিঠি চাহয়ে, পলক না পড়য়ে নয়নে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী

ঝুলন যাত্রা।

কামোদ।

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর।

সুরধুনি তীর, গদাধর সঙ্গহি, চাঁদ রজনী উজোর॥ ধ্রু॥
শাঙন মাস, গগনে ঘন গরজন, দাপীত দামিনী মান।
বরিখত বারি, পবন মৃদু মন্দহি, গঙ্গা তরঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ, রচিতহি দোলা, খচিত কুসুম-চয় দাম।
বট তরু ডালে, ডোর করি বন্ধন, মালতি গুচ্ছ সুঠাম॥
বৈঠল গৌর, বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন-রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরি দৌপাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ, পুরব রস গাওত, সংকীর্ত্তন সুখরঙ্গ।
নিত্যানন্দ, শান্তিপুর-নায়ক, হরিদাস শ্রীবাসাদি সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম, সঞ্জয় আদি বরিখত, কুঙ্কুম চন্দন ফুল॥
উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল॥ ১॥

নবঘন কানন শোহন কুঞ্জ। বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ বনি অপরূপ রতন হিন্দোল। তাপর বৈঠল যুগল কিশোর॥
ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝকোর। পীরত জানি ধনি করতহিঁ কোর॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥ ২॥

মায়ূর।

বিপিন বিহার, করত নন্দ নন্দন, সুবদনী ধনি করি সঙ্গ।
সকল কলাবতী, দুহুঁ প্রেম আরতি, মনমাহা উপজল রঙ্গ॥
রতনহি দোলাপর, বৈঠল দুহুঁ জন, সখীগণ দেওত ঝাকারি।
গগনহি মগন, সঘন রজনীকর, আনন্দে করত নেহারি॥

দেখ দেখ অপরূপ ছাঁদে।

মদনমোহন হেরি, মাতল মনসিজ, কানু নেহারে মুখচান্দে॥ ধ্রু॥
বারিদ গরজি, গরজি ঘন ঘেরল, বিন্দু বিন্দু করি পাত।
কহ শিবরাম, মলয়াচল দুহুঁপর, মৃদু মৃদু করতহিঁ বাত॥ ৩॥

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর। নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন ডোর॥
ললিতা বিশাখা সখি ঝুলাওত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে॥
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর। রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরল চৌ ওর॥
বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা। দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া। সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া॥
বিগলিত দুকুল উদিত স্বেদবিন্দু। অমিয়া ঝরয়ে হেন দুহুঁ মুখইন্দু॥
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম। চামর বীজন লেই করয়ে সেবন॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে। রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে। সখী সঙ্গে দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে॥

৪॥

দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম।

বিবিধ যন্ত্র, সুমেলি সুস্বর, তান মান সুঠাম॥ ধ্রু॥
আষাঢ় গত পুন, মাহ শাঙন, সুখদ যমুনা তীর।
চান্দ-রজনী, সুখময় সুখোদয়, মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্লিত তরুবর, গগনে গরজে গভীর॥
ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত, বিন্দু বরিখত নীর॥
তহিঁ কলপদ্রুম, তল ছায় সুশীতল, রচিত রতন হিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছু পর, গোরী শ্যামর, ঝুলয়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু, দোলয়ে দুহুঁ তনু, অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম-নীল, কমল বিকশিত, স্বেদবিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই, বীজন বীজই, কর্পূর তাম্বূল যোগায়।
সুরট মেঘ, মল্লার গাওত, মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুম চয়বর, হার নটকত, ভ্রমর গুণ গুণ বোল।
হংস শিখি সারস, সুস্বর শবদিত, দাহুরী ঘন ঘন রোল॥
দুহুঁ ভালে চন্দন, চাঁদ চমকিত, তিলক রচিত কপোল॥
চঞ্চল মুকুট, সুচারু চন্দ্রিক, পীঠপর বেণী দোল॥
দুহুঁ শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝলমল, হৃদয়ে শশি মণি হার।
ঝলকে আভরণ, ঝঙ্কৃত ঝন ঝন, ঝুকিত লন বিহার॥

কোই চন্দন ঘর্ষণ, সুগন্ধি ছিরকত, শ্যাম গৌরী অঙ্গ হেরি।
সখী ভাস ইঙ্গিতহি, দাস উদ্ধব, করত কুসুম ঢেরি ॥ ৫ ॥

ধানশ্রী।

ঝুলনা হইতে, নামিলা তুরিতে, রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে, রতন মন্দির মাঝ ॥
সুচারু লেই, বীজন বীজই, সেবা পরায়ণ সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছাঞা দেখি
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুহুঁ সনমুখে।
সখীগণ সঙ্গে, কতহুঁ কৌতুকে, ভোজন করল সুখে ॥
তাম্বূল সাজায়া, কোন সখী লৈয়া, দুহুঁার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥
কুসুম তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকাশ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম ॥
দেখি সখীগণ, কতহুঁ যতনে, শুতাঅল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণবে যায় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ সেবক—শ্রীদোলগোবিন্দ রায়। দক্ষিণখণ্ড।

—:***:—

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ।

১

গভীর গর্জ্জনে কাঁপাইয়া ধরা। উঠিল সে ধ্বনি জগ মনোহরা ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ খোল করতাল। সিঙ্গা ভেরী বর সুন্দর রসাল ॥
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে। শ্রীগৌরাঙ্গ নাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
আঁধার গগনে চাঁদের উদয়। দুঃখের হৃদয় পূরিল আশায় ॥
ঐ শুন মিলি নরনারীগণ। গাইছে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ গান ॥
খুলি প্রাণ মন হয়ে মাতয়ারা। নিতাই গৌরাঙ্গ বলি নাচে তারা ॥

২

আর ভয় নাই হয়েছে সমাজ। শ্রীগৌরাঙ্গ রাজ্য হইল রে আজ ॥
মিলেছে স্বগণ শিক্ষিত সমাজ। বিএ, এমে ধারি আর মহারাজ ॥
তার্কিক নাস্তিক শিক্ষিত যুবক। পেয়েছে গৌরাঙ্গ চান্দের আলোক ॥
হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। বলে প্রভু তুমি দয়া কর মোরে ॥

শ্রীচৈতন্যের কবিত্ব। *

সহস্র দীপালোকে যেমন সূর্য্যালোকের বৃদ্ধি হয় না; অবিরল বারিধারাতেও যেমন মহাসমুদ্রের আয়তন বাড়ে না; ঝটিকা বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে যেমন হিমাদ্রির অঙ্গ পরিপুষ্টি জন্মে না; তেমনই মাদৃশ ব্যক্তির সহস্র সহস্র পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রবন্ধেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মহিমার কণামাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হিমাচল হইতে কুমারিকা এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীরবর্ত্তী যাবনীয় ভূভাগের কথা কি—সমস্ত ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি সকলের মনে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অপার মহিমার কথা অবগত নহেন এমন শিক্ষিত সম্প্রদায় আজি কালি ধরণীতলে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকলুষ নাশে পাপীর উদ্ধারজন্য যিনি অকাতরে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, এমন কি পতিত যবনকেও হরিনাম বিতরণে কৃতার্থ করিয়াছেন, কর্ম্মবদ্ধ জীবকে পবিত্র নামের মহত্ত্ব শিখাইয়া—ভক্তির সুগম পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন,—“হরের্নামৈব কেবলং” ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই—এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন, এবং যুক্তি তর্ক দ্বারা বড় বড় নাস্তিক ও কর্ম্ম-পন্থ পণ্ডিতদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বিষ্ণুর অবতারত্বে সন্দেহ করিবার কাহার কিছু নাই, যিনি কল্পনার জন্মদাতা, এবং বাগ্দেবীর বিধাতা, তাঁহার কবিত্ব-কীর্ত্তন “মেনোয়ারী” জাহাজের কাপ্তেনর পক্ষে সামান্য “জালি বোটের” মাঝিগিরির সুখ্যাতির ন্যায় বই আর কি বলিব! আমরা আপনারা ক্ষুদ্র আমাদিগের মহত্ত্বও তদ্রূপ, হাতমাপা শিকল লইয়া অতলস্পর্শ নীরনিধি মাপিবার চেষ্টার ন্যায় আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র মনটিকে সম্বল করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অভিপ্রায়াদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি; এবং তাঁহার অসীম শক্তি এবং অপার মহিমার যতটুকু তাহাতে কুলায় ততটুকুকেই চূড়ান্ত স্থির করিয়া স্পর্দ্ধা করি। প্রসঙ্গাধীন একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। একজন গ্রাম্য কৃষক কখন হাজার টাকা একত্র দেখে নাই, তাহার মনের ধারণা গণনায় হাজার অপেক্ষা বুঝি আর সংখ্যা নাই। সে একদিন একজন প্রতিবাসীর সহিত একজন গ্রাম্য নূতন ধনীর ধনশালিত্বের তর্ক উপস্থিত করিয়া বলিল—

* ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসের “প্রতিনিধি” পত্রে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিত এই উপাদেয় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়।

নগদ টাকা মহারাজার যত আছে, তত আর কাহার নাই। একজন প্রতিবাসী বলিল—"আমাদের নূতন ধনীর টাকা অনেক, মহারাজার ভূসম্পত্তি বেশী হইতে পারে, কিন্তু নগদ টাকা নূতন ধনীর অনেক।" কৃষক একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"তাও কি হয়—মহারাজা মনে করিলে একদম হাজার টাকা গনিয়া দিতে পারেন।" চৈতন্যদেবের কবিত্বের কথা উত্থাপন করাও আমাদের পক্ষে তদ্রূপ। কিন্তু আজিকালি তাঁহার কবিত্বের কথা অনেকেই অবগত নহেন। ইহা লইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়েও সময়ে সময়ে বাগ্‌বিতণ্ডার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কতকগুলি কবিতা পুস্তক পাইয়াছি, সে গুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তদুপলক্ষে তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতাখ্যায়ক মহাশয়েরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে তাহা দেখাইলে যথেষ্ট হইবে। সুন্দর কৌমুদীময়ী যামিনীতে নভোমণ্ডলে শুক্র-তারার জ্যোতি যেরূপ স্ফূর্তি পায় না, সেই-রূপ মহাপ্রভুর জীবোদ্ধারকারিণী শক্তির নিকট তাঁহার কবিতার তদ্রূপ বিকাশ পায় না। এজন্যই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি আবার কোন্ কালে কবি ছিলেন?

চৈতন্যপ্রাণ ভক্তগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁহারা বলিবেন, বেদ যাঁহার মুখারবিন্দবিনির্গত, তাঁহার আবার কবিত্বের পৃথক পরিচয় কি? তবে আমাদের কথা এই যে, যখন তাঁহাকে লীলার জন্য মানবীয় ধর্ম্মের সংস্রবে আসিতে হইয়াছে, তখন অপরে সকল বিষয়েই তাঁহার পরিচয় দাবী করিতে পারেন। আমাদিগের ইচ্ছা, তাঁহাদিগকে আমরা সেইরূপেই দেখাইতে চাই যে, তিনি সুন্দর কবিত্বশক্তিশালীও ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রাচীন চরিতাখ্যানকারিগণের মধ্যে মুরারি গুপ্ত তাঁহার বাল্য-সহচর, সহাধ্যায়ী এবং চিরানুগত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যের বাল্যচরিত রচনা করিয়াছেন, এবং স্বরূপ-দামোদর নামে তাঁহার অপর এক সহচর তাঁহার মধ্য ও অন্ত্য লীলা বর্ণন করিয়াছেন। ইহাও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই দুই মহাত্মার লিখিত বিবরণ এবং তাঁহার অপরাপর অনুচর ও ভক্তজনের মুখে শুনিয়া অনেকে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য-

ভাগবত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্রী নারায়ণী দেবীর গর্ভসম্ভূত এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য। ইষ্টদেবের অনুমতি ও উপদেশানুসারেই তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। বৃন্দাবন বেদব্যাসের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার প্রচুর প্রতিপত্তি। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব অত্যধিক। তাঁহার রচিত চৈতন্যলীলা গ্রন্থ যেরূপ বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, সেরূপ গ্রন্থ কেবল একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। তিনিও আপন গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে বৃন্দাবন দাসের উক্তির গুরুত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গের আদি ও মধ্য লীলা যেরূপ সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত, অন্ত্যলীলা তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। সেই অভাব পরিপূরণার্থই কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা। তাহাও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করেন নাই বৃন্দাবনস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ, উৎসাহ ও অনুরোধ প্রযুক্ত অতিবৃদ্ধ বয়সে এই গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা সম্বন্ধে বৃন্দাবন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণদাস তাহার প্রত্যেক কথাই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের অগাধ ভক্তি এবং অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি; তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভূত পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। উহার প্রত্যেক স্থানেই জ্ঞান ও ভক্তির কথা, যেখানে সেখানে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রচুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে এই দুই গ্রন্থের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ আর নাই। মহাপ্রভুর কবিত্বের পরিচয় এই দুই খানি গ্রন্থের প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন,—

আদি খণ্ডে সকল ভক্তেরে শাস্তি দিয়া।
আপনি ভ্রমেণ প্রভু মহাকবি হৈয়া॥

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বাল্যকাল হইতেই কবি। পৃথিবীর যত বড় বড় কবির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের এই অনন্যসাধারণ শক্তির উন্মেষ প্রায়শঃ বাল্যকাল হইতেই হইয়া থাকে। পুষ্পের পূর্ণ বিকাশের আভাস কলিকাবস্থাতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। বর্দ্ধিষ্ণুবৃক্ষ পত্র দেখিয়াই চিনিতে পারা গিয়া থাকে। গোস্বামী প্রভুগণের নিকট শুনা যায়, মহাপ্রভুর রচিত "শ্রীগোপাল-চরিত্র" তাঁহার বাল্যকালের গ্রন্থ। যাঁহারা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপ্রভু

কর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাভববার্ত্তা বিশেষরূপ অবগত আছেন। তিনি ভারতের যাবতীয় পণ্ডিতপ্রধান স্থানে বিচারে জয়লাভ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে উপস্থিত হয়েন। মহাপ্রভু তখন অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সবে সেইমাত্র পঠদ্দশা অতিক্রম করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপে আসিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট জয়পত্রী পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন, নতুবা শাস্ত্রযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইতোমধ্যে একদিন সায়ং-কালে মহাপ্রভু শিষ্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া জাহ্নবীতীরে শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন; ঘটনাক্রমে দিগ্বিজয়ী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচিত হইলে, চৈতন্যদেব অতি বিনয়নম্র বচনে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকট গঙ্গার মহিমা বর্ণনা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। দিগ্বিজয়ী মুহূর্ত্তমধ্যে শত শ্লোকে তাহার সুন্দর বর্ণনা শুনাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু শ্লোকশতকের মধ্যে,—

মহত্ত্বং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতি নিতরাং।
যদেষা *শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা*॥
দ্বিতীয়ং শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তু র্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

এই শ্লোকটীর অর্থ শুনিবার জন্য দিগ্বিজয়ীকে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কিন্তু একে মহাপ্রভু অল্পবয়স্ক, তাহাতে আবার শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের অধ্যাপনা করেন, দেখিয়া একটু অহঙ্কার সহিত বলিলেন "অলঙ্কার শাস্ত্রে যখন তোমার জ্ঞান নাই, তখন তুমি ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না।" এই বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রভু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—বলিলেন "আপনি বুঝাইয়া দিলে কেন না বুঝিতে পারিব? যদিও আমি অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই সত্য, কিন্তু যেরূপ শুনা আছে, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, এই শ্লোকে অনেক অলঙ্কার দোষ আছে।" ইহা হইতেই উভয়ে তর্ক আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে পাঁচটী অলঙ্কার দোষ বাহির করিলেন। তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপত্তিসুভগা" এরূপ প্রয়োগ যে নিতান্ত দূষিত, তাহাই দেখাইলেন—জলেই পদ্ম জন্মিয়া থাকে, পদ্ম হইতে কখন জলের উৎপত্তি সম্ভবে না। এই বলিয়াই তিনি বলিলেন,—

অম্বুজমম্বুনি জাতং কচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বুম্।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥

বিচারের মুখে তর্ক করিতে করিতে অবলীলাক্রমে এরূপ সুললিত সদ্ভাব পূর্ণ কবিতাসৃষ্টি কি প্রকৃত কবিত্বের পরিচায়ক নহে? শুধু তাহাই নহে, তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন তাঁহার অদূরবর্ত্তী কমলপুর হইতে শ্রীমন্দিরের পতাকা দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে,—

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুনঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দং

ইত্যাদি শ্লোকাংশ বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই শ্লোকাংশই আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হয়, তিনি ঐ দুই পংক্তিই উচ্চারণ করিতে করিতে উন্মত্তবৎ নৃত্য করিয়াছিলেন, অপরার্দ্ধ বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। রূপসনাতন যখন গৌর-প্রেম প্রাপ্ত হয়েন, তখনও তাঁহার মুখাম্ভোজোচ্চারিত একটী শ্লোকের কথা শুনিতে পাই,—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥

আর একবার ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া প্রলাপচ্ছলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে,—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরোঽপি মে হরৌ।
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং॥
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ চৈ চঃ।

এই শ্লোকটি নিঃসৃত হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি কালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য যাত্রা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কমলপুরের একটী কুসুমকাননে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হয়েন। তৎকালে নিত্যানন্দকে ধ্যাননিমগ্ন দেখিয়া তিনি তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তুতি বাক্যগুলি উচ্চারণ মাত্র ছন্দোবন্ধে গ্রথিত ও ভাবে ভরিয়া যাইতে লাগিল। এরূপ স্থলে কবিতাদেবী তাঁহার শ্রীমুখাগ্রবর্ত্তিনী বই আর কি বলা যাইতে পারে! এরূপ অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন আর কোথায় মিলিবে!

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উক্তি,—

> শ্লোক-ছন্দে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
> প্রদক্ষিণ করেন প্রভু প্রেমেতে পূরিয়া॥
> শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
> যে স্তুতি শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি॥

সেই স্তব আটটী শ্লোকে সম্পূর্ণ! সেই শ্লোক আটটীর নাম "নিত্যানন্দাষ্টকং," বৃন্দাবন আপন গ্রন্থে সকলগুলি উদ্ধৃত করেন নাই। উহা আমাদিগের হস্তগত আছে। তাহাতেই জানিতে পারা গিয়াছে যে স্তবটী দুই একটী শ্লোকে সম্পূর্ণ নহে। উহার প্রথমে লিখিত আছে, "নিত্যানন্দাষ্টকং লিখ্যতে" এবং সমাপ্তিতে "ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভোঃ শ্রীমুখকমলবিনিঃসৃতং শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।"

তিনি "শিক্ষাষ্টকং" নামে আটটী শ্লোক লোকশিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছিলেন এবং নীলাচলে বাসকালে সর্ব্বদাই উহা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন; তাঁহার চরিতগ্রন্থে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঋষি-কল্প কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় আপন চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত যে আটটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই শিক্ষাষ্টক নামে প্রসিদ্ধ। যদিও তিনি ঐ আটটী শ্লোকই যে শিক্ষাষ্টক এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। আমাদিগের নিকট যে শিক্ষাষ্টকের প্রতিলিপি আছে, নিত্যানন্দাষ্টকং যে হস্তে লিখিত, ইহাও সেই হস্তে লিখিত এবং আরম্ভ ও শেষ একই প্রকার। কেবল নিত্যানন্দাষ্টকং" স্থলে "শিক্ষাষ্টকং" এইমাত্র প্রভেদ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল বাসকালে অধিকাংশ সময় কাব্যরসাস্বাদনে অতিবাহিত করিতেন। (১১) মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখনই তাহা ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিয়া পারিষদ ও অনুচরগণকে শুনাইতেন, এবং তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমাবেশে মোহিত হইতেন। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরই এই সকল শ্লোকের প্রধান শ্রোতা ছিলেন। বোধহয়, এই সময়েই শ্রীভাগবতাষ্টকং, শ্রীকিশোরাষ্টকং, শ্রীবিশ্বমোহনাষ্টকং, শ্রীবিষ্ণুনৃত্যষ্টকং, শ্রীপ্রেমরসায়নং, শ্রীরাধারসমঞ্জরী, শ্রীজগন্নাথাষ্টকং, শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশতনাম প্রভৃতি কবিতা তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল। শেষোক্ত কবিতা দুইটী অনেক বৈষ্ণবেরই নিত্যপাঠ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কবি প্রসিদ্ধি লাভের অবতার নহেন। যদি সে উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমরা জগন্মান্য কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি কবির কাব্য নাটকাদি অপেক্ষা অধিকতর চিত্তহারী মহাকাব্যের রসাস্বাদে কৃতার্থ হইতে পারিতাম। কিন্তু প্রেমভক্তি প্রচারই তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য। শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে প্রেম ও ভক্তির জন্ম বলিয়া স্তবস্তোত্রাদির রচনারই তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্যই তাঁহার আর কোন কাব্য-নাটকাদি রচনা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

তার্কিক কবি এদেশে অতি অল্পই আছেন। কালিদাস শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কয়েক জন এই শ্রেণীর কবি। এই দুই গুণের একত্র সমাবেশে কবিতার যেরূপ সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। মহাপ্রভু ঘোরতর তার্কিক ছিলেন। সেরূপ তার্কিকতা কালিদাসের সাংখ্যচর্চ্চায় দুষ্প্রাপ্য; শ্রীহর্ষের ন্যায়শাস্ত্রপারদর্শিতায় প্রায় খুঁজিয়া মিলে না। এতদুভয়েরই দৈব বিদ্যা। তাঁহারা দৈবের অধীন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই দৈবের বিধাতা। অতএব কবিতার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য। সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য্যের পরাভবের হেতুভূত যে "মহত্ত্বং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতি নিতরাং" কবিতার সমালোচক, এবং আত্মারামশ্লোকের চতুঃষষ্টীবিধ ব্যাখ্যা-কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কবিতা যে কেমন মধুর ও কত নির্দ্দোষ কাব্যাংশে কতদূর শ্রেষ্ঠ, তাহার বর্ণনার প্রয়োজন করে না। তাঁহার কবিতার সংখ্যা অধিক না হইলেও, তিনি স্বভাবকবি, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

বৈষ্ণবের দ্বারে নিবেদন।

প্রায় দুই বৎসর হইল শ্রীপত্রিকায় একবার রোদন করিয়াছিলাম। সে রোদনে দুই মহাত্মার হৃদয় গলিয়াছিল—একজনের সাত্ত্বিক ভাবে, আর এক জনের রাজসিক ভাবে। আর আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিলাম। শ্রীহট্ট নিবাসী পরম সাধু ও পরম জ্ঞানী শ্রদ্ধাস্পদ রাজীবলোচন দাস মহাশয় এ দাসকে লিখিয়াছিলেন, "আমি আপনকার শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গীত-তরঙ্গিণীর মুদ্রণ ব্যয়ের সাহায্যার্থে ৫৲ টাকা দিতে প্রস্তুত। আদেশ করিলেই পাঠাইব। এবং গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে যথাযোগ্য মূল্যে ৫ খণ্ড গ্রহণ করিব।" আমি এই মহাত্মার লেখা অনেকবার শ্রীপত্রিকায় দেখিয়াছি; পড়িয়া কখনও হর্ষে

পুলকিত হইয়াছি, কখনও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, কখনও বা প্রগাঢ় তত্ত্বানুসন্ধান দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু ইনি কে? ইঁহার অবস্থা কি? কিছুই জানি না। কিন্তু ইনি একাকী ১৫ টাকা দিতে স্বীকৃত; ভাবিলাম সমগ্র বঙ্গদেশে কি ৩৪ জন রাজীবলোচন মিলিবে না? অবশ্যই মিলিবে এবং আমার বাসনা অতি সত্বরই পূর্ণ হইবে। ইহার পরই তাহিরপুরের রাজাবাহাদুরের রাজার মত আশ্বাস পাইলাম। তখন ভাবিলাম যদি দেশের একজন ধনকুবের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়, তখন আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? করিলেও ভিক্ষা মিলিত কি না সন্দেহ স্থল। কারণ একা রাজীবলোচন ব্যতীত আর ত কেহ একটী পয়সা দিতেও চাহেন নাই।

অতঃপর কি হইল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। আমি আমার সংগৃহীত পদাবলী মুদ্রণ জন্য আর কাহারও কাছে কিছু চাহিব না। শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা থাকিলে, অজানিত ও অতর্কিত রূপেই উহা মুদ্রিত হইবে, না থাকিলে হইবে না। আমি যখন উহা মুদ্রণ দ্বারা অর্থ প্রয়াসী নহি, তখন মুদ্রিত না হইলেই বা বিশেষ কষ্ট কি? সুতরাং বৈষ্ণব বন্ধুগণ নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার নিবেদনের কারণ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা নহে। অনেকেই আমাকে সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "আপনার সংগৃহীত পদাবলী মুদ্রণের কি হইল?" সেই জন্যই তাঁহাদের চরণে এই "নিবেদন।"

রাজাবাহাদুরের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত বন্ধুবর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট গ্রন্থখানি ১৩০৩ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রেরণ করি। উক্ত সনের ১লা ফাল্গুন তারিখের লিখিত তদীয় মতসহ গ্রন্থ খানি প্রতিপ্রেরণ করেন। অক্ষয় বাবুর মতের নকল এই:—

"বিগত চারি মাস কাল যাবত আমি রোগে শোকে মহা বিব্রত থাকায় এই উপাদেয় সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার মত প্রদানে বিলম্ব হইয়াছে। এই সংগ্রহ সম্বন্ধে মতভেদ হইতেই পারে না। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককে বলিতেই হইবে 'সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অগাধ পরিশ্রম ও অসীম যত্নের ধন পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম।' উপক্রমণিকা সম্বন্ধে ও সূচীপত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহা বিজ্ঞ সংগ্রহকারকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কিছু আমার বলিবার নাই, কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি যে শ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গীত-তরঙ্গিণীর ন্যায় সংগ্রহ গ্রন্থের প্রকাশার্থে অর্থব্যয় করা সকল অর্থশালীর অদৃষ্টে ঘটে না।"

উপরোক্ত ফাল্গুন মাসে, অক্ষয় বাবুর স্বহস্ত লিখিত মত সহ রাজাবাহাদুরকে মুদ্রণ আরম্ভ করিতে প্রথম পত্র লিখি। ভুল হইল, এখানি প্রথম পত্র নহে দ্বিতীয় পত্র। শ্রীপত্রিকায় রাজাবাহাদুরের পত্র প্রকাশিত হইলে, রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখি, উহাই আমার প্রথম পত্র। রাজা বাহাদুর প্রথম পত্রের উত্তরে কিছু না বলাতে ভাবিয়াছিলাম, তিনি কর্ত্তব্য ভাবিয়া সাত্বিক দান করেন, সুতরাং তজ্জন্য কাহারও প্রশংসা বা ধন্যবাদ চাহেন না বলিয়াই নীরব রহিলেন। দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত না করাতে মনে করিলাম, তিনি কোন প্রেসের সঙ্গে গ্রন্থ মুদ্রণের বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে।

"দিন দিন গণিতে মাস ভৈ গেল।
মাস মাস গণিতে বরষ বহি গেল।"

কিন্তু প্রতীক্ষা করিতে করিতে যখন ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তখন ১ ৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ্চ তাগিদ পাঠাইলাম। এ পত্রখানির অদৃষ্টেও যে কি ঘটিল তাহা প্রভু গৌরাঙ্গই জানেন। কোথা ১৮৯৭ অব্দের মার্চ্চ আর অদ্য কোথা ১৮৯৮ অব্দের আগষ্ট শেষ প্রায়!! আরও কি রাজ দ্বারে আশা আছে? আমি ত মনে করি পাবনার রাজ তুল্য জমিদার দ্বারে যে ফল হইয়াছে, রাজসাহীর রাজদ্বারেও সেই ফল, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি অবধি চণ্ডীদাসের "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" পদটী গাহিয়া মনকে শান্ত করি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র। ফরিদপুর।

সাধু-সঙ্গ।

"তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

অনন্তর সাধু সঙ্গের কথা বলিতেছি। সাধু-সঙ্গ হইতে সাধন শিক্ষা হয়, এবং সাধু-সঙ্গই সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। সাধু সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার হয়, সাধু সঙ্গে আমাদের ত্রিতাপ-দগ্ধ-হৃদয় শীতল হয়, এবং সাধু সঙ্গে আমাদের সংসারের বাধা-বিঘ্ন সব ছুটিয়া যায়। সাধু সঙ্গ হইতে আমরা ভাগবতের রসাস্বাদন করি, এবং সাধু সঙ্গ হইতেই আমরা রাধা-কৃষ্ণ যুগল সেবার অধিকারী হই। সাধু সঙ্গের বিষয় আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আজকাল যেরূপ সময় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সাধু সঙ্গের কথা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। অনেক জ্ঞানীলোক সাধু সঙ্গে এখন কুফল ফলিতে দেখিয়া সাধু সঙ্গের কথা একবার মনেও স্থান দেন না। বাস্তবিক সাধু-সঙ্গ আমরা ভালবাসি বলিয়া সাধু সঙ্গের শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়িয়াছে, সাধু শব্দের গুণে আজকাল সাধু সম্প্রদায় অনেক হইয়াছে। যে সাধু-সঙ্গ অনেক পুণ্য ফলেও হয় না, যে সাধু-সঙ্গ অনেক উৎকণ্ঠাতেও লাভ হয় না, যে সাধু-সঙ্গ লাভ করা বহু ভাগ্যের কথা, সেই সাধু-সঙ্গ এখন ঘাটে মাঠে পথে যেখানে সেখানে ঘটিতেছে। এখন প্রায় সকলেই সাধুর আসন গ্রহণ করিয়া শিক্ষাগুরু হইবার জন্য ব্যস্ত। সাধু সঙ্গের মধ্যে বিতিকিচ্ছি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। যেমন সংসারি-মানবগণ সংসারে মুগ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারে না, সাধুগণও তেমনই ফাক বুঝিয়া তাহাদিগকে ছায়াবাজীর পুতুলের মত নাচাইতে থাকেন। কেহ সন্ন্যাসীর সাজে আসিয়া নাচাইতেছেন, কেহ ব্রহ্মচারীর বেশে আসিয়া নাচাইতেছেন, কেহ দরবেশ, কেহ বাউল, কেহবা ভেকধারী শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের বেশে আসিয়া নাচাইতেছেন।

যে দিন আবালবৃদ্ধ সকলের হৃদয়ে সাধুত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যে দিন গৃহস্থ ব্যক্তি সাধুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—উদাসীন প্রকৃত সাধু সাজিয়াছিলেন, যে দিন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের হৃদয়, পণ্ডিত ও মূর্খের হৃদয়, রাজা ও প্রজার হৃদয়, ধনী ও দরিদ্রের হৃদয়, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ; সে দিন অনেক দিন গত হইয়াছে। এখন আর সে দিন নাই। এই দিনে যে সর্ব্বত্র সাধু ইহা বিচিত্র ! এখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ লইয়া অপ্রকট। দুই একটি ভক্ত আছেন মাত্র। এখন সকলের হৃদয় প্রায়ই শূন্য। এখন প্রকৃতি আর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ নাই, এখন ভক্তির উজ্জ্বল জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত নাই, সকলের চিত্তবিনোদনকারী সেই মূর্ত্তিমন্ত ভাবও এখন নাই। এখন যে সর্ব্বত্র সাধু, ইহা বিচিত্র নহে কে বলিবে ?

যাহাহউক সাধু সঙ্গের গৌরব চিরদিনইথাকিবে। সাধুর প্রভাব কথনই নষ্ট হইবে না। সাধু-সঙ্গ, এই কথা শাস্ত্রীয়, শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। এখনও একেবারে ভক্তের অভাব হয় নাই, এখনও দেশ একেবারে সাধু শূন্য হয় নাই। যদি অন্তঃকরণে প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হয়, যদি সাধু বলিয়া প্রকৃত প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে ভাগ্যে সাধু-সঙ্গ অবশ্যই লাভ হয়। যদি সাধু পরীক্ষা করিতে পারা যায়, যদি অসাধুকে সাধু বলিয়া ভ্রম না জন্মে,

তাহা হইলে ভাগ্যে সাধু-সঙ্গ ঘটিতে পারে। কিম্বা যদি ঘটে, কাহারও ভাগ্যে হঠাৎ সাধু-সঙ্গ ঘটিতে পারে,—

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য কিছু প্রকাশ পাইবে বলিয়া, একজন দরবেশের সহিত একজন গৃহস্থ বৈষ্ণবের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাই প্রথমতঃ পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি। ভরসা করি কেহ দোষ লইবেন না।

একজন দরবেশ একটি প্রকৃতি সঙ্গে লইয়া গান করিয়া ভিক্ষা করিত। সঙ্গে সুন্দরী যুবতী, তাহাতে দরবেশ গানওয়ালা ভাল, আবার একটু বক্তৃতা করিবার শক্তিও ছিল, কাজেই তাহার পসার প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। দরবেশকে সকলেই ভালবাসিত, কিন্তু একজন গৃহস্থ-বৈষ্ণব তাহার সমাদর করিতেন না। এক দিন ঠিক একই সময়ে সেই গৃহস্থের বাড়ীতে, একজন ভেকধারী বৈষ্ণব আসিয়াছেন, দরবেশও উপস্থিত হইয়াছে। গৃহস্থ বৈষ্ণবকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু দরবেশকে প্রণাম করিলেন না। দরবেশ এই ব্যাপার দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিল;—বাবা! আপনার মনে এতদূর গোল কেন? আপনি কি দরবেশকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করেন না?

গৃহস্থ। কোন্ লক্ষণে দরবেশকে সাধু বলিব?

দরবেশ। দরবেশ, ভক্ত, বৈষ্ণব ও সাধু এই কয়টি একই বস্তু। দরবেশ বলিলে সাধুই বুঝায়। দরবেশকে অগ্রাহ্য করা আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে।

গৃহস্থ। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মতে কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্ত, বৈষ্ণব ও সাধু এই কয়টি এক বস্তু হইতে পারে। কিন্তু দরবেশ পৃথক। দরবেশকে সাধু না বলিয়া বরং অসাধু বলা যাইতে পারে। অসাধুকে প্রণাম করায় প্রত্যবায় আছে।

দরবেশ ভাবিয়াছিল, একটা কথা বলিয়া প্রণাম লইয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু সে এতক্ষণে বিপদে পড়িল। এক স্থানে বসিয়া তর্ক বিতর্ক করিলে সময় নষ্ট হয়, আবার না করিলেও মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। দরবেশ অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া গান করা ভিক্ষা করা বন্ধ করিল, বিচারে প্রবৃত্ত হইল। দরবেশ বলিল, "সনাতন গোস্বামী যখন চন্দ্রশেখরের বাড়ী গিয়াছিলেন, তখন

মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলেন, "দ্বারে একজন বৈষ্ণব আছে তাহাকে লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর দেখিয়া গিয়া বলেন, "প্রভু! বৈষ্ণব নহে, দরবেশ।" মহাপ্রভু পুনরায় বলেন উহাকেই লইয়া আইস। দরবেশ ও বৈষ্ণব যে এক তাহা মহাপ্রভুর কথায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। দরবেশ বলিলে বৈষ্ণবকেই বুঝায়।"

গৃহস্থ। চন্দ্রশেখর গিয়া দেখিলেন, দ্বারে বৈষ্ণব নাই, দরবেশ আছে। দরবেশ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকারী নহে. ইহাই বিবেচনা করিয়া, তিনি ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, "প্রভু! দ্বারে একজন দরবেশ আছে।" অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ সবই জানেন, তিনি বলিলেন, "উহাকেই লইয়া আইস।" দরবেশ যে বৈষ্ণব নহে, ইহা চন্দ্রশেখরের কথায় প্রকাশ পাইল। তবে মহাপ্রভুর কথার স্বতন্ত্র ভাব আছে। যেমন ব্রাহ্মণ সন্তানের যজ্ঞোপবীত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সাধারণে চিনিতে পারে না। ব্রাহ্মণের সংস্কারে দেহ গঠিত বলিয়া যিনি চিনেন, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই চিনেন। সেইরূপ সনাতনকে চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে না পারিলেও তাঁহাতে বৈষ্ণবের সংস্কার ছিল বলিয়া, অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই জানিয়াছেন, ও বৈষ্ণব বলিয়াছেন।

সনাতন অল্প দিনের জন্য কোন কারণে ছদ্মবেশে ছিলেন। তাঁহার সহিত দরবেশের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণ ভজনের জন্য তাঁহার প্রবল ঐকান্তিকতা ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল। প্রবল ঐকান্তিকতার জন্য ভ্রষ্টাচার জনিত সামান্য দোষ তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত গুরুর আশ্রয়ে আসিয়া উপযুক্ত বেশই গ্রহণ করিয়াছেন। যখন সনাতন অভদ্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়াছেন, তখন সাধারণের নিকট তিনি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সনাতন কিছু দিন দরবেশের বেশে ছিলেন বলিয়া তিনি দরবেশ সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন। দরবেশ একটি পৃথক সম্প্রদায়। চন্দ্রশেখর দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, দরবেশ আছে বৈষ্ণব নাই। চন্দ্রশেখরের কথা ও মহাপ্রভুর কথা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে দরবেশ বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষ বৈষ্ণব নহে। দরবেশের আচার-ব্যবহার-প্রণালী-পদ্ধতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি অতি জঘন্য, যাহারা তৈল, তামা ও মৎস্য ব্যবহার করে, যাহারা স্ত্রী সঙ্গ

করে ও কদর্য্য ভক্ষণ করে এবং যাহারা বৈষ্ণবের কোন আচারই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে জানে না, তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যায় না,—তাহারা অবৈষ্ণব। তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিলে প্রকারান্তরে বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয়। ভক্তি-রসে পরিপূর্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য ভক্ত, প্রেমে বিভোর হইয়া অবধূতের ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহার বাহ্য বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তথাপি তিনি বৈষ্ণব—তিনি সাধু। কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বে উপেক্ষা করিয়া বাহ্য বেশ ধারণ করে না, এবং বৈষ্ণবের কোন বিধি মানে না, তাহাদিগকে কিরূপে বৈষ্ণব বা সাধু বলিব? মুসলমানের ফকিরকেও দরবেশ বলে। কারণ দরবেশের লক্ষ্য স্থল মক্কা। সনাতন পলাইবার কালে বলিয়াছেন;—

"দরবেশ হইয়া আমি মক্কায় যাইব।"

কিন্তু এই দরবেশ সে দরবেশও নহে। ইহা দুয়ের বাহির।

দরবেশ, সনাতনের কথা বাদ দিয়া পুনরায় বলিল,—দেহের সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, দেহের উপরিস্থ বেশভূষার সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে? আমার বিবেচনায় অন্তরে ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট হইল। ভক্তিরবশ ভগবান। বেশভূষায় তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারা যায় না।

গৃহস্থ। আমি এখন প্রত্যেক কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে কষ্ট বোধ করিতেছি। তুমি যে সকল কথা তুলিতেছ, তাহার উত্তর দিয়া তোমাকে বুঝান আমার পক্ষে কঠিন।

দরবেশ। আমাকে বুঝান আপনার পক্ষে কিজন্য কঠিন হইল?

গৃহস্থ। যাঁহারা প্রকৃত সাধন ভজন করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশের অধিকারী, তাঁহাদিগকে বুঝান সহজ। কিন্তু তুমি দরবেশ, তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন, সেইজন্য তোমাকে কিছু বলিতে ভয় করিতেছি। দরবেশের যে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল কুসঙ্গ, কুভোজন, কুব্যবহার; কেবল অভিমান, কেবল মোহ, কেবল রজঃ ও কেবল তমঃ।

দরবেশ। আমি কৃষ্ণ ভজনের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছি, এবং অনেকের নিকট উপদেশও গ্রহণ করিয়াছি; কৈ কেহ ত কোন দোষ দেখাইতে পারেন নাই, বরং অনেকে স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অদ্য আমি আপনার নিকট আসিয়া বড়ই সন্দেহের মধ্যে পড়িয়াছি। যাহাহউক আপনি অল্প কথা বেশভূষার প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা সাধনের হীনতা প্রদর্শন করুন।

গৃহস্থ। তুমি বলিতেছ ভক্তি থাকিলেই হয়, কিন্তু ভক্তি কি পদার্থ তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? স্থূল দেহের বিনাশ দেখিয়া বলিতেছ, যখন দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই, তখন বেশভূষা কি আহারের সহিত কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না; কিন্তু দেহের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই সকল বুঝিতে হইলে কিরূপ শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন একবার ভাবিয়া দেখ! এক্ষণে আমি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি,— সিদ্ধভক্ত দেহযুক্ত হইলেও সিদ্ধ স্বভাব জন্য সকল সময়েই দেহ হইতে বিমুক্ত, কিন্তু জীব মাত্রেই স্থূল দেহের বিনাশে দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। মৃত্যুর দ্বারা জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ মাত্র কল্পনা করা যায়, কিন্তু তাহাতেও দেহ হইতে জীবের মুক্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না, গুণে আবদ্ধ জীব সকল সময়েই আবদ্ধ, আর গুণাতীত জীব সকল সময়েই মুক্ত।

জীব একেবারে হঠাৎ গুণাতীত হইতে পারে না। ভক্তির পূর্ণ বিকাশে গুণাতীত (অপ্রাকৃত) হইতে পারে। রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ মলিন থাকে, সেই পর্য্যন্ত ভক্তির বিকাশ হয় না। সত্ত্বগুণে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে ভক্তির বিকাশ হয়। ভক্তির বিকাশ করিতে হইলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আহার ব্যবহার বেশভূষার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে। সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক বেশভূষার দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে হয়, ভক্তির বিকাশ করিতে হয়। ভক্তি আছে বলিলেই হয় না, ভক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্তরে বাহিরে সাধন করিতে হয়। বেশভূষার প্রয়োজনীয়তা ভক্তির জন্য, স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ ভক্তির জন্য।

আহার ব্যবহার বেশ-ভূষা আপনাপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী। সাত্ত্বিক মনুষ্যের সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক বেশভূষায় প্রবৃত্তি; রাজসিক ও তামসিক মনুষ্যের রাজস ও তামস আহারাদির প্রতি প্রবৃত্তি। সকলে আপনাপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী আহারাদির দ্বারা আপনাপন প্রবৃত্তির পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই দৃশ্যমান জগৎই প্রবৃত্তির রাজ্য, এবং ইহাতে কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত ও প্রবল হওয়ার কারণই অনেক। সুতরাং ইহার মধ্যে থাকিয়া সংযম শিক্ষা করা বড় কঠিন। শুধুই সাধন, শুধুই সাবধনতা। সাধনের অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তৈল মৎস্য ব্যবহার করিয়া, অবৈধ রূপে স্ত্রী-সঙ্গ করিয়া হরি বলিলে হইবে না। ভাল ঔষধ হইলে কি হইবে? অনুপান ও পথ্য অনুকূল হওয়া চাই। কু পথ্য ও প্রতিকূল অনুপানে ঔষধের

বল নষ্ট হয়। এই সকল কথার প্রতি মনোনিবেশ করিতে না পারিয়া দরবেশ বলিল,—বোধহয়, আপনি কোন ভাল দরবেশের নিকট দরবেশী সাধনের কথা কিছু শুনেন নাই। দরবেশের অনেক কঠিন কঠিন সাধন আছে। যদি আপনি শুনিতে ইচ্ছা করেন বলিতে পারি।

গৃহস্থ। আজকাল তোমাদেরই দল বেশী। অনেক ধনী মানী পণ্ডিত লোক তোমাদের দলভুক্ত তোমাদের কিছু দেখিব না, কি শুনিব না ইচ্ছা করিলেও, আমাকে অনেক সময়ে তোমাদের বিষয় দেখিতে ও শুনিতে হইয়াছে। আর কিছু শুনিতে ইচ্ছা নাই। তবে নিতান্ত যদি বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যাহা না বলিলে নয়, এমন দুই একটি কথা বল। কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গের কথা কিছু বলিও না।

দরবেশ। প্রকৃতি-সঙ্গ ছাড়া আমাদের সাধনের অঙ্গ পূর্ণ হয় না। প্রকৃতি-সঙ্গ এই কথা আমাদের সাধনের মূলমন্ত্র স্বরূপ। প্রকৃতি সঙ্গের উপরেই আমাদের সমস্ত শাস্ত্রের ভিত্তি সংস্থাপিত। আপনি যখন সেই প্রকৃতি সঙ্গের কথা বাদ দিতে বলিলেন, তখন আর কি বলিব?

গৃহস্থ। মহাপ্রভু যাহা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, মহাপ্রভুর ভক্ত মাত্রেরই তাহা পরিত্যাজ্য। সাধনের কথায় স্ত্রী সঙ্গের কথা আলোচ্য হইতে পারে না। তোমাদের কি স্ত্রীসঙ্গ ছাড়া সাধনই নাই।

দরবেশ।. আছে, তাহাকে আমরা বৈধী ভক্তির অন্তর্গত বলিয়া থাকি।

গৃহস্থ। তোমরা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি বুঝ না। কতকগুলি হাত-গড়া পুস্তককে শাস্ত্র জ্ঞান করিয়া তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছ, তোমাদের জ্ঞান কেবল ভ্রান্তি বিজড়িত। বলিলে কি বিশ্বাস হইবে তোমাদের শাস্ত্র চুপি চুপি বৈষ্ণব শাস্ত্রের মধ্যে আসিয়া, বৈষ্ণব শাস্ত্রকে অপদস্থ করিবার যোগাড় করিয়াছে। একমাত্র তোমাদের শাস্ত্র হইতেই অনেক ভাল ভাল লোক ভ্রমে পড়িয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। তোমাদের শাস্ত্র হইতে যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা তোমাকে আর কি বলিব? তোমাদের শাস্ত্র হইতেই অনেক কুলকামিনীর কুল নষ্ট হইতেছে,—সাধু-সঙ্গ বলিয়া অনেকে অসাধুর সঙ্গে প্রাণ হারাইতেছে। এক্ষণে তোমাদের কথা মনে করিতেই আমার কষ্ট বোধ হইতেছে। আর তোমার নিকট কিছু শুনিতে চাহি না।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব এই কথা বলিয়া নীরব হইলে, দরবেশ বলিল,—আমি দেখিতেছি আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে ভজনের জন্য স্ত্রীসঙ্গের কোনই

প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, চির-কৌমার ব্রত অবলম্বন করিলে, রাধা-কৃষ্ণ রস কিরূপে জানা যাইবে? শঙ্করাচার্য্যের পরকায়া প্রবেশ এবং শঙ্করাচার্য্যের উক্তি কি মিথ্যা?

শঙ্করাচার্য্য—"শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ।
রাজ-মৃতদেহে মুই প্রবেশ কর্‌হ॥
রাণীগণ সঙ্গে রস-বিহার করিয়া।
জানিব রসের রীতি সত্য আস্বাদিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধা-কৃষ্ণ রস-তত্ত্ব জানিব অদূরে॥" শ্রীভক্তমাল।

গৃহস্থ। যে যে স্থানে প্রকৃতি সঙ্গের কথা আছে, তুমি সেই সেই স্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছ। রাখিবারই কথা। কোন্ ব্যক্তি নিজের মতকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা না করে? যাহাহউক আমি এ সম্বন্ধে কিছু উত্তর দিতেছি;—

প্রথম উত্তর। মহাপ্রভুর অনেক ভক্ত আকুমার বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তম এবং ঠাকুর নরহরি আকুমার বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বী। ইহাঁরা কি রাধা-কৃষ্ণ রস জানিতেন না? প্রাকৃত রস জীবের অস্থি মজ্জাগত। পুনঃ পুনঃ জন্মের সংস্কারে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই প্রাকৃত স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন প্রাকৃত রস জানার জন্ত প্রকৃতির সঙ্গ না করিলেও চলে, তখন অপ্রাকৃত রস জানার জন্য প্রকৃতির আশ্রয় ইহা অসম্ভব। গোপীর স্বভাব প্রকৃতির রাজ্যে মিলে না। রাধা-কৃষ্ণ রস জানার জন্য গোস্বামী শাস্ত্রানুসারে সাধন করিতে হয়।

দ্বিতীয় উত্তর। শঙ্করাচার্য্য একজন সিদ্ধ পুরুষ। অন্যের দেহে প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। তিনি কোন রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস জানিবার জন্য প্রাকৃত রস আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছেন। যোগ-শুষ্ক হৃদয়ে কোনই রস থাকে না, তাহাই দেখান কি ঐরূপ লেখার উদ্দেশ্য নহে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে এ ব্যবস্থা যোগীর পক্ষে সঙ্গত।

তৃতীয় উত্তর। ভক্তমাল গ্রন্থে ভক্ত চরিত্রই বর্ণিত আছে। ভক্তমালের লেখক সকল ভক্তের চরিত্র স্ব চক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন নাই। অনেকের চরিত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াও লিখিয়াছেন। হইতে পারে শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অসঙ্গতি দোষ-দুষিত। চরিত্র লেখক এই চরিত্র সম্বন্ধে যাহা

শুনিয়াছেন বা কোন গ্রন্থে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই সরল ভাবে লিখিয়াছেন, কোন বিচার করেন নাই।

চতুর্থ উত্তর। যাহাতে শাস্ত্র, যুক্তি এবং মহাজনের বাক্য এই তিনটের পরস্পর মিল থাকে, তাহাই ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। অথবা মহাজন প্রদর্শিত পথ নিরাপদ হইলে, তাহাই অবলম্বনীয় হয়। যদি শঙ্করাচার্য্যের বিষয় সত্যই হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি বা কার্য্য সাধকের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস। ক্রমশঃ।

শ্রীরসময়ী।

আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থে, করমাবাই, মিরাবাই, মাধবীদেবী প্রভৃতি কয়েক জন স্ত্রীভক্তের বিবরণ পড়িয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে মাধবী ও মিরাকেই "কবি" বলিয়া জানিতাম। মিরাবাই যে কবি, তাঁহার সুপ্রচারিত একটী পদেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই শ্রীপত্রিকায় আজ পর্য্যন্ত কোন লেখক সেই মধুর পদ না দেওয়ায় আমি এখানে তুলিয়া দিতেছি। এ পদটী শ্রীপত্রিকায় থাকা আমার বড় বাঞ্ছনীয়। পদ—

নিত নাহেন সে, হরি মিলে তো, জল জন্তু হোই।
ফল মূল খাকে, হরি মিলে তো, বাদুর বাঁদরাই॥
তিরণ ভোখনকে, হরি মিলে তো, বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে, হরি মিলে তো, বহুৎ রহে হেঁয় খোজা॥
দুধ পিকে, হরি মিলে তো, বহুৎ বৎস বালা।
মিরা কহে, বিন প্রিমসে, না মিলে নন্দলালা॥

মাধবীদেবীর পদ পদসমুদ্রে আছে। ঐ গ্রন্থ আমার কাছে নাই, কাজেই মাধবী রচিত পদ শ্রীপত্রিকায় দিতে পারিলাম না। মাধবীদেবী উড়িষ্যার লোক। মিরাবাইর দেশ রাজপুতানা। আজ আমরা আর একটী ভক্ত ও কবি রমণী পাইয়া পরম কৃতার্থ হইলাম। ইনি বঙ্গদেশবাসিনী। তাঁহার নাম এ প্রস্তাবের শিরোদেশে পড়ুন। ইঁহাকে লইয়া আমরা কবি ও ভক্ত স্ত্রীলোক তিনজন পাইলাম। রসময়ীও যে কবি, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার রচিত সুন্দর শিক্ষা পূর্ণ রসাল গীতি পদটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীরাগ।

তোমাতে আমাতে, যেমন পিরীতি, ভাল সে জানহ তুমি।
যেহে চয়চায়, ভাস্থর ভাওই, এমতি থাকিব আমি॥
আসিবা যাইবা, দূরেতে থাকিবা না চাবে আমার পানে।
বড়ই বিষম, গুরু দুরজন, দেখিলে মরয়ে প্রাণে॥
তুমি যদি বল, পরাণ বধূ, (তবে) কুলে বা আমার কি।
ইঙ্গিত পাইলে, সব সমাধিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি দি॥
এ দুঃখ চাহিতে, এ দুঃখ বড়, কহি কেহ নাহি দোষী।
গোপত পিরীতি, রাখিতে যুকতি, কহে রসময়ী দাসী॥

(পদকল্পতরু তৃতীয় শাখা, ৮ম পল্লব উভয়ানুরাগ ১৪১ সংখ্যক পদ।)

শ্রীরাজীবলোচন দাস।

চূড়াধারীর মিমাংসাপত্র বা দলিল।

প্রায় ২৯।৩০ বৎসর হইল ৮ বৃন্দাবনধাম-স্থিত মাধবাচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে বৃন্দাবনদাস বৈরাগী নামক এক ব্যক্তি একটী উৎসব করেন। সেই সময় শৃঙ্গারবটের প্রভুদিগের সহিত শ্রীধামস্থ অন্যান্য প্রভুদিগের কোন একটী সামাজিক বিষয় লইয়া মনোমালিন্য ঘটে তদবস্থায় সমস্ত দেবালয়ের অধ্যক্ষ ও সমস্ত প্রভুপাদগণ সেই উৎসবে সমাগত হযেন, কেবল শৃঙ্গারবটের প্রভুপাদগণ আসেন নাই। তাহাতে তাঁহাদের সহিত কিছু কথান্তর হয়, তৎকালে অধিকারিমহাশয়গণের কেহ শ্রীধামে ছিলেন না। এই সুযোগে উক্ত অধিকারিমহাশয়গণ শৃঙ্গারবটের প্রভুপাদগণের সহায়তা করিয়া বৈরনির্য্যাতনে সচেষ্ট হন, ও প্রচার করেন যে, চান্দরা যশোদলের গোস্বামিগণ চূড়াধারী ও গৌড়মণ্ডলের প্রভুপাদগণের সহিত চলাচল নাই। এইরূপে মিথ্যাবাদ উত্থাপিত হইলে শ্রীধামস্থিত শৃঙ্গারবটের প্রভুগণ সমস্ত প্রভুপাদগণকে মাধবাচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে উৎসবাদিতে যাইতে নিষেধ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীধামস্থ সমস্ত প্রভুপাদগণ একত্রিত হইয়া শত্রু কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যাপবাদের বিষয় অনুসন্ধান করেন। তাহাতে সাব্যস্ত হয় যে, মুর্শিদাবাদের অধীন জঙ্গীপুরের নিকট বাজীতপুরে চূড়াধারীর গদী আছে। তাঁহারা শূদ্র জাতি, তাঁহাদের প্রথমে যিনি যখন মহান্ত হন তখন তিনি

চূড়া বান্ধিয়া পঙ্গীতে বসেন। চান্দোরা যশোদলের গোস্বামিগণ চূড়াধারী নহেন, তাহা কেবল ঈর্ষা বশতঃ শত্রুগণকর্ত্তৃক মিথ্যাপবাদ মাত্র। এবং গোকুলমণ্ডলের প্রভুপাদগণের সহিত পূর্ব্বাপর যাত্রা মহোৎসবাদিতে সঙ্গত পঙ্গতে চলাচল আছে। ইহাও অবধারিত হয় যে, চান্দোরা যশোদলের গোস্বামিগণ মহাপ্রভুর শাখা, মাধবাচার্য্য সন্তান, গোস্বামীরূপে পূর্ব্ব মহাজন হইতে বিখ্যাত আছেন, এবং শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে মাধবাচার্য্য-পরিবাররূপে খ্যাত হইয়া আসিতেছেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃতের ১০ম পরিচ্ছেদে শাখা বর্ণনাতে যে মাধবাচার্য্য উল্লেখ আছে, সেই মাধবাচার্য্যই বটে। অতএব শত্রুজন কথিত অপবাদ মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া তৎকালে শৃঙ্গারবটের গোস্বামিগণের সহিত ঐক্য হইয়া সমস্ত গোস্বামিগণ এক-খানা দলিলে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাপন নাম দস্তখত করেন, ও তদবধি সামাজিক গোল মিটাইয়া একযোগে সমস্ত গোস্বামী ও দেবালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষগণ উক্ত মাধবাচার্য্যের কুঞ্জে যাত্রা মহোৎসবাদিতে সঙ্গত পঙ্গত করিতেছেন। এই সকল বিষয়ের মোটামোটী বিষয় গুলি উল্লিখিত মিমাংসা পত্রখানি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যাইবে। পাঠক মহাশয়দিগের সম্মুখে উপস্থিত কারণ উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম নিবাসী দেবালয়স্থ গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দবংশ গোস্বামী, শ্রীঅদ্বৈতবংশ গোস্বামী, আচার্য্যবংশ গোস্বামী ও সাতমহান্ত মহানুভাব চরিত বৈষ্ণববর্গেষুঃ— জ্ঞাত কারণ লিখি চান্দোড়া—যশোদল নিবাসী মহাপ্রভুর শাখা মাধবাচার্য্য মহান্তসন্তান গোস্বামিবর্গের অত্র ধামে এক কুঞ্জ আছে, ঐ কুঞ্জে যৎকালীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎ-কালীন উক্ত চান্দোড়া নিবাসী রমাকান্ত গোস্বামী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে একটী উৎসব করাতে তাবৎ গোস্বামীরা ঐ দেবালয়স্থ উৎসবে গিয়াছিলেন, তৎপর তাঁহাদিগের শিষ্য বৃন্দাবনদাসবৈরাগী ঐ কুঞ্জে একটী উৎসব করাতে উহাঁরা কতক কতক গিয়াছিলেন, কেবল ৺শৃঙ্গারবটের গোস্বামীরা যান নাই, তাহাতেই কথান্তর হইয়া চূড়াধারীরূপে মিথ্যা এক অপবাদ উত্থাপন হইয়া কিঞ্চিৎকাল পর অত্র স্থানের ৺দেবালয়ের পরিচার-কেরা কতক কতক যাইয়া পঙ্গত করিয়া বৈষ্ণব-ভোজন করান এবং বৈষ্ণবেরাও যান; কেবল শৃঙ্গারবটের কেহ যান না। কিন্তু ঐ সালে ৺ধামে কোন এক দুষ্ট ব্যক্তি প্রচার করিয়াছিল যে, উপরোক্ত গোস্বামীরা

গৌড়মণ্ডলের গোস্বামিদিগের সহিত যাত্রা মহোৎসবাদিতে চলাচল রহিত। তাহা উক্ত গৌড়মণ্ডলের গোস্বামিদের মধ্যে খড়দহের পাটের কৃষ্ণকান্ত গোস্বামী, নবকান্ত গোস্বামী, নবচৈতন্য গোস্বামী ও শান্তিপুর নিবাসী কলাবাধার রামজয় গোস্বামিরা ৺শৃঙ্গারবটের গোস্বামী দ্বয়ের নিকট লিখন দেন যে, পূর্ব্বোক্ত গোস্বামীরা আমাদের সহিত ও অন্যান্য গোস্বামীদের সহিত পূর্ব্বাপর যাত্রা মহোৎসবাদিতে সঙ্গত পঙ্গত চলাচল আছে, এই অবস্থায় চুড়াধারী রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। চূড়াধারীর, স্বতন্ত্র গদী আছে। জগীপুরের নিকটস্থ শ্যামসর্ব্বেশ্বরের মহান্তেরা চূড়াধারী তাহারা শূদ্র জাতি বটে এবং চূড়া বান্ধিয়া গদিতে বসে। উক্ত গোস্বামীদের অপবাদ মাত্র এখানে হইয়াছে। বিশেষতঃ গোস্বামীরা যে ৺মহাপ্রভুর শাখা সন্তান, তাহার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ১০ম পরিচ্ছেদের শাখা বর্ণনাতে মাধবাচার্য্য যে মহাপ্রভুর শাখা তাহা স্পষ্ট আছে। ইহাতেই উক্ত গোস্বামীরা পূর্ব্ব মহাজন হইতে শিষ্যানুশিষ্যক্রমে মাধবাচার্য্য পরিবাররূপে খ্যাত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, অতএব এই সকল হেতুবাদে ও এখনকার পত্রাদি দৃষ্ট করিয়া বোধ হইল যে, ইহাদিগের কোন দোষ নাই এবং এখানকার বৈষ্ণবেরা ও দেবালয়স্থ ব্যক্তিরা আহার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতেই উক্ত গোস্বামিদিগের সহিত মহোৎসবাদিতে ধর্ম্মসম্মত সঙ্গত পঙ্গত করিতে কোন বাধা নাই। ইহাতে সকলের বিবেচনা পূর্ব্বক উপরোক্ত হেতুবাদ অবলোকন করিয়া যাত্রা মহোৎসবাদিতে সঙ্গত পঙ্গত করার অনুমতি প্রদান করিবেন, আর এই পত্রে আপন আপন হস্তাঙ্কিত চিহ্নিত করিবেন, জ্ঞাত কারণ লিখিলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবজী, গোস্বামী শ্রীশ্যামসুন্দর দেবজী, কামদার শ্রী-কৈলাসচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউ, গোস্বামী শ্রীবেহারীলাল দেবস্য, কামদার শ্রীমাধবচরণ দাস শ্রীপ্রেমানন্দ দেবস্য। শ্রীশ্রীমদ্রাধামোহন দেবস্য। শ্রীশিবসুন্দরী গোস্বামিনী, শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘটক কামদার, শ্রীশ্রবণানন্দ গোস্বামী, বঃ বৃন্দাবন দাস কামদার, (মোহর) মোং ৺বৃন্দাবনধাম। শ্রীপ্রেমচাঁদ গোস্বামী, শ্রীপাট খড়দহ জেলা বগুড়া হাল সাং বৃন্দাবন। শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ চরণপরায়ণ মোহর গোস্বামী শ্রীকেশব দেবস্য, শ্রীশ্রী৺শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তরফ কামদার পঞ্চানন্দ শর্ম্মণঃ, শ্রীআচার্য্য বংশোদ্ভব শ্রীহরিমোহন ঠাকুরস্য ৺বৃন্দাবনধাম অত্র সম্মত। শ্রীশ্রীনিত্যা-

নন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সেবাপরায়ণ শ্রীশৃঙ্গারবট ৺বৃন্দাবনধাম (মোহর) গোস্বামী শ্রীঅখিলানন্দ দেবশর্ম্মণঃ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সন্তান গোস্বামী শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণঃ। শ্রীশ্রীসীতা-অদ্বৈত সন্তান শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী। শ্রীশ্রীসীতা অদ্বৈত প্রভু বংশোদ্ভব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ধারা শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামী, সাং ৺বৃন্দাবন ধাম, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্ম গোস্বামী, সাং মৈশাড়েড়া, অত্র সম্মত। শ্রীপতিতপাবন দাস, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীচরণদাস, শ্রীজগদানন্দ দাস, প্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব, শ্রীসাধুচরণদাস, শ্রীদীনবন্ধুদাস, শ্রীসখী-চরণদাস, শ্রীহরেকৃষ্ণদাস, ৺গোপীনাথের ঘেরা রাধাদামোদর, ৺বৃন্দাবনধাম রাধাদামোদর জিউ মন্দির, শ্রীমহাপ্রভুর কুঞ্জ আমলিতলা শ্যামসুন্দরজিউ মন্দির শ্রীমথুরদাস শ্রীবেহারীদাস।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীঠাকুরদাস দাস। মকদুমপুর, মালদহ

নন্দোৎসব।

পূরুব জনম, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌররায়।
নিজ গণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্ত্তন জনম লীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনি মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরিদাস, নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক, নীলাচল লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর, এ রাধামোহন দাসে ১॥

নিদ্রায় অচেতন রাণী কিছু নাহি জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে॥
ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে।
শুনিয়া আইলা নন্দ সূতিকা মন্দিরে॥
হরল গেয়ান দেখি আপন তনয়।
লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া উদয়॥

উপানন্দ অভিনন্দ সানন্দ নন্দন।
একে একে আসি সভে ভরিল ভবন॥
যে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে না পারে।
জগন্নাথ দাস দেখি ধৈরজ না ধরে॥ ২॥

নিশি অবশেষে, জাগি বরজেশ্বরী, হেরই বালক মুখচান্দে।
কতহুঁ উল্লাস, কহই না পারিয়ে, উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ, গোপেশ্বর আওল, শিশুমুখ হেরিয়া বিভোর॥
চলতঁহি খলত, উঠত খেণে গিরত, কাহু সব গোকুল লোকে।
আইল বন্দিগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন, করতঁহি জাত বৈদিকে।
দধি ঘৃত নবনী, হরিদ্রা তৈয়ল্ভব, ঢালত অঙ্গন মাঝে
কহ শিবরাম, দাস অব আনন্দে, নাচত গাওত ব্রজরাজে॥ ৩॥

যশোদা উঠিয়া তখন ডাকে রোহিণীরে।
পুত্র দেখসিয়া মোর ঘরের ভিতরে॥
হাত রাঙ্গা পা রাঙ্গা না দেখি বয়েসে।
যমুনার জলে যেন উৎপল ভাসে॥
গলিত বৃক্ষের পত্র করেছি ভক্ষণ।
তেকারণে হেন পুত্র দিলা নারায়ণ॥
নন্দের মন্দিরে রে বহিয়া যায় নদী।
ভাণ্ড ভাঙ্গে ননী খায় ফেলে মারে দধি॥
দধি আন দধি আন পড়ে গেল সাড়া।
তার মাঝে নাচে নন্দ দিয়া হাত নাড়া॥ ৪॥

গোকুল নগরক, নব নব রঙ্গিণী, যশোদা মন্দিরে গেল।
নবদুর্ব্বাদল, ধান্য কুসুম ফুল, বালক শিরোপরি দেল॥
যশোমতি প্রতি, কহতঁহি এক ধনি, কৈছন বালক দেখি।
কি কহব ভাগ্য, যোগ্য নহ ত্রিভুবনে, পুণ্যপুঞ্জ তুয় লেখি॥
শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন, ভাসই আনন্দ হিল্লোলে।
আপন হৃদয় সঞে, করে ধরি বালক, দেয়ল তাকর কোলে।
গদ গদ যশোমতি, কহই সকল প্রতি, মঝু নহে তুহুঁ সভাকার।
কহ যদুনন্দন, একে একে সব জন, পরশিয়া আনন্দ অপার॥ ৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের পাট।

বহুকাল হইতে একটী প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, "কলিকাতার উত্তর বরাহনগর গ্রামে ভাগবতাচার্য্যের পাট আছে"; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ কেহই অবগত ছিলেন না। ভাগবতাচার্য্য কে, তাঁহার জন্ম স্থান কোথায়, এবং বরাহনগরের কোন স্থানে তাঁহার পাট আছে, তাহার কিছুই নির্ণয় ছিল না। "শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য একজন পরম ধাম্মিক ও বৈষ্ণবকুলতিলক ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় প্রাদুর্ভূত হয়েন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন," এই মাত্র সাধারণের অবগতি ছিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন করিয়া ভক্তমন্দিরে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীপাট পাণিহাটি হইতে শ্রীপাট বরাহনগরে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে অন্ত্য খণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

কেনমতে পাণিহাটি গ্রাম ধন্য করি। আছিলেন কত দিন শ্রীগৌরাঙ্গহরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহা ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বোল বোল বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়। হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হইয়া। প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে। পুনঃ পুনঃ আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে॥
হেন যে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ। আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোক পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি। ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন। সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি। সবে করিলেন মহা হরি হরি ধ্বনি॥

"তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥" এই পয়ারটি পাঠে অনুভূত হয় যে, শ্রীভাগবতাচার্য্য একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহার নিবাস ভূমিও বরাহনগর। ভাগবতাচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীরঘুনাথ মিশ্র। ইনিই শ্রীব্রজলীলায় শ্রীশ্যাম মঞ্জরী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে মূল স্কন্ধ শাখা বর্ণনে দশম পরিচ্ছেদে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নামের উল্লেখ আছে। যথা :—

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর শারঙ্গ দাস॥

শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়ও শ্রীভাগবতাচার্য্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্ত বল্লভঃ॥

শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাট শ্রীবৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান পুণ্যভূমি, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে শ্রীবৈষ্ণবগণ মাঘী-পূর্ণিমার দিবস শ্রীপাট বরাহনগরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সমাধি দর্শন ও সংকীর্ত্তনাদি করিতেন। মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীভাগবতাচার্য্যের তিরোভাব ইহা শ্রীবৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিনের তালিকা মধ্যে সংযোজিত হওয়া আবশ্যক।

কালক্রমে কলিকাতা ইংরাজদিগের বাস ও বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল, নানা ব্যবসায়ী ও পণ্যজীবিগণ চতুর্দ্দিক হইতে পণ্য দ্রব্য সকল লইয়া তথায় আসিতে লাগিল। এই সময়ে সওদাগরগণ নৌকাযোগে ভাগীরথীর উপর দিয়া কালনা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে যাতায়াত করিত। ঐ সকল ব্যবসায়িদিগকে যাতায়াতকালীন উত্তর বালিগ্রাম হইতে দক্ষিণ ঘুষড়ী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র ট্যাক ঘুরিয়া যাইতে হইত। ঐ ট্যাকের মধ্যভাগে বরাহনগর গ্রাম। বরাহনগর ঐ সময়ে বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও স্থানে স্থানে কতকগুলি ইতর লোক ও তন্তুবায়ের বাস ছিল। তস্করেরা সুবিধা বুঝিয়া বাণিজ্যপোতাপহরণ মানসে ঐ স্থানে আসিয়া আশ্রয় করিতে লাগিল; সুতরাং বরাহনগর শীঘ্র একটি বোম্বেটীয়ার আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঐ স্থানে রঘু প্রভৃতি কতকগুলি বিখ্যাতনামা ডাকাইতের প্রধান আড্ডা ছিল। ইয়ুরোপীয় ও অন্যান্য সওদাগরগণ বরাহনগরের নিকট দিয়া যাইবার সময় অতি সতর্কে ও সাবধানে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরী বোম্বেটীয়া দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইত।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটের নিকট একটী পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণী 'ঘি-পুকুর' নামে খ্যাত। কথিত আছে, কোন সময়ে বোম্বেটীয়ারা একখানি ঘৃতপূর্ণ সওদাগরী নৌকা লুণ্ঠন করিয়া ঘৃতপূর্ণ মট্‌কী সকল নৌকা হইতে অপহরণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে ঐ পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া লুকায়িত রাখে।

ঐ সকল মট্‌কী জলে মগ্ন থাকায় ক্রমে আর্দ্র হইয়া শিথিলমুখ হওয়ায় প্রভাতে মট্‌কীস্থ সমস্ত ঘৃত জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে এবং সমস্ত পুষ্করিণীতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঐ সময় হইতে ঐ পুষ্করিণীটী 'ঘি-পুকুর' নামে অভিহিতা হয়। একে মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে ও বর্গির হাঙ্গামায় জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত এবং সদা সশঙ্কিত, তাহাতে আবার তস্কর ও ডাকাইতের ভয়; সুতরাং কেহই বরাহনগরের সন্নিকট স্থানে যাইতে সাহস করিত না। শ্রীবৈষ্ণবগণও শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের পাট সন্দর্শনে আর সাহসী হইলেন না। ক্রমে ঐ পাট বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না, সমস্তই লোপ হইল। "উত্তর বরাহনগরস্থ 'ঘি-পুকুরের' পূর্ব্ব পার্শ্বে ভাগবতাচার্য্যের পাট ছিল" এই কিম্বদন্তী মাত্র রহিল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, ক্রমে ইংরেজদিগের রাজ্য ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হওয়াতে বর্গির হাঙ্গামা এবং চোর ডাকাইতের দৌরাত্ম্য হ্রাস হইতে লাগিল। বরাহনগরের অনেকগুলি ডাকাইত ধরা পড়িয়া ইংরেজদিগের কারাগারে বদ্ধ হইল; কিন্তু তথাপি বরাহনগর দুষ্ট ও অসৎ লোকের একটি আবাস স্থান হইয়া রহিল; কারণ বরাহনগর তখন ইংরেজদিগের শাসনভুক্ত হয় নাই, ওলন্দাজদিগের অধীনে ছিল। তাঁহারা বাণিজ্যের জন্যই বরাহনগরের সমস্ত গ্রামটি অধিকার করিয়া বাস করিতেন, বাণিজ্যই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রজাশাসনে তত মনোযোগ ছিল না। বরাহনগরের দক্ষিণভাগে ভাগীরথীর তীরে ওলন্দাজদিগের অনেকগুলি তুলার কুঠী ছিল বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত ঐ স্থান 'কুঠীঘাটা' বলিয়া খ্যাত। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে যে ইংরেজদিগের রাজদণ্ড ভয়ে দুষ্ট লোক সকল ফরাসীদিগের রাজ্য ফরাসডাঙ্গায় পলায়ন পূর্ব্বক তথায় বাস করিত; তখনও সেইরূপ দুষ্কর্ম্মা লোকেরা বরাহনগরে আসিয়া বাস করিত। পরে উহা ইংরেজদিগের রাজ্যভুক্ত হইয়া অনেক দুষ্ট লোক শাসিত হইলে ঐ স্থান এক প্রকার শান্তিময় হয়। অনন্তর নানাস্থান হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ তথায় আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের পাটের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন মাত্র পাইলেন না।

প্রায় ১২৫ বৎসর হইল, শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ২৮৮ বৎসরের কিছু পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, একদা রাত্রিকালে কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার নিবাসী পরমভাগবত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং পরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুই আঢ্য

ব্যক্তিকে এক কালীন স্বপ্ন হয় যে, "বরাহনগরে ঘি-পুকুরের পূর্ব্ব পার্শ্বে ভাগবতাচার্য্যের পাট আছে, তথায় যে স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে সর্প বহির্গত হইবে, সেই স্থান ভাগবতাচার্য্যের সমাধি বলিয়া জানিবে। আর তথায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক আগামী মাঘীপূর্ণিমার দিবস হইতে মহোৎসবাদি করিবে।" তাঁহার স্বপ্নের আদেশানুসারে ঘি-পুকুরের পূর্ব্ব পার্শ্বের ভূমি সকল দয়ারাম পাল নামক এক তেলির নিকট ক্রয় করিয়া লোক দ্বারা স্থানে স্থানে খনন করাইতে লাগিলেন অনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিবার কালে তথা হইতে একটী বাঁকা লাঠী, এক যোড়া খরম, এক খানি পুরাতন গ্রন্থ এবং তৎপরে অনেক গুলি বিষধর সর্প বহির্গত হওয়ায় আর খনন করা হইল না, মৃত্তিকা দ্বারা সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ভরাট করাইয়া ফেলিলেন। সেই স্থান শ্রীভাগবতাচার্য্যের সমাধি স্থান জানিয়া তদুপরি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দদেবের দারুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পশ্চাৎ পূজারী নিযুক্ত করিয়া নিত্যপূজা, বৈষ্ণব দ্বারা নিত্য সংকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি এবং শ্রীবৈষ্ণব ও অতিথি সেবাদি সম্পন্ন হইতে লাগিল।

ভাগবতাচার্য্যের পাট প্রকাশিত হইয়াছে, এই কথা প্রচার হওয়াতে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে ভক্ত-লোক সকল তথায় আসিয়া শ্রীভাগবতাচার্য্যের সমাধি স্থান ও শ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এবং তথায় মাঘী পূর্ণিমায়, অর্থাৎ মহোৎসব দিবসে, অনেক স্থান হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ সমাগত হইতে লাগিলেন।

কালীপ্রসাদ ও পরাণচন্দ্র দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা ভট্টনারায়ণের সন্তান বটব্যাল গাঁই, শ্রীপাট খড়দহের (এক্ষণে বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীগোস্বামি প্রভুপাদদিগের শিষ্য। শ্রুত আছি হরিপরায়ণ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের নিকট প্রতিদিন বৈকালে শ্রীবৈষ্ণব-সমাগম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সদালাপ হইত। শ্রীবৈষ্ণবগণ স্বস্ব আবাসে প্রত্যাগমন কালীন কেহ দুইপণ, কেহ চারিপণ কড়ির যথাযোগ্য দেযপত্র অথাৎ বরাত প্রাপ্ত হইতেন। কখন কখন চক্রবর্ত্তিমহাশয় টাকার বোরা সম্মুখে পাইলে বোরা হইতে মুটা মুটা টাকাও শ্রীবৈষ্ণবগণকে দান করিতে কাতর হইতেন না।

কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র। কৃষ্ণপ্রসাদ ও হরিপ্রসাদ; পরাণচন্দ্রের

পুত্র সন্তান ছিল না। পরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহার নিজ ভোগ্য সম্পত্তি সকল, অর্থাৎ রূপার পালকী ও সোণার আড়ানি প্রভৃতি গ্রহণ না করিয়া জয়পুর, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ স্থানে দান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি পালকী খানি ভাঙ্গিয়া জয়পুরের শ্রীশ্রী গোবিন্দজীউর সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয় এবং আড়ানি খানি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজীউকে দেওয়া হয় ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কেবল নগদ টাকা ও ভূমি সম্পত্ত্যাদি সকল গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ইংরেজী, পারসী, আরবী, অধিকন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তৎকালে, এখনকার ন্যায় বিদ্যালয়াদি না থাকায় বাগবাজার নিবাসী অনেক ভদ্র সন্তান কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নাদি করিতেন। তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থে একটী ক্ষুদ্র কুটরী প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল; ইংরেজী প্রভৃতি গ্রন্থের স্বতন্ত্র স্থান ছিল।

কৃষ্ণপ্রসাদ ও হরিপ্রসাদ দুই সহোদরেরই সংকীর্ত্তনে বড় অনুরাগ ও যোগ্যতা ছিল। উভয়েই বড় ভক্তিমান ছিলেন। ইঁহাদিগের সময়ে বরাহনগরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা যথানিয়মে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর হইতে সেবার কিছু ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে। কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির ১০। ১২ বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীগয়া ধামে গমন করেন, এবং তথা হইতে আর গৃহাশ্রমে প্রত্যাগমন করেন নাই।

কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্রের নাম ভোলানাথ এবং হরিপ্রসাদের পুত্রের নাম দামোদর। ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন। দামোদর চক্রবর্ত্তী মহাশয় জীবিত থাকিতেই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন। তাঁহার তিনটী মাত্র কন্যাসন্তান ছিল, জ্যেষ্ঠা কন্যার সন্তান সন্ততি আছে। দামোদর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যা-সন্তান ছিল, পুত্রটির নাম শ্রীনাথ, সেটি ৩। ৪ বর্ষ বয়ক্রম কালে পিতার জীবদশায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। কন্যাটীও পিতার লোকান্তর গমনের ১৪। ১৫ বৎসর পরে বিধবা ও নিঃসন্তান হইয়া কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র দৌহিত্র-সন্তান (যাহার মাতার নাম ব্রহ্মময়ী) বর্ত্তমান আছে। দামোদর চক্রবর্ত্তিমহাশয় অনেক দিবস কাশরোগে পীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার

পীড়ার সময়েই বাটীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউ এবং শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলাদি শ্রীপাট বরাহনগরে প্রেরণ করা হয়।

বাটীতেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউর নিত্যপূজাদি কার্য্য পুজারী দ্বারা সম্পন্ন হইত। ঠাকুরবাটী টী ভদ্রাসন সংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিতা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজীউর স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, হিন্দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্ব গুলি যথানিয়মে নির্ব্বাহিত হইত। প্রধান রথ খানি পিত্তল নির্ম্মিত ও দেখিতে অতি সুন্দর ছিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি শ্রীপাট বরাহনগরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। দুর্দ্দৈবক্রমে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ও যুবতী কন্যা অকালে কাল মুখে পতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ শোকার্ত্ত হইয়া ভাবিলেন যে, দেব-সেবায় কোন অজ্ঞাত অপরাধ হইয়া থাকিবে, যদ্দ্বারা তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; অতএব এক্ষণে দেবালয় পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া তিনি দামোদর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর বনহুগলীতে গিয়া বাস করেন।

এই অবসরে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা হরগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে কোন অভিপ্রায়েই হউক শ্রীস্বরূপদাস মহান্ত নামক এক জন মাধ্বী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করেন। এই মহান্ত রাগ-দ্বেষহীন, দেব-সেবায় রত ও নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক দিন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবায় কালাতিপাত করেন। পরে এক দিবস হঠাৎ তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় তাঁহার চেলা শ্রীনিবাস মহান্ত সেই দেব-সেবা ও দেবত্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত হয়েন। শুনিয়াছি লোকে বাগবাজার নিবাসী চক্রবর্ত্তিগোষ্ঠীর কেহ জীবিত নাই ভাবিয়া দেবত্রের অধিকাংশ অপহরণ করিয়াছে। তজ্জন্য মহান্ত জীউকে মামলা মোকর্দ্দমাও করিতে হইয়াছিল। পরে দেবত্রের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দুই দিনের সেবাও চলিতে পারিত না। মহান্ত ভিক্ষা ও বাগানের ফলাদি বিক্রয় দ্বারা সেবা নির্ব্বাহ করিতেন।

যখন শ্রীনিবাস মহান্ত দেহত্যাগ করেন নাই, তখন আমি একবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তখন শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় দেখিয়াছিলাম। গৃহ সকল ও সমাধি স্থান ভগ্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং অনেক দিবস হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গরাগাদি

না হওয়ায় ও সেবার পারিপাট্য না থাকায় বর্ণ ও শ্রীমুখমণ্ডল মলিন-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আমার শরীর বড় অপটু হওয়ায় আর আমি দর্শন করিতে যাইতে পারি নাই। আপাততঃ সেবাদি কার্য্য কাহা দ্বারা কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে কিছুই বলিতে পারি না। যাহাহউক, এক্ষণে শ্রীভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের পাটে মাঘা পূর্ণিমায় পুনরায় যাহাতে মহোৎসবাদি হয় সে বিষয়ে সচেষ্টিত হউন। ইহাই এ অকিঞ্চনের বিনয়ান্বিতা প্রার্থনা।

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১০ই ভাদ্র শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী দিবসে বৈষ্ণব-সমাজের উজ্জ্বল-রত্নস্বরূপ পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বৈষ্ণব-সমাজ আঁধার করিয়া নিত্য-ধামে গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি দারুণ শ্বাস রোগ ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও তিনি তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গকে বিস্মৃত হন নাই এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি গৌরগুণ-নামে বিভোর হইয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বজন পরিচিত তাঁহার পরিচয় আমরা আর নূতন করিয়া কি দিব? তবে ভগবদ্ভক্ত জনের গুণ-কীর্ত্তন করিলেও মন পবিত্র হয় এবং শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গত প্রিয়জনের বিষয় আলোচনা করি-লেও তৃপ্তি লাভ হয়, তাই আমরা সেই নিত্যধাম-গত ভক্তিনিধি মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় দ্বাদশগোপালের অন্তর্গত সুবাহু নামক গোপাল শ্রীগৌ-রাঙ্গলীলায় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নামে অভিহিত। উদ্ধারণের পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, ও মাতার নাম ভদ্রাবতী। এই শ্রীউদ্ধারণ তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনিবাস দত্তকে গৃহে রাখিয়া অসার-সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রের চরণে শরণাগত হন। ভক্তিনিধি মহাশয় এই শ্রীনিবাস দত্তের বংশসম্ভূত বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন উদ্ধারণের আদিপুরুষ ভবেশ দত্ত, তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত হইতে উদ্ধারণ দত্ত পর্য্যন্ত নয় পুরুষ গত হইয়াছিল। আর ঐ ভবেশ দত্ত হইতে ভক্তিনিধি মহাশয় একুশ পুরুষ, সুতরাং শ্রীউদ্ধারণ দত্ত হইতে ভক্তিনিধি মহাশয় অধস্তন

এগার পুরুষ ছিলেন। আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশাবলী আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের বংশেও বর্ত্তমানকালে দশম বা একাদশ পুরুষ চলিতেছে।

দত্ত মহাশয়ের আদি বাসস্থান সপ্তগ্রাম বা হুগলী প্রদেশে হইলেও তিনি হুগলী জেলার পশ্চিমপ্রান্ত বদনগঞ্জ নামক গ্রামে তাঁহার মাতামহ আশ্রয়ে বাস করিতেন তাঁহার মাতামহ মহাশয় পরম ভাগবত ছিলেন। দত্তমহাশয়ের মাতামহ-গৃহে বিষ্ণুপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বহুসংখ্যক প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল, সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই অদ্যাবধি মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থরাজির মধ্যে পদসমুদ্র নামক একখানি সুবৃহৎ পঞ্চদশ সহস্র পদ সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, উহা তন্মুদ্রিত করিবার জন্য ভক্তিনিধি মহাশয় বিশেষ রূপে যত্ন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তবে যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় ত কোন না কোন ধনবান্ গৌরভক্ত ব্যক্তি দত্ত মহাশয়ের সেই সৎ আশা পূর্ণ করিয়া দবেন।

বিগত ৪০৪ গৌরাব্দে যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্ত্র ও পূজা লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে মহা কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে দত্ত মহাশয় শ্রীগৌর মন্ত্রের ও পূজার অনুকূলে নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া দেনুর নিবাসী কেশব ভারতীর বংশীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় দত্ত মহাশয়কে ভক্তিনিধি উপাধি প্রদান করেন। ভক্তিনিধি মহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় অশিতি বর্ষ হইয়াছিল। তিনি রুগ্ন অবস্থায় শয্যায় পতিত হইয়াও বিগত চৈত্র মাসের শ্রীপত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেই প্রবন্ধই তাঁহার শেষ লেখা, ইহা তিনি স্বয়ংই তাহাতে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ভক্তিনিধি মহাশয় বৈষ্ণবেতিহাস শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাকে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেই মুখে মুখে প্রমাণের সহিত তাহার উত্তর দিতে পারিতেন। অধিক কি দত্ত মহাশয়ের মত বহুদর্শী ভক্ত পণ্ডিত বিরল প্রচার।

পরিশেষে আমরা শ্রীগৌরভক্তগণ সমীপে প্রার্থনা করি যে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে ভক্তিনিধি মহাশয়-নিত্য গৌরলীলায় প্রবেশ পূর্ব্বক গৌর-রস আস্বাদনে নিযুক্ত থাকুন।

প্রয়াণ।

(১)

কি ! কি ! কি ! দারুণ বার্ত্তা শুনিনু হঠাৎ ;
আকাশ ভাঙ্গিয়া শীরে পড়ে অকস্মাৎ।
শরীর অবশ হ'ল, এ চিত চঞ্চল ভেল,
যথার্থই বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত।

(২)

স্থাবর জঙ্গম আদি সুস্থির সবে ;
নিঃশবদ অচঞ্চল সকলই এ ভবে।
বহিল সে ঝঞ্ঝাবাত, নিদারুণ অকস্মাৎ,
বিশাল ন্যগ্রোধে আহা ! ভাঙ্গিল নিরবে।

(৩)

যে তরুর ঘন স্নিগ্ধ ছায়াতলে হায় !
বসি শ্রান্ত পান্থগণ শীতলিত কায়।
নাই সেই তরুবর, নাই ছায়া স্নিগ্ধকর,
শ্রান্ত পান্থগণ আর দাঁড়াবে কোথায় ?

(৪)

ভক্তশ্রেষ্ঠ হারাধন ভক্তিনিধি হায় !
কি শুনিনু ? পত্রী-মুখে, নাই এ ধরায় !
শ্রীরাধা-অষ্টমী দিনে, ত্যজিলা বান্ধবগণে,
কথা কইতে কইতে মরি ! লইলা বিদায় !

(৫)

আর না শুনিব তাঁর মধুর বচন !
সুধামাখা রসময় প্রীতি সম্বোধন।
এত দয়া দীন জনে, আত্মীয়তা বন্ধুগণে,
হেরিব না, শুনিব না, বুঝি বা কখন !

(৬)

ভক্তিপূর্ণ তাঁর কৃত সুসন্দর্ভগণ ;
শ্রীপত্রিকা অঙ্কে আর না হবে শোভন !

(৫)

ভক্তগণ হর্ষভরে, আর না পড়িবে তারে,

আর না শুনিবে সেই সিদ্ধান্ত বচন !

(৭)

যাও, যাও, ভক্তবর ! গৌরাঙ্গ সদনে ;

তোমায় লইলা যিনি কৃপা আকর্ষণে।

ভকতবৎসল গোরা, তুমি প্রেমে মাতয়ারা,

অবশ্য পেয়েছ স্থান শীতল চরণে।

(৮)

ছিড়িয়া আত্মীয়দের স্নেহের বন্ধন ;

অনিত্য হইতে নিত্যে করেছ গমন।

নাই তথা দুঃখ শোক, সদানন্দ সর্ব্বলোক,

তথা গৌর-প্রেমার্ণবে সবে নিমগন।

(৯)

পূর্ব্ব পুরুষ তব দত্ত উদ্ধারণ ;

অপর অপর যত গৌর-ভক্তগণ ;

বাসুদেব র মানন্দ, গদাই জগদানন্দ,

করিবে তোমাকে সবে কৃপা বরিষণ।

(১০)

যাও, যাও, নিত্যধামে ; যাও ভক্তবর !

সুখে উপভোগ কর গৌরাঙ্গ সুন্দর।

গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ, এক মাত্র সারধন,

বুঝেছিলে ; পাইয়াছ ;— হয়েছ কিঙ্কর।

(১১)

ধন্য সে, যে এইরূপ কাটায় জীবন ;

নামে প্রেমে মত্ত,-সদা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন

ধন্য সেই নরকুলে রাধাকৃষ্ণে যে না ভুলে ;

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি দেব হারাধন !

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ।

দুষ্কৃত-সঙ্কুল নিখিল জনাকুল কলিযুগ পাবনকারী।
সুমধুর শ্রীহরিনাম প্রচারণ কর্ম্ম শমন ভয়হারী॥
ইহ পরিপূর্ণতয়াহবতারী। ধ্রু
সুমধুর কীর্ত্তন মঞ্জুল নর্ত্তন নটন-বিনোদন ধারী॥
শ্রীশচিনন্দন গৌর মহাপ্রভুকদয়ন্তি তস্য ভবন্তু:।
নাম যশো-গুণ গান-প্রচারণ-কর্ম্মপরাঃ খলুসন্তুঃ॥
বঙ্গ-সমাজ পরম্পরয়া ভজনাস্পদ জনগণ মোদং।
যচ্ছন্তীতি জগন্তিং ভবতাং যশঃ এতু চ পরম বিনোদং॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজেঽস্মিন্নতে পাষণ্ডিনং জনং।
নাস্তি কশ্চিৎ যস্ত সভাপদ মাপ্তুং ন বাঞ্ছতে॥
এতাবতা সমাজস্য মাদৃশাং সভ্যতাস্পদে।
সমারোহে পরা প্রীতিঃ স্যাত্তদা সর্ম্মতির্ম্মতা॥

শ্রীসকলানন্দ মহান্তঠকুরস্য। দক্ষিণ খণ্ড চতুষ্পাঠী।

১

দারুণ মোহের মদে হ'য়ে মোরা নিমগন,-
দয়াময় গোরাচাঁদে হইয়াছি বিস্মরণ।
তাই গো মরম তলে, নিতি কালানল জ্বলে,
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বহে তাই অনিবার।
তাই গো জগত ভরা হেরি এত অন্ধকার॥

২

উন্নতি লাভের তরে সদা করি হাহাকার,-
উন্নতি হইবে কিসে ভাবিনা তা একবার।
একতা পরার্থ ধনে, দলিয়াছি দু চরণে,-
ছল স্বার্থ হিংসা দ্বেষ মরমে করেছে বাস।
ইথে কি উন্নতি হয় ইহাতে কি পূরে আশ?

৩

দম্ভ অহঙ্কার রাশি যাদের মরম ভরা
তাদের উনতি কোথা তা'রা ত জীবনে মরা।

গাড়ী ঘোড়া কোটাবাড়ী, গহনা বোম্বাইসাড়ী-
ইহার সঞ্চয় নহে উন্নতির হেতু হায়!
এ শুধু মোহের ঘোর কিবা মূল্য আছে তায়?

৪

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদা দারুণ জীবের তরে,
প্রেম মাখা হরিনাম যে বিলালে ঘরে ঘরে,-
সে প্রেম-দেবতা-পায়, না সঁপিলে আপনায়,-
উন্নতি বাসনা শুধু আকাশ-কুসুম প্রায়।
যে চাও উন্নতি ধর গৌরাঙ্গচাঁদের পায়॥

৫

মোদের নীরব প্রাণ মোহ-মদিরায় ভোর।
গৌরাঙ্গ-সমাজ আজ ভাঙাইছে ঘুম-ঘোর॥
কিসে নর হবে শুচি, জীবে দয়া নামে রুচি,-
গৌরাঙ্গ-সমাজ আজ সাদরে শিখাতে চায়,
কে শিখিবি মহানীতি আয় গো সে ছুটে আয়!

৬

কি মধুর কৃষ্ণ রস কত সুধা ঝরে তায়,-
কে করিবি আস্বাদন আয় গো সে ছুটে আয়!
প্রভুর কৃপায় আজ, প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ,
যত গৌর-ভক্তগণে করিবারে সম্মিলন।
আদরে সমাজ ও'ই করে সবে আবাহন।

৭

এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিছেন যেই জন,-
দাও তাঁরে ধন্যবাদ হ'য়ে এক প্রাণ মন।
তাঁহারি করুণা বলে, আবার এ ধরাতলে,
গৌরাঙ্গের পূত-প্রেম শতগুণে উছলায়।
কি মধুর পথ আহা দেখালেন মো সবায়॥

৮

যে জন সরল প্রাণে বারেক "গৌরাঙ্গ" কয়,
এক বিন্দু ছল-মলা তার বুকে নাহি রয়।

এ নাম অতুল ভাই, জগতে তুলনা নাই,
যে যেথানে আছ সবে ছুটে এস একবার।
বল 'গোরা' যাবে বুকে বহিয়া অমৃতধার।

৯

পতঙ্গ অনলে যথা ঢেলে দেয় নিজ প্রাণ,-
তথা এ সমাজে সবে কর আসি আত্মদান।
পতঙ্গ অনলে চুমে, ঘুমায় অনন্ত ঘুমে,
(কিন্তু) এ সমাজে একবার যে করিবে যোগদান,
জাগিয়া উঠিবে তার অবশ নির্জ্জীব প্রাণ।

১০

অনন্ত সুকৃতি ভরা যাঁহাদের পূত-প্রাণ,-
তাঁহাদেরি ভাগ্য হয় দিতে ইথে যোগদান।
যে বুঝে গউর তত্ত্ব সেই ত মনুষ্য সত্য,
গৌরাঙ্গ চিনাবে ব'লে সমাজ ডাকিছে আয়।
এস সবে ছুটে এস ধন্য কর আপনায়॥

১১

প্রভুর প্রেমের ছবি অঙ্কন করিয়া বুকে,-
শ্রীগৌরাঙ্গ জয় ব'লে এস এ সমাজে সুখে।
এস যত ভাই বো'ন, হয়ে এক প্রাণ মন,
প্রভুর কার্য্যেতে সবে ঢেলে দাও আপনায়
সভার উদ্দেশ্য সং তুলনা মিলে না তায়॥

২

পূরিবে হিন্দুর ইথে অনন্ত অভাবচয়,-
আবার প্রেমের স্রোত ছুটিবে জগতময়
একতা সে বরণীয়, প্রভুর একান্ত প্রিয়,
দিছিলেন আচণ্ডালে তাই পূত-প্রেম দান।
(তাই) গৌরাঙ্গ-সমাজ আজ গাহে একতার গান॥

১৩

বাঁধিতে একতা ডোরে প্রাণ মন আপনার,-
পাবে না হবে না কভু এমন সুযোগ আর।

নাম প্রেম যাহা চাবে, এ সমাজে তাই পাবে,
তাই বলি এস সবে শত বাধা পায় দলি।
জুড়াবে পরাণ পড় গোরা-প্রেম-নদে ঢলি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাকাঙ্ক্ষিণী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।
বড়াল লেন, হুগলী।

—**:**—

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের অনুষ্ঠান-পত্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, আমার প্রভুর সেবায় অনেক সময় অতিবাহিত করিবার শক্তি আছে মনে করিয়া, গৌরগত-প্রাণ আমার পরম স্নেহাস্পদ——আমাকে বারংবার শ্রীপত্রিকায় লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু রোগ শোক ইত্যাদি নানাক্লেশে শরীর ও মন এত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রভু যদি সুস্থ না করেন তবে এ দাসের দ্বারা প্রিয়াজীব কিংবা আমার গৌরাঙ্গনাগরের বিন্দুমাত্র কার্য্য হইবে কি না সন্দেহ। যাহাহউক অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে দুই চারি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিগত আষাঢ়ের শ্রীপত্রিকায় অনেক ভক্ত চূড়ামণি, প্রেমিক, পূজ্যপাদ ব্যক্তি যখন অনুষ্ঠান পত্রখানি আদ্যোপান্ত অনুমোদন করিয়াছেন, তখন এ দাসের পক্ষে অন্যথাচরণ ধৃষ্টতা হইবে জানি, কিন্তু অল্পবুদ্ধি বশতঃ প্রতি দফার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মতঅনৈক্য ঘটিয়া থাকে, তবে পূজনীয় সাধুগণ এদাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন এই আশায় দুই তিনটী দফা সম্বন্ধে এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র মত ব্যক্ত হইতেছে।

৩ দফা। বাউল, রসিকভক্ত, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি দলের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে, তাহার অনেকগুলি আমি পাঠ করিয়াছি। তাহার ভিতর সার কথা যেটুকু আছে তাহা জোড়া তালি দেওয়া মাত্র। অনেক অথবা অধিকাংশ স্থলে জোড়ামিল পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রধান একখানি গ্রন্থ কতিপয় বর্ষ গত হইল মুদ্রিত হইয়াছে, নাম বিবর্ত্তবিলাস। "অমুল্য গ্রন্থ" রক্ষা করিতে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ যেন এই সকল গ্রন্থ বৈষ্ণব জগতে বিস্তার না করেন।

৫ দফা। ৪ দফার কথা পরে বলিব। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধি-

কারী প্রভৃতির কৃষ্ণ-যাত্রার অনেক সংগীত সুমধুর বটে; কিন্তু কেবল সুমধুর বলিয়াই উহার প্রচার ও রক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে কি না এ বিষয়ে এ দাসের ঘোর সন্দেহ। যদিও আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এক ও অভেদ, তথাপি এমনও শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তের সহিত এ অধমের আলাপ হইয়াছে, যাঁহারা একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গলীলারই ভক্ত; এবং শ্রীগৌরাঙ্গই যাঁহাদের একমাত্র সর্ব্বস্বধন। গরুড়ের যেমন "পদ্ম আঁখি" শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য; হনুমানের তেমন একমাত্র উপাস্য "শ্রীরাম কমললোচন।" ইহাকে ভেদ জ্ঞান কহে না, ইহা স্ব স্ব উপাস্যের প্রতি একাগ্রতা। শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত উভয়েই বৈষ্ণব সন্দেহ নাই; কিন্তু অনুষ্ঠান পত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ স্থাপনের যে সকল হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তদিগের বিশেষত্ব রক্ষা এই সমাজ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য; তাহা যদি হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের বিশেষত্ব রক্ষাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

৪ দফা। ইহাতে যে "মহাজন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা দ্বারা এ দাসের ন্যায় অনেকের মনেই একটা বিষম খট্‌কা উঠিবে। প্রথমতঃ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" এই শাস্ত্রীয় বচনে সাধু মহাত্মারাই "মহাজন" পদ বাচ্য। কারবারে যে মূলধন বা বাণিজ্যের মাল যোগায় সে "মহাজন," তাহা লইয়া যে কারবার করে সে "খাতক," যেমন সংকীর্ত্তনের পদে আছে "সে হাটের মূল মহাজন আপনি নিত্যানন্দ।" "মহাজনী পদ" বলিতে বুঝায় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদ; সুতরাং এস্থলে "মহাজন" অর্থে বুঝা যায়, "প্রাচীন বৈষ্ণব কবি।" প্রাচীন বটে, কিন্তু কত প্রাচীন কবির পদ হইলে তাহাকে "মহাজনী" পদ বলিতে হইবে? মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবি, না তদীয় সমকালীন বৈষ্ণব কবিরাও? না তদীয় তিরোভাবের শত বর্ষ সার্দ্ধশত বর্ষ পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরাও "মহাজন পদ বাচ্য? স্বতঃই মনোমধ্যে এই সকল প্রশ্নের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত উত্তর মিলে না। কেন না, পদামৃত সমুদ্রের সংগ্রাহক ও রচয়িতা শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক পরের কবি ও গায়ক, অথচ রাধামোহন দাসের পদাবলী "মহাজনী পদ।"— রাধামোহন গোস্বামীর পদসমুদ্রের বহুকাল পরে পদকল্পতরু

গ্রন্থের সংগ্রহ সম্পন্ন হয়, অথচ সংগ্রাহক সেন মহাশয়ের রচিত পদ বা বৈষ্ণব দাসের পদাবলী "মহাজনী পদ বাচ্য।"

"শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক" রচয়িতা ও বিখ্যাত পদকর্ত্তা শ্রীবলরামদাস ঠাকুরের পদ গুলি "মহাজনী" পদ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এবং তিনি স্বয়ংও বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাজন বলিয়া নমস্য। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলরামদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ হয় নাশ॥"

আবার কবিরাজ গোস্বামীর মতে—

"বলরামদাস কৃষ্ণ-প্রেম রসাস্বাদী। নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

আমরা এই মহাজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যাহা পাইয়াছি তাহা এইঃ— সাহিত্য সম্পাদক কহেন, বলরামদাসের মাতার নাম সৌদামিনী, পিতার নাম আত্মারাম দাস, জাতিতে বৈদ্য নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রাম। ইঁহার গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাস। কোন কোন মহাত্মা বলেন ১৪৫৯ শকাব্দে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। এবং ইনি শ্রীমতী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর সমভিব্যাহারে খেতুরীর মহামেলায় গমন করিয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত বলরামদাসের পদের মধ্যে একটী আধুনিক ও জীবিত বলরাম দাসের পদাবলী মিশাইয়া যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, এ গুলি মহাজনী পদ কি না? তিনি কি ১৪৫৯ শকাব্দে জাত ও বর্ত্তমান বলরাম দাসের পদ বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন? আমার যেন বোধ হয় তিনি নিশ্চয়ই ঠকিয়া যাইবেন। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, কিন্তু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল মহাজনী পদ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া আসিতেছি। তাহা সত্ত্বেও যখন অমিয় নিমাইচরিতের প্রথম খণ্ডে বলরাম দাসের পদাবলী পাঠ করিয়া মোহিত হই, তখন ও গুলিকে অপর বলরাম দাসের পদ বলিয়া "স্মরণার্থ পুস্তকে" উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছিলাম। এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি এই দ্বিতীয় বলরাম দাস (ভ্রাতা শ্রী-শিশিরকুমারঘোষ) "মহাজন" এবং তাঁহার সুন্দর পদাবলী "মহাজনী পদ" হইবে কি না? যদি না হয় তবে কি অপরাধ? স্বয়ংই উত্তর দিতেছি, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ একার্থে 'মহাজন" হইলেও তদীয় পদাবলী "মহাজনী পদ" বলিয়া কীর্ত্তনীয়া সমাজে গৃহীত হইবে না।

যে ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া আমি উপরোক্ত উত্তরটী প্রদান করি-

লাম তাহাও বলিতেছি। প্রায় ৬ বৎসর গত হইল আমি সময়ে সময়ে মহাজনদিগের পদানুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের পদের অনুকরণ করিয়া কয়েকটী পদ রচনা করিয়া সাময়িক পত্রিকা বিশেষে প্রকাশ করি। তখন আমি পাবনায় ছিলাম। ঐ পাবনা সহরে আমার দুইটি অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব বন্ধু ছিলেন। ইহাঁদের একজন ডাক্তার ও আমার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সাময়িক পত্রিকার যে খণ্ডে মদ্রচিত একটি রূপাভিসারের পদ ছিল, উহা আমার অজ্ঞাতসারে স্বগৃহে লইয়া যান। দ্বিতীয় বৈষ্ণব বন্ধুটি জ্ঞানী, প্রেমিক, প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া। রাঢ় দেশের বড় বড় কীর্ত্তনীয়াদিগের দলে প্রায় ২৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়া এখন পাবনাতে প্রথম বৈষ্ণব বন্ধুর গৃহের নিকট একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া কালাতিপাত করেন। আমি রূপাভিসারের যে পদটির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা প্রচারের প্রায় ৬। ৭ মাস পরে ডাক্তার বন্ধুর গৃহে পাঁচ ছ'টি বন্ধু একত্র হইয়াছি। দ্বিতীয় বৈষ্ণব বন্ধুটি ৪।৫ টি উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন করিলেন। সকলেই মোহিত হইয়া কীর্ত্তন সঙ্গীত গুলির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন কহিলেন, 'মহাজনী পদ" মনোহর না হইবে ত আর সুন্দর পদার্থ আমাদের কি আছে? গায়ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে কয়েকটী কীর্ত্তন গীত হইল, সকল গুলিই কি মহাজনী পদ?" (এই সময় ইনি স্বয়ং ' চিকিৎসক বন্ধু ঈষৎ হাসিতে ছিলেন, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।) সকলের সহিত আমিও কহিলাম, "উহার সকল গুলিই মহাজনী পদ।" তখন ডাক্তার বন্ধু হাসিতে হাসিতে সাময়িক পত্রিকা খানি বাহির করিয়া সকলকে দেখাইলেন। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। (শ্রীপত্রিকার পাঠকেরা সকলেই জ্ঞানী ও ভক্ত, সুতরাং লেখকের প্রকারান্তরে আত্ম প্রশংসাকে কুভাবে গ্রহণ করিবেন না। যাঁহাতে যতটুকু গুণ থাকুক তাহা তাঁহার নিজের গৌরব করিবার সামগ্রী নহে; তাহা কেবল প্রভুরই কৃপা চিহ্ন, এবং তাঁহারই মহিমাকে জয়যুক্ত করে। যদি শ্রীপত্রিকার পাঠকগণ আদেশ করেন, তবে মদ্রচিত পদ কয়েকটী অতঃপর তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিব।) গায়ক বন্ধু বলিলেন, রূপাভিসারের পদটী মহাজনী পদের ঠিক অনুকরণ হইলেও উহা মহাজনী পদ নহে। তৎসম্বন্ধে তিনি একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন।

আমি যখন যশোহরে ছিলাম, তখন পাবনা জিলা নিবাসী শ্রীযুক্তগুরু-

প্রসাদ সেন সবজজ মহাশয় সেখানে কিছু দিন ছিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে আমি "মহাজন পদ সংগ্রহের" প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি, তাহার এক খণ্ড গুরুপ্রসাদ বাবুর হস্তে উপহার প্রদান সূত্রে আমাদিগের মধ্যে অতি পবিত্র বন্ধুতা স্থাপিত হয়। এই সময়ে প্রাচীন পদের অনুকরণে জজ বাবু পাঁচশত সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন সহস্র পদ রচিত হইলে প্রকাশ করিবেন। কয়েক মাস মধ্যে তিনি স্থানান্তরে বদলী হইয়া গেলেন, তৎপর আর কোন তত্ত্ব রাখিতাম না। পরিশেষে বহু বর্ষ পরে কীর্ত্তনীয়া বন্ধু বলিলেন, গুরুপ্রসাদ বাবু সহস্র পদ প্রকাশ করিয়া বীরভূম, কাটোয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থলের বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াদিগকে এক এক খণ্ড উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পালার মধ্যে মধ্যে ঐ সকল পদ লাগাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা একবাক্যে বলেন উহা সহস্র প্রকারে সুন্দর হইলেও পালার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, কারণ উহা মহাজনী পদ নহে।

যে সকল কথা উপরের চারিটী প্যারাগ্রাফে বলা হইল, তাহা হইতে পাওয়া গেল এই যে, শিশির বাবুর (দ্বিতীয় বলরাম দাসের), গুরুপ্রসাদ বাবুর ও আমার পদ মহাজনী পদ নহে, কারণ আমরা মহাজন (প্রাচীন পদ রচয়িতা) নহি। কিন্তু অনুষ্ঠান পত্রের ৪র্থ দফায় এখনও যাহারা পদ রচনা করেন এবং ভবিষ্যতেও "সুমধুর পদ" রচনা করিবেন, তাঁহারাও "মহাজন"। তাই বলিতেছিলাম, অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত "মহাজন" পদে অনেকের মনে এক বিষম খট্‌কা উঠিবে। ফলতঃ এ "মহাজন" পদের অর্থ করিয়া দেওয়া উচিৎ, নচেৎ লোকে বা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণ কিম্বিধ পদ রক্ষা করিবেন?

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাপ্রভুর পারিপার্শ্বিক ৺নন্দকুমার ভদ্র মহাশয়ের একটি বিখ্যাত হরিসংকীর্ত্তনের দল ছিল, আমরা ছিলাম তাঁহার দোহার। এই দলে অধিকাংশ দাদামহাশয়ের ও আমার রচিত পদ গীত হইত। কালে সে সকল পদ বিস্মৃত-গর্ভে নিহিত হইয়াছে, তবে যাহা মনে আছে, শ্রীপত্রিকার পাঠকেরা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, আশায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১)

ভাল নিতাই হাট বসালে জীব তরাইতে।

(জীব তরাইতে রে জীব তরাইতে, হা রে ও কলির জীব তরাইতে)

সে হাটের মূল মহাজন আপনি নিত্যানন্দ।
সঙ্গে মুচ্ছুদি হইল তাঁর মুরারী মুকুন্দ॥ (জীব তরাইতে)
হাটে বৈসে গৌরীদাস আছে দাঁড়ি ধৈরে।
যার যত ইচ্ছা প্রেম-ধন দিচ্ছে ওজন কৈরে॥
সংকীর্ত্তন-মদ বিকয় দোকানে দোকানে।
তাহা প্রেম-রমণী নরহরি বিলায় জনে জনে॥
হরিদাস আনিয়া সে মদ জগতে বিলাইল।
সে যে আপনি খেয়ে মাতাল হৈয়ে জগত মাতাইল॥ (জীবতরাইতে

(২)

নিতাইচাঁদ আজ প্রেম-নদীর বাঁধ ভেঙ্গেছে।
ব্রজ হইতে ঢল নামিয়াছে॥
সেই প্রেমের বন্যাতে আজি, ন'দে শান্তিপুর ভেসেছে।
ও সেই প্রেম-নদীতে হরিদাস আজ, হরিনামের নৌকা পেতেছে॥
তাতে রূপসনাতন দুজন দাঁড়ি, মনের আনন্দে দাঁড় টানিছে।
নায়ে হালি ধরে গৌর মাঝি, মধুর রসের সাড়ি গাইছে॥
সেই প্রেম-জালেতে ভক্ত-মকর, যেন মীনের মত খেলিছে।
প'ড়ে প্রেমের স্রোতে পাষণ্ডীর দল, কেবল হাবু ডুবু খাইছে॥
নদীর আগে আগে আদ বুড়া, নে'চে হুহুঙ্কার ছাড়িছে॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র। ফরিদপুর।

শ্রীসমাজের কার্য্য বিবরণ।

আমরা অতীব আহ্লাদ সহকারে গৌরভক্ত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ যে সকল বিষয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিরই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ যে যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। গৌরভক্তগণেরও নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া অনেকে আমাদিগের নিকট পাঠাইতেছেন। এই সকল ক্রমে শ্রীপত্রিকায় ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা।

কলিকাতার প্রকাশ্য স্থান সকলে বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় "শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। আপাততঃ বিডন উদ্যানে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মিত্র বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে

বক্তৃতা দিতেছেন। মিত্র মহাশয়ের বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ, যুক্তি ও ভাবপূর্ণ এবং বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। তিনি যখন ভাবের আবেগে আত্মহারা হইয়া প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন শ্রোতৃবর্গ নীরব ও নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লোকের ক্রমেই সমাগম হইতেছে। তাঁহার প্রতি প্রভুর যে কৃপা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যখন খোল করতালের বাদ্যের সহিত কীর্ত্তন করিয়া মনোহর নৃত্য করিতে থাকেন, তখন অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। তখন এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় জগত সুখের বৃন্দাবন বলিয়া বোধ হয়। যদি প্রভুর ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি দেশে বিদেশে প্রচার কার্য্যে শীঘ্রই বহির্গত হইবেন।

পুস্তিকা বিতরণ।

ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

শাখা-সমাজ।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ যে সকল বিষয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কলিকাতা ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে শাখা-সমাজ সংগঠিত হওয়া আবশ্যক, এই ভাবে শ্রীসমাজের অধিবেশনে একটী প্রস্তাব উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। আমরা আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে, ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে শাখা-সমাজ সংস্থাপন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বরিসাল পটুয়াখালি হইতে পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"আমরা এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের একটী শাখা-সমাজ গঠন করিয়াছি। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ইহাতে যোগদান করিয়াছেন ও ক্রমে করিতেছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এখানে গৌরলীলা কীর্ত্তনাদি করিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিতেছি এবং যাহাতে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গকে গ্রহণ করেন, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি। যদি প্রভুর ইচ্ছা থাকে। তবে আমরা ক্রমে তাঁহার পরিবার বৃদ্ধি করিতে পারিব।

"এখানে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিব। পটুয়াখালির তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার ঘোষ মহাশয়ের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র একটী অদ্ভুত বালক। আমরা সন্ধ্যার পর যখন কীর্ত্তন আরম্ভ করি, বালকটী তখন বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিয়া দুই বাহু তুলিয়া আমাদের সঙ্গে গান

করিতে থাকে, এবং একবারে ভাবে বিভোর হইয়া যায়। সে এই ভাবে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের সহিত কীর্ত্তন করে। সে যখন দুই বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "হরি বলে আমার গোরা নাচে" এই গান ধরিয়া দেয়, তখন অতি বড় পাষণ্ড নাস্তিকও বিগলিত হইয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা বিএ মহাশয়ের বিশেষ উদ্‌যোগে কলিকাতা হাটখোলায় একটী শাখা-সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। গত ২৮এ ভাদ্র শনিবার বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় ১নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। স্থানীয় অনেক বৈষ্ণব মহাজন ইহাতে যোগদান করেন। সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথম গৌরচন্দ্র-গীত হইবার পর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভুপাদ এক ঘণ্টা যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গ" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও অতি মধুর বক্তৃতা করেন। তাহার পর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের উদ্দেশ্যগুলি এবং শাখা-সমাজ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলকে সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্ব শেষে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে "হাটখোলা-শাখা শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ" নামক একটী সভা স্থাপিত হইল এবং বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় এই সভার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা বিএ মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার লিখিয়াছেন :—"মালঞ্চী গ্রামে কতিপয় গৌরভক্ত লইয়া একটী হরিসভা ছিল। উক্ত সভা "শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ" নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং প্রতি রবিবারে সভার কার্য্য চলিতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী অধিকারী এবং শ্রীযুক্ত বনমালী দত্ত মহাশয়গণ মন-প্রাণের সহিত রীতিমত কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা প্রচার করিতেছেন। পাবনা হরিসভার অধিনায়ক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন সাহা, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ সাহা, শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন সাহা, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা মহাশয়গণ আমাদের সহিত একতানে কার্য্য করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাঁদিগকে কৃপা করুন।

আমি সত্বর পাবনায় যাইয়া সাধারণ হরিসভায় বক্তৃতা দিব এবং সমস্ত মহাজনদিগকে আহ্বান করিয়া শ্রীসমাজ সম্বন্ধে বলিব। তৎপরে গয়েশপুর, পয়দা প্রভৃতি স্থানে যাইব ঐরূপ অনুষ্ঠান করিব।"

পত্রাদি।

শ্রীসমাজের সভ্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছেন, ইহাতে যোগদান করিবার জন্য গৌরভক্তগণ কিরূপ দীনতা দেখাইতেছেন, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত কয়েক খানি পত্র প্রকাশ করিলাম :—

শ্রীহট্ট—হবিগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দে মহাশয় লিখিয়াছেন :— "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়া হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছে। শ্রীগৌর-ভক্তমাত্রেরই এ সমাজে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি একবার মনে করিয়াছিলাম সমাজে যোগদান করি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল আমার যোগ্যতা কই,—ভুবনপাবন বৈষ্ণব মণ্ডলীর সহিত যোগদানে আমার যোগ্যতা কই,—তাই এতদিন মনের আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলাম। মাসের পর মাস যাইতেছে, সমাজ সম্বন্ধে শ্রীগৌর ভক্তগণের মতামত ও উৎসাহসূচক পত্রাদি শ্রীপত্রিকায় পাঠ করিতেছি। আজও শ্রাবণ মাসের শ্রীপত্রিকা পাঠ করিতেছি, এমন সময় আবার সে কথা মনে হইল, আরও মনে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণ সকলেই গৌরভক্ত, পামর জীবে দয়া করা তাঁহাদের স্বভাব, তবে আমার ভাবনা কি? আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহারা আমাকে ঘৃণা না করিয়া কৃপাই করিবেন। এই কথা মনে করিয়া এই পত্র লিখিতে সাহস করিলাম। যদি গৌরভক্তগণ আমাকে পামর বলিয়া দয়া করেন, তবে আমাকে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের এক জন পরিচর্য্যা বিহীন পরিচারক বলিয়া মনে করিবেন। শ্রীগৌর-ভক্তগণ কৃপা করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলে যথাসাধ্য সমাজের পরিচর্য্যা করিতে যত্ন করিব।"

ভাগলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামবেণু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :— "এই কীটানুকীটকে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের মধ্যে একটু স্থান দিবেন। যদিও আমার এমন কোন গুণ নাই যে, আপনাদের মধ্যে স্থান পাই, তথাপি যদি আপনাদের সংস্রবে গিয়া এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমাজের উপকারে আসিতে পারি, তাহা হইলে এ জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। কত পাপী সেই মহাপ্রভুর নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া ভবসংসার পার হইয়াছে, তাই আশা হয় যে সেই পতিতপাবন-চরণে স্থান দিয়া ভবসংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবেন। আমাদের মত পাপীর তিনি ভিন্ন আর গতি নাই। আমি শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের যাবতীয় নয়মের বশীভূত হইব।"

হুগলী হইতে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী লিখিয়াছেন:—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা শ্রীপত্রিকায় পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। ইহা যে একটি মহান্ সদানুষ্ঠান তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রভু বলিয়াছেন—

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্রেই প্রচার হইবে মম নাম।"

প্রভু বুঝি আপনাদের দ্বারাই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আপনারা ধন্য—শ্রীগৌরসুন্দর আপনাদের মঙ্গল করুন। কৃপা করিবেন আমরাও যেন তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে পারি। শ্রীপ্রভুর কার্য্যের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও খাটিতে পারিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। আমি অতীব আনন্দ চিত্তে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলাম, আমি সমাজের কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

বীরভূম-কুণ্ডলা হইতে শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—মহাশয়ের প্রেরিত ২৪ শে শ্রাবণ তারিখের মুদ্রিত এক খণ্ড কার্ড পাঠ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যতদূর কৃতকার্য্য হইলাম গৌর-ভক্তগণের নাম কতকগুলি লিখিয়া পাঠাইলাম। যাহা কিছু সমাজের উপকার করিতে পারা যায় তাহা সম্পন্ন করা প্রত্যেক ভক্তেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আজ বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজ যে এক গ্রন্থিতে একত্রিত হইবে তাহার উপায় আপনারাই এত দিনে বাহির করিয়া জগতের একমাত্র মঙ্গল সাধন করিলেন। অনুষ্ঠান পত্রে যে সকল বিষয় লিখিত আছে সে সমস্তই যুক্তি পূর্ণ, ইহা প্রত্যেক জেলার গ্রামে গ্রামে যাহাতে প্রচারিত হয় অগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই সমাজে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে ও দীনের নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে সন্নিবেশ করিলে যথাসাধ্য তাহার সদুদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টা করিব।"

বর্দ্ধমান জাহানগর হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল লিখিয়াছেন:—"কয়েক শতবর্ষ পূর্ব্বে যে প্রভু জীবের দশা মলিন দেখিয়া তাহাদিগকে হরিনামামৃত বিতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উদ্ধার মানসে শ্রীমন্নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি কি এক অভুতপূর্ব্ব স্বর্গীয় প্রেমস্রোতে সমগ্র বঙ্গদেশকে মাতাইয়াছিলেন, যিনি ছুটিয়া ছুটিয়া চণ্ডালকেও হরিনাম সুধা এবং প্রেমভরে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়াছেন, যিনি মহাপাপী জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার সাধন করতঃ পতিতপাবন নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং যিনি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র ও বিদ্বান মূর্খকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া এক সম ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন সেই প্রভুর প্রভু শ্রীম মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য

জগতে যত প্রচারিত হইবে ততই ভক্তগণের হৃদয় নিঃসন্দেহ আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকিবে। লুপ্তরত্নোদ্ধারের ন্যায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহের উদ্ধার সাধন এবং আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্য প্রচার জন্য কতিপয় গৌরভক্ত আগ্রহ ও যত্ন সহকারে "গৌরাঙ্গ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই শুভ সংবাদে আমি যৎপরনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ক্রকলই আমার হৃদয় দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইচ্ছা। যদি আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের দ্বারা উক্ত সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধন সম্ভব হয় তবে আমি তদ্বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশে কিছুমা ক্রটি করিব না।"

সভ্যদিগের নিকট চাঁদা স্বরূপ কিছুই গ্রহণ করা হইবে না, এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ যে বৃহৎ কার্য্য হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমাধা করিতে যে, অর্থের প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা আশা করি, গৌরভক্ত মাত্রেই এ বিষয়ে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে ক্রটী করিবেন না। আমরা আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে গোয়ালিয়র হইতে পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সাহায্যার্থে কিছু পাঠাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে লিখিয়াছেন যে, "যখন শ্রীসমাজের সাহায্যার্থে একটী পয়সা বা একমুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত দিতে পারা যায়, তখন অল্প হইল বলিয়া আমি কেন লজ্জিত হইব? শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের উদ্দেশ্য মহৎ। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি মহা-অধম, ইহার সভ্য হইবার উপযুক্ত নহি, তবে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার চেষ্টা করিব।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যিনি যাহা দিতে, ইচ্ছা করেন, তিনি উহা শ্রীসমাজের কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন :—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার, বরাহনগর, কলিকাতা।

আমরা আশা করি শ্রীপত্রিকার গৌরভক্ত পাঠকগণ এই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য হইবেন।

শ্রীসমাজ সম্বন্ধে পত্রাদি নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী — শ্রীসমাজের সম্পাদক।

২৯ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ।

সনাতন বালা, করে লয়ে মালা, জুড়াইতে জ্বালা, বসিল জপে।
স্মরি শ্রীগৌরাঙ্গ, আলাইল অঙ্গ, হৃদি হ'ল ভঙ্গ, বিষম তাপে॥
কনকবরণী, এলাইত বেণী, দীন কাঙ্গালিনী, পাগলীপারা।
ধূলায় ধুসরা, ক্ষীণা কলেবরা, ঝুরিছে নয়নে, বহিছে ধারা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি, বলে মরি মরি, এই ছিল কি হরি, তোমার মনে।
করুণা প্রকাশি, করি নিজ দাসী, দিয়া প্রেম-ফাঁসি, বধিলে প্রাণে॥
যায় প্রাণ যায়, তায় ক্ষতি নাই, ওহে দয়াময়, যে দুখে আছি।
দগধ জীবন, দিয়া বিসর্জ্জন, নিভাই আগুন, এখনি বাঁচি॥
তবে এক সাধ, আছে গোরাচাঁদ, হেরি মুখচাঁদ, মরিব আমি।
অন্তিম সময়, করুণা নিলয়, হৃদয়ে উদয়, হবে কি তুমি?
রাতুল চরণে, করি আলিঙ্গনে, ও চাঁদবদন, দেখিতে দেখিতে।
জনমের মত, সাম্য করি ব্রত, হবে দাসী হত, এ সাধ চিতে॥
আর এক বাণী, শুন গুণমণি, যবে আসি তুমি, দিবে হে দেখা।
ছাড়ি দীন বেশ, আমার প্রাণেশ, এস দাসী পাশ, পরাণ সখা॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর, হবে নটবর, মম হৃদিপর, দাঁড়াবে আসি।
ভরিয়া নয়ন, হেরি সুবদন, তেয়াগিবে প্রাণ, তোমার দাসী॥
যুড়ি দুই হাত, বলে প্রাণনাথ, তুমি জগন্নাথ, জগৎ-স্বামী।
জগৎ বাঞ্ছিত, তোমার শ্রীপদ, যেন হে বঞ্চিত, না হই আমি॥
কহিতে এ কথা, মহামায়া সুতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা, পড়িল ধরা॥
গেল বুঝি ধনি, বলি কাঙ্গালিনী, ধরি পা দুখানি, বসিল ত্বরা॥
উঠ গো জননী, গৌর-সোহাগিনী, জগত তারিণী, জগত মাতা।
তব হৃদীশ্বর, নহেন অন্তর, অন্তরে তোমার, আছেন গাথা॥
ওমা, হয়ে কাঙ্গালিনী, তারিলে অবনী, ধন্য গো জননী, তোমার দয়া।
পড়ি পদতলে, কাঙ্গালিনী বলে, দিও গো যুগল, চরণ ছায়া॥

প্রাচীন-সমাজ।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে দেশের অবস্থা এবং তৎসহ দেশের লোকেরও মতি এবং প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় ইহা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন যাঁহারা স্বদেশের হিতার্থ চিন্তা করেন, ঐ উপলব্ধি হইতেই তাঁহাদের উন্নত মনে স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব পুনঃ স্থাপনেচ্ছা স্বতঃ উদিত হয়। ঐ মহতী ইচ্ছার উত্তেজনাতেই অনেক অনেক মহাত্মা ধর্ম্ম জগতের উন্নতি সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কে কিরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা ৩অ০। ২১ শ্লোক।

এই গীতা-বাক্য অন্যথা করিতে কোন সমাজই সমর্থ নহেন, অনাদিকাল হইতে ঐ বাক্য আপনার সত্যতা জলন্ত দৃষ্টান্তে দেখাইয়া আসিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ভারত, ও আধুনিক মহাজন সংগৃহীত গ্রন্থাবলী উহার সহস্র সহস্র উদাহরণ বহন করিতেছেন, সে সকল এ প্রবন্ধের লেখ্য নহে, আমরা যে কালে জন্মিয়াছি, সেই কালেরই ধর্ম্মালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীকলিযুগপাবন প্রভু শ্রীশ্রীনবদ্বীপে প্রকট হইবার পূর্ব্বে সামাজিক রীতি নীতি ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি যেরূপ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগৌরভক্ত-সমাজের দ্বিতীয় কবি ভক্ত-প্রবর শিশির বাবু অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই জানা যায় যে, সেই সময়ও ঐ গীতা বাক্যের সত্যত সম্বন্ধের সাক্ষ্য দিতে ছিল। যে সময়ের রাজা যবন, ধনিগণ তৎসংসর্গী, পণ্ডিতগণ দার্শনিক শাস্ত্রের চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ সুতরাং অচিরেই আর একটী গীতা বাক্যের কাল উপস্থিত হইল। সেই মহাবাক্য কি? সেই বাক্য আমাদের ভক্তজগতের প্রবোধ; যে বাক্যের মধুরাশ্বাসে তাৎকালিক ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীবাসাদি মহাত্মাগণ আশ্বস্ত হইয়া, প্রভুর পুনরাবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; যাহার মধুরাশ্বাসে জগতের শিবরূপ মহাবিষ্ণুর অবতার শান্তির আলয় শান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু গঙ্গাজল তুলসীদল অবলম্বনে জগতের হিতার্থ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে মহাবাক্য এই—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ গীতা ৪অ০। ৭ শ্লোক।

এই মহাবাক্য সত্য করিতে প্রভু আবার আসিলেন। অন্য অন্য বার রাজকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবারকার কার্য্য সেরূপ নহে, এবারকার কার্য্য আচার ও প্রচার। প্রভু আচারের সহিত প্রচার করিবেন বলিয়াই সেই নিত্য ব্রাহ্মণ বিগ্রহ নিত্য নবদ্বীপবিহারী মায়াপুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ঘরে প্রকট হইলেন। এখনও সেই গীতা বাক্যের প্রাধান্য সেই "যদ্‌যদাচরতি" বাক্যের গৌরব রক্ষা করিলেন। বিদ্যাবিলাসে অধ্যাপক পণ্ডিতগণের বিদ্যাগর্ব্ব চূর্ণ করিলেন, স্বকীয় মহাভাব প্রকটনে ভক্তগোষ্ঠীর রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন, উৎকট সন্ন্যাস গ্রহণে ধনিগণের বিষয় ভোগের অসারত্ব দেখাইলেন, জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ সে প্রভায় মলিন হইলেন, অনেকে প্রভুর শীতল চরণে আশ্রয় লইলেন। প্রভুর পূর্ণ বিকাশে ন্যায়-শাস্ত্রের কূটতর্ক দুর্ব্বোধ জ্ঞানশাস্ত্রের অনধিকার-চর্চ্চারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইল, ভক্তির সুবাতাস বহিল, অচেতন জগত সচেতন হইল, জগতের সৌভাগ্য-উদয়ে গৌর-সূর্য্য উদিত হইলেন। প্রভু জগতের শীর্ষস্থানে উপবেশন করিলেন, পণ্ডিতগণ বিদ্যাগর্ব্ব ছাড়িয়া, ধনিগণ বিষয়গর্ব্ব ছাড়িয়া, দীনভাবে দীন-শরণ প্রভুর পদানত হইলেন, ভক্তি ভরে—প্রেমভরে—ভাবভরে—ধরণী টলমল করিতে লাগিলেন। জগত দেখিল, প্রভু উন্নত চূড়ায় বসিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালকেই ডাকিতেছেন, নিজ অসীম দয়ার ভাণ্ডার কাঙ্গালকেই বিলাইতেছেন, তখন জগতের ধনী মানী পণ্ডিত জ্ঞানী সকলেই গর্ব্ব ছাড়িয়া কাঙ্গাল হইয়া কাঙ্গালের প্রভুর দ্বারের ভিখারী হইলেন। তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, প্লাবনে নিম্ন ভূমিই প্লাবিত হয়, উচ্চ ভূমিতে বর্ষণ হইলেও তাহা গড়াইয়া নিম্ন ভূমিতে সঞ্চিত হয়, সুতরাং উচ্চ ভূমির অনুর্ব্বরতা চিরদিনই রহিয়া যায়, তাহার কাঠিন্য গুণ কিছুতেই অপনীত হয় না, তাহা চিরদিনই কঙ্কর পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেম-প্লাবনে প্লাবিত হইতে হইলে উচ্চতার গর্ব্ব ছাড়িয়া নীচু হইতে হয়। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, দয়াল প্রভু তাঁহার দয়া-রত্ন ছড়াইয়া দিতেছেন, জীবকে তাহা কুড়াইয়া লইতে হইবে, সুতরাং নীচু হওয়াই আবশ্যক। প্রভু কাঙ্গালকেই ডাকিতেছেন, কাঙ্গালকেই দিতেছেন, প্রভুর দয়ার নিকট জগৎ কাঙ্গাল হইয়া গিয়াছে, প্রভুর দ্বারে কাঙ্গালের ভিড় লাগিয়াছে, দয়ার কল্পতরু ধরায় নামিয়াছেন আর কি

জগতে দুঃখ তাপ থাকিতে পারে? প্রভুর শীতল চরণের শীতল সমীরণে জগৎ শীতল হইল, প্রেম প্লাবনে উচ্চ নীচ সমান হইয়া গেল, জগৎ বুঝিল—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণো ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

জগত বুঝিল—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

যুগ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল জনে জনে প্রতিফলিত হইল জগৎ দেখিল—

সংকীর্ত্তনারম্ভ কৃতেঽপি গৌরে ধাবন্তি জীবাঃ শ্রবণে গুণানি।
অশুদ্ধচিত্তাঃ কিমু শুদ্ধচিত্তাঃ শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ খলু তে ননর্ত্তুঃ॥

কলিযুগ-ধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন স্থাপন করিয়া জীবকে প্রেম-ভক্তির পথ দেখাইয়া প্রভু অপ্রকট হইলেন। সূর্য্য অস্তগত হইলেন বটে, কিন্তু ভক্তরূপ চন্দ্র তারা সকল উজ্জল রহিলেন। একদিকে শ্রীশ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, অন্যদিকে শ্রীশ্রীনরোত্তম ও শ্যামানন্দ ঠাকুর, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তজগতের রাজা, গৌড়ে প্রভু সন্তানগণ ভক্তগণ সমাজের পরম পূজনীয়, সুতরাং "যদ্ যদাচরতি" গীতা বাক্য অক্ষুন্ন রহিল, অধিকন্তু সমাজ আরও কিছু উচ্চ শিক্ষা পাইল, অক্ষুন্ন যুগ-ধর্ম্ম আরও উন্নত পথে চলিল। গৃহে গৃহে পঞ্চ-তত্ত্বের উপাসনা প্রণালী প্রতিবিম্বিত হইল, জগৎ বুঝিল—

অনন্য চেতা হরিমূর্ত্তি সেবাং করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্ম নিষ্ঠঃ।
তথাপি ধন্যো নহি তত্ত্ববেত্তা গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদি স্যাৎ॥

জগত বুঝিল—যদিস্যাদ্ বৈষ্ণবে প্রীতিঃ সদা কীর্ত্তন লম্পটঃ।
গৌরাঙ্গচন্দ্র বিমুখঃ ন বৈ ভাগবতোঽপি সঃ॥

চিরদিন সমান যায় না, সৌভাগ্যের উজান স্রোতে ভাটী পড়িল। যবনের রাজত্ব অন্তে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, জীব-জগৎ সুশাসন গুণে শান্তি লাভ করিল। কিন্তু ধর্ম্ম-জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজে শিক্ষিত সভ্য ছিলেন, এবং প্রভুপাদ-গণ ঠাকুর-সন্তানগণ ভক্তগণ সমাজে শিক্ষিত সভ্য ছিলেন, সাধারণ সমাজ তাঁহাদেরই অনুকরণ করিত, তাঁহাদের আচরিত পন্থাই সদাচার ও সভ্যতা বলিয়াই সাদরে সাধারণ সমাজে আচরিত হইত। কিন্তু সে দিন গত হইল, জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইল। জীবের নবজীবন হইয়াছে, ভারতে বিদেশীয়

সভ্যদল পদার্পণ করিয়াছেন, বিদেশীয় সভ্যতা-জ্যোতির নিকট প্রাচীন আচার ব্যবহার আর তাঁহাকে ভাল লাগিতেছে না। সুতরাং এখন অভিনব শিক্ষিত সমাজ অনুকরণ-প্রিয়তা দেখাইয়া ভারতের চিরগৌরবের মস্তকে বজ্রপাত করিয়া নূতন চিত্রে চিত্রিত হইলেন। প্রাচীন শিক্ষিত সভ্যদল এখন 'বোকা, কাদা-মাথা, টিকিওয়ালা, সেকেলে, বাবাকেলে, চলবলাহেগো, ভণ্ড, বিকল মস্তিষ্ক, প্রভৃতি উত্তম উত্তম বিশেষণে বিশেষিত হইয়া অকর্ম্মণ্যের মধ্যে পরি-গণিত হইলেন। নব্য শিক্ষিত সভ্য সমাজের বেশভূষার চাকচিক্যে, রাজ-নৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি ইত্যাদি আন্দোলনে জগৎ টল-মল করিতে লাগিল। দেশে দেশে শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইল, সভা-সমিতি বসিল, সংবাদ ছুটিল, উচ্চশিক্ষার গুণে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মালোচনা রূপ ভ্রান্তি-মূলক কুসংস্কার সকল দূরীভূত হইল। ক্রমে ভারত উন্নতির উচ্চ সীমায় উঠিল। কিন্তু এইরূপ উন্নতি ভারতের পক্ষে উন্নতি কি অবনতি, এরূপ উন্নতির দিনে ভারত সমাজ কোন্ বস্তু হারাইলেন, কোন্ বস্তু কুড়াইলেন, সহৃদয় পাঠকবর্গ, শিক্ষিত সভ্যসমাজ, ইহা একবার নিরপেক্ষ বিচার করি-বেন। দেখিবেন, "যদ্যদাচরতি" এই ভগবদ্বাক্য কত সারবান। দেখিবেন, সে মহাবাক্যের কার্য্যকারিতা কত। দেখিবেন, ভারত সমাজের এরূপ পরি-বর্ত্তনের নিদান কি।

দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, সমাজের এই অসম্ভব পরিবর্ত্তনে, কাহারও কি হৃদয় কাঁদিল না? কাঁদিল বই কি, তখনও ভারতে এ দুঃখে কাঁদিবার লোক ছিল। কিন্তু রাজ-উদ্যান জঙ্গলময় হইয়া গেলে, কচিৎ কোন স্থানে দুই একটি গোলাপ কি বেলি অতি কষ্টে প্রস্ফুটিত হইয়া কি সেই উদ্যানের শোভাসংস্থাপন করিতে পারে? বরং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলে। সুতরাং সে রোদন অরণ্যে রোদন মাত্র। একান্ত বিষয়াবিষ্ট পৈশাচিক সংসারে উপার্জ্জন-অপটু অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের কি গৌরব? তাহার হিতবাক্যও সময়গুণে হাস্যরসে পর্য্যবসিত হয়। গৌরবান্বিত অভি-নব শিক্ষিত সভ্য সমাজ যেরূপ ভাবে চলিবেন, সাধারণ সমাজ তাহাই অনুকরণ করিবে, ইহাই চিরন্তন প্রথা। সুতরাং ভারতের চির গৌরব ধ্বংস প্রায় হইল। এই ধর্ম্ম বিপ্লব কালে শিক্ষিত সভ্যদলের মতির বৈপ-রীত্যের কথা উত্থাপন করিতে কাহারও সাহস হইল না।

এইরূপ সময়ে দুই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষিত সভ্য সমাজ অভ্যুদয় লাভ করিলেন। সে দুই মহাত্মা কে? মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। এই দুই মহাত্মাই উচ্ছৃঙ্খল সভ্য সমাজে সর্ব্বপ্রথমে ভগবচ্চিন্তার বীজ রোপণ করিলেন। দেশে দেশে ব্রহ্ম-সমাজ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তাহাও বিদেশীয় উপাসনা প্রণালীর অনুকরণ মাত্র। আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিলে নিশ্চয় তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইতেন, কেন না অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী সন্তান সে সময় বিদেশীয় অনুকরণেই ব্যতিব্যস্ত, বৈদেশিকভাবেই উন্মত্ত, সুতরাং এরূপ সময়ে এইরূপ উপাসনাই অধিক কার্য্যকারিতা লাভ করিল।

সমাজ নিরাকার ব্রহ্মচিন্তায় মন নিবেশিত করিল বটে, সে চিন্তায় শান্তির সুবাতাস বহিল না; অপথে গতি সমাধা হয় না, সাধুজন সেবিত সৎপথ পরিত্যাগ করিলে বিপথে পদার্পণ হয়। যাহা সত্যযুগের ধর্ম্ম তাহা কলি-যুগে হইতে পারে না, বাল্যকালের নর্ত্তন কুর্দ্দন উল্লম্ফনাদি ক্রীড়া বৃদ্ধ-কালে হইতে পারে না, যুগে যুগে মনুষ্যের দেহ, আয়ু, বল, বুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া থাকে, এই জন্যই ভগবান্ চারি যুগের জন্য চারিপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারই নাম যুগধর্ম্ম। যথা:—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো" ইত্যাদি।

সত্যযুগে ধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তা; ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ-পুরুষ হরির উপাসনা; দ্বাপরে পরিচর্য্যা অর্থাৎ পুষ্পাদি উপহার দ্বারা পূজা। কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন, অর্থাৎ প্রেমের সহিত ভক্তির সহিত হরিকে ডাকা, এবং ব্রজলোকানুসারী ভাবানুগ হইয়া তাঁহার রূপ গুণ লীলা স্মরণ করা। ভগবন্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ইহারই প্রচার করিয়া জীবকে কৃষ্ণ-প্রেমে মজাইয়াছিলেন। ইহাই যুগ-ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্দে ৫ অধ্যায়ে চারি যুগের ধর্ম্ম ও অবতার বর্ণনা স্থলে কলিযুগের ধর্ম্ম এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা:—

নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। ২৮।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥ ২৯॥

ব্রহ্ম-সমাজ সত্যযুগের ধর্ম্ম কলিযুগে আচরণ করিতে প্রয়াসী, এমন কি কাল্পনিক সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত

করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া কি যুগ পরিবর্ত্তন হয়? উহা ভগবানের নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং এ অনধিকার চর্চ্চায় কোন সুযশ হইল না।

যোগবাশিষ্ঠে কুলার্ণবে চ

সাংসারিক সুখাসক্ত ব্রহ্মজ্ঞোঽহমীতিবাদিনং।

কর্ম্ম ব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

যৎকালে ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেম-ভক্তির সহিত যুগ-ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় প্রভুর সহিত হঠ্ করিয়া শ্রীশ্রীমদ-দ্বৈত আচার্য্য প্রভু শান্তিপুরে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ প্রচার করায় অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানচর্চ্চা কলিযুগের ধর্ম্ম নহে জগতকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, এবং কলির জীবের যাহা যথার্থ ধর্ম্ম তাহাই প্রচার করিয়াছেন। ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে যে কার্য্য তাহা সুফলপ্রদ হয় না সুতরাং নব প্রচারিত নব্য ধর্ম্ম সমাজ জীবের যথার্থ মঙ্গল করিতে পারিল না। তবে যে ঐ দুই মহাত্মার মহদুদ্যমে কোন ফল হয় নাই ইহাও বলা যায় না, দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া তাঁহারা এইরূপেই জীবের মনে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপই বর্ষার শান্তিধারার নিদান। জ্ঞানের নীরস চর্চ্চার পর ভক্তির মধুরাস্বাদ বড়ই প্রীতিপ্রদ হয়। যাঁহাকে ভালবাসি, যিনি আমাদের বিপদের বন্ধু যিনি আমা-দের অন্তিমের ভরসা, যিনি আমাদের সকল সুখের সীমা, আমরা যাঁহার দয়ায় বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে বল পাই, যাঁহার মধুর নাম গাহিয়া মনে আনন্দ পাই, তাঁহাকে নিরাকার ভাবিতে, তাঁহাকে দেখিতে পাই না ভাবিতে, বড় কষ্ট পাই, জীব-জগৎ যখন প্রভুকে ভাবিতে শিখিল, ডাকিতে শিখিল, যখন তাঁহার নাম লইয়া জুড়াইতে শিখিল, তখন নিয়মের নৈসর্গিকতা হেতু তাঁহাকে দেখিতেও তাহাদের হৃদয় ব্যগ্র হইল; যতই সেই ব্যগ্রতা লালসায় পরিণত হইতে হইতে লাগিল, ততই নিরাকার ভাবনা দূর হইতে লাগিল। ভক্তাধীন প্রভু সময় বুঝিয়া দীন-জীবের বাসনা পূর্ণ করিলেন।

এমন সময় কয়েকজন মহাত্মা ভগবৎ প্রেরিত শক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া সাত্বতা ভগবদ্ভক্তি প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন, ভক্তিরসোদ্দীপ বক্তৃ-তার শান্তিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সমাজের গতি ফিরিয়া গেল। জীব যাহা চাহিতেছিল তাহা পাইল, দেশে ভক্তির তুফান উঠিল, জ্ঞান প্রজ্বলিত,

শুষ্ক নেত্রে ভক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকাশ হইল, নয়নে প্রেমধারা বিগলিত হইল, উত্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইল। কিন্তু আরও কিছু যেন অপেক্ষা—যেন এখনও কিছু অবশিষ্ট রহিল; সমাজে ভক্তির প্রবাহ চলিল বটে, কিন্তু প্রভুর নিকট যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল না।

অপ্যগণ্যমহৎপুণ্যমনন্য শরণং হরেঃ।
অনুপাসিত চৈতন্যং ন ধন্যং মন্যতে মতিঃ॥

যিনি আমাদের জন্য এই ঘোর কলিযুগে হরিনাম-সুধা বিলাইবার জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছেন, যিনি জীবের জন্য উৎকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, যিনি সাধন সম্বলিত যুগধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিখাইয়াছেন, যাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত একভাবে তাঁহাকে পাইবার অধিকারী হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিটি যতক্ষণ হৃদয়ে হৃদয়ে না নাচিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ভগবানের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভের অধিকারী হইল না।

উপাস্য মূর্ত্তির গুণ উপাসকে প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবানের অন্যান্য মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যময়ী—শ্রীশ্রীবৃন্দাবননাথ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়, শ্রীশ্রীগিরিগোবিন্দ মূর্ত্তি মহাভাবময়ী। শ্রীশ্রীনন্দ নন্দনের রূপ-মাধুর্য্য লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইলে ভাবরূপা রসনার আবশ্যক, এই জন্যই মহাভাবময়ী গৌর মূর্ত্তির উপাসনা জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল। গৌরচন্দ্র বিহীন কীর্ত্তন যেমন শোভা পায় না, গৌরোপাসনা বিহীন হরিভক্তিও তদ্রূপ সর্ব্বার্থ সাধিকা হইতে পারে না। যেমন গুরু পূজা ভিন্ন সকল পূজাই বিফল, গৌর ভক্তিহীন ভগবদ্ভক্তিও তদ্রূপ। দেশে যে ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, এই প্রবাহে গৌর-প্রেমের তরঙ্গ উঠিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, জীব হরিভক্তির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। যথা হরিভক্তিবিলাসে—

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥

তথা—প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমং।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ॥

বীজ রোপণ মাত্রেই ফল হয় না। যখন হরিভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে তখন ফল পুষ্পে শোভিত হইবে সন্দেহ কি?

নেহাতিক্রম নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গীতা ২। ৪০॥

এই ভগবদ্বাক্য অন্যথা হইবার নহে, এতদিনে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া গৌর-ভক্তি সৌগন্ধে ধর্ম্ম-জগৎ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মসমাজ এখন শ্রীশ্রীপতিত-পাবন গৌরচন্দ্রের শীতল চরণ আশ্রয় জন্য ধাবিত হইয়াছে; এইবার জীব রসনা পাইয়াছে, যখন রসনা পাইয়াছে তখন অবশ্যই ঐ বৃক্ষের ফলরূপ শ্রীনন্দ-নন্দনের চিরদিনের অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বল রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। বৃক্ষের সকল আম্র গুলি এক সঙ্গে পাকে না। যখন কতকগুলি পাকিয়াছে তখন সকল গুলিই পাকিবে বলিয়া আশা হইতেছে, যদি বিকৃত বায়ুর হস্তে রক্ষা পায়।

শিখা, সূত্র, তিলক, তুলসীমালা, হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, ইহা ত্যাগ করিয়া সমাজ কি লইয়া হিন্দু হইবেন? আমি যে দিন শিক্ষিত বাবু অবধি অশিক্ষিত প্রহরীটি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত দেখিব, সেই দিন জানিব ভারতের যথার্থ উন্নতি হইয়াছে, সেই দিন জানিব ভারতবাসী নিজ গৌরব বুঝিয়াছে, সেই দিন জানিব ভারতের অতীত সৌভাগ্য পুনঃ স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ-সমাজে শিক্ষিত সভ্যগণের সহানুভূতি দেখিয়া—স্বদেশের গণ্যমান্য মহাত্মাগণের সহযোগীতা দেখিয়া—গৌরভক্তির বহুল প্রচার দেখিয়া, আজ যেন আমার সেই আশা কার্য্যে পরিণত হইবার আশ্বাস দিতেছে। শিক্ষিত নব্য সভ্যগণ গৌরভক্ত হউন, ভক্ত-জগতের ইহাই প্রার্থনা। কেন না তাঁহাদেরই অনুকরণে ভৌমস্বর্গ ভারতভূমির এই দশা। তাঁহারা গৌরভক্তির গরিমা বুঝিলেই তাঁহাদের অনুকরণে আবার ভারত পূর্ব্বরূপ ধারণ করিবে।

প্রার্থনা করি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা বহুব্যাপক হউক আবার জগৎ দেখুক—
নিরন্তরং কৃষ্ণ কথা পরস্পরং সুভক্তিদং নাম হরে র্বদন্তি বৈ।
জল্পন্তি লোকা ভুবি ভাব বিহ্বলা গৌরেঽবতীর্ণে কলিপাপ নাশকে॥
আবার জগত উন্নত কণ্ঠে ঘুষুক—

যদবধি হরিনাম প্রাদুরাসীৎ পৃথিব্যাং,
তদবধি খলু লোকা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এতে।
তিলক বিমল মালা নামযুক্তা পবিত্রা,
হরি হরি কলি মধ্যে এবমেবং বভূব॥

শ্রীশ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দের চরণে শত শত প্রণাম পূর্ব্বক অদ্য এই স্থানেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম। যদি ভক্তগণের কৃপা পাত্র হই, আগামী মাসের পত্রিকায় উদাহরণ সম্বলিত প্রাচীন ভক্ত সমাজের কিঞ্চিৎ বিবরণ ভক্তগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল

ভক্তজন কৃপাপ্রার্থী—শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ, ভক্তিভিখারী।

নিত্যানন্দ ও অভিরাম।

(১)

ছি! ছি! এমন ভিক্ষা কে চায়? কেহ বা দেয়? এ কালে এমন অসম্ভব দাতা নাই।

"তোমার ঐ ভুবনমোহন ছেলেটি আমায় দাও। তোমার ঐ আশার যষ্টি নিরাশার সম্বল, তোমার ঐ নয়নের তারাটি আমায় দাও" এ অপরূপ ভিক্ষা কেহ করে না; আর এমন "দাতাকর্ণ' কাহাকেও দেখি না।

যথার্থই কিন্তু এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ততোধিক বিস্ময়ের বিষয় যে এরূপ "দাতাকর্ণ" কলিকালে জন্মিয়াছিলেন।

রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান মল্লারপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট) প্রাচীন একচক্রা গ্রাম। একচক্রার উল্লেখ মহাভারতে আছে পাণ্ডবগণ বনবাস কালে একচক্রায় একদা বাস করিয়াছিলেন।

এই একচক্রায় হাড়াই পণ্ডিত (নামান্তর মুকুন্দ) বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। ইহাঁদেরই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুবের (নিত্যানন্দ।) কুবের ১৩৯৫ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। যথা—

"রাঢ়দেশে একচাকা নামে গ্রাম ধন্য। যাহি নিত্যানন্দ রাম হৈলা অবতীর্ণ॥
বসুদেব অবতার হাড়াই পণ্ডিত। তার পুত্র নিত্যানন্দ সদাই আনন্দিত॥
পদ্মাবতী মাতা তাঁর সাধ্বী শিখামণি।
মোর প্রভু (অদ্বৈত) কহে যারেসাক্ষাৎ রোহিণী॥
তেরশত পচানব্বই শকে মাঘমাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

কুবেরের চরিত্র অতি অদ্ভুত, কুবের সারাদিন খেলা করে, খেলা বই জানে না। সে খেলা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির বিচিত্রতা পূর্ণ। এরূপ খেলা কেহ কখন খেলে নাই, দেখে নাই। কুবের শিশুগণ লইয়া পৌরাণিক অভি-

নয় করিতেন, রামলীলা বা কৃষ্ণলীলা বই খেলিতেন না। খেলিবার সময় কুবের ও শিশুগণ তন্ময় হইয়া যাইতেন, তাঁহারা সজ্ঞানে আছেন—বোধ হইত না, কোন এক শক্তি তাঁহাদিগকে যেন কলের পুতুলের ন্যায় চালাইত। এরূপ বিচিত্র ভাব এবং অভিনব খেলা বৃদ্ধগণও আশ্চর্য্যের সহিত দাঁড়াইয়া দেখিতেন। এই কচি ছেলে কুবের পৌরাণিক বৃত্তান্তগুলি কোথা হইতে জানিতে পারিল? ইহা ভাবিয়া, তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না।

কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধির সহিত কুবের খেলা ত্যাগ করিয়া লেখা পড়ায় মন দিলেন। কুবেরের সকল ব্যাপারই অদ্ভুত, কুবের অল্পকাল মধ্যে অল্পায়াসেই মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ভক্তি রত্নাকর বলেন—

"অল্প দিবসেই হৈল নিত্য উপনীত। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে হৈল বিচক্ষণ॥"

কুবের শীঘ্রই অধ্যাপক হইতে 'ন্যায়চূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন। নিত্যানন্দ তাঁহার গুরুদত্ত নাম, কুবেরের কৃষ্ণপ্রেমানন্দ দর্শনে গুরু লক্ষ্মীপতি তাঁহাকে 'নিত্যানন্দ' নামে অভিহিত করেন। যথা—

"ন্যায়চূড়ামণি ইহ বহু শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপূরে স্থিতি॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ

দেখিতে দেখিতে নিত্যানন্দের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিল, এই সময়েই তাঁহার শুভ বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"নিতাইর বয়স হৈল দ্বাদশ বৎসর ষোড়শ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর।
বন্ধুগণে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত। পুত্রের বিবাহ দিতে হৈল উৎকণ্ঠিত॥
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন। বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ষ হৈল সর্ব্বজন॥

এইরূপে একচক্রাবাসিগণ যখন আনন্দে মগ্ন, তখন পর্ব্বতপাত হইতেও একটি গুরুতর আঘাত তাঁহাদের মাথায় পড়িল,—সকল আনন্দ নিমিষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

ঐ সময়ে এক জন পরম রূপবান্ তেজঃপ্রভ সন্ন্যাসী কোথা হইতে অতিথি রূপে হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী আসিলেন। হাড়াই পুত্রের সহিত পরম যত্নে সন্ন্যাসীর সেবা করিতে লাগিলেন। এই সন্ন্যাসীই একচক্রার আনন্দরাশি হরণ করিয়া লইলেন! চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর। আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর॥
নিত্যানন্দ পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া। রাখিলেন পরম আনন্দ যুক্ত হঞা॥
সর্ব্বরাত্রি নিত্যানন্দ পিতা তাঁর সঙ্গে। আছিলেন কৃষ্ণকথা কথন প্রসঙ্গে॥

গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে। নিত্যানন্দ-পিতা প্রতি ন্যাসীবর বলে ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার। কত দিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥"

সন্ন্যাসী পুত্র-ভিক্ষা চাহিলেন। অপরিচিত এক ব্যক্তি এক রাত্রি মাত্র বাস করিয়াই ভিক্ষা চাহিল, "তোমার প্রাণপ্রতিম সন্তানটি দাও।" যে সন্তানটিকে পণ্ডিত তিলমাত্র চক্ষের অন্তর করেন না—সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখেন; যে সন্তান একটু সরিয়া গেলেই পণ্ডিত, "তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়।"

সেই পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিলেন!! এ নিদারুণ বাক্য শ্রবণে পণ্ডিত কি করিলেন? তিনি সাব্যস্ত করিলেন যে পুত্রকে বিলাইয়া দিবেন! যদিও পুত্র বিনে তাঁহার সংসার শূন্যময় হইয়া যাইবে, যদিও পুত্র বিদায় দিয়া তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না; তথাপি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, ভিক্ষুক বিমুখ করিতে পারেন না। তবে পুত্রে ত তাঁহার একা অধিকার নহে; পুত্রের জননীর কি ইহাতে সম্মতি হইবে? এই ধর্ম্ম সংরক্ষণে তিনি যেন প্রতিবন্ধকতা না করেন, এই ধর্ম্ম সঙ্কটে কৃষ্ণ যেন রক্ষা করেন। পণ্ডিত মনে মনে ভগবানের কাছে এইজন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যথা ভক্তি-রত্নাকরে—"এ ধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে"

পদ্মাবতী এ সকল কথা ধীরচিত্তে শ্রবণ করিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কষ্টে শ্রেষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন—

"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই কথা মোর।"

নিত্যানন্দের পিতা মাতা এইরূপ ছিলেন। এইরূপ পিতা মাতা না হইলে নিত্যানন্দের ন্যায় সন্তান লাভ করা যায় না। যা হোক, অভীষ্ট-ভিক্ষা লাভ করিয়া সন্ন্যাসী আর মুহূর্ত্তমাত্র রহিলেন না, শীঘ্রই লোক-চক্ষুর অন্তরাল হইলেন।

যেই মুহূর্ত্তে নিত্যানন্দ গৃহের বাহির হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই পিতা মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"নিত্যানন্দ লইয়া ন্যাসী চলিলা ত্বরিতে। মুর্চ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রাণহীনা প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী। হইল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি ॥
কি নারী পুরুষ যত এ একচক্রায়। এ কথা শ্রবণ মাত্র হৈল মৃত প্রায় ॥
সঙ্গী শিশুগণ কহে মো সবে ছাড়িয়া। কোথা গেলা বলি কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
এই একচক্রা গ্রাম হৈল শূন্য প্রায়। যেখানে সেখানে লোক করে হায় হায় ॥"

সে যাহাহউক, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ কঠিন হৃদয় সন্ন্যাসীটি কে? কি উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি এ কাণ্ডটি করিলেন?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীল চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "পরে মহাপ্রভুর ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিলেন। আহারান্তে ঐ বালকটীকে পিতা মাতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গেলেন।"

ইহা একটা জনশ্রুতি মাত্র, ইহা অবিসংবাদী সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

"হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে। নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থ যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর। তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥"

অর্থাৎ ১২ + ২০ = ৩২ বৎসর বয়সের পরে নিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন। এ সম্মিলন নিমাইর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে হইয়াছিল। (নবদ্বীপে নিমাইর যে যে লীলা হয়, নিতাই তখন উপস্থিত, অতএব এই সম্মিলন কালে মহাপ্রভুর বয়স ২৩ বৎসর, কি তদপেক্ষা ২। ৪ মাস অধিক হইবে মাত্র।) অতএব মহাপ্রভু হইতে নিত্যানন্দ প্রভু কিঞ্চিদধিক নয় বৎসরের (৩২—২৩ = ৯) মাত্র বয়োধিক, * ইহা বলা যাইতে পারে।

এদিকে বিশ্বরূপও শ্রীনিমাই হইতে প্রায় দশ বৎসরে বড়। † সুতরাং নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ প্রায় সমবয়স্ক।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে লোচনদাস কৃত চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"ষোড়শ বরিষ পুত্র ভেল বয়ঃক্রম। বিবাহের যোগ্য রূপ যৌবন সম্পূর্ণ॥
এই মত কথা পিতা হৃদয়ে করিল। বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা হৃদয়ে ধরিল॥"

ইহাতে বিশ্বরূপ মনে মনে এক সংকল্প করিয়া তদুচিত কার্য্য করিলেন। যথা—

"বিবাহ করিব আমি নহেত উচিত। নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত॥

---

* অদ্বৈতপ্রকাশানুসারে নিত্যানন্দ নিমাই হইতে ১১ বৎসরের বয়োধিক। চৈতন্যভাগবতের "তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচরে" ইহার "তবে শেষের" অর্থ ২০ বৎসরের পরে যদি ধরা হয়; এবং নিতাইর জন্ম ১৩৯৫ শকের মাঘ মাসে হওয়ায়, সেই দুই মাস মাত্র ১৩৯৫ সংখ্যক শকাব্দটী হিসাবে ধরা না হয়, তবেই চৈতন্যভাগবতে ও অদ্বৈতপ্রকাশে অনৈক্য থাকে না।

† শ্রীপত্রিকা ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল শিশির বাবু লিখিত "শচীদেবীর বয়ঃক্রম" প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

এই মনে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে বাহির হইয়া গেল পুঁথি বাম হাতে॥"

পূর্ব্বে প্রদর্শন করা গিয়াছে যে, নিত্যানন্দের বয়ঃক্রম দ্বাদশ অতিক্রম হইতেই অপরিচিত সন্ন্যাসী তাঁহাকে লইয়া যান। সে সময় বিশ্বরূপের বয়স ১৩ কি ১৪ বর্ষের অধিক ছিল না, বলা যাইতে পারে; এবং চৈতন্য মঙ্গলের বর্ণনানুসারে তখন তিনি গৃহে—সন্ন্যাস করেন নাই। সুতরাং পূর্ব্ব কথিত প্রবাদটী (যে প্রবাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।) অবিসংবাদী সত্য রূপে গৃহিত হইতে পারে না। (অন্ততঃ চৈতন্য ভাগবত ও অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে প্রবলতর প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ প্রবাদ সত্যরূপে কদাপি গৃহিতব্য নহে।)

তবে এ সন্ন্যাসী কে? ইঁহার পরিচয় কি চিরদিন অচ্ছাদিত থাকিবে?

এ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরের মত এই যে, এ সন্ন্যাসী অপর কেহ নহেন, নিত্যানন্দের ই মায়া-মূর্ত্তি। নিতাই স্বেচ্ছা বশতঃই এ কাণ্ডটী করেন। তিনি স্বীয় মনে জানিতে পারেন যে, কোথাও শ্রীভগবানের অবতার হইয়াছে। তিনি মনে করেন যে, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সুতরাং নিত্যানন্দ যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে। এবে শীঘ্র গমন করিব তীর্থাটনে॥
হেনকালে গ্রামে আইলা এক ন্যাসী।" ইত্যাদি।

ঐ সন্ন্যাসী যে নিতাইর মায়ামাত্র নিতাই হইতে অভিন্ন; তাহা একচক্রাবাসী কোন কোন মহাত্মা, নিতাই চলিয়া গেলে অনুধাবন করিয়াছিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"কেহ কহে সন্ন্যাসী কেবল ছলমাত্র তাঁর। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে ঐছে শক্তিকার॥
বলরাম কৈলা পূর্ব্বে তীর্থপর্য্যটন। তাহাই করিবা এবে হৈল হেন মন॥"

অতএব ভক্তিরত্নাকরের অভিপ্রায় এই যে, এ সন্ন্যাসী নিতাইচাঁদের মূর্ত্তি ভেদ মাত্র। নিতাই গৃহত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিতে গেলেন, লোকে প্রথমতঃ দেখিল নিতাই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই গেলেন; কিন্তু একটু পরেই সে সন্ন্যাসীর কোন তত্ত্বই পাওয়া যাইতেছে না; তিনি "একেশ্বর" তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিলেন, ইহা লিখিত আছে। যথা তত্রৈব—

"প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে। চলে একেশ্বর মহা গজেন্দ্র গমনে॥
দ্বাপরে করিলা যৈছে তীর্থ পর্য্যটন। সেইরূপ সর্ব্ব তীর্থে করয়ে ভ্রমণ॥"

সে যাহা হোক, এইরূপ নিতাইচাঁদ যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করেন।

(২)

নিত্যানন্দ নানাতীর্থ ভ্রমণান্তর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন, নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-প্রেমে সদা উন্মত্ত. জ্ঞান মাত্র নাই, এমন কি তিনি—

"কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি।"

এবং—

"আহার নাহিক কদাচিৎ দুগ্ধপান। সেহ অযাচিত যদি কেহ করে দান॥"

(চৈতন্য ভাগবত।)

কিন্তু দুঃখ এই যে যেজন্য পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমিতেছেন, আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পান নাই।

এক দিন নিতাই কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। এমন সময় শ্রীমদীশ্বরপুরী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এখানে কি চাহিতেছ? তোমার কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় উদিত হইয়া-সম্প্রতি গয়া হইতে গিয়াছেন, যাও— তাঁহাকে তথায়ই প্রাপ্ত হইবে।"

এই শুভ সংবাদ শুনিয়া নিতাইর জ্ঞানলোপ হইল, আনন্দে তিনি নাচিতে লাগিলেন। আজ শ্রীদাম কোথায়? তাঁহাকে এ শুভ সংবাদ দিতে হইবে। নিতাই আনন্দে ডাকিতে লাগিলেন—শ্রীদাম! শ্রীদাম।

যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অপ্রকট হন, ব্রজবাসীর তখনকার দশা অবর্ণনীয়। চির-তেজস্বী শ্রীদাম তখন মনে মনে একটী দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া গোবর্দ্ধনের নিভৃত কন্দরে বসিয়া রহিলেন। সে অবস্থায় ধ্যানাবেশে তিনি কানাইর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

যুগের পর যুগ আসিয়াছে, শ্রীদাম আপন ভাবে বিভোর, তাঁহার ধ্যান আর ভঙ্গ হয় না। সে গভীর ধ্যান ভাঙ্গিতে পারে কাহার সাধ্য?

নিতাই ডাকিতেছেন। জন বিহীন গহনকাননে কে তাঁহার উত্তর দিবে? শব্দ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিতে লাগিল—"শ্রীদাম!" প্রতি পর্ব্বত হইতে প্রতিধ্বনি হইল—"শ্রীদাম!" নিতাই নিরাশ হইয়া, উৎকণ্ঠায় আবার ডাকিলেন—ভাই শ্রীদাম।

শ্রীদাম কি জীবিত আছেন!

গোবর্দ্ধন-কন্দরে শ্রীদামের দেহ অচেতন-পদার্থবৎ পড়িয়া আছে। উপরে মৃত্তিকা, তদুপরি বৃক্ষাদি জাত হইয়াছে। কিন্তু বলদেবরূপী নিত্যানন্দের আহ্বানের শক্তি, শত শত পর্ব্বত শৃঙ্গ ভেদ করিয়া, শ্রীদাম দেহে চেতনার

সঞ্চার করিয়া দিল। অচেতন সচেতন হইল, সেই আহ্বান শক্তিবলে শ্রীদামের জড়বৎ দেহে জীবন লক্ষণ দেখা গেল।

শ্রীদাম চাহিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শেষে ধ্বনি লক্ষ করিয়া চলিলেন। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই পরস্পরে দেখা হইল। নিত্যানন্দ শ্রীদামকে কৃষ্ণের সংবাদ দিলেন। শ্রীদাম অতি আনন্দিত হইলেন, কিন্তু দাদা বলাই এত খর্ব্ব কেন, বুঝিতে পারিলেন না। নিতাই তখন স্বীয় ঐশ্বর্য্য বলে শ্রীদামকেও কালোপযোগী খর্ব্ব করিয়া দিলেন। সেই হইতে শ্রীদাম, রামদাস বা অভিরাম নামে আত্ম পরিচয় দিতে লাগিলেন। যথা—'নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থে— *

"প্রভু যবে করিলেন অবধূতাশ্রমে। উৎকণ্ঠা হইয়া গেল বৃন্দাবন ভূমে॥
কৃষ্ণ অদর্শনে উৎকণ্ঠা অতিশয়। ভাইরে শ্রীদাম উচ্চ করিয়া ডাকয়॥
গোবর্দ্ধন গিরি হইতে বাহির হইলা। সিঙ্গা বেণুরব করি আসিয়া মিলিলা"

তখন নিত্যানন্দ—

'কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল। ঘুমায়ে রহিলি মূর্খ জাতিয়া গোয়াল॥
তার স্কন্ধে হল দিয়া কৈল আকর্ষণ। খর্ব্ব হও বলি এই বলিল বচন॥
তবু আপনার হাতে রহে চারি হাত। সুন্দর শরীর মহাপুরুষ বিখ্যাত॥
পূর্ব্ব শুদ্ধ সখ্য ভাব হয় সর্ব্বকাল। অতএব নাম হৈল অভিরাম গোপাল॥

অভিরামকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় নাই, (এই অদ্ভুত কথা এ কালে অনেকেই অবিশ্বাস করিতে পারেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছু বলিতে চাহিনা)

কিন্তু অভিরাম অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, সর্ব্বদাই পূর্ব্বভাবে অভিভাবিত থাকিতেন; সেরূপ স্বভাব সেরূপ ব্যবহার তৎকালীয় লোকের যে অনধিগম্য ছিল, ইহা স্বীকার না করিবার যো নাই। অভিরাম অনেক অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদন করিয়াছিলেন। সে সকল অতিলৌকিক ঘটনা ছাড়িয়া দিয়া তদীয় সাধারণ কার্য্যগুলি বিচার করিলেই মনে অন্য ধারণা যেন আপনা আপনি উদিত হয়।

সে যাহা হউক, দাদা বলাইর বাক্য শ্রবণে অভিরাম স্থির করিলেন যে, তিনিও কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইবেন। তিনি ভাবিলেন, যথা অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে :—

---

* শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কৃত চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট রূপ বংশবিস্তার গ্রন্থের ১৪৯৭ শকাব্দে লিখিত প্রতিলিপি হইতে গৃহীত।

"ব্রজেতে কৃষ্ণ বহু সেবন করিলা। তখন আমাকে কৃষ্ণ আপনি কহিলা॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জনে। বশ হইনু দেখ তোমার সেবনে॥
বলরাম আদি করি যত সখাগণ। সবার অপেক্ষা শক্তি দিলাম এখন॥
এমন পিরীত সেই শ্রীকৃষ্ণ সহিত। মনে না করিয়া গেলা হইয়া বিস্মিত॥
বুঝিব এবে তার প্রিয় হয় কেবা কাহার প্রেমেতে বশ পাইবেন সেবা॥
সেবা বশ হঞা সেই প্রেমেতে চলিলা। অতেব আমাকে তিঁহ বিস্মৃত হইলা॥
এতেক ভাবিয়া মনে করেন ভ্রমণ যেখানে বিগ্রহ আছে করেন দর্শন॥
দর্শন করিয়া তাঁহা বলেন হাসিয়া কেবা কোনরূপে আছ দেখিব কাষয়া॥
এতেক বলিয়া পাবে দণ্ডবত দিলা। দণ্ডবত করি শীঘ্র দেখিতে লাগিলা॥
দণ্ডবত দ্বারে সেই বিগ্রহ সংশয়। মনেতে জানিলা কেহ নাহিক নিশ্চয়॥
সেই স্থান হইতে পুন গমন করিলা। বহু দেবালয় সেই ক্ষণেকে ভ্রমিলা॥
যতেক বিগ্রহ দেখি করেন প্রণাম ফাটিতে লাগিল সব দেখি অভিরাম॥"

অভিরাম অতি তেজস্বী ছিলেন, ভক্তিরত্নাকর বলেন— অভিরাম গোস্বামীর প্রভাব প্রচণ্ড॥" প্রচণ্ড প্রভাব বিশিষ্ট অভিরাম ঠাকুর এইরূপে প্রণাম করিয়া বরিয়া ভ্রমিতে লাগিলেন। শক্তিবিহীন বিগ্রহগণ তাঁহার প্রণাম সহ্য করিতে না পারিয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখিতে লাগিলেন, তাহার কানাইর অধিষ্ঠান কোথায় কোথায় আছেন। তিনিই বলিয়াছেন—

"জীবের তারণ আর বিগ্রহ দর্শন। প্রকাশ করিব সব করিয়া ভ্রমণ॥
দুই কার্য্য হেতু আমি ভ্রমিয়া বেড়াই॥"

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে অভিরাম কাজিপুরে (খানাকুল) উপস্থিত হইলেন। সেই খানে তাঁহার মন ভাববিশেষে প্রবিষ্ট হওয়ায় মুরলীর কথা স্মরণ হইল। সেই স্থানেই তিনি মালিনী দেবীর সহিত সম্মিলিত হন। যথা—

"এখানে কৃষ্ণ গ্রামে মালিনী লইয়া। নদীর তটেতে দুঁহে আছেন বসিয়া॥
মুরলীর কাষ্ঠ তবে দেখেন সেখানে। সে মর্ম্ম গোসাঞিজীউ জানেন সন্ধানে॥"

ঐ সময় তথাকার যবন কাজীগণ সেই খানে উপস্থিত হইলেন। কাজীগণ মালিনী দেবীকে যবন-কন্যা জ্ঞান করিয়া কহিলেন; যথা—

"উদাসী হইয়া তব কেন হেন রীত। বুঝিতে নারি যে এই তোমার চরিত॥
বৈরাগী হইয়া কেন না [illegible]। যবনের কন্যা কেন করিলে বাসনা॥"

ঐ সময় গোস্বামীর ইচ্ছায় (বংশীরূপী) এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ নদী জলে ভাসিয়া আসিল। তখন একটু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া—

সেই কাষ্ঠ শীঘ্র গিয়া তুলিলা গোসাঞি। এক হস্তে ধরি কাষ্ঠ বলেন তথাই॥
এই কাষ্ঠ সবে মিলি তুলহ ত্বরিতে। মোর সনে যুদ্ধ তবে করিবে পশ্চাতে॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিলা। শত লোকে পারে নাই কেমনে তুলিলা॥
এতেক ভাবিয়া সবে করিল বিনয়। কাষ্ঠ ধরা কভু আমাদের সাধ্য নয়॥"

অভিরাম তখন যবনগণকে মালিনী দেবীর মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য তাঁহাকে ঐ কাষ্ঠ খণ্ড তুলিতে ইঙ্গিত করিলে, মালিনী অনায়াসে ঐ সুবৃহৎ কাষ্ঠ উত্তোলন করিলেন। এতদৃষ্টে যবনগণ বিস্ময়াবিভূত হইল। যথা—

"ষোল সাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলিতে না পারে।
সেই কাষ্ঠ দেখ কন্যা অঙ্গুলিতে ধরে॥
এতেক বলিয়া সবে হইল সন্তোষ।
উদাসীর বেশ মাত্র ইহ সাধুজন। জীবের নিমিত্তে বুঝি করেন ভ্রমণ।",

অতঃপর গোস্বামী ভাববিশেষে আবিষ্ট হইয়া সেই কাষ্ঠ খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ফুৎকার দিলেন, পার্ষদ প্রবরের ফুৎকারে সেই কাষ্ঠে রন্ধ্রাদি হইয়া গেল, এবং তাহাই বাঁশী স্বরূপ অভিরামের হাতে শোভা পাইতে লাগিল। যথা—

"মালিনীর হাত হইতে কাষ্ঠ লইয়া।
মুরলী বাজায়ে কত করেন গর্জ্জন। বকুলের বৃক্ষতলে করিলা আসন॥"

অভিরাম ষোল সাঙ্গের অর্থাৎ ৩২ জন লোকের বহন উপযোগী কাষ্ঠ লইয়া বাঁশী বাজাইয়াছিলেন। (কিন্তু গত শ্রাবণ সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় শ্রীল চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই অভিরামের এত বহুসংখ্যক বংশী ছিল যে, তাঁহার ৩২ জন বংশী বাহকের প্রয়োজন হইত।" এই কথা আনুমানিক মাত্র। "বহুসংখ্যক" বংশী যে ছিল না, একটী মাত্র কাষ্ঠকেই বংশীরূপে বাজাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থ প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত আছে। যথা—

"অভিরাম মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥"

অর্থাৎ অভিরাম ষোল শাঙ্গের বা ৩২ জন লোকের বহনোপযোগী কাষ্ঠ খণ্ড তুলিয়া বাঁশী বাজাইয়াছিলেন।

খানাকুলে এই লীলা করিয়া অভিরাম মালিনীকে তথায় রাখিয়াই অন্যত্র

যাইতে মনে করিলেন। তিনি কোথায় কি জন্য যাইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে মালিনীকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন। যথা—অভিরামলীলামৃতে।

জানিলে কহিতে হয় শুনহ মালিনী। শ্রীকৃষ্ণ হইলা সেই রাধিকার ঋণী॥
সে ঋণ শোধিবে তিঁহ নদীয়া আসিয়া। অতেব মিলিব আমি তাঁহারে যাইয়া॥"

ইহার পরই অভিরাম নদীয়া আগমন করেন ও শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন।

অভিরামের নবদ্বীপাগমনের পূর্ব্বেই নিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল, বলিয়া অদ্য এই খানেই সমাপ্ত করা গেল। *

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

শ্রীঈশান নাগর ভুযী নহেন।

পাঠকগণ! গত ৯ই জ্যৈষ্ঠের ঢাকাপ্রকাশে তৎসম্পাদক মহাশয়, শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীঈশান নাগরের উপর কতকগুলি অন্যায় কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল অশাস্ত্রীয় অসার বাগ্‌জালের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে শ্রীহট্টের পণ্ডিতবর শ্রীবৈষ্ণবদাস মহানুভব, তৎসম্বন্ধে যে কিছু বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে ঢাকা প্রকাশের একটী কথার প্রত্যুত্তরে পবিত্রাত্মা বৈষ্ণবদাস যাহা লিখিয়াছেন, আমি অদ্য তাহার কিঞ্চিৎ পরিশিষ্ট লিখিয়া আপনাদিগকে উপহার দিতেছি।

ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন যে, "শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিশেষ কথা এই যে মহাবিষ্ণুর উপরেও আর একজন ভগবান করা হইয়াছে।"

অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, "বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য—শ্রীমদ্ভাগবতেও মহাবিষ্ণুর উপরে আর কাহারও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।"

---

* এ প্রবন্ধে "মুকুন্দ" প্রস্তাবের স্থান বিশেষের বিচার আছে। অতএব উক্ত প্রবন্ধের আর একটা কথা উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন "কৃষ্ণদাস চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের টীকা শ্রীজীব গোস্বামীকে প্র ত করিতে বলেন।" এ কথাটা গ্রহণযোগ্য ব'লে বোধ হয় না। শ্রীজীবকে টীকা করিতে দেওয়া অসম্ভব। তবে তখন শ্রীজীবের অনুমোদন বা সহি ব্যতীত নূতন গ্রন্থ প্রামাণ্য রূপে গৃহিত হইত না বলিয়া অনুমোদনার্থ দিয়াছিলেন। ব

সুবিজ্ঞ পাঠক! ভাবুন, এই যে, "আর একজন ভগবানের কল্পনা" ইত্যাদি শ্রীঈশান নাগরের স্বকপোল কল্পিত হয়, তবে অবশ্যই দোষের কথা। আর যদি পূর্ব্বতন শাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণ, মহাবিষ্ণুর উপরে আর একজন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে ঈশান নাগরের অপরাধ কি? তাঁহার উপর এত ঝাল ঝাড়াই বা কেন? পক্ষান্তরে যদি ঐরূপ ঋষিবাক্য থাকে তবে উহাকে "শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা" বলিয়াই বা কিপ্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কেন না, ঋষিগণের বাক্যই ত শাস্ত্র। আবার শাস্ত্র বাক্যই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র। অতএব এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা কিরূপ লিখিয়াছেন তাহাই দেখিতে হইতেছে। প্রথমে মহাবিষ্ণুর জন্মকথা বলিতেছি।

ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে পরব্যোম ধামের শীর্ষস্থানে শ্রীগোলকধাম। সেই গোলকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধিকার গর্ভে শ্রীমহাবিষ্ণুর জন্ম হয়। অতএব শ্রীরাধিকার একটী নাম হইতেছে মহাবিষ্ণু প্রসবিনী। যথা—

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা বহুসৌভাগ্যসংযুতা।
মহাবিষ্ণোঃ প্রসূঃ সা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মনা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণু প্রসূরপি॥—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে শ্রীমহাবিষ্ণুর জন্ম বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাৎ গর্ব্ভং দধারহ।
* * * *
সুসাবডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরং।
দৃষ্ট্বা ডিম্বঞ্চ সা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা।
উৎসসর্জ্জ সকোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে।
* * * *
অথ ডিম্বং জলে তিষ্ঠন্ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
ততঃ স্বকালে সহসা দ্বিধারূপো বভূব সঃ॥
তন্মধ্যে শিশুরেকস্য শতকোটী রবিপ্রভঃ।
ক্ষণং রোরূয়মানশ্চ স্তনান্ধঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা॥
মাতৃপিতৃপরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডনাথনাথো যো দদর্শার্দ্ধমনাথ বৎ॥

স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোঽপি নাম্না যো হি মহাবিরাট্ ॥
পরম র্ণর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থূলাত্তথাপ্যসৌ।
তেজসাং ষোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আধারোঽসংখ্যবিশ্বানাং মহাবিষ্ণুশ্চ প্রাকৃতঃ ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

তত্বঃ শ্রীমহাবিষ্ণু গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের একাংশ।

তেজসাং ষোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।—তত্রৈব।
সুবিস্তৃতে জলাধারে শয়ানশ্চ মহাবিরাট্।
রাধেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ষোড়শাংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥—তত্রৈবান্যত্র।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা বিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়ঃ।

এই মহাবিষ্ণুই (নামান্তর মহাবিরাট) এক মূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত শয্যায় শয়িত থাকিয়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্যসম্পাদন করাইতেছেন।

এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীঅনন্তদেব সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া এই মহাবিষ্ণুর ছত্রের কার্য্যসম্পাদন করিতেছেন। মহালক্ষ্মী ইহাঁর শ্রীচরণ সেবায় নিযুক্ত আছেন। কল্পভেদে ইহাঁরই নাভিতলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার জন্ম। "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-মিত্যাদি ভাগবতপদ্যই তাহার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী মহাবিষ্ণুই "জগৃহে পৌরুষং রূপং "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্য সকলের লক্ষ্য স্থল। ব্রহ্মাদি দেবগণ, কার্য্যানুরোধে ক্ষীরপয়োনিধির কূলে গিয়া স্তবাদি দ্বারা ইহাঁকেই প্রতিবোধিত করেন। এতৎসম্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণ অনেক আছে বাহুল্য ভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

তবে এখন বৈষ্ণবগণের সর্ব্বাপেক্ষা মান্য শ্রীমদ্ভাগবত, মহাবিষ্ণুর উপরে আর একজন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কি না তাহাই দেখিতে হইতেছে। পাঠক মহাশয়! শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে দেখা যায় যে ভারাক্রান্তা পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে করিতে আপনার মনোবেদনা জানাইলে—

"ব্রহ্মাতদুপধার্য্যাথ সহদেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স ত্রিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥"

ব্রহ্মা ক্ষীরপয়োনিধির তীরে উপস্থিত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী জগৎপতি মহাবিষ্ণুকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা স্তব করিলে সমাধি অবস্থায় আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন।

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতং নিশম্য বেধা স্ত্রিদশানুবাচহ।

গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন র্বিধীয়তা মাশু তথৈব মাচিরং ॥ ভাঃ দঃ সমাধৌতত্রগগনে সমীরিতাংমিতি ক্ষীরোদনাথস্যাপি ব্রহ্মণাপি দুর্লভ দর্শনত্বং। পৌরুষীং পুরুষস্য ক্ষীরোদনাথস্য গাং বাচং।—শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা।

ব্রহ্মা সমাধি অবস্থায় ঐ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সহচরগণকে কহিলেন, অহে অমরগণ! তোমরা ক্ষীরোদনাথের বাক্য শ্রবণ কর, আর সেই বাক্যানুসারে কার্য্যে প্রবর্ত্ত হও! অত্র স্থানে ব্রহ্ম আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন ইহাতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীরোদনাথকেও সহজে দর্শন প্রাপ্ত হন না।

পুরুষস্য বাচ মেবানুবদতি। ইতি টীকাকারঃ—

ব্রহ্মা সেই ক্ষীরোদনাথের বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন, অর্থাৎ ক্ষীরোদনাথ যাহা বলিয়াছেন অবিকল তাহাই বলিতেছেন।

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুধূপ জন্যতাং।
স যাবদুর্ব্ব্যাভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকাল শক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্‌ভুবি ॥ তত্রৈব।
বিজ্ঞাপনাৎ পুরৈব পুংসা ঈশ্বরেণ। ইতি শ্রীধর স্বামীঃ।
পুংসা—স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন। চক্রবর্ত্তী তোষণী টীকাকারৌ।

ঈশ্বরেশ্বর ইতি। ক্ষীরোদনাথাদয়ো বয়মীশ্বরাঃ অস্মাক মপীশ্বরঃ। চক্রবর্ত্তী

ব্রহ্মা কহিলেন, ক্ষীরোদনাথ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, অয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ! তোমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী দেবীর মনোবেদনা অবগত আছেন। সেই ঈশ্বরেশ্বর; (অর্থাৎ আমরা ক্ষীরোদনাথাদি যে দৈবত ঈশ্বর, আমাদিগের ও ঈশ্বর) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারহরণ কার্য্যে যাবৎ মর্ত্তাধামে বিচরণ করিবেন, তাবৎকাল মধ্যে তোমরা অংশ দ্বারা যদু প্রভৃতির কুলে জন্মগ্রহণ কর।

এখন বুঝিয়া দেখুন! ক্ষীরোদনাথ কহিতেছেন, তোমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই সেই ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ধরাজ্বর অবগত আছেন, সুতরাং ক্ষীরোদ নাথের উপরেও যে আর একজন ভগবান্ আছেন একথা স্বিরিকৃত হইতেছে কিনা? ক্ষীরোদ নাথই যে মহাবিষ্ণু, তৎ প্রমাণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি

তবে আরও দুইটী প্রমাণ দিয়া পূর্ব্ব প্রমাণের দৃঢ়তা সম্পাদান করিতেছি। যথা পদ্মপুরাণে—বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধি মন্দিরং। বৃহৎ সহস্র নামস্তোত্রে।

দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড সংস্থিতং। সাত্বত তন্ত্রে।

এই অণ্ডসংস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাবস্থিতই মহাবিষ্ণু। পঠিক মহাশয়! এ সকল বিষয়ে ভূরিশঃ প্রমাণ আছে—পুরাণাদি শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। তাহাতে যদি আলস্য করেন তবে শ্রীভগবৎ সন্দর্ভগ্রন্থ এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃতাদি গ্রন্থ দেখিবেন। যদি সংস্কৃত ভাষা না জানেন তবে বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ খানি দেখিবেন, তবেই সন্দেহ নিরসন হইবে। ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্রেই শ্রীশঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মহাবিষ্ণু, মৎস্যাদি অবতারগণকে শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় পদ্য এবং "রামাদি মূর্ত্তিষুকলা নিয়মেন তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা পদ্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিতবর শ্রীঈশাননাগর গোস্বামী, এই সকল শাস্ত্র বাক্য দেখিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছেন অতএব তিনি নিরপরাধী। বুঝিবার দোষে মহজ্জনে অযথা কলঙ্কার্পণ করিলে মহদতিক্রমজনিত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়।

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, উখলী।

চৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার।

ষষ্ঠ উপদেশ।

দেবলেশ্বর শিব দর্শন পূর্ব্বক মহাপ্রভু জিজুরী নগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে খাণ্ডবা নামে এক মহাদেব মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার কতক গুলি সেবাদাসী ছিল। ইহারা মুরারী নামে খ্যাত ও অশেষ পাপাশক্তা পতিতারমণী। বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, মহাপ্রভু ইহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

"তোমরা সকলে কায়োমনোবাক্যে সর্ব্বদা হরিনাম কর; নামবলে অবশ্যাই নিত্যধাম পাইবে। হরি অগতির গতি ও পরম দয়াল, অন্য পতি বা উপপতির আশ্রয় ও আশা পরিহার পূর্ব্বক, সেই পতিতপাবন হরিকেই সকলে স্বস্ব স্বামী রূপে চিন্তা কর; ব্রজে ব্রজগোপীগণ হরিকে পতিরূপে

প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রশুদ্ধ মনে ও নৈষ্ঠিক ভাবে ভগবতী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; এবং সেই ব্রতফলে কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তোমরাও সেই ব্রজরমণীদিগের পন্থানুসরণ কর শ্রীকৃষ্ণকে পতি ভাবে ভজনা কর। নিশ্চয় জানিবে সেই দয়াময় হরিই সমগ্র জগতের এক মাত্র পতি, অন্য পতি ভ্রম মাত্র। সর্ব্বদা ভক্তিভরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে থাক; এবং সর্ব্বদা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' এই সুমধুর নাম জপ কর। নাম বলে ত্রিতাপ ভস্মীভূত হইবে এবং নামবলে অসংখ্য অগণিত কলুষরাশি বিদূরিত হইবে। যদি কেহ মোহ বশতঃ পাপ কর্ম্ম করে, তবে একবার বদনে হরিনাম লইলেই সেই পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

চোরা নন্দীবনে নারোজীনামে এক ভীষণ দস্যুদলপতি সদলে বাস করিত। নরহত্যা, পরস্বাপহরণই এই দস্যুদলের নিত্যব্রত ছিল। জীবোদ্ধার বিশেষতঃ মহাপাপীর উদ্ধারই যখন মহাপ্রভুর একমাত্র কার্য্য, তখন নারোজী সে অসীম দয়ার ফল ভোগী কেন না হইবে। তিনদিন দস্যুদল মধ্যে বাস করাতে, দস্যুগণ মহাপ্রভুর অতুল রূপ দেখিয়া তদীয় ভক্তির আবেগ দর্শন করিয়া, তদীয় শ্রীমুখে হরিনাম গান শ্রবণ করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সকলের মনেই পাপের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা হইয়াছিল; সকলের মনই পুণ্য পথে ধাবিত হইয়াছিল। দলপতি নারোজী অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন—

"ষাটিবর্ষ বয়ঃক্রম হ'য়েছে আমার। পাপ কার্য্য না করিব ছাড়িব সংসার॥
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণ তনয়। মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয়॥
উদর পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা দিলে। তবে কেন থাকি মুই দস্যুসহ মিলে॥
বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্ম্মের প্রতি। আর না রহিব মুই দস্যুদল পতি॥"

ইহা কহিয়া নারোজী ও তদীয় দলস্থ লোক স্বস্ব অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মহাপ্রভুর মুখ পানে তাকাইয়া তদীয় নয়নাভিরাম রূপ দর্শন করিতে লাগিল ও তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন দলপতিকে উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু দস্যুদিগকে বলিতে লাগিলেন—

"সংসারে দুইটী বস্তুর প্রয়োজন; অন্ন ও বস্ত্র। চীরপরিধান করিলেই বস্ত্রের কার্য্য হয়; এবং সুমিষ্ট ভিক্ষাতেই উদর পূর্ত্তি হয়। সুতরাং সংসারে অর্থ সঞ্চয়ের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু, যাহাদিগের জন্য অর্থার্জ্জন কর, তাহারা তোমার কেহ নয়। এবং তুমিও তাহাদের কেহ

নও। তবে পরের জন্য পাপ করিয়া অর্থোপার্জ্জন কি উন্মত্ততা নহে ? এক-বার ভাবিয়া দেখ বা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহারা কেহ তোমার পাপের অংশী হয় কি না ? তবে পাপ করিয়া, আত্মাকে কলুষিত করিয়া, আত্মাকে ধ্বংস করিয়া কেন অর্থ উপার্জ্জন ও অর্থ সঞ্চয় কর? মুষ্টিমেয় অন্নে গণ্ডুষমাত্র নির্ঝর বারিতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়; তবে বহু খাদ্যাদি সংগ্রহই বা কেন কর ? কুবের সদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগকেও প্রেতপুরে যাইতে হইবে, এবং যে পথে দরিদ্র তথা যাইবে, সেই সকল ধনাঢ্য-দিগকেও সেই পথেই যাইতে হইবে, পথান্তর নাই। মৃত্যুর পর সম্রাট ও ভিক্ষা-ভোজীতে কিছু মাত্র প্রভেদ থাকিবে না। অতএব সংসার ও সংসার-চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেম-ভক্তি সহকারে ভগবানের নাম কর।"

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

—:০:—

প্রার্থনা।

ভকতি সায়র, মথিয়া গোউর, জগতে দিয়াছ নাম।
সো হেন অমিয়া, মোহেতে মজিয়া, পিতে না হইল কাম॥
মোর জনম বহিয়া গেল।
বিষম বিকারে, তনু-মন জরে, হিয়া উতপত ভেল॥
দিবস যামিনী, কনক কামিনী, সেবা অনুরত চিত।
ভুঞ্জি পুনঃ পুনঃ বাড়য়ে দ্বিগুণ, আশা নহে তিরপিত॥
নামে পাষাণ দরব ভেল।
দারুণ পাষাণ, এ মঝু পরাণ, তেমতি রহিয়ে গেল॥
করম বিপাকে, ভ্রমি আন দিকে, পরেছি মোহের ফাঁসি।
সে দৃঢ় বন্ধন, করাহ ছেদন, বিতর করুণা রাশি॥
মো সম পামরে, যদি কৃপা ক'রে, প্রেম রসে কর ভোরা।
ত্রিজগত বাসী, গাবে নিশি দিশি, অমিয়া পাবন গোরা॥

ভক্তিহীন—দাস অমিয় গোপাল।

সরোদন প্রার্থনা।

১

হা ! হা ! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতপাবন,
আর্ত্তবন্ধু কৃপাময় করুণা-সাগর ;
অগতির গতি তুমি অধম তারণ,
আমাকে করুণা কর প্রভু বিশ্বম্ভর ;

২

সাধন ভজন হীন নাই সদাচার,
কুসঙ্গে কু-আলাপেতে যেতেছে সময় ;
জুড়াইতে প্রাণ গুণ গাইয়া তোমার,
পারি না সতত বাধা উপনীত হয় ;

৩

যে করেছে বহু পুণ্য জন্ম জন্মান্তরে,
অথবা এ জন্মে পুণ্য করেছে যে জন ;
সে জন তোমার গুণ প্রসন্ন অন্তরে,
গাইয়া সফল করে আপন জীবন ;

৪

আমি অতি অপরাধী নিজ কর্ম্ম ফলে,
রোগে শোকে যন্ত্রণায় হয়েছি কাতর ;
জ্বলিছে হৃদয় সদা দুশ্চিন্তা অনলে,
দিবারাত্র বিষাদিত আমার অন্তর ;

৫

মলিন মনেতে নহে তোমার স্মরণ,
মায়ায় হইয়া মুগ্ধ আমি মন্দমতি ;
তোমার চরণে প্রভো ! আত্ম সমর্পণ,
না করিয়া ভোগিতেছি মহান্ দুর্গতি ;

৬

যাতনা ভাবনা ছাড়া করিয়া আমারে,
দান দাও তোমার ভকত পদ পাশ ;
আধ মরা হয়ে আছি গৃহ কারাগারে,
সংসার চিন্তায় বুদ্ধি করিল বিনাশ ;

৭

তোমার ভক্তের পূজা তোমার ভজন,
যে সংসারে থাকি হয় সে সুখ সংসার ;
তেমন সংসার নাহি ছাড়ে কোন জন,
ভকতি বিরোধী প্রভো ! সংসার আমার

৮

এ ঘোর যন্ত্রণা হতে গৌরভগবান্,
পতিতপাবন গুণে করহ উদ্ধার ;
এ কালে পতিত নাই আমার সমান,
কোন বল নাই বিনা করুণা তোমার ;

শ্রীরাজীবলোচন দাস। শ্রীহট্ট।

বিরহ।

মরণ মঙ্গল মোর বিহনে শ্রীহরি। কৃষ্ণ বিনে এ জীবনে বাঁচিয়া কি করি ॥
জীবনে না হ'ল যদি কৃষ্ণ দরশন। কি ফল রাখিয়া তবে এ ছার জীবন ॥
প্রাণ দিয়ে প্রাণ কৃষ্ণ পাই যদি সখি। প্রাণ অন্তে প্রাণ কান্তে নিয়ে হব সুখী ॥
কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ রাখিয়া কি ফল। যে দেহে নাই কৃষ্ণ চিহ্ন সে দেহ বিফল ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

শশিশেখর-পদাবলী।

সুচারু চন্দ্রিকা ফুটল জানি। শ্যাম অভিসারে চলিল ধনি॥
লোটয়ে লম্বিত মালতী মাল। সৌরভে মাতল ভ্রমর জাল॥
কুচ গিরিফল চন্দন মাখা। নূপুর ধবল বসনে ঢাকা॥
সোণাতে জড়িত মুকুতা কশা। ওষ্ঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাসা॥
গজ-দশনের সুচারু শাঁখা। করমূলে কিবা দিয়াছে দেখা॥
নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি। শশী কহে কুঞ্জে মিলল গোরি॥

আজি অদভুত তিমির রঙ্গ, আপনি না চিনে আপন অঙ্গ,
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ, অঙ্কুশ নাহি মান রে—
সাজল ধনি শ্যাম বিহার, সিঁথি নির্দ্ধুত কবরী ভার,
নীলোৎপল রচিত হার, কণ্ঠহি অনুপম রে—
নীল বসন সোণার গায়, কি মেঘে বিজুরী লুকিয়া যায়,
মদন-দীপ পথ দেখায়, অনুরাগ আগুয়ান রে—
পরিমল পাই ভ্রমর পুঞ্জ, বৈঠল আসি চরণ-কুঞ্জ,
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ, লালস মধু পান রে—
মুখমণ্ডল শশী উজোর, হেরি ধায়ল তাঁহ চকোর,
উড়িয়া পড়ত হই বিভোর, চাহে পীযূষ দান রে—
পথে পরমাদ হেরিয়া রাই, নীল বসনে মুখ ছিপাই,
সঙ্কেত বন মিলল যাই, যাঁহা নিবসই কান রে—
রাই আগমন নিরখি কান, শীতল ভেল তপত প্রাণ,
নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান, আদরে আগুসার রে—
আইস আইস বলি ধরল হাত, লহু লহু লহু পুছত বাত,
শশী কহে শুন পরাণ নাথ, আজি বড় আঁধিয়ার রে—

হরি অভিসার কাজে। উলটা সকল সাজে॥
মাথে মুকুতার মালা। হিয়াতে হেম মেখলা॥
চরণে কঙ্কণ পরি। ত্বরিতে চলিলা গোরি॥
নূপুর পাণির মূলে। অঞ্জন রঞ্জন ভালে॥

সিন্দুরে অরুণ আঁখি। চিবুকে চন্দন রাখি॥
হেন বিপরীত বেশে। মিলিল শ্যামের পাশে॥
শশিশেখর পহুঁ। হেরি হাসে লহু লহু॥

তলপ রচিয়া রসের ভরে। আপনার তনু ধরিতে নারে॥
সখীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়। কেহ তাল ধরে কেহ বাজায়॥
আনে নাচাইয়া আপনি নাচে। শ্রম-জল নীল বসনে মুছে॥
কর্পূর সহিত খপুর পান প্যারি হাসে ভাসে রসের বাণ॥
সখীগণ সঙ্গে ঝমকে খেলে। বধূজনে শশিশেখর বলে॥

ভক্তি-ভিক্ষু—শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পঞ্চ মাধব।

মাধব ঘোষ। মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনে এক মাধব ঘোষের নাম পাওয়া যাইতেছে,—

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

আর নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা গণনায়ও এক মাধব ঘোষের নাম পাওয়া যাইতেছে,—

শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়া গণে। নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যার গানে॥

তবে কি মাধব ঘোষ দুই জন? না; দুই নহে। একই ব্যক্তি উভয়ের শাখায় উল্লিখিত। তাহাই দর্শনে জানা যাইতেছে; মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনে—

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভুর আজ্ঞায় আইলা॥

শ্রীরামদাস মাধব বাসুদেব ঘোষ। নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে—

"শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।
নিত্যানন্দ আজ্ঞা যবে গৌড়ে যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন। মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি। ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিলা কৈল বাঁশী
গদাধর দাস গোপী ভাবে পূর্ণানন্দ। যাঁর ঘরে দান খেলা কৈলা নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়া গণে। নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করেন প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাঁহার শ্রবণে॥"

অতএব দুই গণে দোঁহার গণন। মাধব বাসুদেব ঘোষের বিবরণ॥

এই বাক্য দ্বারা দেখা যাইতেছে,—রামদাস, (নামান্তর অভিরাম গোস্বামী) গদাধর দাস, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ; ইহাঁদিগের দুই গণেই গণনা আছে। সুতরাং দুই গণের মাধব ঘোষই যে এক ব্যক্তি, তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। দীপিকা ও চরিতামৃতের এক বাক্যতা করিলে তাহাই প্রতীতি হইবে। দীপিকায় এই মাধব ঘোষের স্বরূপ রসোল্লাসা সখী।

পাঠক! চৈতন্য চরিতামৃতের মাধব সপ্তকই যে দীপিকায় মাধব পঞ্চক রূপে পরিণত; তাহা আবার সংক্ষেপে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১ম মাধব ঘোষ। দীপিকায় স্বরূপ রসোল্লাসা সখী, পঞ্চম মাধবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাপ্রভুর শাখার মাধব ঘোষ ও নিত্যানন্দ প্রভুর শাখার মাধব ঘোষ, একই ব্যক্তি, দুই গণে বর্ণিত মাত্র।

২য় মাধাই—মাধব। দীপিকায় স্বরূপ বিজয়। দ্বিতীয় মাধবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাপ্রভুর শাখার মাধাই আর নিত্যানন্দ প্রভুর শাখার—

"নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।"

এই পয়ারস্থ মাধব একই ব্যক্তি দুই গণে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

৩য় মাধব—গঙ্গাবল্লভ মাধব আচার্য্য দীপিকায় স্বরূপ শান্তনু। এই তিন জন নিত্যানন্দ শাখা। নিত্যানন্দ শাখায় এই তিন মাধব ব্যতীত আর মাধব নাই।

৪র্থ মাধব—মহাপ্রভুর শাখার মাধব আচার্য্য, ইহাঁর অন্য উপাধি মিশ্র। দীপিকায় ইহাঁর স্বরূপ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রকাশ অর্থাৎ বৃষভানু। বৃষভানু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি রূপে পণ্ডিত গোস্বামীর গুরু এবং মাধব মিশ্র রূপে পণ্ডিত গোস্বামীর জনক হইয়াছেন। তৃতীয় মাধবে এই তত্ত্ব প্রকাশ করা গিয়াছে। মহাপ্রভুর শাখায় এই মাধব আচার্য্য ব্যতীত আর মাধব আচার্য্য নাই।

৫ম মাধব—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তাত ভাই, কালিদাসের পুত্র মাধব আচার্য্য। ইনি "কৃষ্ণমঙ্গল" রচয়িতা। ইনিই অদ্বৈত প্রভুর শাখার মাধব পণ্ডিত। দীপিকায় ও প্রেমবিলাসে ইহাঁর স্বরূপ মাধবী সখী। চতুর্থ মাধবে ইহাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করা গিয়াছে। অদ্বৈত শাখায় এই মাধব আচার্য্য ব্যতীত আর মাধব নাই।

পাঠক! দেখিবেন দীপিকায় ও চরিতামৃতে মাত্র পাঁচ মাধবই পাওয়া গেল। এই পাঁচ মাধব ব্যতীত গৌরগণে আর মাধব নাই।

বৈষ্ণবাচার দর্পণে—

"সুধীরা যে সখী মাধব আচার্য্য এবে। সনাতন মিশ্র পুত্র সুধীরা জানিবে॥"

গ্রন্থ রচয়িতা প্রভুপাদের এই লেখা ভ্রমপূর্ণ, তাহা প্রভুপাদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্তের স্বরূপ সুধীরা সখী, ইহার প্রমাণ প্রেমবিলাসে আছে।

প্রতিবাদক বৈষ্ণব আচার দর্পণের লেখা দ্বারা কোন কোন পাঠককে ধান্ধায় ফেলিয়াছেন, এখন তাহাই নিরসন করা যাইতেছে। দীপিকা ও চরিতামৃতাদির সহিত বৈষ্ণব আচার দর্পণের মাঝে মাঝে বিরোধ দেখা যায়। তাহার কারণ গ্রন্থ রচয়িতার ভুল।

শ্রীপাদ নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু ১২৬৭ সনে বৈষ্ণব আচার দর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রভুপাদের ভ্রম দৃষ্ট হয়, আমি ভ্রম দেখাইয়া প্রভুপাদকে পত্র লিখি, প্রভুপাদ পত্রান্তরে আপনার ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আমার প্রদর্শিত ভ্রম ও প্রভুপাদের পত্রগুলিন ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনন্দকুমার গোস্বামী।

গৌর ও গয়া।

গয়া একটী প্রাচীন তীর্থ। এ তীর্থ পিতৃগণের। পিতৃগণের উদ্দেশে এখানে শ্রাদ্ধতর্পন না করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয় না। পিতৃঋণ শোধ করিতে না পারিলেও জীব ধর্ম্মজগতে প্রবেশের অধিকারী হয় না। এই ত গম্ভীর শাস্ত্র-বাক্য। সেই শাস্ত্র-বাক্যের উপর আস্থা রাখিয়া জীবশিক্ষার নিমিত্ত নবদ্বীপের নিমাইপণ্ডিত গয়া দর্শনে সংকল্প করিলেন। এই সময়ে নিমাইয়ের বয়ঃক্রম কিঞ্চিৎন্যূন দ্বাবিংশতিবর্ষ, পূর্ণ-যৌবন। নিমাই পণ্ডিত লাবণ্যের বিলাসভূমি। নিমাই পণ্ডিত নদিয়া নাগরীগণের লক্ষ্য স্থল। নিমাই পণ্ডিত কুটতার্কিক ও ন্যায়-দর্শন বাদিদিগের বিদ্বেষ ভূমি। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার ছাত্রগণের জীবন স্বরূপ। যাহারা নিমাইয়ের কাছে পড়িয়াছে, তাহারা নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলে আর কাহারও কাছে পড়ে নাই। সেই নিমাই পণ্ডিত আজ সমীচিন শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্য এবং পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত লোকশিক্ষা হেতু গয়া ধামে উপস্থিত। সঙ্গে কতিপয় ছাত্র মাত্র। নিমাই

যে সময় গয়াধাম দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন সেই সময় এই পথ অতি দুর্গম ছিল। নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পথে হিংস্র জন্তুর ভয় অপেক্ষা দস্যু ভয়েরই আধিক্য ছিল। নিমাই পথে আসিতে আসিতে জ্বরে আক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্থাপন নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়াছিলেন।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

নিমাই ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সম্মান করিয়া গিয়াছেন তাহার একমাত্র প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।

নিমাই ক্রমশঃ গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। নিমাই গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে চক্র-বেড় মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপদ দেখিতে যান। এই বিষ্ণুপদ দেখিবার সময় নিমা-ইয়ের চক্ষে অজস্র প্রেম-বারি প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর মিলন হয়। নিমাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন অগণ্য লোক ভক্তিভাবে বিষ্ণুপদে মাল্য ও পিণ্ড দান করিতেছেন। আজ আমাদের প্রাণের নিমাইও ভক্তিভরে বিষ্ণুপদে মাল্য চন্দন ও পিণ্ড দিতেছেন আর চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। নিমাইয়ের অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই ভাবিতেছেন এমন ভক্তত কখনও দেখি নাই। নিমাই-য়ের এই ভাবে সকলেই বিমুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে আর এক জন ছিলেন, তিনি নিমাইয়ের ভাবে নিমাইয়ের অপূর্ব্ব প্রেম দেখিয়া চক্ষু আর অন্য দিকে ফিরাইতে পারিতেছেন না। অন্যান্য দর্শকগণ চলিয়া গেল; কেহ কেহ নিমাইকে আড় চোকে দেখিতে দেখিতে কেহ বা নিমাইয়ের রূপ চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে করিতে, স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। কিন্তু একব্যক্তি মাত্র সেখানে থাকিয়া অনন্যচিত্তে গৌরহরিকে দেখিতেছেন।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনি কোন্ মহাত্মা। ইঁহার নাম শ্রীঈশ্বর-পুরী। কতক ক্ষণ দেখিতে দেখিতে ইনি বলিলেন,—"শ্রীমান্ আপনার নিবাস নবদ্বীপে নয়? আপনি না নবদ্বীপে অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন? আমি আপ-নাকে নবদ্বীপে দেখিয়াছিলাম; আপনি সেই পরব্রহ্মের অংশ।" প্রাণ-গৌর পরে ঈশ্বরপুরীর সহিত আলাপ করিলেন। গৌর তাঁহাকে প্রেমময় জানিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীও সেই প্রেমালিঙ্গনেই

স্নিগ্ধ হইলেন। উভয়ের বিবিধ আলাপে উভয়ে তুষ্ট হইলেন। তখন নিমাই কহিলেন;—"শ্রীপাদ! আপনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন। আমি পিতৃকার্য্যাদি শেষ করিয়া পরে আপনার সহিত মিলিত হইব।" তদুত্তরে পুরী কহিলেন;—"শ্রীমান্! অবস্থানের কো স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে যে দিন কৃষ্ণ যেখানে রাখেন সেই খানে থাকি। আপনার পিতৃকার্য্য শেষ হইলে আবার মিলন হইবে।" ইহা বলিয়া ঈশ্বরপুরী অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। আমাদের নিমাইও পিণ্ডদানোদ্দেশে গমন করিলেন।

আমরা দুই মাস ধরিয়া অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু নিরতিশয় দুঃখের বিষয় কেহই আমাদের নিমাইয়ের কথা কিছু বলিতে পারে না। আমরা বিষণ্ণ বদনে গয়াতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত অন্য কিছু প্রমাণ না দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম যদি কোন লোক বলিতে পারে, নিমাই এই গয়াক্ষেত্রে আসিয়া কোথায় বাস করিয়াছিলেন এবং ইহার অন্তর্বর্ত্তী কোন্ স্থানে পিণ্ডাদি দিয়াছিলেন তাহাহইলেই আমি তাহার নিকট চিরবিক্রিত হইয়া থাকিব। অনেক অনুসন্ধান করিতে আজ প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল একটী ব্রাহ্মণ (প্রাচীন) আমার নিকট আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপ্ কাঁহা সে আয়ে, আওর ইহা কোন কাম কর্ত্তে হেঁয়।"

আমি তাহার প্রকৃত উত্তর দিলাম। তিনি আমার উত্তরে আমার নিবাস নবদ্বীপ শুনিয়াই যেন আহ্লাদে আট্খানা হইলেন এবং বলিলেন;—"ইহা এক জাগা হ্যায় যাঁহা নদিয়া কা এক ভারী পণ্ডিত আয়া রহা।" আমরা নদিয়ার ভারী পণ্ডিতের নাম শুনিবা মাত্র কহিলাম,—"সে পণ্ডিতের নাম কি?" তিনি কহিলেন, নিমাই পণ্ডিত। তখন আমার কৌতূহল অতিশয় প্রবল হইল। আমি তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিত এখানে আসিয়া কোথায় প্রথমে ছিলেন ইত্যাদি কিংবদন্তী। কিছু শ্রুত আছেন কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কহিলেন;—"হাঁ এক পাথরকা উপর উন্‌কা নাম লিখা হ্যায়, দেখায় সক্তা হুঁ চলিয়ে।" আমি অনতিবিলম্বে একখানি গাড়ী আনাইয়া দুই জনে সেই পাথর খানি দেখিতে চলিলাম।

ব্রাহ্মণটী আমাকে সঙ্গে লইয়া মঙ্গলা-গৌরীদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলেন। সেই স্থানের সন্নিকটে একটী গুহা আছে। উহা দেখিয়া বলিলেন, আমি আমার বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এই স্থানটী গয়ার তীর্থ-

ভূমি। এখানে নিমাই পণ্ডিত আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সমস্ত দিন পরিভ্রমণের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া খাইতেন। কোন দিন বা জুটিল তো বিষ্ণুপ্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। কোন দিন বা রন্ধন করিয়া খাইতেন। তার পর বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম একজন নদীয়ার সাধু আসিয়া এখানেই ছিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি আর কিছু দেখাইতে পারেন কি না? যাহা দেখিলে আমার মনে প্রীতি হয় তাহাই দেখাউন। আমার ইহাতে প্রত্যয় হইতেছে না।" তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বাঙ্গালী ধরমকো কব মানতা?" আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "যেখানে নিমায়ের নাম লেখা সেই স্থানে লইয়া চলুন।" "আচ্ছা, চলিয়ে, ইঁয়াই পাথর দেখাতেহেঁ।" আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীরামযাদব বাগ্চি।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ।

—:***।***:—

আহ্বান।

(১)

সুনীল গগনে, সোণার বরণে, উদিল শীতলচাঁদ।
শীতল কিরণে, জগবাসী জনে, ঘুচাইল পরমাদ॥
চারিদিকে তারা, হ'য়ে মাতয়ারা, ফুটিল গগন গায়।
মিটি মিটি চায়, চাঁদের প্রভায়, জগত ভাসিল তায়॥

(২)

হের রে নয়নে, সোণার বরণে, ভুবন করেছে আলো।
যোগী যোগাসনে, যাহার ধেয়ানে, কাটায় অনন্তকাল॥
সেই বস্তু খানি, আপনাআপনি, আসিয়া প্রকাশ হলো॥
এমন সুযোগ, এই শুভযোগ, হবে না হ'য়েছে আর।
ধন্য কলিকাল, হইয়ে দয়াল, ভক্ত ভাবে অবতার॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ, অগণ্য মহান্ত, উদিল নদীয়াপুরে।
জগতবাসীর, হৃদয়-কুটীর, ভরিল প্রেমের নীরে॥
নাহি দুঃখ লেশ, আনন্দ আবেশ, পরাণ ভরিয়া হেরে।
হাসে নাচে গায়, ভূমে পড়ি যায়, প্রেমবশে হ'য়ে ভোর॥

(৩)

বৃন্দাবন ধন, গোপিকা মোহন, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা যার।
নবজলধর, শ্যামল সুন্দর, শোধিতে রাধার ধার ॥
লুকায়ে সে অঙ্গ, হ'য়েছে গৌরাঙ্গ, কাঙ্গাল দেখিয়া দেশ।
কাঙ্গাল জীবের, করিতে উদ্ধার, ধরেছে কাঙ্গাল বেশ ॥
যখন যে ভাব, ধরার স্বভাব, সেই ভাবে অবতরি।
জগৎ তারিল, জীব নিস্তারিল, হইয়ে গৌরাঙ্গহরি ॥

(৪)

আয় ভাই আয়, দেখিগে তাহায়, লইয়ে প্রেমের ভেট।
প্রেমময় গোরা, নবরসে ভোরা, অমিয় মুরতি ঠাট ॥
হ'য়েছে সমাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ আজ, মিলিবে সকল সাথে।
ঐ দেখ বন্ধু, করুণার-সিন্ধু, ভ্রমিতেছে পথে পথে ॥
(বলে) আয় আয় জীব, করিব সজীব, ডুবাইব তোরে প্রেমে।
যাহা কোন জন, দেখেনি কখন, দেখাব আনিয়া ধামে ॥

(৫)

গৌরাঙ্গ-সমাজ, হইয়াছে আজ, ছিল যা গোপত হয়ে।
প্রভুর কৃপায়, হয়েছে উদয়, ভকত প্রেমিক লয়ে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য দেখি হীন বীর্য্য, ডাকিল হুঙ্কার করি।
বৈষ্ণব সমাজ, বৃদ্ধি কর আজ, আসিয়া গৌউর হরি ॥

(৬)

সমাজ সহিত, আসিল ত্বরিত, সব আশা পূর্ণ করে
পূরিল রে আজ, গৌরাঙ্গ-সমাজ, বহু যুগ যুগান্তরে ॥
যে যেখানে থাক, গোরা ব'লে ডাক, সমাজে আসিয়া মিল
থেকনা গোপনে, সমাজ বিহনে, আর নাহি ক্ষণকাল ॥

(৭)

প্রেমধন যার, হৃদয় মাঝার, দিয়াছে গৌউরহরি।
সে কি কভু পারে, থাকিতে অন্তরে, গৌরাঙ্গ-সমাজ ছাড়ি
কি যেন পিপাসা, মিলিবার আশা, পশিবে অন্তরে তার।
খুঁজিবে যতনে, করি প্রাণপণে, কোথায় কুটুম্ব তার ॥
জ্ঞানী মুর্খ মেলি, করে কোলাকুলি, হৃদয়ে পশিলে গোরা।
নাহি জাতি ভেদ, নাহি বর্ণ ভেদ, গঠিছে সমাজ তারা ॥

(৮)

উদিলে চন্দমা, যায় নিশা অমা, সুন্দর আলোক হয়।
সেই সে আলোকে, হইয়া পুলকে, স্পষ্ট সব দেখা যায়॥
তেমতি গৌউর, সুন্দর নাগর, হৃদয় আঁধার নাশি।
আপনা আলোকে, পুলকিল লোকে, ভকত হৃদয়ে পশি॥

শ্রীমুকুন্দলাল সরকার।

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ নিম্ন-লিখিত পত্র খানি লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে পত্র খানি সত্বর শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে। পত্র খানি এই ;—

"শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ সম্বন্ধে অনুষ্ঠান পত্র এবং প্রথম অধিবেশন ও নিয়মাবলী পাঠে আনন্দিত হইলাম। যাহাতে পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত এই আলোক বিস্তারিত হয় ইহাই আমার প্রার্থনা, তদুপযোগী দুইটি নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল। সমাজের অনুমোদন যোগ্য হইলে কৃতার্থ হইব।

১। প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের বহুপ্রচারই জীবের মঙ্গলের নিদান। অতএব বঙ্গবাসীর সুলভ শাস্ত্র গ্রন্থাবলীর ন্যায় সুলভ মূল্যে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, কিম্বা বার্ষিক মূল্য নিরূপিত হইয়া মাসিক পত্রিকাকারে পৃথক্ পৃথক্ পত্রাঙ্কে চিহ্নিত হইয়া প্রচারিত হইলে ভাল হয়।

২। কয়েকজন শিক্ষিত ভজন-পরায়ণ সদ্বক্তা দেশের হিতের জন্য নিস্বার্থ ভাবে নিজ ব্যয়ে বা শ্রীসমাজের ব্যয়ে প্রত্যেক বিখ্যাত অবিখ্যাত হরিসভায় এবং ভক্ত-সমাজে বক্তৃতা দিয়া ভ্রমণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। যেন কোন দরিদ্র সমাজ ব্যয়ভার বহন সাধ্যাতীত ভাবিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের উপকারিতায় বঞ্চিত না হন।

এই দুই নিয়ম প্রচারিত হইলে অনেকেই আবেদন করিবেন। এই সদনুষ্ঠানের ব্যয় প্রভু তাঁহার ধনী ভক্ত দ্বারা সংকুলান করিবেন। এখনও ভারতে অনেক পরোপকারী ধনী ভক্ত আছেন।"

পাবনা গোবিন্দপুর হইতে শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র কুণ্ড মহাশয় লিখিয়াছেন ;—
"বহুদিনের পর পুনঃ জগতের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয়োন্মুখ হইয়াছে। গত

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের শ্রীপত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম, কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীসমাজ অনুষ্ঠিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এতদিনে পতিত দুরাচার, ঘোর পাষণ্ড অতিশয় গণ্ডমূর্খ, মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির ত্রিতাপ তাপিত দগ্ধ হৃদয়ে আশালতার বীজ বপিত হইল। ভরসা করি শ্রীসমাজ হইতে যথা সময়ে প্রেম-বারি সিঞ্চনে আশালতার অঙ্কুরোদ্গম হইবে, এবং কালে পুষ্পিত হইয়া অবশ্যই সুফল প্রসব ক'রবে।

আহা! অপার করুণাসাগর দয়াময় শ্রীপ্রভুর জীবের প্রতি কি অসীম দয়া! পাপান্ধকারে মলিন চিত্ত আমরা, সেই প্রাণেরপ্রাণ প্রাণবল্লভকে ভুলিয়া নশ্বর বিষয় মদে মাতিয়া মহা নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি। তথাপি প্রাণবল্লভ আমাদিগকে ভুলিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহার পতিত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন নাই; কৃতবিদ্য ভবাদৃশ ভক্ত মহাজনগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠান হইয়া জীবোদ্ধারের জন্য ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেম মাখা নাম-রত্ন-ধন আরও উজ্জ্বলতর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। "এমন কভু হয় নাই—হ'বেনা"—ধন্য প্রভুর মধুর লীলা ধন্য আপনারা গৌরভক্ত-মণ্ডলী। শ্রীপ্রভুর ভক্তমণ্ডলি! আপনারা সকলেই পতিত-পাবন, আপনা-দিগের বিতরিত নাম-সুধারস পান করিয়া পতিত জীবগণ ভব ক্ষুধা মিটাইয়া নিত্যানন্দময় নিত্য-ধামে যাইবার সম্বল সংগ্রহ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার গ্রাহকগণকে শ্রীসমাজের সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়াছেন; এ উপাদেয় অনুরোধ অবশ্যই শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু দীনাতিদীন অতি পতিত পাষণ্ড আমি, এ হেন বিশুদ্ধ প্রেমময় সমাজে অধিরোহণ করা আমার পক্ষে বামন হইয়া করতল দ্বারা গগনেন্দু স্পর্শের ন্যায় অনুভব করিতেছি। কেবল ভরসার মধ্যে মহাজনগণের আশ্বাস বাক্য—
"তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমী মো অধমে কর নিজ দাস॥"

শ্রীখণ্ড ঠাকুর পাড়া হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন;—"আপনারা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা হিন্দু মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অতি মধুর ও অপূর্ব্ব লীলা। সুতরাং তাঁহার লীলা ও তাঁহার পারিষদ ভক্তগণের কীর্ত্তি জগতের সর্ব্বত্র যতই প্রচারিত হইবে সাধারণতঃ ততই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবধর্ম্মই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম, সুতরাং এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও আরও কয়েকটী মহদুদ্দেশ্য সাধনের

নিমিত্ত এই প্রকার একটি সমাজ সংগঠনের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক সম্প্রতি এ বিষয়ে যোগ দেওয়া—সহানুভূতি প্রকাশ করা ও আনুকূল্যের পরিচয় দেওয়া জন সাধারণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ এই সমাজের উদ্দেশ্য গুলি বড়ই মহৎ।

অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গোটের উপর সকল কর্ম্মেরই ক্রমোন্নতি হইতে পারে। সম্প্রতি আমাদের হস্তে এই শ্রেণীর কার্য্যের ভার ন্যস্ত। সুতরাং যাঁহারা এই মহদনুষ্ঠানের উদ্যোগী—প্রবর্ত্তক—এবং যিনি ইহার নেতা—তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করি এরূপ সাধ্য আমার নাই, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ সম্বন্ধে আমার সানুরাগ সহানুভূতি আছে এবং আমি অতীব আগ্রহের সহিত ইহার অর্থাৎ এই মহতী সমিতির সভ্য হইলাম। প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ আমার দ্বারা যতটুকু হইতে পারে আমি প্রাণপণে তাহা করিব। অনুমাত্র ত্রুটি হইবে না।"

বাঁকুড়া রাইপুর হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল লিখিয়াছেন ;—অমৃত বাজার পত্রিকায় অবগত হইলাম, আপনারা সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্মাদৃশ নিশ্চেষ্ট শক্তিহীন গৌর-চরণানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে প্রোৎসাহিত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্মজ্ঞ করিবার জন্য "শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ সমাজে ধন, মন, প্রাণ, দেহ—নিজের' বা আমার বলিতে যাহা কিছু আছে—সে সমস্ত অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে অর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগ ও শান্তিময় জীবন লাভ করিবার অবসর বিষয়ী মাত্রেরই সুলভ রূপে সংঘটিত হইল।

যাহা হউক আমার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র মূর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তি এ সমাজে গৃহীত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও—বলিতে লজ্জা হইতেছে—ভবাদৃশ ব্যক্তিবৃন্দ যদি দয়া করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের নিকৃষ্টতম কিঙ্কররূপে আমাকে গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ ও পরম প্রীত হইব। "আমি গৌরভক্তগণের দাস" এই অনুপম অভিমানে পবিত্র ও সফল মনোরথ হইবার আশাতেই কেবল এই প্রার্থনা। আপনারা ভালবাসিলে, গোরা কখন না কখন দয়া করিবেনই ইহা প্রধান ও বিশ্বস্ত ভরসা।

আমি অজ্ঞ ও নিঃস্ব ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ উপায়ে 'শ্রীসমা-জের' যতটুকু সহায়তা করা আমার সাধ্যায়ত্ত, আপনারা আদেশ ও উপদেশ করিলে, তদনুসারে যত্ন করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

আমি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য রাইপুর মডেলস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকতা করিতেছি। শিক্ষাদানের অবশিষ্ট সময় শ্রীগৌরাঙ্গের সুধাময়ী লীলারস-কথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দুঃখদায়ক চিন্তাবিষের জ্বালা ক্ষণকাল বিস্মৃত হই।

আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সর্ব্ববিধ চেষ্টা প্রেমভক্তি রূপে নদীয়ানাগর শ্রীগৌরহরির চরণকমলে পর্য্যবসিত হয়। আশা করি পতিত-পাবন কলিকলুষ নাশন বিশ্বম্ভর-চরণ-পরায়ণ আপনারা আমাকে উপ-দেশ ও অনুগ্রহ দানে উপেক্ষা করিবেন না।

টাঙ্গাইল এলাসীন হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু মহাশয় লিখিয়াছেন;—"শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সংস্থাপন বার্ত্তা শ্রবণে এবং শ্রীসমাজের অনুষ্ঠান পত্র অধি-বেশন ও নিয়মাবলী পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিলাম। আমার ন্যায় ভিখারীর দ্বারা যদি আমার প্রাণবল্লভের প্রেম-ধর্ম্মের কোন সামান্য কার্য্য সাধিত হয়, এবং আমি এই শ্রীসমাজের পদতলে যদি বসিতে একটু স্থান পাই, তবেই আপনাকে ধন্য মনে করিব প্রাণপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, শ্রীসমাজের সাধু উদ্দেশ্য তিনি সফল করেন। তাঁহারি প্রেম-গঙ্গায় আবার দেশ ভাসিয়া যাউক। আমরা যেন প্রাণ ভরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাইয়ের জয় ঘোষণা ও পতিত উদ্ধারের জয় পতাকা উড়াইতে পারি।"

প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা।

আশ্বিন মাসে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ হইতে প্রকাশ্য স্থানে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত করা গেল ;—

গত ৩রা আশ্বিন রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতা বিডন উদ্যানে শ্রীমান্ অন্নদা চরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম" সম্বন্ধীয় ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ বলেন। এই বক্তৃতার প্রথমাংশ ইহার পূর্ব্ব রবিবারে বলিয়াছিলেন। শ্রোতার সংখ্যা অন্যান্যবার অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল এবং সকলেই একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ

করেন। বক্তা যখন হৃদয় উঘাড়িয়া শ্রীগৌরগুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহই চক্ষের জল ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন না।

তৎপরে দুই রবিবারে অর্থাৎ ১০ই ও ১৭ই আশ্বিন তারিখে শ্রীমান্ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র ভবকিঙ্কর মহাশয় বাঙ্গলা ভাষায় "শ্রীহরিনাম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি যখন সুললিত ভাষায় শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, যখন দীনের দীন হইয়া নিজের কাহিনী বর্ণন করিতেছিলেন, তখন কেহই ধৈর্য্য ধরিতে পারেন নাই। তিনি শৈশব হইতেই ধর্ম্ম অর্জ্জন করিবার জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া, ধর্ম্মের নানাপথ বাহিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তলাভ করিতে না পারিয়া, অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপদাশ্রয় করিয়াছেন।

তাহার পরের রবিবারে অর্থাৎ ২৪এ আশ্বিন তারিখে শ্রীমান্ অন্নদাচরণ মিত্র মহাশয় বিডন উদ্যানে ইংরাজি ভাষায় "শ্রীসংকীর্ত্তন" সম্বন্ধে এবং শ্রীমান্ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র ভবকিঙ্কর মহাশয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বহুবাজার জলের কলের মাঠে) বাঙ্গলা ভাষায় "শ্রীগৌরতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া স্থির হয়। বক্তৃদ্বয় নির্দ্ধারিত সময়ে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। শ্রোতৃবর্গেরও ক্রমে সমাগম হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় বক্তৃতা স্থগিত হইল। ভবকিঙ্কর মহাশয়, দেবতার এই দুর্য্যোগ সত্বেও প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গও বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে নিশ্চল হইয়া তাঁহার বদন-নিঃসৃত মধুমাখা কথা শুনিতেছিলেন।

আলিপুর জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ, বি এল, মহাশয় বিগত ৩১এ আশ্বিন রবিবার অপরাহ্নে বিডন উদ্যানে "শ্রীগৌরাঙ্গ" সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় একটী সুন্দর সুমিষ্ট ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। জগাই মাধাই উদ্ধারের সময় মহাপ্রভু যে "চক্র চক্র" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, এবং এই দুই ভ্রাতার পাপরাশী নিজ স্কন্ধে লইবার সময় শ্রীপ্রভুর সোণার অঙ্গ যে কাল হইয়া গিয়াছিল, বক্তা যখন ইহা বর্ণন করিলেন ও যুক্তির দ্বারা শ্রোতৃ-বর্গকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন, তখন সকলেই আহ্লাদে গগনভেদী হরিধ্বনী করিয়া উঠিলেন। বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৭।০টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া, বক্তা যখন দীনভাবে সকলের চরণতলে লুন্ঠিত হইয়া বলিলেন,

"আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গকে আমি লাভ করিতে পারি," তখন উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই কারুণ্যরসে ডুবিয়া গেলেন।

ঐ তারিখে এবং ঐ সময়ে ভবকিঙ্কর মহাশয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে "আমাদের উদ্ধারের উপায়" সম্বন্ধে তাঁহার সেই সুললিত ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহা শুনিয়া সকলে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

শাখা-সমাজ।

আমরা আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি যে আশ্বিন মাসে কলিকাতা মফস্বলে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী নূতন সমাজ সংগঠিত হইয়াছে;—

১। শ্রীমান্ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র ভবকিঙ্কর মহাশয়ের উদ্‌যোগে সিমুলিয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের একটী শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। বিগত ২৩এ আশ্বিন শনিবার অপরাহ্নে সিমুলিয়া ৩নং মদন মিত্রের গলিতে "চৈতন্য বিদ্যালয়" ভবনে ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থানে অনেক ভক্ত ও গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ভবকিঙ্কর মহাশয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা" বিষয়ক বক্তৃতা করেন। সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতাটী অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয় ভবনে প্রতি শনিবারে নিয়মিতরূপে ইহার অধিবেশন হইতেছে।

২। ভাগলপুর কলেজের জনৈক ছাত্র লিখিয়াছেন;—"এখানে আমরা কয়েকজন ভক্তিহীন দানহীন কাঙ্গাল আছি। আমরা ভ্রাতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের প্রাণের গৌরাঙ্গের লীলা আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকি। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আমরা এখানে শ্রীসমাজের একটী শাখা সংস্থাপিত করিয়াছি। গত ২রা আশ্বিন তারিখে একটী ছাত্র-নিবাসে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-নাথ মজুমদার একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা এই সঙ্গে পাঠাইলাম। [এই প্রবন্ধটী আগামী কার্ত্তিক মাসের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।] এই সমিতির সভ্য সকলেই কলেজের ছাত্র। মনে করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া আমরা মিলিত হইয়া আমাদের প্রাণ-গৌরের

কথা কহিব ও কীর্ত্তনাদি করিব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমাদের মঙ্গল হয় এবং আমরা যেন এই ভাবে পরিচালিত হইতে পারি।"

আমরা আশা করি অন্যান্য স্থানের বালকবৃন্দ ভাগলপুর কলেজের ছাত্রদিগের পথ অনুসরণ করিবেন। শৈশব হইতেই যাঁহাদের চরিত্র সুগঠিত হয় ও শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মায়, তাঁহারা চিরদিনই বিমল আনন্দ উপভোগ করেন এবং তাহাদের দিন সুখে কাটিয়া যায়।

৩। শ্রীযুক্ত নটবর সিংহ লিখিয়াছেন ;—"গত আষাঢ় মাসের শ্রীপত্রিকায় বেহার প্রদেশের অন্তর্গত গোড্ডায় শ্রীশ্রীনামোৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের একটী শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলতঃ গোড্ডায় শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসিনী নামিকা যে সভা আজ কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, শ্রীহরি ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পার্থক্য না থাকায় তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অন্তর্গত শাখা সমিতি বলিয়া সভ্যগণের নিকট গৃহীত হইয়াছে। এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ গুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত পরম প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় এই ধর্ম্মবীজ জন সাধারণের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইলে এ প্রদেশ সুখময় হয়।"

৪। বিগত ১৬ই আশ্বিন শনিবার তারিখে সম্বলপুরবাসী কয়েক জন গৌরভক্তের উদ্যোগে এখানে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় অনেক শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। এই সমাজের নাম হইয়াছে, "শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রদায়িনী সভা" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষণ মিশ্র ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বলরাম বহিদার ইহার সম্পাদক রূপে মনোনীত হইয়াছেন। প্রতি শনিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠে ইহার অধিবেশন এবং নিয়মিত রূপে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীকীর্ত্তনাদি হইতেছে॥

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ;—"গোড্ডার শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসিনী সভার নেতৃগণের মধ্যে জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ সিংহ সর্ব্ব প্রধান। ইনি বেহার প্রদেশের অন্তর্গত বারকোপ নামক রাজ্যের রাজকুলের তিলক স্বরূপ। সম্প্রতি তিনি স্বীয় রাজধানী বারকোপে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভজনাদি ও কীর্ত্তন পরম ভক্তি সহকারে আলোচিত হইতেছে। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে এতদ্দেশীয় অনেকানেক ভক্তবৃন্দ ও পণ্ডিতমণ্ডলী অধিবেশন কালে সভায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ধর্ম্মের নিগূঢ় রস আস্বাদন ও তৎপ্রতি পরম উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ সিংহ মহাশয়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবকিশোর সিংহ মহাশয়; ও রাজশ্রী চন্দ্রদয়াল বর্ম্মা মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ সিংহ মহাশয় যে প্রকার ধর্ম্মশীল ও প্রেমিক, তাহাতে আশা ক। যায় যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত প্রেম-ধর্ম্ম অচিরকাল মধ্যে বেহার প্রদেশস্থ মনুষ্যগণের প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠিবে।"

৬। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস মহান্ত লিখিয়াছেন;—"জয়কা গ্রামে কতকগুলি আঢ্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বসতি করেন। এই গ্রামের সকলেই শক্তির উপাসক ও মাংসাশী ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় সেই গ্রামে অল্পদিন যাবৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত দীননাথ কর নামক একটী ভদ্রসন্তান স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অতি সৎস্বভাবাপন্ন, পরম সাধু, হরিভক্তিবিলাস সম্মত আচারে নিপুণ, ত্রিসন্ধ্যায় স্নান সন্ধ্যা পূজা, একাদশ্যাদি ব্রত, ভাগবতাদি পাঠ ও একসন্ধ্যা নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি সৎকার্য্যপরায়ণ। তাঁহার ভজন সাধন দেখিয়া জয়কা গ্রামস্থ ভদ্রসন্তানেরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। তাঁহার উপদেশে গত ২২এ ভাদ্র মঙ্গলবার বাবু কৃষ্ণনারায়ণ রায় ও বাবু কৃষ্ণসুন্দর রায়ের উৎসাহে উক্ত বাবুদের বাড়ীতে একটী ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সভায় জয়কা, পানুয়া, কামরাটীয়া প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় বাণীগ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দকিশোর গোস্বামী তর্কবাগীশ প্রভুপাদ ও পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দকুমার তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রভুপাদ আহুত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সভাতে আলোচিত হইয়াছিল। যথা,—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম, সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয়ের বিশদ ব্যাখ্যা, কর্ম্মজ্ঞান, যোগ ও ভক্তির ব্যাখ্যা, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তির উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন, সাঙ্খ্যযোগ, ষড়বিংশ তত্ত্ব, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রদর্শিত ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও নামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন, বৈষ্ণব লক্ষণ, সম্প্রদায়ী ও অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবভেদ, গোস্বামী

শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা, বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, অসাত্ত্বিকগণের পক্ষে পূজায় ছাগাদি বলিদান ও মাংসাদি আহার শাস্ত্রে বিহিত ইত্যাদি অনেক বিষয় সংক্ষেপে পূজ্যপাদ গোস্বামীদ্বয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় শ্রুত হইয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

বাবু কৃষ্ণসুন্দর বাবু ছাগাদি বলিদান ও মাংসাদি আহার যে অবৈধ ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। ইহা যে তিনি একেবারে ত্যাগ করিবেন, ইহা তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি ও দৈন্য দ্বারা বিশদরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি দীনদয়াল শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা কটাক্ষ পড়িয়াছে, তিনি আজ আমাদের নিকট গৌরভক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তিসম্পন্ন হৃদয়বান ব্যক্তি যে গ্রামে বসত করিবেন সেই গ্রাম পবিত্র হইবে সন্দেহ নাই। সন্তান বিষ্ণুভক্ত হইলে স্বর্গে পিতৃলোকেরা আস্ফালন করেন, পিতামহগণ নৃত্য করেন, কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, পৃথিবী ও বাসস্থান ধন্য হয়। শাস্ত্রে আছে—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স মাং ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা স বসতিশ্চ ধন্যাঃ।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ॥

প্রভো! গৌরাঙ্গদেব! যাহার প্রতি তোমার কৃপা-কটাক্ষ পড়িয়াছে, সে যে অবিলম্বে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অবিলম্বে তোমার পরম ভক্ত হইবে, তাহাতে আর কথা কি"

পাটুয়াখালি শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা-সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদিগের তালিকা;—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক; শ্রীযুক্ত রসিকমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়, সহকারি সম্পাদক; শ্রীযুক্ত কালিকমল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গুহ, ডাক্তার; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু; শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায়; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ রায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা-সমাজের সভ্যগণ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্যরূপে মনোনিত হইবেন।

কলিকাতা হাটখোলা শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা-সমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে নিয়মিতরূপে প্রতি বৃহস্পতিবারে হইতেছে। ইহার প্রথম দুই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পাঠ করেন। গৌরভক্তদ্বয় যখন ভাবে গদগদ হইয়া পাঠ করিতেছিলেন, পাঠ করিতে করিতে যখন তাঁহাদের হৃদয় উচ্ছাসিত হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে ছিল, তখন শ্রোতৃবর্গ আপনাদিগকে পরমভাগ্যবান মনে করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রত্যেক অধিবেশনে তাঁহার নিজকৃত সুমধুর কীর্ত্তন-পদগুলি গাহিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করেন। আমরা প্রার্থনা করি শ্রীগৌরাঙ্গ, চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, এবং তাঁহার দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করুন।

সাহায্য প্রদান।

শ্রীগৌরাঙ্গসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গোমলিয়া হইতে ডাক্তার বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় কয়েক দফায় ১১৲ টাকা এবং বোম্বাই হইতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বসাক ২৲ টাকা পাঠাইয়াছেন।

পাবনা জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর হইতে শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র কুণ্ড মহাশয় লিখিয়াছেন;—"আমাদের অতি সামান্য একটী গুড়-চিনির কারবার আছে। তদ্দ্বারা আমরা ৮।৯টি লোক শ্রীপ্রভুর কৃপায় একরূপ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। বাৎসরিক নিকাশ সময়ে কিছু কিছু করিয়া শ্রীশ্রী৺ বৃত্তি জমা হইয়া আসিতেছে। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি যে, তন্মধ্য হইতে শ্রীসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য প্রতি মাসে ১৲ এক টাকা করিয়া চাঁদা দিব। আপনাদের প্রসাদে যত দিন এই কারবার চলিবে ততদিন বোধ হয় অবশ্যই দিতে পারিব। গত শ্রাবণ মাসে শ্রীসমাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে; শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন তিন মাসের ৩৲ তিন টাকা মণিঅর্ডারযোগে শ্রীসমাজের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের বরাবর অদ্য পাঠাইলাম। আশা রহিল ঐরূপ ত্রৈমাসিক চাঁদা এক সঙ্গে পাঠাইব। শ্রীসমাজ যখন মুষ্টি-তণ্ডুল গ্রহণেও সন্তোষ লাভ করিবেন তখন এ সামান্য অর্থ হইলেও দয়াপুরঃসর গ্রহণ করিবেন।"

পটুয়াখালি শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্তচক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"বিতরণার্থে ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাপাইবার জন্য আমরা কিছু খরচ পাঠাইতেছি।"

শ্রীরামপুর হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"শ্রীসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থের আবশ্যক। আমি যথাসাধ্য পাঠাইব।"

শ্রীবিগ্রহের তালিকা।

শ্রীহট্ট কাজলধারা হইতে শ্রীবঙ্কবিহারী দাস মহাশয় শ্রীহট্টস্থ শ্রীবিগ্রহের নিম্নলিখিত তালিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন :—

১। জিলা শ্রীহট্ট পোষ্ট ঢাকাদক্ষিণের অধীন ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। এইখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ একত্রে বিরাজমান এই ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বতন পুরুষের বাসস্থান। এই শ্রীবিগ্রহ এখানকার মিশ্র মহাশয়গণের স্থাপিত। এইখানে প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা ও চৈত্র মাসের প্রত্যেক রবিবারে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। এই জন্য আয়ও যথেষ্ট হয়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ খুব জাগ্রত, অনেক অলৌকিক বিষয় দেখাইয়াছেন।

২। জিলা শ্রীহট্ট পোষ্ট ফুলতলার অধীন টিকরা গ্রামে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। ইনি জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপিত। এখানেও শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ স্থাপিত। এখানে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের প্রত্যেক রবিবারে বিস্তর যাত্রী সমাগম হয়। এই জন্য আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হয়।

৩। জিলা শ্রীহট্ট, পোষ্ট কাজলধারার অধীন শ্রীপুর বাজারে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন। ইনি সাহ বংশোদ্ভব জনৈক মহাত্মা দ্বারা স্থাপিত। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়া বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহার সময়ে এখানে খুব উন্নতি হইয়াছিল। এখন মহাপ্রভুর সেবা অতিকষ্টে চলিতেছে। কারণ স্থানীয় লোকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু সকলের মন ত একরূপ নহে, এই জন্য সাহায্য খুব কম। এখানেও শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপিত আছেন।

৪। জিলা শ্রীহট্ট, পোষ্ট ফুলাউড়ার অধীন কাদিপুর গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ আছেন। ইনি মিরাসদার মহোদয়ের স্থাপিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যগণের নাম ও ধাম।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু	সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	সিমলা।
,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী	মৈনা, কানাইবাজার—শ্রীহট্ট।
,, কালীময় ঘটক	পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দে	কালীসিংহের লেন ,,
,, কালিদাস নাথ	রামবাগান ,,
,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী	রামধন মিত্রের লেন ,,
পণ্ডিত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর	শ্রীখণ্ড।
,, গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	গড্ডা।
,, গোলোকনাথ মজুমদার	নবদ্বীপ।
,, গোপাললাল ঘোষ	বাগবাজার, কলিকাতা।
,, গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র	খাগরা।
পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী	শান্তিপুর।
শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র	ফরিদপুর।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	বরাহনগর।
,, জ্ঞানানন্দ চক্রবর্ত্তী	টাঙ্গাইল।
,, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	সারপেণ্টাইনলেন, কলিকাতা।
,, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	চট্টোগ্রাম।
,, দেবকীনন্দন সেন	শ্রীরামপুর, ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
পণ্ডিত নীলমণি গোস্বামী	বাগবাজার, কলিকাতা।
,, নবচন্দ্র গোস্বামী	গদাডিহি, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।
,, নবীনচন্দ্র সেন	ময়মনসিং।
,, নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	বারাসত।
,, নীলমণি দে	মজঃফরপুর।
,, নন্দলাল ঘোষ	দরজিপাড়া, কলিকাতা।
,, নন্দকুমার গোস্বামী	বাণীগ্রাম, কাটীয়াদিহি, ময়মনসিং।
,, প্রহ্লাদদাস মাণিক	নবাবগঞ্জ।
,, প্রাণশঙ্কর রায়	তেওতা।
,, বিহারীলাল শূর	বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দ বেধরা	সম্বলপুর।
„ বরদাপ্রসাদ বাগচি	রঙ্গপুর।
„ বলরাম বহিদার	সম্বলপুর।
পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী	সিমলা, কলিকাতা।
„ মধুসূদন গোস্বামী	বৃন্দাবন।
„ মধুসূদন গোস্বামী	উথলী, ঢাকা।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার	মালঞ্চি, পাবনা।
„ মদনমোহন দত্ত	বসুপাড়া, কলিকাতা।
„ মতিলাল ঘোষ	বাগবাজার, „
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	বাগবাজার, „
„ মণিলাল সিংহ রায়	চকদীঘী।
পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী	বৃন্দাবন।
„ রাধিকানন্দ ঠাকুর	শ্রীখণ্ড।
শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি	গয়া।
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী	হাটখোলা, কলিকাতা।
„ রাজীবলোচন দাস	মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট।
„ রামচন্দ্র দাস	বড়বন্দ, দিনাজপুর
„ রামকুমার বিশ্বাস	পুটীজুড়ী, শ্রীহট্ট।
„ রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী	ভাগলপুর।
„ রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী	সুকীয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ সীতানাথ সাহা	চিৎপুর, „
„ শরৎচন্দ্র চৌধুরী	হাটখোলা, „
পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী	আহীরিটোলা, „
„ শ্রীনাথ গোস্বামী	উথলী, ঢাকা।
„ সৃষ্টিধর চট্টোরাজ	পদাড্ডিহি।
„ শম্ভুচন্দ্র গুপ্ত	গড্ডা।
„ সৌরেশচন্দ্র সরকার	কীর্ণাহার।
„ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	ঝাটপাল—ঢাকা।
„ সদাশিব গুরু	সম্বলপুর।
„ শিশিরকুমার ঘোষ	বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা।
„ সত্যচরণ শাস্ত্রী	মহেশ।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	তেলিপাড়া, কলিকাতা।
„ কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়	রামকান্ত বসুর লেন, কলিকাতা।
„ কুঞ্জবিহারি দাস গায়ক	পাথুরেঘাটা, „
„ সনাতন সাহা	শোভাবাজারষ্ট্রীট, „
শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়	রামকান্ত বসুর লেন, „
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	শ্যামপুকুর, „
„ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ	ওয়েলিনটনষ্ট্রীট, „
„ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চাষাধোবাপাড়া, „
„ দীনবন্ধু সাহা	সোদপুর।
„ যতীন্দ্রলাল মিত্র	শোভাবাজার, কলিকাতা।
„ গঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায়	মেছুয়াবাজারষ্ট্রীট, „
„ রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়	মিডেলরোড্ „
„ কেদারনাথ ঘোষ	ব্যাটরা।
„ ললিতমোহন ঘোষাল	বরাহনগর।
পণ্ডিত রাধাচরণ গোস্বামী	শ্রীবৃন্দাবন।
শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার	কর্ণওয়ালিস, কলিকাতা।
„ হরলাল রায়	সুকীয়াষ্ট্রীট, „
„ হরলাল রায়	ঐ „
„ নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী	গোরাবাগান, „
„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য	সাণ্ডার্সলেন, „
„ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	„ „
„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	উডষ্ট্রীট, „
„ রামরেণু চট্টোপাধ্যায়	জোনপুর।
„ নগেন্দ্রবালা মোস্তফী	হুগলী।
„ অক্ষয়নাথ মিত্র	চন্দননগর।
„ অনুকূলনাথ মিত্র	„
„ তারকনাথ মিত্র	„

ক্রমশঃ—

শ্রীগৌর-কুসুম-স্তবম্।

ভজ মিশ্র পুরন্দর পুত্রবরং বর হেম মহাম্বুজ গর্ভরুচিং ;
রুচিরস্মিত নির্জিত দেববরং নররূপ বিধায়ক রম্যপদং।
পদনির্জ্জিত কোমল পদ্মদলং দলনীকৃত পাপ বিমূঢ়গণং।
গণদেব পিতুঃ পরিসেব্য তনুং তনুমর্দ্দিত পিঞ্জর কান্তি হয়ং।
হরিনাম রসাব্ধিপ্রকাশ করং করশোণমহাম্বুজ ভাতি জিতং।
জিত দুর্ম্মদ কোবিদ বুদ্ধি গতিং গতি লজ্জিত মত্ত গজেন্দ্র কুলং।।
কুল কামবতীগণ তোষ করং করকান্তি বিনির্জ্জিত দণ্ডবরং।
বরকর্ম্ম বিমোহিত প্রেমপ্রদং প্রদমাদি শমাদি প্রচার পরং।।
পরপ্রেম প্রচারণ ধস্ত কলিং কলিকাল ভুজঙ্গম ভেষজকং।
জন দুর্গতি নাশক গৌরবিধুং বিধু কোটি বিনিন্দিত চারুমুখং।।
মুখরীকৃত নির্লপ পঞ্চজনং জন ভাবুক নাম প্রদান পরং।
পরদেব শচীসুত নাম ধরং ধরণীচ্ছিত দুঃখিত দুঃখ হৃতং।।
হৃত কামিনী মানস চৌর সমং সম বালক কেলিক নর্ম্ম হৃদং।
হৃদয়ানুগতৈ রতি সেব্যভবং তরলীকৃত মানুষ বজ্র হৃদং।
হৃদয়াঙ্কিত মাল্য সুদাম বরং বরকেলি বিমোহিত মাতৃ হৃদং।
হৃদয়ীকৃত গোপ বধূ হৃদয়ং দয়য়ৈব চ বন্ধু কৃতাত্মহতং।।
হৃত বালক জীব প্রদান কৃতং কৃত কীর্ত্তন রূপ মখ প্রকটং।
কটকাদিনবাদি কৃপালু মিমং মিহিরাকৃতি শোভিত বস্ত্র ধৃতং।।

ইতি শ্রীবদনচন্দ্র বিরচিতং শ্রীশ্রীগৌর-কুসুম-স্তবং সম্পূর্ণং।

—**:*—

আমার প্রথম মহোৎসব দর্শন।

যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন আমার ধর্ম্মে একটু রুচি ছিল মাত্র। খৃষ্টানদিগের প্রার্থনা ও বৈষ্ণবদিগের সংকীর্ত্তন ভাল লাগিত। খৃষ্টানদিগের প্রার্থনার মর্ম্ম এই, "হে ঈশ্বর, আমাকে মার্জ্জনা কর ও পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।" বৈষ্ণবদিগের ভজন খোল করতালের সহিত হরিনাম করিয়া নৃত্য করা। এই বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের মর্ম্ম কি জানিতাম না, কিন্তু ইহাদের খোল-করতাল বাদ্য, নৃত্য, ভাবভঙ্গি দেখিলেই আমার হৃদয় দ্রব হইত। বৈষ্ণবদিগের প্রতি আমার ঘৃণা ছিল, তাহার কারণ বলিতেছি। বৈষ্ণবেরা দরিদ্র, মূর্খ, অস্পৃশ্য জাতী, অনেকে কুকর্ম্মে রত, বাহ্যদৃষ্টে অপরিস্কার। এই সব কারণে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ভাবিতাম, ঠিক ভদ্রলোকের ন্যায় আপন বিছানায় বসিতে দিতাম না।

এই সঙ্গে আমার ইহাদের উপর একটু অনির্ব্বচনীয় টানও ছিল। তাহাতে ইহাদের সঙ্গ করিতে ভাল বাসিতাম। এই ধর্ম্মে যে কিছু পদার্থ আছে, মনে মনে সে বিশ্বাসও ছিল। আর ইহাদের হরিসংকীর্ত্তনে অত্যন্ত সুখ পাইতাম।

যশোহর সহরের নিকট কোন গ্রামে উদ্ধব দাসের বাড়ী। নগরে তাঁহার একটী দোকান ছিল। তাহার দোকানে ক্রয় করিবার উপলক্ষ করিয়া দুদণ্ড বসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাবার্ত্তা কহিতাম একদিন বৈকালে দেখি উদ্ধব ব্যস্ত উদ্ধব বলিলেন, "আমার বাড়ীতে কল্য মহোৎসব হইবে।" আরও বলিলেন, "যাবেন কি? ভারি সংকীর্ত্তন হইবে" আমি উত্তরে বলিলাম, "বৈষ্ণবের মহোৎসব কখন দেখি নাই, আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে বটে। কিন্তু গেলে কি হবে? তোমরা কেবল রাধা-কৃষ্ণের গান গাইবে, উহা আমার ভাল লাগিবে না। যদি হরিসংকীর্ত্তন শুনাইতে পার তবে যাই।" উদ্ধব বলিলেন, "তাহাই হইবে" উদ্ধবের কাছে আরও শুনিলাম যে, জেলার সমস্ত বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৈষ্ণবের সমাগম হইবে। আমি তখন ভয় পাইয়া বলিলাম যে, "এত বৈষ্ণব আমার অনুরোধে রাধা-কৃষ্ণের গান ছাড়িয়া কেন হরি সংকীর্ত্তন করিবেন?" উদ্ধবদাস বলিলেন, "তাহাই করিবেন।"

গ্রীষ্মকাল, বোধহয় বৈশাখ মাস। মহোৎসবের স্থান আমার বাসা

হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে। শুনিয়াছিলাম, দুই কি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইবে। আমার আহার করিতে বেলা হইল। ১১টার সময় বাসা ত্যাগ করিলাম। রৌদ্রের নিমিত্ত, আর ঠিক আহারের পর বলিয়া, খুব দ্রুত চলিতে পারিলাম না। স্থূল কথা আমি যাইয়া দেখি যে তখনই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গিয়াছে! প্রধানগণ এক স্থানে বসিয়া আছেন, তাঁহারা জন দশ পোনের। দেখি, উদ্ধব দাস ব্যস্ত। আমাকে দেখিয়া সমাদর করিয়া স্বতন্ত্র একটী আসন দিলেন। ঘৃণা করিয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে বসি না বসি, বোধহয় এই বিবেচনা করিয়া কয়েক জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে উঠাইয়া মাদুর খানি লইয়া "বাবুকে" বসিতে দিলেন। আমি না বসিয়া উদ্ধবের দিকে চাহিলাম। উদ্ধব আমার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন যে, "মহাত্মগণ সকাল হইতে কীর্ত্তন করিতেছেন, পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আর এখনই সেবা করিতে যাইবেন।" আমি বলিলাম, "এমতাবস্থায় আর সংকীর্ত্তনে কাজ নাই। ইঁহারা সেবা করিতে যান, আমি একটু বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইব।" এই কথা সর্ব্ব প্রধান যিনি, তিনি শুনিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইহা কখনই হইতে পারে না। বাবু পরিশ্রম করিয়া, এতদূর হাঁটিয়া কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের সেবা করিতে যাওয়া উচিত নহে। ইহাই বলিয়া সহচরগণের প্রতি বলিলেন, উঠ। ইহাতে ১৪। ১৫ জন লোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখি, ক্ষুধায় সকলের পেট পড়িয়া গিয়াছে, আর বেলাও ১টা বাজিয়াছে। আমি মিনতি করিয়া বলিলাম যে, তাহাদের এত কষ্ট দিয়া আমার কীর্ত্তন শ্রবণের একটুও ইচ্ছা নাই। কিন্তু ইহা তাঁহারা শুনিলেন না। তখন উদ্ধব দাস প্রধানজনের কর্ণে বলিলেন যে, বাবু হরিনাম শ্রবণ করিবেন।

সকলে দাঁড়াইলে, দেখিলাম উহার মধ্যে ২। ৩ জন প্রকৃত শ্রীভগবদ্ কৃপাপাত্র হইয়াছেন। যেরূপ অধ্যাপকগণকে দেখা যায়, তাহাদের মূর্ত্তিও সেইরূপ সৌম্য, স্নিগ্ধ, শীতল ও আর যে কি তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। সকলের পরিধান কৌপীন ও গলদেশে হরিনামের মালা। এই বেশে তাহাদের তখন শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এ বেশভূষা পূর্ব্বে কখন ভাল লাগিত না, কিন্তু সেদিন তাহাদের অঙ্গে বড় মনোহর বোধ হইতে লাগিল। যখন খোল করতাল বাজিয়া উঠিল, তখন হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি হইল। শেষে ক্রমে গায়কদের অঙ্গে নানাবিধ ভাব ভঙ্গী প্রকাশ হইতে,

লাগিল, পরিশেষে সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন

পূর্ব্বে জানিতাম যে, পাপের নিমিত্ত শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই ধর্ম্মের সার, এখন দেখিলাম এই বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের কাছে কিছু চাহিতেছেন না, কিন্তু কেবল তাঁহার নাম করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পায়ে নূপুর দিয়া নৃত্য গীত করিতেছেন। এই ভাব উদয় হওয়াতে আমার শরীর আনন্দে পরিপূরিত হইয়া গেল। দেখিলাম, নয়নে জল আসিতেছে, কষ্টে নিবারণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। তখন চাদর দিয়া মুখাবৃত করিলাম। তাহার পরে কি হইয়াছিল, তাহার আমার বড় স্মরণ হয় না। বোধ হয় ক্ষণেক কাল নিমিত্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম। সেই মহোৎ-সবের সমস্ত চিত্র. আমি মাঝে মাঝে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার চিত্তকে শোধন করিয়া থাকি।

শ্রীশিশিরকুমার দাস ঘোষ।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ।

পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, সনক এই চারি ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইবেন। যথা :—

"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ॥
চত্বার স্তে কলৌভাব্যাঃ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকঃ।
ভবিষ্যন্তি প্রসিদ্ধাস্তে হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

জগৎপতি নারায়ণই সর্ব্ব গুরু; নারায়ণ হইতেই শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃ-সন পবিত্র হন। প্রমেয়রত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মী রামানুজ স্বামীকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণু-স্বামীকে, এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করেন। যথা :—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামীনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

নাভাজী স্বীয় হিন্দি ভক্তমালা-গ্রন্থে এই চারি মহাপুরুষকে শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা :—

"চৌবিস প্রথম হরি বপু ধসৌতোঃ চতুরব্যূহ কলিযুগে প্রগট।
শ্রীরামানুজ উদ্দার সুধানিধি অবনি কল্পতরু॥
বিষ্ণুস্বামী বোহিত্থসিন্ধু সংসার পারকরু।
মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তি শরণ সর ভরিয়া॥
নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহর অজ্ঞান জু হরিয়া।
জন্ম কর্ম্ম ভাগোত ধর্ম্মসম্প্রদায়থাপী অঘট॥"

অর্থাৎ, হরি পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি দেহ ধারণ করেন ; কলিতে তাঁহার চারি দেহই প্রকট হইয়াছে বলা যাইতে পারে। উদারচরিত রামানুজ, দয়ার সাগর বিষ্ণুস্বামী, ভক্ত্যামৃতবর্ষী মধ্বাচার্য্য, তমনাশক নিম্বাদিত্য। তাঁহারা জন্ম-কর্ম্ম বিভাগ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভক্তমালে ইহাঁদের মহিমা এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা :—

"চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহান্ত।
বেদের স্বরূপ বেদ বিধি বিজ্ঞবন্ত॥
বিচারে পাণ্ডিত্যে যে অদ্বিতীয় অপার।
কু-সিদ্ধান্তবাদি পরাভবে খড়্গাধার॥
চারি জন হয় চারি দিগ্‌গজ স্বরূপ।
ভক্তি ভূমি ধারী বহে বিক্রমে অনূপ॥"

১। শ্রীসম্প্রদায়—রামানুজ স্বামী।

রামানুজ স্বামী হইতে "শ্রী সম্প্রদায়," "রামানুজ সম্প্রদায়" নামেই কথিত হয়। অনুরাগ-বল্লী বলেন :—

"শ্রী শব্দে লক্ষ্মী কহি তাহাতে হৈতে।
সম্প্রদায় চলিয়াছে কহিল নিশ্চিতে॥"
"তাঁহার উপশাখা ক্রমেতে অনেক।
তাঁর পাছে শ্রীরামানুজ হইলা পবতেক॥
শ্রীলক্ষ্মণ আচার্য্য নাম তাঁর হয়।
অত্যাদরে রামানুজ আচার্য্য সবে কয়॥
রামানুজ ভাষ্য যেঁহো করিল রচন।
জ্ঞান কর্ম্ম খণ্ডি ভক্তি-তত্ত্বের স্থাপন॥
রামানুজ আচার্য্য বিশ্ব বিখ্যাত হইলা।
তাঁর নামে সম্প্রদায় কতক কাল চলিলা॥"

শ্রীরামানুজ স্বামী অনন্তের অবতার। নাভাজী বলেন :—

"সহস্র আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধারণ যতন কিয়ে।
গোপুর হৈব আরূঢ় উচ্চস্বর মন্ত্র উচ্চারেয়ো॥" ইত্যাদি।

রামানুজের পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম ভূমি দেবী। রামানুজের আদি নাম লক্ষ্মণ, শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে * তিনি প্রাদুর্ভূত হন। প্রাচীন মটচ্চর বা মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তরবর্ত্তি পেকম্বর পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদার্থ আচ্ছাদন করিয়া স্বকল্পিত মত প্রচার করেন, তাহার নিরসনার্থ রামানুজই সর্ব্ব প্রথম উত্থিত হন। তিনি তৎকালপ্রচলিত শৈবধর্ম্মের কঠোর প্রতিবাদ করেন। রামানুজ কাঞ্চিপুরে শিক্ষা লাভ করত সেই স্থানেই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় মত পরিব্যক্ত করেন। তিনি কাবেরী-বেষ্টিতা রঙ্গ-ক্ষেত্রে রঙ্গনাথের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহের সহিত শৈবধর্ম্মের অপূর্ণতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। চোলরাজ কেরিকালের শৈবধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণ সমস্তকে বিনয়, উৎকোচ, ও ভয় প্রদর্শনে বাধ্য করিয়া স্বমতে আকর্ষণ করেন। রামানুজকে অনুরোধ করা হইলে তিনি ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। বাধাপ্রাপ্ত সম্বর্দ্ধিত বেগবতী নদীর ন্যায় রামানুজ তখন অধিকতর উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ্যে স্বমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ সময়কার উপদেশ বাক্য গুলি এইরূপ ছিল। যথা প্রপন্নামৃতে রামানুজ স্বামীর উপদেশ বাক্য :—

"বিষ্ণোর্দিব্যবিহারাণি গোপুরাণি জগৎপতেঃ।
দৃষ্টিমাত্রেণ সহসা কারয়েদঞ্জলিং তদা।
দৃষ্টেতর বিমানানি বিস্ময়ং নৈব কারয়েৎ॥
শ্রুত্বা ন বিস্ময়ং গচ্ছেদ্দেবতান্তর কীর্ত্তনং।
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ নাম সংকীর্ত্তনানি চ।
কুর্ব্বন্তঃ পুণ্য পুরুষান্ দৃষ্ট্বা ন বাপ্যং বৈমদং।
আক্রোশমপচারং স্যান্মধ্যে তেষাং সুনিশ্চয়ং॥"

অর্থাৎ, ভগবানের বিমান ও গোপুর দর্শনেই প্রণত হইবে, কিন্তু দেবান্ত-

* ১০৫০ শকাব্দ—Buchanan's Mysore. কিন্তু শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—"In the middle of the 12th century, he led a movement against the Sivaites, proclaiming the unity of God, under the title of Vishnu.' &c.

রের মন্দির দর্শন বিস্ময়োৎপাদক নহে বিষ্ণু-ভক্তের গুণকীর্ত্তনকারী ভক্ত দর্শনে আনন্দিত না হওয়াই পাপ।

এইরূপে রামানুজ শৈব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবল ঝড়ের ন্যায় উত্থিত হইলেন। তাঁহার তর্ক-বাণ বর্ষণে অদ্বৈতমার্গী ও শৈবগণের মত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। চোলরাজ কোনও প্রকারে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, ধৃত করিবার জন্য কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রামানুজ স্ব শিষ্য-বর্গের সহায়তায় পলায়ন পূর্ব্বক কর্ণাটের জৈন নৃপতি বেতালদেবের শরণ গ্রহণ করেন। বেতালদেবের কন্যা ভূতাশ্রিতা হইয়া ছিলেন, রামানুজের প্রভাবে ভূত পলায়ন করায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন।* রাজা রামানুজের মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম ধারণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হন। রামানুজ যাদবগিরিতে চয়নরায় নামে এক কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অনেক দিন বাস করেন; পরে চোলরাজের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। রামানুজ দক্ষিণাত্যে ৭০০ মঠ বা আখড়া ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন

রামানুজ সম্বন্ধে ভক্তমালে লিখিত আছে যে, একদা তিনি সহস্র শিষ্য সঙ্গে নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে জগন্নাথ-সেবকগণের সদাচারাভাব দর্শনে তিনি ক্ষুব্ধ হন ও আপন শিষ্যদিগকে সেবায় নিয়োজিত করেন। রামানুজের এই কার্য্য জগন্নাথের মনঃপূত হয় নাই। ভগবান্ ভক্তির বশ, তিনি ভক্তি বিরহিত সদাচারের পক্ষপাতী নহেন। ভক্তমাল বলেন:—

"স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভু তাহে নাহি সুখ। পূর্ব্বের সেবক সেবায় পরম উৎসুক॥
স্বামি প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি। পূর্ব্ব সেবক সেবায় সুখী আমি॥
তথাচ না বিরমহে সেবানন্দে মগ্ন। প্রভু সনে হট করি করয়ে সেবন॥
জগন্নাথ প্রিয়ভক্তে কোপ নাহি করে। গরুড়েরে আজ্ঞা দিলা রাখ লৈয়া দূরে॥
রাত্রিযোগে গরুড় সহস্র শিষ্য সহে। রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্ব্বে যথা রহে"

রামানুজ এ ঘটনায় লজ্জিত ও ভক্তিরসে আর্দ্র হন। রামানুজের আর একটী শ্লোক এই:—

* "Râmânuja fled to the Jain sovereign of Mysore. This prince he converted to the Vaishnavite faith by expelling a spirit."—See Hunter.

"বিজন্ত্রীণাং ভক্তে মূর্দ্ধনি বিজুবাম্মে ব্রজগবাং,
দধি ক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুট চিপিটমুষ্টৌ মুরবিপো।
যশোদায়াং স্তন্যে ব্রজযুবতী দন্তে মধুনি তে,
যথাসীদামোদস্তমিমমুপহারেঽপি কুরুতাং॥"

২। ব্রহ্ম সম্প্রদায়—মধ্বাচার্য্য।

অনুরাগ-বল্লী বলেন:—

"আদৌ শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাষ্যকার হয়।
মাধ্বভাষ্যে ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয়॥
ঈশ্বর পুরী পর্য্যন্ত এই মতে
মাধ্ব সম্প্রদায় বলি হইল বিখ্যাতে॥"

বৈষ্ণবাচার দর্পণে লিখিত আছে:—

"শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াময়।
* * * * *
সেই গণের মধ্যে মধ্ব শিষ্য হৈল।
যিনি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য প্রথমেই কৈল॥
এই হেতু মধ্বাচার্য্য নাম হইল তার।
সেই হইতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা প্রচার॥"

মধ্ব, পবনদেবের অবতার। মধ্ব দাক্ষিণাত্যের তুলব দেশস্থ মাধিজী ভট্টের একমাত্র পুত্র। ভক্তিরত্নাকর বলেন:—

"শ্রীআনন্দতীর্থ তার আর এক নাম।
সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্ব গুণে অনুপাম॥"

মধ্বাচার্য্য ১১২১ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি বাল্যকালে অনন্তেশ্বর নামক শিবের মঠে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। অতি অল্প বয়সেই তদীয় পরিপক্ক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মঠস্থ সকলেই বিস্মিত হন। সেই বয়সেই সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মে। রামানুজের চেষ্টায় শৈবগণ নির্জ্জিত হইলেও কালে তাহারা মস্তকোত্তলন করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম হইতেই মধ্বের বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনুরক্তি ছিল, তিনি ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়া, নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে অচ্যুতপ্রেক্ষ নামক আচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর মধ্ব গীতা ভাষ্যাদি রচনা করেন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য "সোহং"-বাদ প্রচার করেন, ইহা ভক্তিধর্ম্মের একান্ত বিরোধী ; মধ্ব বালক হইলেও স্ফুরিত-তেজা বহ্নির ঐ সকল কু-মতকে ভস্মাবশেষে পরিণত করেন। তিনি বলেন—

"সোহং মা বদ সেব্যসেবক তয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং,
তেন স্যাৎ তব সদ্গতি র্ব্বিমধঃপাতো ভবেদন্যথা।
নানাযোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে,
স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীবত্বয়া ভ্রাম্যতে ॥"
"সোহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরে-
স্তস্যাহং কিল সেবকঃ সভগবাং স্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব,
স্বান্তে সম্প্রতি বিদ্যতে যদি হরাবেকান্ত ভক্তিস্তদা ॥"
"নদ্যঃ সমুদ্রেমিলিতাঃ সমস্তা, নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদ শুদ্ধোদকয়ো বিভেদা দান্তেতয়োর্বাস্তব এব ভেদ ॥"
"দুগ্ধে দুগ্ধং জলেষপি জলে মিশ্রিতং সর্ব্বথা তৎ,
নৈকং প্রাপ্তং নিয়তমনয়োর্ম্মানমস্তোব যস্মাৎ।
এবং জীবাঃ পরমপুরুষে ধ্যানযোগাদ্বিলীনা,
নৈকং প্রাপ্তা বিমলমতয়ঃ সন্ত এবং বদন্তি ॥"—তত্ত্বমুক্তাবলী ॥

অর্থাৎ,—হে জীব! তুমি 'সোহং' বাক্য বলিও না, সেবক ভাবে হরি-সেবা কর, সদ্গতি হইবে, অন্যথা অধঃপাত, এবং নানাযোনি ভ্রমণ।

সোহং জ্ঞান তোমার ভ্রম। হরিপাদপদ্ম ভজন কর। আমি তাঁর দাস, এই ভাবনা কর। অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করতঃ দ্বৈতবাদ স্বীকার কর।

নদী জলধিতে আত্মোৎসর্গ করিলেই ঐক্য প্রাপ্ত হয় না, উভয় জলই পৃথক্ থাকে ; জল ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রে ভেদ নিত্য।

দুগ্ধে দুগ্ধ ও জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু ঐক্য প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু উভয়ের পরিমাণ সমই থাকে। ধ্যানযোগে জীবে ও পরম পুরুষে মিলিত হইলেও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না, ইহা পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন।

মধ্ব পূর্ব্বাচার্য্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

"রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো নিনিন্দ বিম্ব প্রতিবিম্ব বাদং।
শিষ্টৈ গৃহীতং ন মতন্ত যস্মাৎ তস্মাৎ ভবেচ্চারু তরন্তু ন্যায়ং ॥"

মধ্বাচার্য্য নারায়ণ ভট্টের নিকট ভক্তি-শাস্ত্র শিক্ষা করেন; কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"শ্রীনারায়ণ ভট্টবর্য্য সবিধে তদ্ভক্তি ভূষাভিধং,
সাঙ্গোপাঙ্গ মধীত্য ভক্ত কৃপয়া জ্ঞানং বহস্য ব্রজং।
ভক্ত্যাধারো ভয়া যথামতি শতশ্লোকী নিবন্ধমেয়া,
জীব ব্রহ্ম বিভেদ তত্ত্ব বিষয়ে সদ্বাক্য মুক্তাবলী॥"—তত্ত্বমুক্তাবলী।

ভাষ্যাদি প্রচারেব পরই তিনি মধ্বাচার্য্য নামে বিদিত হন। কথিত আছে, মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্যাসদেবকে স্বকৃত ভাষ্য উৎসর্গ করেন। ব্যাসদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটী শ্রীচক্র দান করেন; মধ্বাচার্য্য তাহা ব্রাহ্মণ্য উদিপি ও মধ্যস্থলে স্থাপন করেন।

মধ্বাচার্য্যের আর একটি শ্লোক এইখানে দিলাম—

"যস্য শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া মূ কোপি বাচালতাং,
পঙ্গুঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনেঽখিল মহোসামর্থমেতিক্ষণাৎ।
জন্মান্ধোপ্যরবিন্দ সুন্দর দৃশোদ্বন্দ্বং কিমন্যৎ পরং,
বন্দে নন্দকিশোরমিন্দুবদনং তং ভক্ত চিন্তামণিং॥"

৩। রুদ্র সম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য্য।

অনুরাগ-বল্লী গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শ্রীমহারুদ্র হইতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী। তাঁর পরিবার তাঁ সভার মুখে শুনি॥
তাঁর শাখা প্রশাখাদি অনেক জন্মিলা।
শ্রীবল্লভাচার্য্য নাথজীউর অধিকারী হৈলা।
তখন বল্লভী বলি সম্প্রদায় চলিলা॥"

বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী হইতেই এ সম্প্রদায়ের আরম্ভ। বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্যের পরে প্রাদুর্ভূত হন। বিষ্ণুস্বামী পরম ভক্ত ছিলেন। ভক্তি-রত্নাকর বলেন—

"ভক্তিরসে মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য সাথে। পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে॥"

বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্যের ন্যায়ই অল্প বয়সে সন্ন্যাসাবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচারে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার উপাস্যতত্ত্ব। বিষ্ণুস্বামী সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শিষ্য স্বীকার করিতেন না। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণুস্বামীর সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই অবগত হওয়া যায়। রুদ্র সম্প্রদায়ে বিষ্ণুস্বামীর

শিষ্যপর্য্যায় বল্লভাচার্য্য এই মতের বিশেষ পুষ্টি সাধন করেন; সেই হইতে ইহা "বল্লভী সম্প্রদায়" নামে অভিহিত হয়।

বল্লভাচার্য্য ত্রৈলঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণভট্টের পুত্র। শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। ঐ সময় আমাদের শচীনন্দন শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু যখন পশ্চিম ভ্রমণ করেন, তখন প্রয়াগ ক্ষেত্রে বল্লভ ভট্ট তৎসহ সম্মিলিত হন। চৈতন্য চরিতামৃতে যথা—

"সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আড়াইল গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥
দণ্ডবত কৈল তিঁহো প্রভু আলিঙ্গিল। দুই জনে কৃষ্ণ কথা কতক্ষণ হৈল॥"

"তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।"

"স্বগণ প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া। ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া॥"

শ্রীমহাপ্রভুকে লইয়া বল্লভ যমুনা পথে স্ব ভবনে আনয়ন করিলেন। পথে যমুনা দর্শনে প্রভুর ভাবরাশি উথলিয়া উঠিল, তদ্দর্শনে বল্লভ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; বাটি গিয়া ভক্তির সহিত—

"আনন্দিত হৈঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন। আপনে করিলা প্রভুর পাদ প্রক্ষালন॥
বংশ সহ সেই জল মস্তকে ধরিল। নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥"

অতঃপর শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল প্রত্যাগমন করেন। বল্লভভট্ট গোকুল গ্রামবাসী। যথা ভক্তমালে—

"বল্লভ আচার্য্য নাম মহান পণ্ডিত। গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত॥"

শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমনের পর, তিনি স্বমত প্রচারার্থ উৎসুকান্বিত হইয়া গোকুল হইতে দক্ষিণ দেশে গমন করেন। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তর্ক-যুদ্ধে তত্রত্য স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করেন, তৎপর উজ্জয়িনীতে গমন করত স্বমত প্রচার করেন। বল্লভাচার্য্য বালগোপালোপাসক ছিলেন। তৎকৃত একটি শ্লোক এই—

"পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণোহি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ।
দ্বিরূপং তদ্ধি সর্ব্বং স্যাদেকং তস্মাদ্ বিলক্ষণং॥"

অর্থাৎ,—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ও বৃহৎ বস্তু। তৎকৃত কৃষ্ণাশ্রয় স্তোত্রটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"সর্ব্ব মার্গেষু নষ্টেষু কলৌ চ খলধর্ম্মিণি।
পাষণ্ড প্রচুরে লোকে কৃষ্ণ এব গতির্মম॥ ১॥

ম্লেচ্ছাক্রান্তেষু দেশেষু পাপৈক নিলয়েষু চ।
সৎপীড়া ব্যগ্র লোকেষু কৃষ্ণ এব গতির্ম্মম ॥ ২ ॥
অহঙ্কার বিমূঢ়েষু সৎসু পাপানুবর্ত্তিষু।
লাভ পূজার্থি যত্নেষু কৃষ্ণ এব গতির্ম্মম ॥ ৩ ॥
নানাবাদ বিনষ্টেষু সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রতাদিষু।
পাষণ্ডৈক প্রযত্নেষু কৃষ্ণ এব গতির্ম্মম ॥ ৫ ॥
অজামিলাদি দোষাণাং নাশকোণু ভবেস্থিতঃ।
জ্ঞাপিতাখিল মাহাত্ম্যঃ কৃষ্ণ এব গতির্ম্মম ॥ ৬ ॥
প্রাকৃতাঃ সকলা দেবা গণিতানন্দকং বৃহৎ।
পূর্ণানন্দা হরিস্তস্মাৎ কৃষ্ণ এব গতির্ম্মম ॥ ৬ ॥
বিবেক ধৈর্য্য ভক্ত্যাদি রহিতস্য বিশেষতঃ।
পাপাসক্তস্য দীনস্য কৃষ্ণ এব গতির্ম্মম ॥ ৭ ॥
সর্ব্ব সামর্থ্য সহিতঃ সর্ব্বত্রৈ বাখিলনার্থ কৃৎ।
শরণস্থ সমুদ্ধারং কৃষ্ণ বিজ্ঞাপয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণাশ্রয় মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ কৃষ্ণ সন্নিধৌ।
তস্যাশ্রয়ো ভবেৎ কৃষ্ণ ইতি শ্রীবল্লভোঽব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

ঐ সময়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকা রচনার পরে বল্লভাচার্য্য নীলাচলে উপস্থিত হন। ঐ সময় গৌড়িয় ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলনার্থ নীলাচলে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীমহাপ্রভুর সহিত তাঁহার যথা সময়ে সম্মিলন ঘটে। বল্লভাচার্য্য বলিলেন; (যথা চৈতন্য চরিতামৃতে)—

"বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে। জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে ॥
তোমার দর্শন পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥"
"কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ-শক্তিধারী তুমি ইথে নাহি আন ॥"

সেই দিন হইতে প্রত্যহ ভট্ট প্রভু দর্শনে গমন করিতেন। আপনে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়া বল্লভাচার্য্যের মনে একটী অহঙ্কার ছিল। প্রভু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কৃপান্বিত হইলেন; তিনি ভঙ্গী করিয়া স্বীয় ভুবন-

পাবন-ভক্তবর্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া বল্লভ ভট্টের গর্ব্ব একবারে তিরোহিত না হইলেও, তাঁহাদিগকে দেখিতে আগ্রহান্বিত হইলেন এবং একে একে ভক্তদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গৌর-পার্ষদ-গণের প্রভাবে ভট্ট সঙ্কোচিত হইলেন। যথা—

"বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তা সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার॥"

যা'হোক, আত্মাভিমানী পণ্ডিত মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের কাছে আপন প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টার ক্রটী করিলেন না, কিন্তু প্রতি উদ্যমেই পরাস্ত হইলেন।

এক দিন হাস্য পরিহাস মধ্যে বল্লভভট্ট অদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন, "স্ত্রীলোক স্বামীর নামোচ্চারণ করেন না; জীব মাত্রই প্রকৃতি, কৃষ্ণ স্বামী। আপনারা অহরহঃ পতি নাম উচ্চারণ করেন, কোন ন্যায়ানুসারে?"

"ন্যায় ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি ঐ ত রহিয়াছেন, ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর।" শ্রীমহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া আচার্য্য প্রভু বল্লভভট্টকে কহিলেন। তখন—

"শুনি প্রভু কহিলেন না জান ধর্ম্ম মর্ম্ম।
স্বামীর আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা, নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়। নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়॥"

আর এক দিন বল্লভভট্ট প্রভুকে তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবত টীকা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যথা ভক্তমালে—

"শ্রীমদ্ভাগবত টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া। স্থানে স্থানে স্বামীর টীকায় দোষ দিয়া॥
শ্রীমান গৌরাঙ্গ স্থানে গেল শুনাইতে। আপন পৌরষ মানি লাগিল কহিতে॥
শ্রীধর স্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু। তা'হা দূষি সদর্থ স্থাপিল মুঞি পহু॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া। নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহিলা স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়। ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥
এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া। গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিল বসিয়া॥"

ইহাতে কি হইল? চরিতামৃতে যথা—

"প্রভুর উপেক্ষায় যত নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥"

এইবার বল্লভাচার্য্যের প্রকৃত বুদ্ধির উদয় হইল, ভাবিলেন—প্রয়াগে মহাপ্রভু আমার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করেন, এখন তদ্বিপরীত ব্যবহারের কারণ কি? মনের অভিমান-মালিন্য দূর করাই কি উদ্দেশ্য নহে? যেহেতু—"ঈশ্বর স্বভাব এই করেন সবার হিত।"

তার পরে চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, বল্লভ ভট্ট—

"এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে। দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥"

তখন— "প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাহা তাহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥"

"শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান। অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥"

এইরূপে ভট্টের গর্ব্ব-পর্ব্বত বিচূর্ণীত হইলে তিনি বুঝিলেন, রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনাই মধুরতর। এইরূপ মনে হওয়ায় তিনি মহাপ্রভুর অনুচর, পার্ষদ-শ্রেষ্ঠ গদাধর পণ্ডিত হইতে মন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক যুগলের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যথা:—"কিশোর গোপাল উপাসনার মন হৈল।"

"তাহাঞি বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সব সিদ্ধি কৈলা॥"

বল্লভভট্ট বালগোপাল উপাসনা ত্যাগ করিয়া যুগল উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেও, বল্লভী সম্প্রদায় তাঁহার পূর্ব্ব মতানুসারেই চলিতে লাগিল, এবং অদ্যাপি চলিতেছে। বল্লভাচার্য্যের আর একটী শ্লোক এই—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ কৃতমাত্মনিবেদনং।
যৈঃ কৃষ্ণসাৎকৃত প্রাণৈঃ তেষাং কা পরিবেদনা॥

৪। সনক সম্প্রদায়—নিম্বাদিত্য।

অনুরাগবল্লী বলেন:—

শ্রীসনক সম্প্রদায় চতুর্থ গণনা। প্রথমে সনক সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা॥
শ্রীনিম্বাদিত্য অনেক শাখা উপরান্ত। মহাভাগবত তিঁহো হইলা মহান্ত॥
সেই হইতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় বলি। কতক সময় হেন মতে গেল চলি॥

নিম্বাদিত্য সূর্য্যের অবতার। নিম্বাদিত্যের বিশেষ পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধনের নিকটে নিম্বাদিত্যের বাস ছিল। শাস্ত্রে তাঁহার নিম্বার্ক নাম পাওয়া যায়; তাঁহার আর একটি নাম অরুণি। অরুণিই আদি নাম। নিম্বার্ক নাম হওয়ার এই আখ্যান আছে যে, তিনি এক

যতীকে একদা নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু পাক সমাপন হইতে না হইতেই রাত্রি হইয়া যায়। রাত্রে দণ্ডীদের আহার নিষিদ্ধ, নিম্বাদিত্য তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় প্রভাবে স্বয়ং সূর্য্যের ন্যায় তেজ ধারণ করিয়া, প্রাঙ্গনস্থিত এক নিম্ব বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এদিকে রাত্রি হয় নাই জ্ঞান করিয়া যতীও আহার করিলেন। যথা অনুরাগবল্লীতে—

"একদিন এক দণ্ডী সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। করিয়াছিল তিঁহো বহু বিনয় যতন॥
অনেক সংঘট্ট রসোই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। প্রস্তুত হইল ভোগ লাগাইল মহন্ত॥
সন্ন্যাসীকে বোলাইতে সে কহে বচন।
সূর্য্য অস্ত হৈলে আমি না করি ভোজন॥
ব্যস্ত হঞা কহে আসি দেখহ সত্বর। সূর্য্যদেব রহিয়াছেন নিম্বের উপর॥
তাঁর আঙ্গিনাতে এক নিম্ব বৃক্ষ ছিল। তারে তদুপরি সূর্য্য প্রকট দেখাইল॥
প্রত্যয় করিয়া তিঁহো ভোজন করিল। তার ভক্তি মুদ্রা দেখি বড় সুখ পাইল॥
বসিলে বাজিল রাত্রি হৈল ছয় দণ্ড। বুঝিল সন্ন্যাসী তাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড॥
নিম্বের উপরে আদিত্যেরে দেখাইল। নিম্বাদিত্য নাম তাঁর তেকারণে হৈল॥"

ভক্তমাল গ্রন্থে ঠিক এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্বাদিত্য কৃত চারিটী মাত্র শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"অনাদি মায়া পরিযুক্ত রূপং ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎ প্রসাদাৎ।
বদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ কিল বদ্ধমুক্তং প্রভেদ বাহুল্য মথাপি বোধ্যং॥" ১॥
"স্বভাবতোঽপাস্ত সমস্ত দোষ মশেষ কল্যাণ গুণৈক রাশিং।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিং॥" ২।
"অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানামনুরূপ সৌভগাং।
সখী সহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্ট কমদাং॥" ৩॥
"নান্যাগতিঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দাৎ সংদৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদি বন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্ত সুচিন্ত্যবিগ্রহাদচিন্ত্য শক্তে রবি চিন্ত্য শাসনাৎ॥" ৪॥

অর্থাৎ,—ভগবৎ প্রসাদে জীব অনাদি মায়া হইতে মুক্ত হয়। বদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধমুক্ত ভেদে জীব তিন প্রকার। তাহাও অবস্থাভেদে বহুপ্রকার হয়। ভগবত্তত্ত্ব সমস্ত মহৎ ও মঙ্গলময় গুণে পরিপূর্ণ। তিনি পরব্রহ্ম, কৃষ্ণ, তিনিই হরি। সেই কৃষ্ণের বামে সহস্র সখী পরিবেষ্টিতা শ্রীমতি রাধিকাকে স্মরণ করি। ব্রহ্মা শিবাদি বন্দিত, অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ব্যতীত আর অন্য গতি নাই।

নিম্বাদিত্যের আর একটি শ্লোক এই—

"উপাসনীয়ো নিতরং জনেঃ সদা, প্রহানয়েহজ্ঞান তমোহনুবৃত্তেঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্ম্মুনিভি স্তর্ম্মোনিকং, শ্রীনারদায়াখিল সত্ব সংক্ষিপে॥"

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।—শ্রীহট্ট।

নাগর ঈশান দাস।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-ঘরণী শ্রীমতী সীতামাতার আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত পদ্মার পূর্ব্বপার রায় তেওথা গ্রামে আমাদের ঈশান দাস নাগর অদ্য উপস্থিত, উদ্দেশ্য এই। মাতা যখন বলিলেন,—

"ওরে ঈশান দাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ॥" অদ্বৈত প্রকাশ॥

ঈশান নাগর এই কথাটী শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মা, বুঝিয়া আজ্ঞা করিবেন, এ আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার সাধ্য নহে, কেন না সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ঃক্রম, ইথে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পণ?" ইহাতে সীতা মাতা উত্তর করিলে, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই জন্য তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু নাম ধারণ করিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" যথা—

"পূর্ব্ব দেশ যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে। বিয়া করাইবে ইঁহো করিয়া যতনে।
তাঁহা গৌর গৌর-ধর্ম্ম করিয়া প্রচার। তাহে বহু জীবগণ হইবে নিস্তার॥
তোহার সন্ততি মহাভাগবত। হরিনাম দিয়ে জীবে করিবেক মুক্ত।
শিরে ধরি এই সীতা মাতার আদেশ। জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইলু পূর্ব্বদেশ॥"

সীতামাতার সেই আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য জগদানন্দ রায় ঈশান নাগরকে লইয়া নিজ বাসস্থান বা জমীদারি রায় তেওথা গ্রামে উপস্থিত হইয়া নাগর ঈশানের বিবাহ দিতে উদ্যোগ করিলেন।

এই স্থানে কয়েকটী গণ্ড গ্রাম আছে। সম্প্রতি পদ্মার তীর হইতে যে সকল শিবালয় গ্রাম ভেদ করিয়া এবং কিছু পূর্ব্বাংশে কান্তাপতি নদীও গ্রাম-উথলী ভেদ করিয়া মানিকগঞ্জ গিয়াছে। উহার দক্ষিণ দিকে আরিচিয়া (এলাচিপুর) বর্ত্তমান ষ্টীমার ষ্টেসন এবং উত্তর দিকে সিবালয় থানা, পোষ্টাপিস সংলগ্ন গ্রাম নিহানপুর, ঝাঁকপাল, তেরবাড়িয়া, তেওথা, এবং তাহার উত্তরে যাইটঘর বল্লা

রাবুর-তেওথা বলে, এই রাবুর-তেওথার পশ্চিমোত্তরে গান্ধাইল এবং তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে জগদানন্দের বাসস্থান, রায়-তেওথা, (এই সমুদায়কে তেওথাও বলে) অদ্যাপি বড় বড় তরুলতা এবং বাঁস ও বেতবন হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপন বিগত গৌরব মনে করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জগদানন্দের বংশধরেরা সেই বিস্তীর্ণ গ্রামের প্রায় এক প্রান্তে, দরিদ্রের কুটিরস্থ নিশীথ সময়ে নির্ব্বানোন্মুখ দীপ-শীখার ন্যায় টীপ টীপ করিয়া জ্বলিয়া অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এখনও বর্ত্তমান আছেন। হায় কোথায় সে জগদানন্দ কোথায় সে বৃহৎ পরিবার, কোথায় সে গৌরব, আর কোথায় সে "জগার-গাড়," * কালের দুর্দ্দমনীয় চক্রে শেষ হইয়া এখন কিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

এই রায়-তেওথার দক্ষিনেই গাঁন্ধাইল। এই গ্রামে সেই সময় কএক ঘর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাঠক উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরাই প্রধান। ইহাদের যাজনিক পেশা, যজমান বাইট ঘর তেওথার বৈদ্য-বংশীয় গণ। এখন আর তাঁহারা গাঁন্ধাইল গ্রামে নাই, যজমানদের গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন, অদ্যাপি তাঁহাদিগকে গান্ধালীয়া পাঠক বলে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গান্ধাইল ত্যাগের কারণ কি? উত্তর কি করিব, কিছুই জানি না, তবে একটী কথা বলিতে পারি—যখন তাঁহাদের জনতার হ্রাস হইতে লাগিল, বা তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী ঢালীদের উপদ্রপে বিব্রত হইতে লাগিলেন, সম্ভবতঃ যজমানদের কি নিজেদের উদ্যোগে স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যজমানদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। নবাবের ঢালীগণ এই স্থানে তখন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, চুরি ডাকাতি জোর যবরদস্তি যতদূর সম্ভব তাহা করিতে তাহারা কুন্ঠিত হইত না। বোধহয় জগদানন্দের অভাবে কি গৌরগতপ্রাণ জগদানন্দ বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন হইতেই ঢালীদের প্রশ্রয় প্রাপ্তির কারণ। এই ঢালী বংশীয়গণ ইঁহারই অধীনে থাকা অধিক সম্ভব। যাহাহউক সে সকল কথা আমাদের আলোচ্য নহে।

এই গান্ধাইল গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক ঘর রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের একটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ স্ব-শ্রেণী জমিদার জগদানন্দের অনুগত, অথবা এই পরিবারের এক

* সময় ও স্থান পাইলে পাঠককে পরে জানাইব।

মাত্র রক্ষয়িতাই জগদানন্দ রায় ছিলেন যে কারণেই হউক, এই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে জগদানন্দের সাহায্যে আমাদের ঈশানদাস নাগর বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন। পরম উদাসীন ও শুষ্ক-গৌরাঙ্গ-গত-প্রাণ বৃদ্ধ ঈশান নাগর-সীতা মাতার ইচ্ছায় একবার সংসারে সংসারী হইয়া মায়ার সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এ খেলার মূল কে? এ প্রশ্নে আমাদের সুযোগ্য পাঠক মহাশয়েরা নিশ্চয় বলিবেন—আর কে—সীতা-মাতা, না হয় শেষ বলিবেন ঈশানের কর্ম্মপাশ! বাস্তবিক তাহাই বটে, কিন্তু একটু ঘোর আছে। এই ঈশান নাগর বাল্য-কাল হইতেই সীতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হয়েন। বয়ঃপ্রাপ্তেও তিনি সেই সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রধান সেবা তাঁহার প্রতি দিন মাথায় করিয়া গঙ্গাজল আনা এবং সেই জলে মাতাকে স্নান করান। এক দিন গঙ্গাজল লইয়া আসিতে বড়ই বিলম্ব হয়, ঈশান যখন জল লইয়া আসিলেন, মাতা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঈশান উত্তর করিলেন, গঙ্গাতীরের পথে একটী বিবাহিত বর-পাত্রী যাইতেছিল তাই দেখিতে দেখিতে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। কথাটী বলিয়া সেবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে বিবেচনায় ঈশান লজ্জিত ও ক্ষোভিত হইয়া বলিলেন, মা! অবোধ ও অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে, এই বলিয়া চরণতলে পতিত হইলেন। মাতা ঈশানকে উঠাইয়া ইষদ্ধাস্যে আশ্বাসিত বাক্যে কহিলেন, ঈশান! ইহাতে লজ্জিত ও দুঃখিত হইতেছ কেন? বিবাহ দেখিবার সামগ্রী, তা না হয় দু দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখিয়াছ, তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে, বেশ করিয়াছ। সীতামাতা মনে মনে ভাবিলেন ঈশান সংসারে কোন সুখই ভোগ করে নাই, বাল্যকাল হইতেই দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। যাহাহউক শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা থাকিলে ঈশানকে সংসারের কিছু সুখ ভোগ করাইতে চেষ্টা পাইব। সেই সময় পাইয়া আজ সীতামাতা প্রাণপ্রতিম পুত্রাধিক ঈশানকে জীবনের শেষ দশায় স্নেহ-মমতা প্রযুক্ত সংসার-সুখ ভোগ করিতে অবসর দিলেন। ঈশান এখন কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ, মায়ার খেলা খেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথা আমরা নিজ মাতামহী ও বৃদ্ধা মতামহীর মুখে শুনিয়াছি।

সে খেলায় মায়া তাঁহাকে বড় অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। বোধ হয় সেই হইতে প্রায় ৮। ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার তিনটী সন্তান জন্মে। কেহ তিন চারি, কেহ কেহ দুই তিন, কেহ বৎসরেক কি গর্ভে

এই সময়ে তিনি সীতা-মাতার আদেশ ক্রমে এই অঞ্চলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও তাঁহার শেষ আদেশ যখন মনে হইল, তখন ঈশান নাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্ত্রী-পুত্রের মমতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া একেবারে নিজ প্রভুর জন্ম স্থান শ্রীধাম লাউরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে দায়-মুক্ত ভাবিয়া ভজনানন্দে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাই আহ্লাদে অদ্বৈত-প্রকাশে লিখিয়াছেন—

"বংশ রক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম লাউরে॥"—ক্রমশঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ দাসানুদাস কাঙ্গাল—শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
ঝাঁকপাল, পোঃ—তেওথা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার।

৭ম উপদেশ।

দমন নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এক পক্ষকাল ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাশাক্ত ও মহামায়ার মহাভক্ত সুরথ রাজার রাজ্যে উপনীত হইলেন। সেখানে সুরথ রাজার প্রতিষ্ঠিত এক অষ্টভুজা পাষাণময়ী মূর্ত্তি আছেন। সুরথ নৃপতি ঐ দেবীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক, উহার সম্মুখে লক্ষ ছাগ বলি প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবতীকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ উদিত হইল। দেবীর মন্দিরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি মহাপ্রভুকে দেখিয়া ভক্তিভরে কহিলেন—

"তোমারে দেখিয়া ভক্তি উপজিছে মনে। সংসার সাগর বল তরিব কেমনে॥
কিরূপে ভজিতে হয় পরম ঈশ্বর। ইহা বলি ব্যাকুলতা ঘুচাও আমার॥"

মহাপ্রভু কহিলেন "আমি একে বালক তাহাতে অজ্ঞ, সারতত্ত্ব কিছুই জানি না; মাতা ভবাণীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার মনের অন্ধকার দূর করিবেন; তবে আমি একটী সহজ সঙ্কেতের কথা শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর—

"সুন্দর নায়ক দেখি সামান্যা নায়িকা।
যেই ভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা॥

সেই ভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বারে বার।
আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের আঁধার।”

উভয়ে এইরূপে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি দেবী অষ্টভুজার সমীপে বলিপ্রদানের জন্য একটী ছাগ লইয়া উপস্থিত হইল; তাঁহাকে ও তাহার সমভিব্যাহারী লোকদিগকে ছাগ বলির অবৈধতা প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—

“তোমরা কি দেবীর প্রীত্যর্থে না স্বীয় উদর পূর্ত্তির জন্য ছাগ বলি দিয়া থাক? তোমরা কি বলিতে পার মৃত্যুর পর তোমাদিগের কোথা গমন করিতে হইবে। দেবী ভগবতীর মূর্ত্তি অতি পবিত্র; তোমরা কি বিশ্বাস কর তিনি অপবিত্র ছাগের রক্ত-মাংসে পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হয়েন? তোমরা পশু হিংসা করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে ব্যস্ত, অথচ শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত নহ। সত্য বটে সুরথ নৃপতি ভগবতীর নিকট লক্ষ ছাগ বলি দিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা কি শাস্ত্রালোচনা করিয়া অবগত হও নাই, যে সেই জীবহিংসা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই সুরথ নরপতিকে প্রেতপুরে লক্ষ অসির আঘাত খাইতে হইয়াছিল? যে সকল ব্রাহ্মণেরা পশুহিংসার ব্যবস্থা দিয়াছেন, নিশ্চয় জানিও তাঁহারা নর রূপে মাংসাশী রাক্ষস ছিলেন। ‘অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের উপদেশ। জীবে দয়া কর, দেখিবে অন্তঃকরণে কি বিশুদ্ধানন্দের উদয় হয়! তোমরা চতুর্দ্দিকে এরূপ দৃঢ়রূপে মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ যে, শাস্ত্ররূপ জ্ঞানাস্ত্র ব্যতীত তাহা ছিন্ন হইবার নহে। তোমাদের সাত্ত্বিক আহারে রুচি নাই; তামসাহারের জন্য রসনা লোলুপ, তজ্জন্যই ধর্ম্মের ভাণ করিয়া দেবীর নিকট ছাগ মেষ বলিদান করিতে আগমন কর। মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া ভাব-পশুহিংসাই পরিত্রাণের উপায়, অতএব সেই জন্য বলি প্রদান কর। আমি দুইটী মাত্র প্রশ্ন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পার, তবে পশুহিংসা করিও। আর যদি অপারগ হও তবে যে ছাগটী বলি প্রদান করিতে আনিয়াছ তাহাকে ছাড়িয়া দেও, আমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যাই। প্রশ্ন দুটী এই—প্রথমতঃ, তোমরা শরীর হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার, অর্থাৎ কোন প্রাণীকে জীবন শূন্য করিতে পার; কিন্তু বল দেখি মৃত শরীরকে জীবিত করিতে পার কি না? দ্বিতীয়তঃ, মনে কর অপর কেহ ছাগটী ছাড়িয়া দিয়া তোমাদের এক জনকে দেব-দেবীর সম্মুখে বলি দেয়, তবে তাহা কি তোমরা ইচ্ছাকর বা তাহাতে

সন্তুষ্ট হও? তোমাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য আমি আরও কয়েকটী কথা সঙ্ক্ষেপে বলিব। ভগবতী জগন্মাতা, জীব মাত্রেই তাঁহার সন্তান। তোমার আমার ন্যায় ছাগাদি পশুও তাঁহার সন্তান; সুতরাং তিনি সন্তানের রক্ত-মাংসে কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। পরন্তু তোমরা নিগূঢ় অর্থ যদি অবগত থাকিতে তবে ঈদৃশ হাস্যকর অথচ কলুষিত আচরণ করিতে পারিতে না। অষ্টভূজা ভগবতী মদ্য-মাংসে পরিতৃপ্ত হয়েন, একথা কোন সাধু ব্যক্তির নিকট বলিলে তিনি ঘৃণা সূচক হাস্য করিবেন না? ভগবতী পরমা বৈষ্ণবী, সুতরাং তিনি মাংসাশী একথা বলাও মহাপাপ। বিশেষতঃ তিনি বালিকা নহেন, সুতরাং তাঁহাকে মাংস দিয়া ভুলাইতে যত্ন করিও না। আরও দেখ যদি পশুহিংসা করিলে পুণ্য হয় তবে মৎস্যজীবী ও নরহত্যাকারী দস্যু কেন পুণ্যবান্ বলিয়া আদৃত হইবে না? ফলতঃ নরহত্যার ন্যায় পশুহত্যাও মহাপাপ; সুতরাং ঈদৃশ পাপাচরণে কেবল ত্রিতাপেরই বৃদ্ধি হয়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

চূড়াধারির মীমাংসাপত্র বা দলিল।

গত ভাদ্র মাসের শ্রীপত্রিকার উক্ত শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রথম অংশ সম্ভবতঃ মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ মুদ্রিত হয় নাই। এই অংশ মুদ্রিত না হওয়ায় প্রকাশিত প্রবন্ধটীর ৭ম ও ৮ম পঙ্‌ক্তিতে অধিকারী মহাশয়গণের যে উল্লেখ আছে, তাঁহারা কে এবং কোথাকার, ও প্রবন্ধে তাঁহাদের উল্লেখ কেন করা হইল, তাঁহা সম্পূর্ণ অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে; এবং ৭ম পঙ্‌ক্তিতে তৎকালে (শৃঙ্গার বটের প্রভুপাদগণের সহিত ৮ধামস্থ অন্যান্য প্রভুপাদগণের মনোমালিন্য ও কথান্তর হওয়া কালে) অধিকারী মহাশয়গণের কেহ ছিলেন "না" মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুগত্যা অধিকারী মহাশয়গণের কেহ তৎকালে তথায় ছিলেন, এক "না" কথা অতিরিক্ত সংযোজিত হওয়ায় প্রবন্ধটী অঙ্গহীন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাঠকগণ! উক্ত ৭ম পঙ্‌ক্তির "না" কথাটী কাটিয়া দিয়া প্রবন্ধটীর প্রথমে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি সংযোগ করিয়া লইবেন।—

"আমরা অনেক দিন হইতে বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়া আসিতেছি যে

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত চান্দরা ও যশোদল গ্রামে মাধ্বাচার্য্য প্রভুর বংশধর গোস্বামিগণের বসবাস এবং ঐ জেলাস্থ কোন এক গ্রামের অধিকারী মহাশয়গণ নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয়ের উপশাখা-পরিবার। তাঁহারা নব অভ্যুদয় ইচ্ছুক হইয়া উপশাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূল শাখাতে এবং অধিকারী শ্রেণী হইতে গোস্বামিত্ব পদে পরিগণিত বা উন্নীত হইতে ইচ্ছুক হওয়ায় ঐ দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলিয়া স্বীকার না করায়ও কেবল চান্দরা ও যশোদল ভিন্ন আর কেহ ঐ দেশে গোস্বামী নাই বলায়, এইরূপ ঐ বিষয়ের আন্দোলিত হওয়ায় উক্ত অধিকারী ও গোস্বামীদিগের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে, এবং সেই হইতে অধিকারিগণ উক্ত গোস্বামী প্রভুদিগের প্রতিপত্তির খর্ব্বতার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। এইরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ৮ বৃন্দাবনধামে আর একটী ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং তাঁহাদের অভিষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ ঘটে।"

বৈষ্ণব দাসানুদাসের অযোগ্য—শ্রীঠাকুরদাস দাস।

মকুহাপুব আনসহ।

শ্রীখণ্ড।

গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণবদিগের প্রাণ জুড়াইবার স্থান যদি বঙ্গদেশে থাকে, তবে সে শ্রীখণ্ড। শ্রীমন্নরহরিদাস-সরকার ঠাকুর এই স্থানকে যে গৌর-প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়া গিয়াছেন, আজি পর্য্যন্ত সে তরঙ্গের বিরাম হয় নাই। এখানকার বালকদিগের মুখে যেরূপ গৌরনাম উচ্চারিত হয়, এরূপ মধুমাখা নাম অন্যত্র কুত্রাপি শ্রবণ করা যায় না। এখানকার লোক সকলেই গৌর-প্রাণ, গৌর ব্যতীত অন্য আর কেহ ঈশ্বর আছেন তাহা ইঁহারা জানেন না। আজ কাল কার্ত্তিক মাস নিয়ম সেবা, সেই জন্য অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীলোকগণ গৌর-সেবায় নিযুক্ত হয়েন, বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অতিথি অভ্যাগতদিগকে অতি যত্নের সহিত সেবা করান। কেনইবা না হইবে? ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিত্য সহচরী। শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় একটী পদে বলিয়াছেন—

মরমহি গৌর গৌরগুণ শ্রবণহি বদনহি গৌরকি নাম।
ভরমহি গৌরচাঁদ বিনে লোচনে হেরিএ না হেরিএ আন॥

সজনি শুরু গৌরব দূরে গেল।
তনু মন লোচন শ্রবণ রসায়ন সবহুঁ গৌরময় ভেল।
দুর সঞে গৌরনাম যব শুনিএ চমকিএ অবিচল চিত।
না জানিএ কিএ অনুরাগে ঘটাঅল গোরাচান্দ সম্বমিত॥
পতিক সোহাগ আগসম লাগই ধৈরজ ভেল উদাস।
নিশিদিশি গোই গোই কত রাখব কহতহি নরহরি দাস॥

যাঁহাদের আদি পুরুষ এইরূপ গৌর-প্রাণ তাঁহার বংশের নরনারী যে গৌর-প্রাণ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

এই সরকার-ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। ইহারই বংশধরগণ এই শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যগণের মধ্যে শশিশেখর রায় একজন প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে। ইনি একটী পদে বর্ণনা করিয়াছেন—

ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে, যাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে, মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসই রাত্রি দিনে, নাম ধরে নরহরি দাস॥
ব্রজ মধ্যে যুথেশ্বরী, রূপে গুণে আগরী, মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনিতে অবতরি, পুরুষ আকৃতি ধরি, পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম॥
মধুমতী মধু দানে, ভাসাইল ত্রিভুবনে, মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগর।
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর যত ভক্তবৃন্দ, বেদবিধি পড়িল ফাঁপর॥
যোগপথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ সহোদর।
দুখিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়, শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥

অত্রস্থ ঠাকুরবংশ পণ্ডিতের আকর-ভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বংশসম্ভূত শ্রীবদনচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের কৃত শ্রীগৌর-কুসুম নামক একটী স্তোত্র শ্রীপত্রিকার স্থান বিশেষে প্রকাশিত হইল, তাহা পাঠ করিলে শ্রীরূপ-গোস্বামীর রচনা-চাতুর্য্য স্মৃতিপথে উদিত হয়। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জগদানন্দ ঠাকুর এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পদের রচনা-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিলে মনুষ্য কৃত বলিয়া বোধ হয় না। পাঠকগণ "জাগহুঁ বৃষভানু নন্দিনী" ইত্যাদি পদ পাঠ করিয়া থাকিবেন। ইঁহার কৃত অনেকগুলি পদ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া নানা স্থানে পতিত হইয়া আছে, তাহা একত্র করিলে একখণ্ড বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে। আমরা যে কয়েকটী নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই শ্রীখণ্ডধাম কাটোয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণংশে দুই ক্রোশ মাত্র.

এই পথের এক ক্রোশ গমন করিলেই শ্রীবাজিগ্রাম দর্শন হয়। এই স্থানে প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছিলেন, অত্রস্থ নবগ্রামবাসী গোস্বামীদিগের অধিকারে এই সেবা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সম্প্রতি শ্রীমধুসূদন দাস নামক জনৈক সদাচারী বৈষ্ণব, সেবা ভার নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন। তিনি ভগ্ন শ্রীমন্দিরের সংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া কিছু ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে। এখানে শ্রীগৌরমূর্ত্তির সেবা আছেন এবং শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণচিহ্ন—প্রাচীন বট বৃক্ষ—তমাল বৃক্ষ ও একটী নিম্ব বৃক্ষ আছে। এই নিম্ব বৃক্ষটি আচার্য্য প্রভুর দন্তকাষ্ঠ ছিল তাহাই মঞ্জরিত হইয়া অদ্যাবধি জীবিত আছে। এখানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে; ইহাকে "ডাইল ঢালা পুষ্করিণী" বলিয়া থাকে। কথিত আছে আচার্য্য প্রভু যখন মহোৎসব করেন তখন এই স্থানে মহোৎসবের "ডাইল" ঢালা হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডবাসী ঠাকুর-সন্তানগণের মধ্যে শ্রীরাধিকানন্দ-ঠাকুর, শ্রীসর্ব্বানন্দ-ঠাকুর, শ্রীরাধিকাবিলাস-ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধিকাবিলাস-ঠাকুর বড়ই ভজনবিজ্ঞ; ইঁহার দর্শন ভক্তগণের প্রার্থনীয়। শ্রীরাধিকানন্দ-ঠাকুর বৈষ্ণব-সেবায় উন্মুক্ত-হস্ত। ইঁহার মত মিষ্টভাষী, বৈষ্ণবসেবী ও দাতা অতি বিরল। শ্রীসর্ব্বানন্দ-ঠাকুর মহারাণী স্বর্ণময়ীর গুরুপুত্র ইনি সুপণ্ডিত এবং বৈষ্ণব-সেবীও বটেন। এই ঠাকুরবংশের দৌহিত্রবংশীয়গণ প্রায়ই ঠাকুর মহাশয়দিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই গৌরপরায়ণ।

ভাব সম্মিলন গৌরচন্দ্র।

(শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর কৃত।)

হোত মনহুঁ হুলাস সুলছন বাম নিজ ভুজ উরজ ঘন ঘন
ফুরই দূরসঙ্গে প্রাণ পিউ কিএ অদূব আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব, আগেনি. লিখন সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভুখণ সবহুঁ ভাওব রে॥
ত্রিপথগামিনী তীর পিউ যব, অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তজি কুচ কলস জোর অগোরি সাজব রে।
তবহিঁ হিমমাহ হার পহিরব, বেণী ফণি মণিমালে বিরচব,

চলব জলছলে কলস লেই সব কলেশ ভাজব রে।

নদীয়াপুর জয় তুর বাওব, হৃদয় তিমির সুদূর ধাওব,
ভকত-নখতর-মাঝ বব দ্বিজরাজ রাজব রে।
গৌর অঁগ যব আগন আওব, ঘুঘুট দেই তব নিকট যাওব,
দিঠি জল ছলে কলধৌত-পগ করি ধৌত মাজব রে।
রঙ্গণ শয়নক ভঙন পৈঠব, পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব,
কছু বিরস ভই কছু সরস দৈ দশ দোখে দোখব রে।
পীন কুচ করকমলে পরশব, ক্ষীণ তনু মনু পুলকে পূরব,
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস রাখি রোখব রে॥
বাহু গহি তব নাহ সাধব, সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুখই সুধাময় অধর পিবি পিউ পুন পিআওব রে।
মীনকেতন সমরে চেতন, হীন হোওব নিশি নিকেতন,
অবিরোধ বিন অনরোধ পিউ পরবোধ পাওব রে॥
মিটব কি হিয় বিষাদ ছল ছল, নয়নে পর্ছ যব তবহিঁ কল কল,
নাদ সুখদ সম্বাদ এক ধনি ধাই লাওল রে।
নাহ আওল এতনি ভাখন, মৃত সঁজীবন শ্রবণে পিবি পুন,
জগত ভণ জনু জীবন মৃত তনু জীবন পাওল রে॥

শ্রীপাটের বিবরণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালিদাস নাথ মহাশয় শ্রীপাট ও পুরাতন গ্রন্থাদির অনুসন্ধানার্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে সকল বৈষ্ণবতীর্থ ও গ্রন্থাদি দর্শন করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবসাধারণের গোচরার্থ প্রচার করা যাইতেছে—

শ্রীবসুজাহ্নবাজীউর শ্রীপাট।

এই তীর্থ পূর্ব্বকালে নদীয়ার অন্তঃপাতি সুখসাগর নামক গ্রামে অবস্থিত-ছিল। এক্ষণে গঙ্গার ভাঙ্গনে সেই স্থান লুপ্ত হওয়ায় ঐ পাটস্থিত শ্রীবিগ্রহাদি চাকদহের নিকটবর্ত্তী চান্দুড়ে নামক স্থানে সেবিত হইতেছেন। ঐ সেবার সত্বাধিকারী জিরাট নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-কন্যা গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীগণ। সেবার অবস্থা অতীব শোচনীয়, গোপালদাস নামক একজন ব্রজ-

থারী বৈষ্ণব ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যদ্বারা সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাবাজী চল্লিশবর্ষ যাবৎ এই স্থানের মহান্ত পদে অভিষিক্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। আখড়ায় দুই মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ, এক মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ, এক মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ এবং এক মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন। এই শেষোক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির বামভাগে শ্রীজাহ্নবাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এক স্থলে এত গুলি শ্রীমূর্ত্তি থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী মহাশয় কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা অনুমান করি সুখসাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বালিডাঙ্গা নামক গ্রাম ছিল। পাটমালার তালিকা অনুসারে ঐ বালিডাঙ্গায় উপগোপাল শ্রেণিভুক্ত পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পাট ছিল, তাহাও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে। এই কারণে ঐ পাটের শ্রীমূর্ত্তি সেবাদি যাহা ছিল তাহাও ঐ সুখসাগরের পাট বাড়ীতে নীত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে সেই দুই শ্রীপাটের শ্রীমূর্ত্তিগণ একত্রিত হইয়াছেন। শ্রীবসুজাহ্নবা জীউর পাটের বিবরণ এই যে—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটকালে তৎপুত্র বীরচন্দ্র প্রভু দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। পরে প্রভুর অপ্রকট হইলে বীরচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব্যতীত আর কেহ উপযুক্ত আচার্য্য প্রকট ছিলেন না। সুতরাং তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন বলিয়া খড়দহ হইতে নৌকাপথে শান্তিপুর গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে যশোড়ার ঘাটে * শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার উপদেশে শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু শ্রীজাহ্নবা মাতার নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করেন। † অবধূতনন্দন মাতৃস্থানে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াই কোন কার্য্যবশতঃ গৌড়নগর গমন করেন। ‡

---

* যশোড়া তৎকালে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে এই গ্রামের এক ক্রোশ দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন।

† এই কথাগুলি আমরা একাল পর্য্যন্ত মুখে মুখেই শুনিয়া আসিতেছিলাম, কোন গ্রন্থাদিতে প্রায় দেখা যায় নাই। সম্প্রতি শ্রীখণ্ডধামে যে সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ সংস্কৃত ভাগবতে লিখিত আছে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট হইলে কতক গুলি পাষণ্ড কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের অনিষ্ট সাধিত হয়, সেই জন্য কতক গুলি সদ্বৈষ্ণব বীরচন্দ্র প্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। বীরচন্দ্র তখন অদীক্ষিত, পরে তিনি মাতৃস্থানে দীক্ষিত হইয়া পাষণ্ডদলনার্থ গমন করেন। বোধ হয় এই গমনই গৌড়নগর গমন হইতে পারে।

সেখানে কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া রাজ-কারাগারস্থ বারশত কয়েদীকে মুক্ত করিয়া সকলকেই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ঐ দ্বাদশশত বৈষ্ণবসহ পুনরায় মাতৃসমীপে আগমন করিয়া এই সকল বৈষ্ণবদিগের পথশ্রান্তি ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য শ্রীজাহ্নবা দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, আমার সহিত বারশত মূর্ত্তি বৈষ্ণব আছেন, ইহাদিগের বিশ্রাম ও ভক্ষণোপযোগী স্থান ও খাদ্যের ত কোন অভাব হইবে না?" জাহ্নবাদেবী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন—'বীরচন্দ্র আমার ঐশ্বর্য্য কিছুই পরিজ্ঞাত নহে বলিয়াই এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহার সঙ্গে যে বারশত বৈষ্ণব আছেন ইঁহারাও অত্যন্ত তেজস্বী; এই সকল বৈষ্ণব ভূমণ্ডলে থাকিলে ইঁহাদের প্রভাবে জগতের মহৎ অমঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা; অতএব বীরচন্দ্রকে আমার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইব এবং এই বৈষ্ণবদিগের তেজঃ যাহাতে খর্ব্ব হয় তাহাও করিবার চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া শ্রীজাহ্নবাদেবী স্বীয় শরীর হইতে তেরশত স্ত্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। ইহারা সকলেই রূপযৌবনসম্পন্না এবং বৈষ্ণবী। জাহ্নবাদেবীর আজ্ঞানুসারে এই রমণীগণ পূর্ব্বোক্ত বারশত বৈষ্ণবগণের সেবার্থ নিযুক্ত হইলেন। * ইহার মধ্যে গোকুলানন্দ-রামনাথ প্রভৃতি চারিজন মাত্র বৈষ্ণব যোষিৎসঙ্গ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট সকলেই স্ত্রী গ্রহণ স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ তেজোহীন হইয়া গেলেন। পলায়িত কয়েক ব্যক্তির মধ্যে গোকুলানন্দ ঠাকুর বর্ত্তমান চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বেলেবসিরহাট গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তাহার কোন চিহ্নাদি আছে কি না তাহা অনুসন্ধানীয়।

বীরচন্দ্র মাতৃপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে অনেকগুলি গ্রন্থ ছিল তাহা এখন আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা প্রায়ই খণ্ড, তবে বহু অনুসন্ধান করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেখানি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত বৈষ্ণব-

*। কারাগার-মুক্ত বৈষ্ণবগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করণান্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যখন খড়দহে আগমন করেন তখন সকলেই মুণ্ডিত মুণ্ড সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে নাড়া বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, সেই জন্যই "বারশো নাড়া তেরশো নেড়া" এই কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

বন্দনা *। এই গ্রন্থখানি ১৭০৩ শকাব্দার লিখিত। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড এই দুই খণ্ড পুঁথি এখানে আছে তাহা বাঙ্গালা ১০৮৮ সালে লিখিত।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ থানার অধীন যশোড়া গ্রামে এই শ্রীপাট সংস্থাপিত, এই স্থানের কোন ব্যত্যয় হয় নাই। সেই কালের একটী শুষ্ক বকুল বৃক্ষ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাঙ্গনে অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। এখানকার প্রধান সেবা শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ও শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিদ্বয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত স্বয়ংই প্রকাশ করেন, ইহার বিশেষ বিবরণ জগদীশ চরিত্রে আছে এবং শ্রীপত্রিকায় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর লেখা হইল না। এক্ষণকার সেবাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ গোস্বামী। ইঁহারা রাঢ়ীয়শ্রেণী বন্দ্যঘটী গাঁই, এক্ষণে গোস্বামী বলিয়াই পরিচিত। ইঁহাদিগের বাটীতে যে কয় মূর্ত্তি মহান্ত সন্তান ও ইঁহাদের দৌহিত্র সন্তান বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা সকলেই অল্পবয়স্ক যুবক হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুতে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রায় সকলেই শ্রীহরিনামের সংখ্যামালা ধারণ করেন এবং তাঁহারা সকলেই মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং অতিথি-প্রিয়। এখানে প্রাচীন নিয়মানুসারে দেব-সেবায় উষ্ণতণ্ডুল প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ইঁহাদের গৃহে শ্রীজগদীশ চরিত্র বিজয় নামক একখানি গ্রন্থ আছে, এ খানি ১৭৩৭ শকে একবার পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের আদ্যোপান্ত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

শ্রীধাম শান্তিপুর।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর মহিমা অপার, তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রথিত। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে হরির অদ্বিতীয় তনু বলিয়াই তিনি অদ্বৈত এবং ভক্তি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা

* দেবকী নন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনাই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত, আর একখানি শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত বলিয়া চলিত আছে তাহা শ্রীআচার্য্যপ্রভু বংশীয় বৃন্দাবন ঠাকুর কর্ত্তৃক ত্রিপদীছন্দে রচিত। এখানি পয়ার

বলিয়া আচার্য্য, তাই তিনি অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভুর প্রকট কালে আচার্য্য বলিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকেই বুঝাইত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহাঁর মহিমা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, একদিন এই মহামহিমান্বিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের মুখ্যতত্ব গুরু—সমস্ত শাস্ত্রের কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যাখ্যাতা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গভীর হুঙ্কারে মহাবৈকুণ্ঠের আসন টলমল করিয়া টলিয়াছিল, তাহার ফলও কলির জীব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, শ্রীশ্রীমহাবৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কলি-জীবের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য—নিজ ভক্তের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য—অনর্পিতচরী নিজ প্রেমভক্তি সমর্পণ করিবার জন্য—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই প্রভুবংশীয় গোস্বামীগণই শান্তিপুরের শীর্ষস্থানীয়।

এই প্রভু-বংশীয় গোস্বামীপাদগণের বংশাবলী যাহা সংগৃহিত হইয়াছে তাহা এই—

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অচ্যুত, গোপাল, কৃষ্ণমিশ্র, বলরাম মিশ্র ও জগদীশ প্রভৃতি পুত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণমিশ্র ও বলরাম মিশ্রের বংশীয় প্রভুপাদগণ বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে শ্রীবলরাম প্রভুর দশ পুত্র।

১। কামদেব, ২। বাসুদেব, ৩। গোপীরায়, ৪। গোপীরমণ, ৫। মধুসূদন, ৬। পূর্ণানন্দ, ৭। নিত্যানন্দ ৮। কুমুদানন্দ, ৯। দেবকীনন্দন, ১০। মথুরেশ।

এই দশ প্রভুর মধ্যে কামদেব, কুমুদানন্দ, দেবকীনন্দন ও মথুরেশ এই চারি প্রভুর বংশীয় গোস্বামীগণ শ্রীপাট শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। কামদেবের বংশে রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রাধামোহনই গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কৃত ন্যায় শাস্ত্রের টিপ্পনী (পাতড়া) অতি উপাদেয়। নাটরাধীশ্বর মহারাজ বিশ্বনাথ শক্তি-মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁরই স্থানে বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্বমোহন শ্রীবিগ্রহ ইহাঁদিগেরই গৃহে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। শ্রীরাধামোহন কৃত কৃষ্ণভক্তি সুধার্ণব নামক একখানি বৈষ্ণব স্মৃতি এখানে প্রচলিত আছে। ইহাঁর কৃত আরও অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম স্কন্দের ও একাদশ স্কন্দের টীকা এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা প্রসিদ্ধ।

কুমুদানন্দ প্রভুর বংশধরগণ আউলিয়া বা পাগলা গোস্বামী নামে অভি-

হিত। দেবকীনন্দনের বংশধরেরা আগাবুনিয়া এবং বকুলতলা গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। বিদ্যাবলে মথুরেশ প্রভু চক্রবর্ত্তী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁকে মথুরেশ চক্রবর্ত্তী বলা হয়। মথুরেশের তিন পুত্র তন্মধ্যে ১ম রাঘবেন্দ্র ২য় ঘনশ্যাম ও ৩য় রামেশ্বর এই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারেই রাঘবেন্দ্র বংশীয়গণ বড় গোস্বামী, ঘনশ্যাম বংশীয়গণ মধ্যম বাড়ী বা মাঠা বাড়ী অথবা হাটখোলা গোস্বামী বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং রামেশ্বরের বংশীয়গণ ছোট বাড়ী বা চাকফেরা বাড়ী নামে অভিহিত। এই রামেশ্বর গোস্বামীর কেশব, হরিদাস, গোপাল, সন্তোষ ও রামকান্ত নামে পাঁচ পুত্র। ইহাদিগেরই বংশধর কুঞ্জবিহারী এবং ক্ষেত্রগোপাল সম্প্রতি বর্ত্তমান। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হইতে কুঞ্জবিহারী নবম পুরুষ ও ক্ষেত্রগোপাল দশম পুরুষ। এই ছোট গোস্বামী বাড়ীতে যে শ্রীসীতানাথ মূর্ত্তি আছেন তাহাই প্রাচীন সেবা, এই মূর্ত্তি মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত। যদিও শান্তিপুরস্থিত গোস্বামীদিগের সকল বাড়ীতেই শ্রীসীতানাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, তথাপি শ্রীসীতানাথের বাড়ী বলিলেই ছোট বাড়ী গোস্বামীদিগের বাড়ী বুঝিতে হয়।

সম্প্রতি বর্ত্তমান শান্তিপুরের ঈশানকোণে বাবলা নামক স্থানে একটী শ্রীসীতানাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিদেশী দর্শনার্থীগণ অজ্ঞতা বশতঃ ঐ শ্রীমূর্ত্তিকেই আদি মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু আমরা ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। উহা জনৈক বঙ্গদেশী বামাৎ বৈষ্ণব কর্ত্তৃক স্থাপিত। তবে বাবলা গ্রামটী পূর্ব্বে গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ছিল ঐ স্থানটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভজন স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা যে দর্শন যোগ্য স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনুমান ৬০।৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে বড় গোস্বামী প্রভুদিগের বাটীর শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামী প্রভু এই স্থানে একটী শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিবেন বলিয়া রাজমিস্ত্রী দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অতি বিস্ময়কর ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিয়া এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে ঐ ছোট বাড়ীর গোস্বামীদিগের শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীসীতানাথের সেবা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়াই কষ্টকর, তাহার উপর আবার বিগত ভূমিকম্পনে শ্রীমন্দির নাট মন্দির প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়াছে, সুতরাং সেবার বড়ই বিশৃঙ্খল দেখিয়া তত্রস্থ কতিপয় শিক্ষিত ভদ্র সন্তান একত্রিত হইয়া একখানি অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে

আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে গৌরভক্তগণ নিজ নিজ ঔদার্য্য গুণে আমাদের "গৌর-স্থান।" অদ্বৈত ঠাকুরের বংশধরগণের কীর্ত্তি বজায় করিতে যত্নবান হউন।

শ্রীপাট খেতুরী।

"ভজনের স্থান কবে, নয়ন গোচর হবে,
আর যত আছে উপবন॥" প্রার্থনা।

এবার লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরেই শ্রীসমাজের কার্য্যের জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। ইষ্ট বেঙ্গলষ্টেট্ রেলওয়ের যাত্রী হইয়া দামুক দিয়া ঘাটে পহুঁছিলাম। সম্মুখে পদ্মা, অদূরে একখানি ষ্টিমার, এই ষ্টিমার পাটনা যাতায়াত করে, গোয়ালন্দ হইতে চাপঘটীর মোহনা পর্য্যন্ত পদ্মাতীরের যাত্রীগণের ইহাই অবলম্বন। কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে আমরা এই ষ্টিমারে আরোহী হইলাম, আমার নিকট "শ্রীগৌরাঙ্গ" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকার অনেক গুলি ছিল। লোক বুঝিয়া অনেককেই তাহা দিলাম। সারাদিন আমরা ষ্টিমারে অনাহারে ছিলাম। কিন্তু শ্রীগৌরের নামে, প্রার্থনার গানে এবং শ্রীপাট খেতুর দর্শন লালসায় কি প্রকার আমাদের সময় কাটিয়া গেল বড় বেশী বুঝিতে পারি নাই। রাত্রে আমাদের ষ্টিমারেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে আট ঘটিকার সময় ষ্টিমার প্রেমতলীর নিকট একটী ষ্টেসনে পহুঁছিল। আমরা অবতরণ করিলাম, পদ্মায় স্নান করিলাম, আর কাল গৌণ না করিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া শ্রীকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপাট দর্শন করিতে ছুটিলাম। যে খানে অবতরণ করিলাম তথাহইতে শ্রীপাট ঠিক দুই ক্রোশ। আমাদের প্রাণে তখন দয়াময় ঠাকুর মহাশয় এক আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের সঙ্গিগণের মধ্যে অধিকাংশের বয়স পঁচিশের নীচে। বয়সে আমি বড়, কিন্তু দেখিলাম প্রেমভক্তিতে আমার সঙ্গী বালক ও যুবকগণ আমার শিক্ষা-গুরু। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পথের ধূলাতেই গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আমি অধমও সে লোভ সামলাইতে পারিলাম না। আমরা ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া গান করিলাম—

ত্যজিব শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥

তখন জলে বুক ভাসিল, দলে দলে লোক আসিয়া মধুর শ্রীকীর্ত্তন মধুরতম করিয়া তুলিলেন; শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নামের ধ্বনি দশদিক্ ব্যাপিয়া পড়িল; আমরা এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নাচিয়া গাইয়া শ্রীপাটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কিন্তু শ্রীপাটের সমীপস্থ হইলে আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে ত দেখিতে পাইব না। তাঁহার সেই তিলক-ঝলকিত মধুর মৃদু হাসি মুখখানি তো আর দেখিবার ভাগ্য নাই ভাবিয়া হৃদয় একবারে দহিয়া গেল, আনন্দাশ্রু আসিয়া শোকের অশ্রু বহিতে লাগিল। বন্ধুগণের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শ্রীপাটে হাজির হইলাম। লোকে লোকারণ্য। খেতুর এখন অরণ্যবিশেষ, এই অরণ্যের মধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির। আমরা ভেট দিয়া শ্রীঅঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। শ্রীমন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত। গাথনী ভাল নহে। শ্রীগৌরসুন্দর কাঙ্গালের ঠাকুর। এই অরণ্যে শ্রীমতী প্রিয়াজির সহিত কাঙ্গাল ভাবেই বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বদক্ষিণে এই শ্রীগৌরাঙ্গ যুগল মধুর মূর্ত্তি বোধহয় অষ্টধাতু নির্ম্মিত ও ব্রজভাবে গঠিত তারপর শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি মূর্ত্তি বিরাজমান শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রণীত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা নয়নজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই শ্রীমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিমাংশে বট বৃক্ষ তলার পার্শ্বে একটী বাঁধা বেদী আছে, এই বেদীতে শ্রীল আচার্য্য প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেন। বেদীর মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম শিক্ষাগুরুর সহিত শিষ্যের আসনের পৃথকত্ব সূচনার জন্যই নাকি বেদী বিদীর্ণ হইয়াছিল। আমরা বেদী দর্শন করিয়া গড়াগড়ি দিলাম। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিগ্রন্থের কথা মনে হইল। তার পরে শ্রীমন্দিরের কতকটা উত্তর পূর্ব্বভাগে একটী জঙ্গলময় স্থান ঠাকুর মহাশয়ের ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার দর্শন পাইয়া আনন্দে প্রণত হইলাম। কিন্তু এই মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্দিরের কোনও সাজসজ্জা হয় নাই।

ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত—

"কি অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গনে আবৃত। কত শত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত॥
কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে। কেহ বহুলোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষণে॥

কোথা আছে নানা বাদ্য বাদক নর্ত্তক। বহুদেশ হইতে আইল অনেক গায়ক।

অথবা নরোত্তম বিলাসে বর্ণিত—

"স্থানে স্থানে কদলীবৃক্ষের নাহি লেখা। নারিকেল কদলী বেষ্টিত অস্ত্র শাখা॥"

ইহার তো কিছুই নাই। না থাকিবারই কথা। সে রাজা রূপনারায়ণ নাই, চাঁদরায় নাই, নরসিংহ নাই। খেতুরী এখন শ্রীঠাকুরমহাশয়ের প্রেমপুণ্যের স্মৃতি লইয়া অরণ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই মহামহোৎসব উপলক্ষে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি অষ্টপ্রহর শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন তবে ভক্ত-দর্শকগণের পক্ষে বড়ই মঙ্গল করা হয়। কিন্তু সেরূপ শ্রীকীর্ত্তনানন্দের ব্যবস্থাও দেখা গেল না। যেখানে যে মহোৎসবে এক সময়ে দেবীদাস, গোকুলদাস, গৌরাঙ্গদাস, কান্ত চৌধুরী, জয়নারায়ণ ঘোষ, গন্ধর্ব্ব রায়, রূপ রায় প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত বায়ন ও কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তনমঙ্গল উঠাইয়া ভক্তবৃন্দকে শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা গানে পরিতৃপ্ত করিতেন, এখন সেখানে হায়! হায়! তাহার কোনও নিদর্শন দেখা যায় না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? এই মহামহোৎসবে যাহাতে প্রার্থনা কীর্ত্তন-মঙ্গল দিবারাত্র ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। খেতুরী বৈষ্ণবগণের পুণ্যতীর্থ, খেতুরী নামেও প্রেমের উদয় হয়, খেতুরীর ধূলী অঙ্গে মাখিলে অকৈতব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয়, প্রাণে প্রাণবল্লভের তরে লালসা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আতিশয্য ঘটে। প্রিয় পাঠক যদি শ্রীগৌর-লীলা বুঝিতে চাও, তবে প্রতি বৎসর একবার খেতুরে যাইও, যাইয়া ভজন-স্থানের পবিত্র রজে একবার গড়াগড়ি দিও।

ভজনস্থান।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভজন-স্থান সন্দর্শন জীবের এক মহা সৌভাগ্য। সেস্থানে প্রেমে গড়াগড়ি দেওয়া জীব মাত্রেরই এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষার্থ। ভজনস্থান প্রকৃতই গুপ্তবৃন্দাবন। পন্থ, নিবীড়, স্নিগ্ধ চিরশ্যামল এবং প্রেম-পূর্ণ। শ্রীমন্দির হইতে ভজনস্থান একক্রোশ উত্তরে। এই যে মহামহোৎ-সবের আনন্দে শ্রীমন্দির বেড়িয়া প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া দিবারাত্র লোক কোলাহলে খেতুর এক সহর সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু ভজনস্থলীতে আগমন করিলেই সকল কোলাহলের বিরাম হইয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহা-শয়ের ভজনপ্রভাবে অদ্যাপি এইস্থানে বৃন্দাবনী মধুরতা যেন মূর্ত্তিমতীভাবে

বিরাজ করিতেছেন। ভজনীস্থানে যাইবার সময় আমরা গান ধরিলাম—

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবশানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনার জলে, স্নান করি কুতুহলে,
প্রেমাবেশে সানন্দ হইয়া।
বাহুপরে বাহু তুলি, বৃন্দাবনে বুলি বুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াব তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি,
কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব॥ ইত্যাদি।

যখন আমরা ভজনস্থানে পহুঁছিলাম, আমাদের কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল; আঁখি ফুটিয়া ধারা বহিল, আমরা সেই প্রেমের ধুলায় "জয় নরোত্তম" বলিয়া গড়াগড়ি দিয়া তাপিত অঙ্গ শীতল করিতে লাগিলাম। মনে হইল এই-খানে বসিয়াই বুঝি ঠাকুর মহাশয় আমাদের জন্য প্রেমভক্তি ও প্রার্থনার আকারে অমূল্যরত্ন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই বটবৃক্ষ এখনও আছে, সেই প্রকাণ্ড গোল বেদিকা এখনও আছে। তাহার পশ্চিমে তেঁতুল-গাছ বেড়িয়া শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রিয়সখা শ্রীল রামচন্দ্রের ভজনবেদিকা এখনও রহিয়াছে। অদূরে ভোজন-স্থলীরও দর্শন পাইলাম। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জন্য প্রাণে কেমন এক শোকের তরঙ্গ ছুটিল, আমরা আর গান করিতে পারিলাম না। আমাদের কাক-কণ্ঠের কর্কশ রবে সেই-স্থানের মধুরতায় বাধা দেওয়াও ভাল বোধ করিলাম না। আমরা কেবল "জয় গৌরনিত্যানন্দ, জয় ঠাকুর নরোত্তম" এই গান করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। পরদিবস বস্ত্রের অঞ্চলে সেই প্রেমের রজ বন্ধু-বান্ধবের জন্ত বাঁধিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ।

প্রচার কার্য্য।

কলিকাতায় প্রকাশ্য স্থান সকলে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত মফস্বলেও প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীসমাজের সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মালদহ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের সময় তিনি এই পুণ্যধাম দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীপাট খেতুরীর একটী বিবরণ তিনি শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গকে উপঢৌকন দিয়াছেন। ইহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

শ্রীসমাজের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় শ্রীপাট সমূহের বিবরণ ও প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহার্থে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপাট সকলের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল এবং অবশিষ্টাংশ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থও তিনি অনুসন্ধান করিয়া অনেক বাহির করিয়াছেন। ইহা ক্রমে পাঠকগণকে জ্ঞাত করা হইবে।

শ্রীসমাজের প্রচারক শ্রীমান্ অন্নদাচরণ মিত্র মহাশয় শারদীয় পূজোপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করেন। সেখানে শ্রীসমাজের একটী শাখা সংস্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমি ভারত ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশন উপলক্ষে কানপুরে গিয়াছিলাম। সেই সভায় একদিন প্রেমের উপলক্ষে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছিলাম। এই স্থানে শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেককে শ্রীমহাপ্রভুর দিকে উন্মুখ দেখিয়াছিলাম। তৎপরে আর একদিন কানপুরের হরিসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম। এখানে আমি "অবতার" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। এই বক্তৃতা উপলক্ষে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্বকেই উপাস্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলাম। পরে খোল করতাল আনাইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছি।

সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অগ্রবাল সভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে আমাকে বরেলি যাইতে হইয়াছিল। সেই সভায় মঙ্গলাচরণচ্ছলে আমি

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং উপস্থিত ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ কে?" শীর্ষক ইংরাজি পুস্তিকা বিতরণ করিয়া আসিয়াছি।

সম্প্রতি আমি ফরক্কাবাদে গিয়াছিলাম। অনেক লোক সেখানে ধর্ম্মোপদেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতা করিবার উদ্যোগ করা হইল, নোটিশের মুসাবিদা করা হইল, আমি তাহাতে গৌরাঙ্গ সমাজের প্রচারক বলিয়া নাম দিলাম। সেখানে একটী মাত্র প্রেস, সেদিন সেটী বন্ধ ছিল, সুতরাং নোটিশ ছাপা হইতে পারিল না, তখন কয়েকজন ভক্ত ও তাঁহাদের মিত্রগণ মিলিয়া হাতেই প্রায় আড়াই শত নোটিশ লিখিলেন ও বিলি করিলেন। বিষয় "সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণ।" তাহাতেই ঈশ্বর ও জীবের তত্ত্ব নিরূপণের কথা উঠিল, ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে অবতারের প্রসঙ্গ চলিল। তিনদিন পর্য্যন্ত কেবল অবতার বিষয় লইয়াই বক্তৃতা হইল, অবতার মধ্যে কলিযুগ-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের প্রসঙ্গ আসিল—তাহারই সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রবণ করিয়া অনেক শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চতুর্থদিনে একজন গৌর-ভক্ত ব্রাহ্মণ হিন্দি ভাষায় দুইটী শ্রীগৌরাঙ্গের পদ গান করিলেন। আমি সেই দুইটী পদ শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম ও সেই দুইটী পদ সংগ্রহ করিয়া লইলাম। নিম্নে সেই দুইটী পদ লিখিতেছি। ভক্তগণ ইহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মণ্য আনন্দঘন—অধম উদ্ধার নবদ্বীপবাসী।
মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রকট তনু প্রেমপরিপূর্ণ মহাভাব রাশি।
ভ্রমত তৈলঙ্গ কর্ণাট গৌড়াদিসব বিমত-গজদমনকু সিংহ য্যায়সে।
প্রবল পাষণ্ড সব মতনকো খণ্ডকর চণ্ড পরতাপ মার্ত্তণ্ড ব্যায়সে॥
হেম হরতাল গোরোচনা ললিত দ্যুতি দামিনী দমন মৃদুমন্দ হাসে।
কৃষ্ণজীবন-প্রভু প্রকট চিন্তামণি শচীনন্দন অদ্বৈত দরশে॥ ১॥

হামতো শ্রীচৈতন্য উপাসী।
আনন্দ মঙ্গল নিধি শচীনন্দন সোত হেঁ সুখরাশি॥
ইন্‌কে চরণ শরণ যে আওয়ে পাওয়ে বৃন্দাবনবাসী।
কিশোরি দাস ইন্‌সে যে বহির্মুখ তে নর নরক নিবাসী॥ ২॥

ঐখানে সত্বরই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের একটী শাখা-সমাজ সংস্থাপিত করি-

বার চেষ্টায় আছি। ভরসা করি শ্রীপ্রভু সত্বর সকল কার্য্য সমাধা করিবেন।"

মালকী শাখা-সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় প্রচারক-রূপে মনোনীত হইয়াছেন।

শাখা-সমাজ।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের প্রচারক শ্রীমান্ অন্নদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই আমি শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের একটী শাখা সেই স্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত কতিপয় মহাত্মার নিকট প্রস্তাব করা হয়। আমাকে সেই স্থানে বক্তৃতা দিতে হয় নাই। তাঁহারা সকলেই কার্য্যটী সমাধা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীরামপুরের উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় সিংহ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার উদ্যোগে বড়ালের বাটীতে একটী সভা আহূত হয়।

বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ভাগবত-রত্নাকর মহাশয় নিয়ম-সেবা উপলক্ষে পাঠ করিতে শ্রীধামে গিয়াছিলেন। তিনি আদরের সহিত সভার আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবত-রত্নাকর মহাশয়ের বক্তৃতা বড়ই মধুর সুললিত ও ভাবময়। তাঁহার পাঠও শ্রবণীয়। নিয়ম-সেবার কার্য্য সমাধা হইলেই তিনি সমাজের নিয়মানুসারে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিবেন।

কলিকাতার আখড়ার মহান্ত শ্রীযুক্ত কিশোরদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার নাটমন্দির সভার অধিবেশনের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক আখড়ার যাত্রিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া সভার ব্যায় নির্ব্বাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইঁহার উদারতায় ও উৎসাহে সভার মঙ্গল আশা করি।

কাঙ্গাল শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, যাঁহার দীনতা দেখিলে পাষাণ-হৃদয় দ্রবিভূত হয় ও যিনি আমার ধর্ম্ম-জগতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনিও এই সভাভুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামযাদব বাক্‌চি এম্, ডি, মহাশয় সভায় উৎসাহ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভারতী ও উপরোক্ত মহান্ত মহাশয় সম্পাদক রূপে মনোনীত হইয়াছেন। নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছেন।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র কাব্যতীর্থ; মহান্ত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস বাবাজী; এবং শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দে সরকার।

বড়ালের বাটীতে কয়েক দিবস সভা উপলক্ষে সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।"

কটক ভগবদ্ভক্তি প্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অভিমন্যু মহাপাত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বিশেষ আনন্দসহকারে জানাইতেছি যে, কটক ভগবদ্ভক্তি প্রদায়িনী সভা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের শাখারূপে পরিগণিত করা হইল। শ্রীসমাজ কর্ত্তৃক যখন যে কার্য্য হইবে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন এবং যখন যে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় তাহা আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। অত্র স্থানের উৎকল দীপিকা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় পরম গৌরভক্ত। তিনি আমাদের সভার একজন সভ্য। এই পত্রিকায় নিয়মিতরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আলোচিত হইবে।"

বাঁকুড়া রাইপুর হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমার বহুদিনের বাসনা আজ কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছি, ক্ষুদ্র পত্রে কি তাহা ব্যক্ত হইতে পারে? আমার জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণা ক্রমেই তদীয় উদারচরিত্র পরমদয়ালু ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে এই সর্ব্বজনোদ্ধারিণী শুভ বাসনার উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ সংস্থাপনে সমস্ত ভারতের (কালে সমস্ত পৃথিবীর) শ্রীগৌরভক্তগণ পরস্পর পরিচিত হইয়া, ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে সম্মিলিত হইবেন, তাহার উপায় হইতেছে। আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস, শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমশঃ ইহাতে যোগদান করিয়া শিক্ষিত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। ধনীর ধন, বাগ্মীর বাক্‌পটুতা, বুদ্ধিমানের কার্য্যনৈপুণ্য প্রভৃতি যাঁহার যাহা আছে তদ্দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সাধ্যানুসারে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবার ইহা সুলভ ও সুপ্রশস্ত অবসর।

আমি অতি অকিঞ্চন হইলেও সম্পাদক মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সভ্যরূপে গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এবং মহাশয়ের দয়া করিয়া যে পত্র ও কয়েক সংখ্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। শ্রীসমাজের কার্য্য বিবরণ এবং বহু সংখ্যক মহাত্মার এতদ্বিষয়ক পত্রাবলী পাঠে অবগত হইয়াছি যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের একান্ত ইচ্ছা প্রতি গ্রামে তাঁহার প্রচার হয়।

আমার প্রস্তাবক্রমে রাইপুর হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীক্ষীরদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়বর্গের

যত্নে এখানে একটী 'শাখা-শ্রীগৌরাঙ্গসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের আশা এই শাখা-সমাজ সাধ্যমত শ্রীসমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন।

আমার বিশ্বাস প্রতি গ্রামেই শাখা-সমাজ স্থাপিত হইবে। তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে এই শুভ সমাচার প্রচার করা কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দর করুণা করিয়া এই দারুণ কলিকল্মষ বিমূঢ় পতিতগণকে স্বীয় ভজনানন্দ দানে উন্মত্ত করিবেন বলিয়াই আপনাদিগের দ্বারা এই সুমহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমি একজন অতি শ্রেষ্ঠ পতিত। আমার ত্রিতাপ-দগ্ধ-নীরসহৃদয়-মরুতে ভক্তিমন্দাকিনীর বিমল প্রবাহ প্রবল বেগে বহিলেই পতিতপাবন নাম অন্বর্থ হইবে। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীগৌরাঙ্গের ও তদ্ ভক্তবৃন্দের পরিচর্য্যাতেই আমার জীবন অতিবাহিত হয়।

পরিশেষে প্রার্থনা, এ দীনকে শ্রীসমাজের সভ্য মনে না করিয়া অধম কিঙ্কর বলিয়া জানিবেন। আমার দ্বারা যাহা করাইয়া লইবেন, শক্তি-সঞ্চার করিয়া আদেশ করিলে, যতদূর পারিব সমাজের সেবা করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইব।

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতিনাথ সরকার মহাশয়দ্বয় লিখিয়াছেন—

"টাঙ্গাইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজে একটী শাখা সংস্থাপিত হইল।—ইহার নাম শ্রীঅমিয়-শাখা সমাজ এই প্রাণের শ্রীঅমিয়-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, পাষণ্ডদ্বয়ের মন-মরুভূমে, এই সদেচ্ছার একটী নগণ্য অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল; কিন্তু পতিত-পাবন গৌরভক্তমণ্ডলীর প্রেম-সুধা-সিঞ্চন-অভাবে, সেই নবাঙ্কুরটী জীবন্মৃতাবস্থায় ছিল, এতদিনে কলিযুগপাবনাবতার প্রাণারাম শ্রীঅমিয়গৌরাঙ্গের অসীম কৃপাদেশে, গৌর-ভক্তমণ্ডলী আদিষ্ট হইয়া প্রেম-বারিসিঞ্চন করাতে, সেই অঙ্কুরটী সম্যক্ বিকশিত হইল। ভ্রাতৃগণ! এতদিন সাহস করিয়া আপনাদের শ্রীচরণ-প্রান্তে কিছুই নিবেদন করিতে পারি নাই। গৌরভক্তগণ! আপনারা অধমতারণ, আপনাদিগের বিতরিত নাম-সুধা-রস ও প্রেম-পীযূষ পান করিয়া পতিত জীবনগণ ভবক্ষুধা মিটাইয়া অবশ্য নিত্যানন্দময় নিত্যধামে যাইবার সম্বল সংগ্রহ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

আপনারা যে মহৎ উদ্দেশ্যসাধন করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া-

ছেন এবং জীবগণকে ব্রতী হইতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এ দীনাতিদীন কীটানুকীটদ্বয় কি সাহসে কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। বামন হইয়া চন্দ্রমা ধরিতে অভিলাষ হইয়াছে। তাহা কি কখন কেহ পারিয়া থাকে? অসম্ভব—অসম্ভবই বলি কেন? কারণ, সাধুমুখে শুনিয়াছি, "যদি প্রভুর দয়া হয়, অসম্ভব কিছুই নয়।" শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দয়া হইলে, না হইতে পারে এমত কিছুই নাই। "অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে।" এই স্থিরবিশ্বাসে ভর করিয়া আমরা চাঁদ ধরিতে অগ্রসর হইবার বাসনা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা, জানি না। ভগবান্ শচীনন্দন ও আপনারাই জানেন। এখানে প্রায় ৫ বৎসর হইল একটী "শ্রীহরিসভা" স্থাপিত হইয়া প্রতি রবিবারে রীতিমত সভার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। উক্ত সভায় "শ্রীগৌরাঙ্গসমাজ" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া, শ্রীহরি ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ব সম্বন্ধে কোন পার্থক্য না থাকায়, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গসমাজের অন্তর্গত "শাখা-সমাজরূপে" সভ্যগণের নিকটে গৃহীত হইয়াছে। এই শাখার নাম "অমিয়-শাখা" রাখা হইল। "শ্রীঅমিয়-সমাজ" নাম কি উদ্দেশ্যে রাখা হইল, তদ্বিবরণ নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

গৌরভক্তগণ! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের যেন মঙ্গল হয়, আমরা এই মহদুদ্দেশ্যে যেন সফলকাম হইতে পারি। আমাদের এমন কোন গুণ নাই যে, তদ্দ্বারা আপনাদের চরণ-প্রান্তে স্থান পাই। তবে ভরসা কেবল মহাজনদের আশ্বাস-বাক্য—

"তথাপি মূর্খের ভাগ্যে মনের উল্লাস। দোষ ক্ষমী মো অধমে কর নিজ দাস॥"

আমাদের ভিতরে কিছুই নাই—কেবল বাহিরেই সাধুতা প্রদর্শন করি। তবে ভরসা এই, যেখানে সজ্জা বাহ্য ঠাট মাত্র, সেখানে সজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হউক গৌণ উদ্দেশ্যও ত সিদ্ধ হইতে পারে। ভগবানের দাস হওয়া ত সহজ কথা নহে। তাঁহার দাস হইতে পারি আর না পারি, আমরা যে তাঁহার দাস সাজিয়াছি, ইহাতেই আমাদের ভরসা আছে, আমরা ভবসিন্ধু পার হইব। তাই জনৈক ভক্ত-বৈষ্ণবের সুরে আমরাও আবদার করিয়া বলি—

"সেবে সদেব বিষয়ান্ পুরুষ ক্রমেণ,
দাসস্তবেতি জগতি প্রতিপাদয়ামি।

হে কৃষ্ণ! বঞ্চয়িতুমণ্ডকদূতগোষ্ঠীং
ঘট্টীং তরতি ন শঠা মহদাখ্যয়া কিং॥"

শ্রীশ্রীঅমিয়ধামের অধীশ্বর, পরম অমিয় রভস-রাস-রসিক-রসেশ্বর-রাস-বিহারী, মোহনচূড়া ও মধুর মুরলীধারী, কুটিল-কটাক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকার মন-প্রাণ-পরিমন্থনকারী সেই নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার যে পথ, তাহা অমিয়-পথ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার যে সব পথ আছে, তাহা বড়ই দুর্গম—যোগ সাধনাদি-পথ বড়ই কৃচ্ছ্র সাধ্য। আমরা কলির জীব—অসমর্থ শিশু। আমরা ভক্তিবিশ্বাসহীন, সংযমবিহীন। অতএব যে পথ সহজ ও সুখ-সাধ্য, তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়, বাঞ্ছনীয় ও সর্ব্ববাদিসম্মত। যে পথে, ভগবানকে সহজে লাভ করা যায়, তাহাই 'অমিয়-পথ'-নামে অভিহিত হইতে পারে, এবং সেই প্রকৃত "অমিয়-পথ।" সেই অমিয়-পথ কি?—না, "শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন।" ইহার জন্ম বেদ-গর্ভে। অনাথ-বান্ধব, পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ বেদের গুহ্য-গর্ভ মথিত করিয়া, এই অমৃত জগতে বিলাইয়াছেন। প্রাণীজগতে বোধ হয়, 'অমৃতে' কাহারও অরুচি নাই?—সকলেই 'অমিয়ের' দাস। অতএব, যে পথে সহজে সেই অমিয়ধামের "পরম অমিয়কে" প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 'অমিয়-পথ।' যে সমাজ সেই 'অমিয়-পথের' অনুসরণ করিতেছে, তাঁহাকে "অমিয়-সমাজ" না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? অতএব, এই সমাজের নাম "অমিয়-সমাজ" রাখা গেল।—বোধ হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে।

২১এ কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি ৮ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীঅমিয়-শাখার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবাহন-সঙ্গীত হইয়া, তৎপরে সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণন ও নিয়মাবলী পাঠ এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে সমাজের নিম্নোক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করা হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু, অধ্যক্ষ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক; শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ সরকার, সহকারী সম্পাদক; শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরিবন্ধু পাল।

মালঞ্চী হইতে শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মালঞ্চী শ্রীগৌরাঙ্গসমাজ শাখাসমাজরূপে গঠিত হইয়া প্রতি রবিবারে অধিবেশন হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা এবং তাঁহার অবতার স্বীকার

সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় এবং শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন করা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের কীর্ত্তন বড়ই মধুর হয়, কারণ আমাদের সভার সভাপতি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে মহাপ্রভুর আবির্ভাব সেইখানেই আনন্দ প্রচুর। সমাজের কার্য্যে নিম্নোক্ত ভক্তগণ ব্রতী হইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার সম্পাদক
,, মহিমারঞ্জন সরকার, মালঞ্চী।
,, সতীশচন্দ্র অধিকারী ,,
,, ঋষিকেশ ভট্টাচার্য্য ,,
,, হেমচন্দ্র সরকার ,,
,, গণেশচন্দ্র নন্দী, তাজপুর।
,, জানকীনাথ মজুমদার, মালঞ্চী।
,, বনয়ারিলাল দত্ত ঐ
,, কৃষ্ণচন্দ্র ভাগবতভূষণ, শ্রীবৃন্দাবন।
,, দুর্গাপ্রসন্ন সাহা, পাবনা-হরিসভা।
,, ভক্তেশ্বর সাহা। ,,
,, চন্দ্রনাথ অধিকারী ,,

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার প্রচারক রূপে পাবনা, গএশপুর গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ বৃদ্ধির জন্য বক্তৃতা করিবেন। গত রবিবারের অধিবেশনে বিরুদ্ধবাদিগণ কর্ত্তৃক যে তর্কবিতর্ক হয় এবং শ্রীবৃন্দাবনে সম্পাদক মহাশয় বাস করা কালে যেরূপ আলোচনা করেন, তাহাই শ্রীপত্রিকায় প্রেরণ করা গেল। যে দিন যেস্থানে বক্তৃতা হয় এবং যাহারা সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হয়, তাঁহাদের নাম ক্রমশ প্রকাশ করিব। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা হইলে আমাদের সভ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে।

সভ্যদিগের তালিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন সরকার।	মালঞ্চী।
,, অন্নদাচরণ মিত্র	১৪নং চাউলপটী ভবানীপুর।
,, রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	কুণ্ডলা—বীরভূম।
,, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী	পটুয়াখালি, বাকরগঞ্জ।
,, হরসুন্দর চক্রবর্ত্তী	মুনসেফ, বরিশাল,

শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ চক্রবর্ত্তী	রমেশচন্দ্র হল, টাঙ্গাইল।
,, রঘুনাথ দাস	হেড পণ্ডিত ভগবান ইন্‌সটীটিউসন পুটীজুরী, শ্রীহট্ট।
,, রজনীকান্ত পৈত্য	২য় পণ্ডিত ঐ
,, হরিদাস বাবাজী	১১নং জানবাজার কলিকাতা।
,, নবকিশোর কবিরাজ	দক্ষিণখণ্ড, উখরা, বর্দ্ধমান।
,, নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী	আগরডিহি সঙ্গীত বিদ্যালয়, বর্দ্ধমান।
,, পরশুরাম গণাটিয়া	সোহিলা, সম্বলপুর।
,, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মহেশতলা।
,, নিতাইচরণ দাস সাহা	পোষ্টমাষ্টার বীরগঞ্জ।
,, নবীনচন্দ্র দে দাস	উকিল হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট।
,, সত্যনাথ বিশ্বাস	পুলিশ আপিষ কুচবিহার।
,, তারকচন্দ্র রায়	১৬৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, রামপ্রসন্ন ঘোষ	গোবরহাটী মুর্শিদাবাদ।
,, চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়	মুন্‌সিগঞ্জ-কলেজ, ঢাকা।
,, বিহারীলাল ঘোষ	লস্‌কর হাসপিটাল, গোয়ালিয়ার।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত	১৯৯নং দরমাহাটাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, গিরিজাকুমার বসু	৫০নং বেচূচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, খগেন্দ্রনাথ মোস্তফী	বড়াল লেন, হুগলী।
,, যতীন্দ্রলাল মিত্র (ভবকিঙ্কর)	৩নং মদনমিত্রের গলি, শুকিয়াষ্ট্রীট।
,, গৌরভূষণ গোস্বামী	রুকুনপুর, মুড়াগাছা, নদীয়া।
,, হরিগোপাল গোস্বামী	ঐ ঐ
,, কৃষ্ণসুন্দর রায়	জয়কা, করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	পোষ্টমাষ্টার, মুঙ্গের।
,, বালমুকুন্দ বেহারা	সম্বলপুর।
,, শশিভূষণ পাল	জাহানগর, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।
,, রামসহায় মোক্তার	মুঙ্গের।
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মহেশতলা।
,, শিবপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
,, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
,, জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	মহেশতলা।
,, কালীপ্রসন্ন রায়।	,,
,, মহাদেবচন্দ্র রায়।	,,
,, রজনীকান্ত সরকার।	উকীল, নিলফামারী।
,, নলিনীকান্ত বসু।	এলাসীন, টাঙ্গাইল।
,, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল। দ্বিতীয় শিক্ষক,	রাইপুর বাঁকুড়া।
,, অন্নদাপ্রসাদ মিত্র।	হেডমাষ্টার, প্রাণনাথ হাইস্কুল, সাতক্ষীরা।
,, গোকুলেশ্বর বহিদার।	সম্বলপুর।
,, পরমেশ্বর বিশি।	সারগিপালি, সম্বলপুর।
,, হরকুমার রায়।	৬৭নং চাষাধোপাপাড়া, কলিকাতা।
,, মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়।	ঈশাবপুর, ফরিদপুর।
,, নারায়ণচন্দ্র সেন।	৩১ নং মদন মিত্রের গলি।
ঐ গোপালচন্দ্র ঘোষ।	২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
ঐ যতীন্দ্রনাথ দে।	কোদালিয়া, সোণারপুর।
ঐ মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।	মুদিয়ালীগ্রাম, গার্ডেনরিচ।
ঐ অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন।	মহেন্দ্র গোস্বামীর বাটী, সিমুলিয়া।
ঐ তারাপদ ঘোষ।	জগদ্দল, শ্যামনগর।
ঐ শরচ্চন্দ্র দত্ত।	কোদালিয়া, সোণারপুর।
ঐ উদ্ধবচন্দ্র কুণ্ড।	গোবিন্দপুর, সাগরকান্দি, পাবনা।
ঐ প্রতাপচন্দ্র বসাক।	৯৭ নং পাইধনীরোড, বোম্বাই।
ঐ ভোলানাথ লাহা।	৭নং গোপালনগর রোড, আলিপুর।
ঐ কালিদাস চক্রবর্ত্তী।	মিয়ানমিয়ার।
ঐ গোপালচন্দ্র রায়।	শ্রীরামপুর।
ঐ যতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।	ভাগলপুর।
ঐ শরদিন্দু চক্রবর্ত্তী।	ঐ
ঐ রজতশেখর সেন।	ঐ
ঐ যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।	ঐ
ঐ সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।	ঐ
ঐ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।	ঐ
ঐ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	ঐ

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ লাহা।	ভাগলপুর।
ঐ কানাইলাল গুপ্ত।	ঐ
ঐ প্রফুল্লনাথ মজুমদার।	ঐ
ঐ আশুতোষ বসু।	২৯নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ঐ রোহিণীচন্দ্র রায় চৌধুরী।	বেটখৈর, চান্দাইকোণা।
ঐ পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়।	উলাকোর্ট গ্রষ্টার।
ঐ নীলমাধব রায়।	সাঁকোয়া বেনাপুর, মেদিনীপুর।
ঐ কালীপদ চট্টোপাধ্যায়।	রাইপুর, বাঁকুড়া।
ঐ ক্ষীরোদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।	ঐ ঐ
ঐ রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।	ঐ ঐ
ঐ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	ঐ ঐ
ঐ দীননাথ সাহু।	ঐ ঐ
ঐ গঙ্গাহরি গোস্বামী।	লড়কা, ঐ
ঐ বামহরি গোস্বামী।	ঐ ঐ
ঐ হরলাল চক্রবর্ত্তী।	ঐ ঐ
ঐ হৃদয়নাথ পাণ্ডা।	মটগদা, ঐ
ঐ উদয়নাথ সনগিরি,	বারপাথাল, ঐ
ঐ অখিলচন্দ্র সনগিরি।	ঐ ঐ
ঐ মুকুন্দদাস সনগিরি।	সাঁইতড়া ঐ
ঐ অধরচন্দ্র সনগিরি।	ঐ ঐ
ঐ পীতাম্বর সনগিরি।	ঐ ঐ
ঐ নন্দকুমার সাঁই।	গোহালডাংরা ঐ
ঐ পার্ব্বতীনাথ সরকার।	টাঙ্গাইল।
ঐ বঙ্কুবিহারী দত্ত।	ঐ
ঐ হরিবন্ধু পাল।	ঐ
ঐ অভিমন্যু মহাপাত্র।	হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সম্পাদক, কটক।
ঐ কিশোর দাস মহান্ত।	টালা, কলিকাতা।
ঐ বৈদ্যনাথ গোস্বামী।	কলাবামা, রেঙ্গালি, সম্বলপুর।
ঐ চারুচন্দ্র মিত্র।	খালিসপুর, সেনহাটি, যশোহর।
ঐ গোকুলচন্দ্র রায় বিদ্যার্ণব।	গোফলাই ডুবররাজপুর, বীরভূম।

শ্রীযুক্ত ললিতমাধব গোস্বামী।		ভাদবা।
ঐ রুদ্রকান্ত বসু।		ঐ
ঐ হরিগোবিন্দ বসু।		ঐ
ঐ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।		ঐ
ঐ নীলকান্ত বসু।		ঐ
ঐ প্যারিমোহন দাস।		ঐ
ঐ অক্ষয়কুমার গোস্বামী		ঐ
ঐ বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়		ঐ
ঐ গুরুদয়াল সিংহ।		ঐ
ঐ বৈকুণ্ঠনাথ শীল।		ঐ
ঐ ভবানীকুমার।		ঐ
ঐ হরিশচন্দ্র সরকার।		ঐ
ঐ রাসবিহারী সাহা।		ঐ
ঐ ভীমচন্দ্র তরফদার।		ঐ
ঐ হরিশচন্দ্র বসু।		ঐ
ঐ মাধবচন্দ্র কর্ম্মকার।		ঐ
ঐ সুখরঞ্জন বসু।		ঐ
ঐ নলিনীকান্ত বসু।		ঐ
ঐ যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।		ঐ
ঐ ললিতকৃষ্ণ বসু।		ঐ
ঐ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী।		ঐ
ঐ শরৎচন্দ্র বসাক।		নবাবপুর, ঢাকা।
ঐ পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস।		ছাপড়া।
ঐ বনয়ারি গোপাল মজুমদার।		বনয়ারি-আবাদ, মুর্শিদাবাদ।
ঐ পণ্ডিত কৃষ্ণচৈতন্য চট্টরাজ।		ঐ ঐ
ঐ বেহারিলাল হালদার।		ঐ ঐ
ঐ পণ্ডিত শশিভূষণ ঠাকুর।	দক্ষিণখণ্ড	ঐ ঐ
ঐ হরিদাস ভাস্কর।		দাঞিহাট, বর্দ্ধমান।

ক্রমশঃ—

সাহায্য প্রদান।

শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জেলা পাবনা গোবিন্দপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় প্রতিমাসে এক টাকা হিসাবে গত শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসের ৩৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। মালদহ শ্রীপাট গয়েশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বামনবিহারী গোস্বামী মহোদয় এক টাকা এবং জনৈক গৌরভক্ত দশ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা আহারিটোলা শঙ্কর হালদারের লেইন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চুণীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাসিক চারি আনা হিসাবে বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের সাহায্য চারি আনা প্রদান করিয়াছেন। গোয়ালীয়র হইতে ডাক্তার বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় ভাদ্র মাসে এক টাকা ও আশ্বিন মাসে ১২ টাকা পাঠান তাহা শ্রীপত্রিকায় স্বীকৃত হইয়াছে। ইনি বর্ত্তমান মাসে আরও আট টাকা শ্রীসমাজের সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছেন।

বেলুচিস্থানে গৌর-ভক্ত।

প্রায় চারি বৎসর হইল ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীল অম্বিকা দত্ত ব্যাস মহাশয় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে দেরাগাজির্খা নামক স্থানে গিয়াছিলেন। ঐ স্থান সিন্ধুনদীর অপর পারে এবং বেলুচি স্থানের মধ্যে। সেখানে যাইয়া তিনি এক দিন দেখিলেন এক জন তদ্দেশীয় বৈষ্ণব শ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের তিলক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাসজীর উৎসুক হইল যে এই বেলুচিস্থানে বাঙ্গালার সম্প্রদায়ের লোক কি করিয়া আসিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে সেখানে একটী শ্রীমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন এবং ৫০। ৬০ জন মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মূর্ত্তি আছেন। ইহারা তদ্দেশ বাশী এবং ব্যাসজী মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। এই ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস মহাশয় মহাপ্রভুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং আমরা আশা করিতেছি ইহা দ্বারা শ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সমাজের বিশেষ কার্য্য করাইবেন।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

চন্দ্রশেখর-পদাবলী।

বরাড়ী—হরি হরি দারুণ জেঠহি মাসে।
মাঝ গগনে আসি দিনপতি বেড়ল দশশত কিরণ বিকাশে ॥ ধ্রু ॥
ধূপক ভয়ে সব জন ঘরে পৈঠল, দ্বারহি দেয়ল কপাট।
চামর বিজন সব জন সেবই পথিক না চলত বাট ॥
ঐছন সময়ে রাই অভিসারল কানু মিলন প্রতি-আশে।
দেহ মরিযাদ কিছু নাহি রাখল ছুটল হরি অভিলাষে ॥
আগুনি অধিক রেণুপর চলইতে দগধল পদঅরবিন্দ।
চন্দ্রশেখর কহে মিলল কলাবতী কুঞ্জে শ্যামর চন্দ ॥

ভূপালী—কামিনী লাগি হরি যামিনী জাগল সঙ্কেত কাননে যাই।
নিজ গৃহে সুন্দরী রজনী উজাগরি ভয়ে যাইতে নাহি পাই ॥
দেখ দেখ সই সবর সুবিহানে।
কুঞ্জাক তিমিরে বেড়ল ব্রজ মণ্ডল অনুকূল দেব বিধানে।
অলখিতে সুন্দরী ছল করি নিকশল গুরুজন কোই না জানে।
দক্ষিণ করে এক সু ভেজল চলতহি মাঘ সিনানে ॥
অচিরে কলাবতী কুঞ্জহি মিলল নাগর নিরখি আনন্দ।
অমিলন জনিত দুহুক দুখ দূরে গেল উলসিত শেখর চন্দ্র ॥

বিষম বিধুন্তুদ বদনে পড়ল বিধু বুধগণ বোলত রাম।
সবহু বরজ জন দ্বিজগণে দেয়ত রতন বসন অনুপাম ॥
দশদিশে উঠল জয় জয় রোল।
কোই গায়ত কোই বাজায়ত নিকটে না শুনিয়ে কোন। ধ্রু ॥
ঐছন সময়ে একেশ্বরী সাজল হরি সঙ্গম সুখ সাধে।
যৌবন দান শ্যামধনে দেয়ত দূরে করি কুল মরিযাদে ॥
কুঞ্জ ভবনে অনুরাগিণী পৈঠল কানু সঞে গলে গলে লাগ।
চন্দ্রশেখর ভণে মুঝুমনে এতিখনে চান্দে লাগল উপরাগ ॥ ক্রমশঃ—

ভক্তিভিক্ষু—শ্রীআশুতোষচরণ গুপ্ত।

সমুদ্র-মন্থন।

——ঃ***।***ঃ——

অপরূপ জলধি, গৌর এবে হোয়ল,
তরঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত তায়।
কৃপাহুঁ জোয়ারে, অধম মরু সিঞ্চই,
আনন্দে নিত্যানন্দ রায়॥
ভাব বাসকী তাহে, সনাতন মন্দর,
শ্রীরূপ মন্থন কেলি।
প্রেম কমঠ তহিঁ, ধরল হি গিরিবর,
তহি কত উতপতি ভেলি॥
সুরতরু, হেম, পরসমণি, বৈষ্ণব,
মকর গদাধর দাস।
কিএ হরিদাস, মত্ত ঐরাবত,
পাষণ্ডী গরল প্রকাশ॥
ভকতি লছমী রূপ, উঠল সুধা নিধি,
নামহি শ্রীমতী রাধা।
জ্ঞান যোগ কত, তহি বড়বানল,
কুমতি করিণী পথে বাধা॥
দেখ হরি নাম, উদয় ভেল শশধর,
পতিত উদ্ধারণ ঠাম।
এ লোচন দাসে, তুহি না উদ্ধারবি,
এ কলঙ্ক তোহে বহু নাম॥

---

* সমুদ্র—শ্রীগৌরাঙ্গ, তরঙ্গ—অদ্বৈত, জোয়ার—নিত্যানন্দ কৃপা, মরুভূমি—অধম, বাসকী—ভাব, মন্দর—সনাতন, মন্থনকারী—শ্রীরূপ, কমঠ—প্রেম, সুরতরু, হেম ও স্পর্শমণি প্রভৃতি—বৈষ্ণবগণ, মকর—গদাধর দাস, ঐরাবত—হরিদাস, গরল—পাষণ্ডী, লক্ষ্মী,—ভক্তি, সুধা—রাধা, বড়বানল—জ্ঞানযোগ, করিণী—কুমতি, চন্দ্র—হরিনাম।

শ্রীপাটের বিবরণ।

রামচন্দ্রপুর।

শ্রীপাটমালার তালিকা অনুসারে হলায়ুধ পণ্ডিত, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং মুকুন্দঠাকুরের বাসস্থান রামচন্দ্রপুর। এই রামচন্দ্রপুর শ্রীধাম নবদ্বীপের উত্তর গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আমরা ভ্রমণকালে শ্রীনবদ্বীপ হইতে রামচন্দ্রপুর গমন করিলাম, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সেই গ্রাম এক্ষণে গঙ্গাদেবীর গর্ভে নিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি যাহাকে রামচন্দ্রপুর বলে ইহা অনুমান ৭০।৭৫ বর্ষ মাত্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন রামচন্দ্রপুর ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল, সেখানে প্রসিদ্ধ দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দেবমন্দির, বান্ধা ঘাট, অতিথিশালা এবং সেই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ যুগলমূর্ত্তির সেবা ছিল। এক্ষণে তাহার আর চিহ্নমাত্র নাই, নূতন রামচন্দ্রপুর স্থাপনের পূর্ব্বেই এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে। এখন যে স্থানে কালীদহ নামে একটী জলাশয় আছে, উহারই দক্ষিণ অংশে একবার দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখা গিয়াছিল। ইহা গঙ্গাদেবীর ভাঙ্গনেই আবিষ্কৃত হয়, পরে আবার বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। ইহা বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। অত্রস্থ শ্রীমূর্ত্তি এক্ষণে শ্রীবারাণসীধামে আছেন। এই গ্রামে একটী প্রাচীন বৈষ্ণব ও জনৈক প্রাচীন গোপ আছেন। বৈষ্ণব বাবাজীর নাম সখীচরণ দাস, প্রাচীন গোপের নাম মুচিরাম ঘোষ। ইঁহাদের বয়ঃক্রম সত্তর বৎসরের কম নহে। বাবাজী এই স্থানে চল্লিশ বৎসর বাস করিতেছেন, ঘোষজীর জন্মস্থান এই গ্রামে ইঁহারা শ্রীপাটের বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এই স্থান হইতে অর্দ্ধক্রোশ মাত্র উত্তরাভিমুখে গমন করিলে মাতাপুর নামক স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, পরিক্রম পদ্ধতি গ্রন্থানুসারে এই গ্রাম মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত। গ্রন্থে লিখিত আছে—"এবে মাতাপুর কহে লোক। পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখ শোক॥" স্থানটী অতি রমণীয়, শ্রীসুরধুনীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের বাটীর কোন গোস্বামী এইস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই গ্রাম মাধাইপুর বলিয়া আখ্যাত

হইয়াছে, এইস্থানে জগাই মাধাইয়ের শ্রীমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এবং অত্রস্থ একটী ঘাট মাধাইয়ের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ।

অগ্রদ্বীপ শ্রীমাধব ঘোষের পাট এবং অত্রস্থ শ্রীগোপীনাথ ঐ মাধব ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা যে একটী অতি প্রাচীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠ করিলে এই সেবা বাসুদেব ঘোষের বলিয়া প্রতীতি হয়। এবং এই সকল গ্রামে যাহা জনশ্রুতি আছে তাহাতেও বাসুদেব ঘোষের পক্ষই বলবান। "নহ্যমূলা জনশ্রুতি" এই ন্যায়ানুসারে শ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা বাসুদেব ঘোষের বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম। ইহার বিশেষ বিবরণ বাসুদেব ঘোষের জীবনীতে বিস্তার রূপে বর্ণিত হইবে। প্রাপ্ত পদটী যথা—

গোপীনাথ বন্দনা।

প্রণাম করিএ এবে করি জোড় হাত। অগ্রদ্বীপের মাঝে বন্দো গঙ্গাগোপীনাথ
ধন্য ধন্য অগ্রদ্বীপ অবনী ভিতর। যাহার নিকটে বহে গঙ্গা নিরন্তর॥
সেই স্থানে বাসুঘোষ করিলেন বাস। জীব তরাবার লাগি সেবার প্রকাশ॥
ভকতবৎসল হরি ফেরেন ভক্ত সাথ। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী প্রভু গোপীনাথ॥
একেত জাহ্নবী আছেন পতিতপাবনী। আর তাহে অবতীর্ণ হৈলেন চক্রপাণি
কিবা সে মাধুর্য্য রূপ জগমনোহর। ময়ূর পুচ্ছ শোভা করে চূড়ার উপর॥
কপালে অলকা সাজে অতি অনুপাম। কাম জিনি ভুরু চক্ষু পদ্মের সমান॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া প্রভুর মুখচন্দ্র। নয়ান ভরিয়া দেখ হইবে আনন্দ॥
নানা অলঙ্কার প্রভুর পাদপদ্মে সাজে। তার মধ্যে সোণার নূপুর রুণুঝুণু বাজে
আজানুলম্বিত ভুজ রাতুল চরণ। নবঘন জিনি রূপ ভুবনমোহন॥
একবার রূপ যার নয়নেতে লাগে পাশরিতে নারে রূপ হৃদয়েতে জাগে॥
সেই পাদপদ্ম যদি সদা করে মনে। ভবভয় তরে যায় কি করে শমনে॥
বাসুঘোষ বড় ভক্ত শুন সর্ব্বজন। যার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে করয়ে ঘোষণ॥
যাহাকে বলিলেন পিতা প্রভু নারায়ণ। মধুকৃষ্ণা একাদশী অপ্রকট হন॥
গোপীনাথ কুশধরি মোচ্ছব করান। দেশ বিদেশের লোক করেন আখ্যান॥
ভকতবৎসল প্রভু ভক্ত আজ্ঞাকারী। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন পীতাম্বর ছাড়ি॥
কিবা সে মাধুর্য্য রূপ তাহে খাদি পরি। সভাতে বসিয়া প্রভু হাতে কুশধরি॥
কুশধরি সেই হরি করেন তর্পণ। এই লীলা করেন প্রভু নন্দের নন্দন॥

মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি দেন গঙ্গাজল। অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল ॥
ভকতের প্রাণ তিনি ভকত তাঁহার। ভক্ত লাগি অগ্রদ্বীপে কৈলা অবতার ॥
অবতার করি প্রভু পাতকী তরাইল। দরশন দিবার লাগি ডুরি লাগাইল ॥
দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব্ব উত্তর ঈশান। চতুর্দ্দিকে যায় সব লৈযা প্রভুর নাম ॥
গোসাঞি মহান্ত এসে মহান্তের জন। সবে আসি মচ্ছবের করেন আয়োজন ॥

আখ্‌ড়া ছাড়ি আখ্‌রা বান্ধে যত আখ্‌ড়াধারী।
সওয়া দুইশ খরচ কাক কারু দুই চারি ॥

নীলাচলে লীলা করে প্রভু জগন্নাথ। তৎস্থানে মহোৎসব করেন গোপীনাথ ॥

গোপীনাথের স্থানে স্থানে মচ্ছবের আয়োজন।
(সবে) মালসা পুরি মিষ্টান্ন করেন নিবেদন ॥

সর্ব্বত্র বসিয়া প্রভু করেন ভোজন। অবশেষে মহাপ্রসাদ পায় সর্ব্বজন ॥
গৃহস্থ বৈষ্ণব * * * মহাপ্রসাদ লৈয়া সভে করে কাড়াকাড়ি ॥
স্থানের মাহাত্ম্য ভাই কহনে না যায়। বর্ণভেদ নাই প্রসাদ সকলেতে খায় ॥
প্রসাদ পাইয়া সভে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তার মাঝে নৃত্য করেন সেই মহাজন
কারু দশা হয় কেহ মুখে বলে হরি। কারু * * হয় কেহ প্রেমে গড়াগড়ি ॥
সর্ব্বত্র শুনিএ খোল করতাল ধ্বনি। আনন্দে বিভোর হৈয়ে কৃষ্ণকথা শুনি ॥
এই মত মহোৎসবের করেন আয়োজন। দয়া কর গোপীনাথ করি দরশন ॥
মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি রাজবেশ ধরি। কিবা সে মাধুর্য্য হয় বামেতে কিশোরী ॥
কিশোরা কিশোরী সভে করে দরশন। দেখিয়া দোঁহার রূপ জুড়ায় নয়ন ॥
কাতর হইয়া ভট্ট বাঞ্ছারাম বলে। আমার পিতাকে প্রভু রেখ পদতলে ॥
আমি অতি হীন মতি না জানি ভজন। যেন সকুটুম্ব পরিবারে পায় শ্রীচরণ ॥

ইতি শ্রীগোপীনাথের বন্দনা সমাপ্ত সন ১২৩৯ শাল ২২শে কার্ত্তিক।

শ্রীপাট দাঞীহাট।

পাটমালার লিখনানুসারে এই স্থান শ্রীমাধবানন্দ ঘোষের শ্রীপাট। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে মাধবানন্দ ঘোষের শ্রীপাটের কোন চিহ্নাদি এখানে নাই, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গায়ন মুকুন্দদত্তের শ্রীপাট এই স্থানে ছিল, এখন আর কোন চিহ্নাদি দৃষ্ট হয় না। এক গৃহস্থের বাটীর মধ্যে ঐ স্থান পতিত হওয়ায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে। আমরা সেই গৃহস্থের বাটীতে গমন করিয়াছিলাম, বাটীর কর্ত্তা একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমরা শুনিয়াছি এই

স্থানে শ্রীমুকুন্দ দত্তের পাট ছিল। তিনি আরও বলিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে এই স্থানে যে গৃহস্থ বাস করিতেন তিনি এই স্থানে একটী কূপ খনন করিয়াছিলেন সেই সময়ে কূপ খননকারী কূপ হইতে উঠিয়া বলিল মহাশয়! এই কুয়ার ভিতর ঠাকুর পূজা হইতেছে, নানাবিধ কাঁসর ঘণ্টা বাদ্য শুনা যাইতেছে এবং ধূপ ধুনার সৌগন্ধে কূপের তলদেশ আমোদিত হইয়াছে। এই কূপ ব্যবহার করিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে না। কিন্তু গৃহস্থ তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, অল্পদিন মধ্যেই তাহারা নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। আমরা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বিনয় সহকারে বর্ত্তমান গৃহস্থকে বলিলাম, আপনি শ্রীপাটের স্থানটুকু ছাড়িয়া দিয়া সেই স্থানে একটী তুলসী বেদী গাথিয়া রাখুন, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একটী করিয়া প্রদীপ দান করিবেন, গৃহস্থ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছেন।

আর ও জানিতে পারা গেল যে শ্রীমুকুন্দ দত্তের কৃত শ্রীরসিক রায় শ্রীবিগ্রহের সেবা শ্রীচক্রবর্ত্তী বাটীতে আছেন, এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের প্রধান শাখা শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর সন্তান।

এই স্থানে অনেকগুলি ভাস্কর জাতির বাসস্থান আছে, ইহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব এবং গৌরভক্ত। শ্রীবৈষ্ণব বন্দনার এক স্থানে লিখিত আছে, "ভাস্কর ঠাকুর বন্দ বিশ্বকর্ম্মানুভব।" এই ভাস্কর ঠাকুরের নাম গদাধর ভাস্কর। এই গদাধরেরই আত্মীয় স্বজনগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইহার মধ্যে নবীনচন্দ্র ও হরিদাস ভাস্কর ভ্রাতৃদ্বয় প্রস্তরশিল্প কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। ইহাদের খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি আজকাল রাজসাহি, পাবনা ও ঢাকা প্রভৃতি দেশে নীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্প্রতি ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যাদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া ইহাঁরা বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন। এই গ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তর পাতাইহাট নামক স্থান, এই পাতাইহাট গ্রামে রামানন্দ নামে দুই ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন, ইহার একজন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণব ছিলেন। যেমন কবি রামপ্রসাদ সেন ও আজু গোসাঞি পরস্পর সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব কলহ হইত, সেইরূপ এই রামানন্দ দ্বয়েও সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব কলহ হইত শাক্ত রামানন্দ কৃত "রণমাঝে দিগম্বরী নাচে গো মা" এই গানটী প্রসিদ্ধ আছে। এই স্থানে কতকগুলি পুরাতন ভগ্ন প্রস্তর দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এই প্রস্তর গুলি নৈহাটীর রাজভবনের ভগ্ন প্রস্তর, প্রস্তরের গায়ে হিন্দুদের দেবীবমূর্ত্তি চিত্রিত আছে, একখানি দীর্ঘ প্রস্তর হনুমানের গদা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীপাট আকাই হাট।

পাতাই হাটের উত্তরেই আকাই হাট গ্রাম। এই আকাই হাট কালিয়া কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে চৈত্রকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব হইয়া থাকে। এখানকার সেবাধিকারিণী জনৈক বৈষ্ণবী,—ইহাঁরা বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত এখানে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা এবং কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধি আছে। সমাধি মন্দিরের পশ্চিমাংশে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, ইহাকে নূপুর কুণ্ড কহে। এক সময়ে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বড় ডেঙ্গিতে নৃত্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পদস্থ নূপুর বিচ্ছিন্ন হইয়া এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এই জন্য ইহাকে নূপুরকুণ্ড কহে। ইহার তিন ক্রোশ দক্ষিণে কড়ুই গ্রামের মহান্ত বাড়ীতে সেই নূপুর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কালিয়া কৃষ্ণদাস ঠাকুর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

উদ্ধারণপুর।

উদ্ধারণ দত্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সুবাহু গোপাল হুগলির নিকট সপ্তগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্রস্থ নৈহাটীর রাজার দেওয়ান ছিলেন। নৈহাটী নগর কাটোয়ার দেড়ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। নৈহাটীতে যে রাজা ছিলেন তাঁহার নাম নই রাজা, তাঁহার জন্মস্থান ঝামটপুরের নিকট রসডাঙ্গা। ইহা অপেক্ষা নইরাজের আর কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না, নৈহাটীগ্রাম অতি প্রাচীন, এখানে একস্থানে একটী ভগ্ন বান্ধা রাস্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত, এই রাস্তার নির্ম্মাণকৌশল, ইষ্টক সংস্থাপন ও ইষ্টকের আকৃতি দেখিলে বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রামে অনেক গুলি ভদ্রলোকের বাসস্থান আছে, পরিমাণও নিতান্ত কম নহে।

বৈষ্ণব গ্রন্থে আমরা দুই স্থানে নৈহাটী ও নবহট্ট গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীজীবগোস্বামী তোষণী টীকার উপসংহারে নিজ বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

> বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমি বাস স্পৃহাং,
> স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিণী তটনিবাস পর্য্যুৎসুকঃ।
> ততোদনুজ মর্দ্দন ক্ষিতিপ পূজ্যপাদঃ ক্রমা,
> দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥

ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্মনাভ শিখরভূমি

হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে নবহট্ট গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই নবহট্ট গ্রামের অপভ্রংশে নৈহাটী নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। শিখরভূমি বর্ত্তমান আসান্‌শোল ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অবস্থিত, সেখান হইতে গঙ্গাতীরে আসিতে হইলে বর্ত্তমান নৈহাটী গ্রামেই আসিতে হয়, যেহেতু রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে গঙ্গাস্নানার্থিগণ অদ্যাপি কাটোয়ায় আসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। শ্রীপদ্মনাভ যে সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া ছিলেন, সে সময়ে নৈহাটী গ্রামই প্রসিদ্ধ ছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস কাল হইতেই কাটোয়ানগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে স্বীয় পরিচয় স্থানে এই নৈহাটী গ্রামের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নৈহাটী নিকটে হয় ঝামটপুর গ্রাম। যহিঁ স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥" অতএব নৈহাটী একটী রাজধানী না হইলে কখনই তাহার উল্লেখ করিতেন না।

এই নৈহাটীর উত্তরেই উদ্ধারণপুর. উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় নৈহাটীর রাজার দেওয়ান ছিলেন, তিনি যখন রাজকার্য্য করিয়াছিলেন সেই সময়ে এই স্থানে বাস করেন বলিয়া গ্রামের নাম উদ্ধারণপুর হইয়াছে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু একবার আগমন করিয়াছিলেন। এখানে একটী অতি প্রাচীন কালের বান্ধা নিম্ববৃক্ষ আছে, এই নিম্ববৃক্ষ তলেই মহাপ্রভু উপবেশন করেন, গাছটি সেইকালের বলিলেও বলা যায়। এই স্থানে উদ্ধারণ দত্ত কৃত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহাঁরই শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিগে দত্ত মহাশয়ের সমাজ আছে, এবং পূর্ব্বদিকে নিম্ববৃক্ষ বর্ত্তমান। অত্রস্থ শ্রীমূর্ত্তি এক্ষণে বনয়ারি-আবাদ দানীশমন্দ বাহাদূরের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তি সময়ে উদ্ধারণপুরে আগমন করিয়া থাকেন। এই দিনটি উদ্ধারণদত্তের তিরোভাবের দিন বলিয়া কথিত হয়। এই মকর সংক্রান্তির সময় এখানে তিন দিবস বৈষ্ণবদিগের একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এখনকার শ্রীমন্দিরাদি বনয়ারি-আবাদ অধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণে একটী পল্লি আছে, তাহার নাম বেণে-পাড়া। শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের কুটুম্বগণও সেই সময় এখানে বাস করিয়াছিলেন তাহা অনুমিত হয়। উদ্ধারণপুরে কয়েকটী বৈষ্ণবের আখড়া আছে, গ্রামটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া ইহা অতি রমণীয় স্থান। সংপ্রতি অনুমান ২০।২৫ বর্ষ হইবে গঙ্গার ভাঙ্গনে একটী বান্ধা ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর

ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। এই ঘাট উদ্ধারণ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। এই গ্রামের পশ্চিম অংশে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বৃহৎ ভগ্ন সেতু আছে, তাহা দেখিলেও সেই কালের বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীপাট ঝামটপুর।

কাটোয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে চারিক্রোশ ব্যবধানে ঝামটপুর গ্রাম। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত ভৃত্য মীনকেতন ও রামদাস এই ঝামটপুরে বাস করিয়াছিলেন, শ্রীপাটের তালিকার মধ্যে ঝামটপুর মীনকেতন ও রামদাসের পাট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা এই ঝামটপুর দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। এই স্থান শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সেবা, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর খড়ম এবং ভজন স্থান আছে, সেবাধিকারী শ্রীবিপিনদাস মহান্ত, ইনি সংযোগী বৈষ্ণব-শ্রেণিভুক্ত। আমরা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর হস্তাক্ষর লিখিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ এখানে আছেন, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে শ্রীকবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থ এখানে আছেন। ইহা অত্রস্থ মহান্তের কথা। কিন্তু আমরা ঐ গ্রন্থ দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করায় তিনি নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিলেন, পরে আমরা কেবল মাত্র শেষ পত্রটী দেখিতে চাহিলাম, শুনিয়া মহান্ত মহারাজ বলিলেন, ঐ গ্রন্থের শেষ পত্রটী ঐ গ্রন্থ মধ্যে কোথায় গোলযোগ হইয়া গিয়াছে তাহা পাওয়া যায় নাই সুতরাং ইহা শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখেরসহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইলাম। এই শ্রীপাটের শ্রীমন্দির এই দেশের দক্ষিণ খণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক শ্রীরসিকদাস কর্ত্তৃক ১৩০২ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রামে আরও কয়েক ঘর বৈষ্ণব আছেন, তাঁহারা সকলেই সংযোগী বৈষ্ণব-শ্রেণিভুক্ত।

টেঞা বৈদ্যপুর।

এই গ্রাম পদকল্পতরু গ্রন্থের সংগ্রহকারের জন্মস্থান, সংগৃহীত গ্রন্থে তাঁহার নাম বৈষ্ণবদাস থাকিলেও তাঁহার প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন। এই স্থানের জনৈক প্রাচীন গৌরভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে গোকুলানন্দের পতিত ভিটা দেখাইলেন এবং তাঁহারই মুখে শুনিলাম

যে অনেক দিন পূর্ব্বে গোকুলানন্দের বংশ লোপ পাইয়াছে। গোকুলানন্দের পুত্র রামগোবিন্দ সেন, তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল, সেই কন্যাদিগের বংশ আছে কি না তাহা তিনি পরিজ্ঞাত নহেন। শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের সময়ে গোকুলানন্দ বর্ত্তমান ছিলেন। এই গ্রাম ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধান। এই টেঞা গ্রাম উদ্ধবদাস নামক পদকর্ত্তার জন্ম স্থান, এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্র বংশীয়গণ এখানে বাস করেন। উদ্ধব দাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত * মজুমদার, জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত ও গোকুলানন্দে বড়ই বন্ধুত্বছিল, এমন কি কৃষ্ণকান্ত যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহাতে বৈষ্ণব দাসের নাম দিতেন এবং গোকুলানন্দ যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহাতে উদ্ধব দাসের ভণিতা দিতেন। ইঁহারা দুই জনে একত্র হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তথা হইতে আগমন কালে শ্রীবারাণশীধামে আসিয়া গোকুলানন্দের সাংঘাতিক পীড়া হয়, তাহাতে কৃষ্ণকান্ত বন্ধুর জীবনে হতাশ হইয়া একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই পদটী পাইবার জন্য আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাইবার সুযোগ হইল না। গোকুলানন্দ এ যাত্রায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে বাঙ্গালা বারশত সালের শেষ ভাগে জীবনযাত্রা শেষ করেন। উদ্ধব দাস বা কৃষ্ণকান্তের উপাধি মজুমদার, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র মজুমদার। ইঁহার সাত পুত্রের মধ্যে রাম কেশব মজুমদারের পুত্র নিতাইচাঁদ মজুমদার, এই নিতাইচাঁদের পত্নী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তিনি এখন কাটোয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিনক্রোশ কড়ুই নামক গ্রামে পিত্রালয়ে বাস করেন। রামকেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণের দৌহিত্রগণ টেঞা গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীপাট কাঞ্চনগড়িয়া।

টেঞার উত্তর একক্রোশ গমন করিলে কাঞ্চনগাড়িয়া গ্রাম পাওয়া যায়। এই গ্রাম দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের পাট দ্বিজ হরিদাস বড় হরিদাস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোকুলানন্দ, কনিষ্ঠ শ্রীদাস. ইহাঁরা পিতার আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকটে দীক্ষিত হয়েন।

* কৃষ্ণকান্ত ভণিতা যুক্ত পদ কতকগুলি পদকল্পতরুতে আছে, তাহাও উদ্ধবদাস কৃত বা উদ্ধবদাস ভণিতা যুক্ত পদগুলি কৃষ্ণকান্ত মজুমদার কৃত ইহাই বুঝিতে হইবে।

হরিদাস ফুলের মুখুটী নৃসিংহের সন্তান, ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশীয়গণ টেঞা গ্রামে এবং শ্রীদাসের বংশীয়গণ সাঁটুই নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীপাট মালিহাটী।

টেঞার একক্রোশ পশ্চিম মালিহাটী গ্রাম। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন এই গ্রামে মহারাজা নন্দকুমার প্রদত্ত একটী সুন্দর দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে, এই দীঘী ১১৭৬ সালে দুর্ভিক্ষ সময়ে মহারাজের ব্যয়ে খনিত হইয়াছিল। নন্দকুমার রাধামোহনের শিষ্য ছিলেন, পুটিয়ার অধীশ্বর রবীন্দ্রনারায়ণও শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি পুঁটিয়া রাজসভার পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া শক্তিমন্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া রবীন্দ্রনারায়ণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করান্। ইহার বিশেষ বিবরণ ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুটীয়াধীশ্বর রাজা পরেশনারায়ণ বাহাদুরও এই বংশীয়গণের শিষ্য। এক সময়ে গৌড়মণ্ডলে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে একটী বিচার হয়, এই বিচারে ঠাকুরমহাশয়ের পরিবার-গোস্বামীগণ, সরকার ঠাকুর-পরিবার-গোস্বামীগণ শ্রীজীবপরিবার-গোস্বামীগণ এবং শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার গোস্বামীগণ পরকীয়া বাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, এই বিচারে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরই প্রধান হইয়া বিচার করেন। ইহাঁর সঙ্গে বৈদ্যপুরবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার ও গোকুলানন্দের বংশীয় টেঞা নিবাসী কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর এই দুইটী ছাত্র ছিলেন। রাধামোহন এই বিচারে জয়লাভ করিয়া একখানি জয়পত্র লাভ করিয়াছিলেন। উহা বাঙ্গালা ১১২৫ সালে লিখিত হয়, এ সময়ে রাধামোহনের বয়ঃক্রম ত্রিশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পরেও রাধামোহন ২।৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। রাধামোহন কর্ত্তৃক সংগৃহীত পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। রাধামোহনের পুত্রাদিজন্মে নাই, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন ঠাকুরের বংশধরগণ মালিহাটী গ্রামে বাস করিতেছেন। মালিহাটী গ্রামে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা ও তাঁহার বসিবার আসন (গাদি) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদবেন্দু বা যাদবেন্দ্র ঠাকুরের বংশীয়গণ এই গ্রামের নিকটে দক্ষিণখণ্ডগ্রামে বাস করিতেছেন, যাদবেন্দ্র ঠাকুরের কতকগুলি পদ পদকল্পতরুগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশাবলী এই—ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ, তৎপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, তৎপুত্র জগদানন্দ এই জগদানন্দ ঠাকুরের ছয় পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে যাদবেন্দু বা যাদবেন্দ্র ঠাকুর, দ্বিতীয়পক্ষে রাধামোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন, শ্যামমোহন ও মদনমোহন। ইঁহারা প্রায় সকলেই পদকর্ত্তা ছিলেন। ভুবনমোহন ঠাকুরের বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ—মাণিক্যহার গ্রামে বাস করিতেছেন।

গুরু-ভক্তির প্রত্যক্ষ ফল।

গুরু ভক্তির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই, কিন্তু এতদ্দেশে বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে গুরু ভক্তি প্রথাটা যেন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। গুরুগণও হাটের তোলা আদায়কারী বা ছুটা নাথেরাজের করগ্রাহী গোমস্তার ন্যায় হইয়াছেন, শিষ্যগণও তাঁহাদিগকে একটা আপদ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। গুরু-গণও যেমন উপযুক্ত, শিষ্যগণও তেমনি উপযুক্ত, সুতরাং গুরু ভক্তি ও বিশ্বাসও সেই প্রকার। যেমন গুরু ভক্তি, সিদ্ধিও তদনুরূপ। এরূপ জগতে গুরু ভক্তির কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি একটী আশ্চর্য্য সত্য ঘটনা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিগত ১৩১৯ সালের শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব দিবস আগরায় একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে মাণিক্যহার শ্রীপাটের একটী ঠাকুর মহাশয় বাসা লইয়া ছিলেন। সে বাসায় আরও অনেক ভাড়াটিয়া লোক ছিল। ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার একটী বালক পুত্র এবং একটী বৃদ্ধ শিষ্য ছিল, শিষ্যটি গুরুর সেবাকার্য্যের জন্যই আসিয়াছিল। রাত্রি শেষ হইয়াছে পূর্ব্বদিকে উষাজ্যোতিঃ প্রকাশিত; প্রবাসী গৃহবাসিগণ কেহ জাগিয়াছেন, কেহ নিদ্রা যাইতেছেন; ঘরটি বড় জীর্ণ বিশেষ বর্ষার জল বসিয়া আরও অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং আর যাত্রিভার বহন করিতে অক্ষম, পতনোন্মুখ দ্বিতল গৃহ লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্যই যেন সঙ্কেতরূপ খোয়ামাটী বর্ষণ করিল। যাত্রিগণ একেই প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতেছিলেন, খোয়া ও ইষ্টকাদি পতন মাত্রেই সকল হতসম্পত্তি বান্ধবের ন্যায়; সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। জন শূন্য গৃহ তখন পতনোন্মুখ হইয়া প্রচুর ইষ্টকাদি বর্ষণ করিতে করিতে সরিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে পতিত হইল। ঠিক সেই

ভীষণ সময়ে গুরুঠাকুর মহাশয় বর্ষীয়ান শিষ্যকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিম্ন তলস্থিত গৃহ মধ্যে হইতে পোর্টমেণ্ট বাহির করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। একালের শিষ্য হইলে তখনি গুরুকে বলিত "রসাতল যাইতে হয় তুমিই যাও।" কিন্তু গুরুভক্ত প্রাচীন শিষ্য আজ্ঞামাত্র নিজের বিপদ গণ্য না করিয়া প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া গুরু আজ্ঞা পালন করিল। গুরু ভক্ত বিশ্বাসী শিষ্য যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে শমনেরব্যাদিত বদন সদৃশ গৃহে প্রবেশ করিয়া সবেমাত্র পোর্টমেণ্টেতে হস্ত প্রদান করিয়াছে, হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ সেই আপতমান দ্বিতল গৃহটি সশব্দে ভক্তের উপর পড়িয়া গেল। আহা! একান্ত গুরুগত প্রাণ শিষ্য, স্তূপাকৃতি ইষ্টকরাশি মধ্যে প্রোথিত হইল। কেবল সেই ইষ্টক স্তূপের ভিতর হইতে সেই গৃহ পতনের বজ্রনিনাদ বিরত হইতে হইতেই "কেও আমায় তোলাও গো" একবার মাত্র এই শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নাবশিষ্ট অপর ভিত্তি ধূলিজালে দিগ্দিক অন্ধকার করিয়া সশব্দে সেই শব্দ ডুবাইয়া পতিত হইল। নিরব আর কোন শব্দ নাই হইলেও সে শব্দ ইষ্টকরাশি ভেদ করিয়া উঠিল না, বা গুরু ভক্ত সাধুর কণ্ঠস্বর চিরবিরতি লাভ করিল। আহা! ধন্য ভক্ত তুমিই ধন্য! এই গুরুভক্তি বিহীন দেশে তুমিই গুরু ভক্তির উন্নতধ্বজা উড়াইয়া চলিলে। কিন্তু হে ভক্ত! তোমার এ গুণের গরিমা কে করিবে? তুমি এ সমাজে ধন বা বিদ্যা দ্বারা খ্যাতনামা নহ, তুমি দরিদ্র, মূর্খ, তোমার মত ব্যক্তির এই সত্য কালোচিত গুণ কে দেখিবে, তুমি যদি এ সভ্যজগতের কেহ হইতে এখনি তোমার ফটো উঠিত, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে অদ্ভুত আকারে তোমার যশোরাশি অতি রঞ্জিত হইয়া দেশে দেশে প্রচারিত হইত। এখনি তোমার যশঃকাহিনী স্কুল পাঠ্য পুস্তকে আদর্শ চরিত্ররূপে লিখিত হইত, সভ্যদলের রসনাগ্রে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইত। সে ভাগ্য তোমার নাই, তাই আজ ছয় বৎসর পরে তোমার সেই অতুল গুরু-ভক্তিরূপ দেবদুর্ল্লভ যশোরাশি আমার মত লেখকের ক্ষুদ্র লেখনীর ক্ষুদ্র মুখে নিঃসৃত হইতেছে। রাশি রাশি উদ্যান-জাত ফুল থাকিতে পঙ্কজাত পদ্মপুষ্প কি আদর পাইবে? যদি পদ্মের আদর কাহারও নিকট থাকে তাঁহার নিকট তোমার যশঃও অক্ষুণ্ণ।

গৃহ পতন শব্দে আমরাও সে স্থানে গিয়াছিলাম। তখন অনেক লোক ছুটিয়া কলরব করিতেছে, কিন্তু কেহই সাহসে নির্ভর করিয়া লোকটির অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে চাহে না, তখনও পশ্চাতের ভিত্তি পতনোন্মুখ হইয়াছে।

পাঁচথোপী নিবাসী বাবু কালীপ্রসন্ন হাজরা আমাদের বাসায় ছিলেন। তিনি খুব সাহসী, সর্ব্ব প্রথমে তিনিই লোকটীর অনুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমাদের বাসায় অনেক গুলি লোকছিল। কালী বাবুর সাহসে সাহসী হইয়া তাহারাও সকলে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিল। অনেক অনুসন্ধানে অনেক উপাসনায় একখানি কোদালী পাইলাম, তাহার দ্বারা এবং কতকটা বা কেবল হস্তদ্বারা সেই ইষ্টকস্তূপ সরাইতে লাগিলাম। শব্দ স্থান লক্ষ্য করিয়া বহু ইষ্টকাদি সরাইয়া উপর্য্যুপরি পতিত দুইটী তীর বাহির হইল। তারপর আরও কিছু মৃত্তিকা ইষ্টক সরাইতে সরাইতে দেখিলাম তীরদ্বয়ের উপর্য্যুপরি পতনে অল্পমাত্র স্থান ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান স্থানে ধূলী-সমাচ্ছন্ন রুধিরাক্ত একটী নৃমুণ্ড গলদেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত যাহার জন্য এত শ্রম করিলাম তাহাকে পাইলাম, কিন্তু তাহাতে আনন্দ হইল না। কারণ সে জীবিত কি মৃত তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তখন সকলে তাহার গলদেশ ও বক্ষ পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিয়া কর্ণের নিকট মুখ লইয়া দীর্ঘস্বরে ডাকা গেল। ধন্য হরি, ধন্য তোমার মহিমা, তুমি ভক্তবৎসল, বিপন্নের বন্ধু, অনাথের নাথ এ কথা সত্য বুঝিলাম তোমার দয়ার ইয়ত্তা নাই। বৃদ্ধ ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল। আহা! দীননাথ! আমরা শুনিয়াছিলাম, “পড়িয়া না পড়ে বজ্র মস্তকে তাহার” এখন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়া তোমার শরণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছ। অদ্য এই সুদীন ভক্তকে রক্ষা করিয়া গুরু ভক্তির জলন্ত মহিমা অবোধ জীবকে শিক্ষা দিলে, আহা! কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রথম তীরটী পতিত হইয়া ভিত্তিগাত্রে আটকাইয়াছে, দ্বিতীয় তীরটী তাহার উপর পড়িয়া আশ্চর্য্য কৌশলে, ভক্তের মস্তক ও শ্বাস প্রশ্বাস নিরাপদ রাখিয়াছে, ভিত্তি গাত্রে না আটকাইলে প্রথমটী বৃদ্ধের স্কন্ধে পতিত দ্বিতীয়টী মস্তক চূর্ণ করিত, কিন্তু তাহা না করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার হেতু হইল। ইহা কি? ইহা তোমার ভক্তবৎসলতা ইহা তোমার দীনবন্ধু নামের পরিচয়।

বহু কষ্টে বৃদ্ধকে উঠান হইল। তখন তাহাকে বাহিরে আনিয়া কয়েকটী স্ত্রীলোকের সাহায্যে কয়েক কলসী জল আনাইয়া তাহা মস্তকে ঢালিয়া দেওয়ার পর সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাহার শরীরে বেশী আঘাত লাগে নাই, কিন্তু আমরা দেখিলাম তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত লাগিয়াছে, এবং মস্তকেও রক্তপাত হইয়াছে। এই সময় একবার সুজাগঞ্জের সবইন্-

স্পেক্টর বাবুটী তদন্তে আসিয়া, তাহাকে পোর্টমেণ্ট আনিতে গুরু আদেশ করিয়াছিলেন কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শিষ্য গুরুর দোষ অস্বীকার করিল। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি তাহার গুরু পোর্টমেণ্ট আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এত যে কাণ্ড হইয়াগেল কিন্তু গুরুঠাকুর একবার সংবাদও ল'লেন না যে, শিষ্যের কি হইল। পুলিসের নিকট একবার মাত্র আসিলেন বটে, কিন্তু শিষ্যকে কিছু জিজ্ঞাসা'ও করিলেন না। পরম দয়াল শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর বংশে এরূপ ব্যবহারে আমরা হৃদয়ে ব্যথা পাইতেছি, কি করি সত্যের অনুরোধে লিখিতে হইল। গুরু ও শিষ্যের ভক্তি ও বাৎসল্য তুল্য হওয়াই বিধেয়। যাহাহউক, বৃদ্ধকে গাড়ি করিয়া সরকারী ডাক্তার খানায় পাঠান হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য গুরুভক্তির মহিমা, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ পদব্রজে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের আনন্দবিধান করিল।

আহা! করুণাবতার শ্রীশ্রীশচী-দুলালের কি আশ্চর্য্য করুণা! এই বৃদ্ধকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইল কে? যাহার আকণ্ঠ ইষ্টক রাশিতে প্রোথিত ছিল, তাহার শরীরে বেদনা নাই, যাহার মস্তকের উপর দ্বিতল গৃহ পতিত হইয়াছে, তাহার শরীরে বেদনা নাই, এ করুণা কাহার যিনি যবনকুল-পাবন ভাগবত শ্রেষ্ঠ হরিদাসের পৃষ্ঠের উপর পতিত হইয়া যবনদূতের প্রচণ্ড বেত্রাঘাত স্বীয় পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিলেন এ সেই প্রভুর করুণা। হে দয়াময়! আমাদিগকেও ঐ রূপ ভক্তি দাও, তুমি আজ জীবকে যদি শিক্ষা দিলে, তবে বুঝিবার শক্তিও দাও, বদ্ধজীব তোমার ভক্তিকে হৃদয়ে ধরিয়া অনায়াসে ভব-সমুদ্র পার হউক। হে ভক্তগণ! এই রূপেই সেই দয়াল প্রভুর দয়া জীব-লোকে নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। জীব দুর্ভাগ্য বশতঃ দেখিয়াও দেখিতেছেনা, ইহাই তাঁহার মায়া। অতএব ভ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার দয়া ও মায়ার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করিয়া অকপট চিত্তে প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকুন, বিপদভঞ্জন প্রভু অবশ্যই আশ্রয় দিবেন। আশ্রয় দিবেন বলিয়াই তাঁহার দয়ার হস্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত।

বৈষ্ণব চরণ ভৃঙ্গ—শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ ভক্তিভিখারী। গোবরহাটী।

ব্রজবিলাস।

পূর্ব্বরাগ

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১

সখে,

কে ও ধনী যায়,
নবীন নাগরী,
কাঁখেতে গাগরী,
ঠমকে ঠমকে চায়।
দেহের বরণ,
সে যে অতুলন,
বিজুরী সরম পায়!

২

কে ও ধনী যায়?
আগে পাছে সখী,
যেন হেন লখি,
তারা ঘেরা শশী তায়।
হাসির ছটায়,
পরাণ মাতায়,
কি মাধুরী মরি তায়!

৩

কে ও ধনী যায়?
ও কটাক্ষশর,
করে জর জর,
মরম বিঁধিল হায়।
কেবা হেন বীর,
না হ'য়ে অথির,
ধৈরজ ধরিবে তায়!

৪

কে ও ধনী যায়?
গতি মৃদুতর,
জিনি করিবর,
বেণীতে ভুজগ ভায়।
ভুরু কাম ধনু,
জর জর তনু,
কিসে হৃদি থেহ পায়!

৫

কে ও ধনী যায়,
বক্ষ পরিসর,
অতি মনোহর,
হেন মোর সাধ যায়,—
হ'য়ে অগেয়ান,
ওহিমাঝে প্রাণ,—
না জাগে চির ঘুমায়।

৬

মৃদু হাসি তায়,—
মর্ম্ম সখা কয়,
ওহে রসময়,
কি কহ পাগল প্রায়,
(ও যে) রাজার নন্দিনী,
রাধা বিনোদিনী,
যমুনা সিনানে যায়।

শ্রীমতীর প্রতি সখী।

১

শুন শুন রসময়ী রাই,
নিঠুরা হইয়া হেন,
কানুকো বধিছ কেন,
তুয়াবিনা জিয়েনা কানাই।
সদা করে হায় হায়,
মনে না সোয়াথ পায়,
আকুল হইয়া সদা রোয়,
নাহি বসে লোকালয়,
সদা নিরজনে রয়,
ভাল তাহে নাহি লাগে কোয়।

২

কভুবা চাহত নীলাকাশে,
কভু নখে লিখে ধরা,
কভুবা গেয়ান হারা,
সখা জন ডাকিলে না ভাষে।
কভু ধড়া চূড়াখুলি,
ধরায় পড়ত ঢুলি,
গোঠ মাঝে আর নাহি যায়।
কভু "রাধা রাধা" বলে,
বুক ভাসে আঁখি জলে,
সাধিলেও কিছু নাহি খায়।

৩

ধনি কিবা করিলি তাহায়?
মোহন বেশেতে তার,
যতন নাহিক আর,
স্বর্ণ অঙ্গ ধূলাতে লুটায়।
কিক্ষণে দেখালি মুখ,
ভেদিলি কোমল বুক,
ঘন ঘন ছাড়ে নিশোয়াস,
হৃদি তার ভেঙ্গে চুড়ে,
এখন রহিলি দূরে,
বাঁচিবেনা হেন বিশোয়াস।

৪

ব্রজে আছে আরো কতধনী,
ভুলেওনা নাম করে,
সদা ঝুরে তুঁহু তরে,—
তুই তারে নিঠুর এমনি।
শুনিয়া দূতীকো ভাষ,
মরমে বাড়ল আশ
লাজে মুখে বাক না সরই।
নীরব হইয়া ধনি,
স্মরে পিয় গুণমণি –
মিলনের বাসনা স্বতঃই।

নগেন কহিছে ত্যজ লাজ,
ঝুরে শ্যাম রসময়, বিলম্ব উচিত নয়,
লাজের মাথায় হানিবাজ,—
বস দুহে একাসনে, হেরি বালা দুনয়নে,
জনম সফল করু আজ।

কুঞ্জ মিলন।

শ্যামবিনা রাধিকার কাতর পরাণ। হেরি তাহা দ্রুত সখী করল পয়ান॥
শ্যাম পাশে গিয়া বলে শুন শুন কান। তুয়া বিনা ধনী বুঝি ত্যজয়ে পরাণ॥
রাইক ঐছন দশা করিয়া শ্রবণ। সখী সহ কুঞ্জে কানু করিল গমন॥
নাগর সে চারু কায়ে আরোপিল হাত। রসময়ী লাজ ভরে ঢাকে নিজ গাত॥
কত জানে রস-কলা বৈদগধ কান। নবীন নাগরী ধনী কিছুই না জান॥
সরমে বিভলা ধনী দূরে যেতে চায়। নাগর চুমিয়া মুখ হৃদে ধরে তায়॥
সে মাধুরী হেরে বালা বিভল হিয়ায়। কবে বা হইব রত নিকুঞ্জ সেবায়॥
ইতি পূর্ব্বরাগ। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাকাঙ্ক্ষিণী— শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী। ক্রমশঃ।

রামিণী।

(বঙ্গভাষায় আদি স্ত্রীকবি)

এ পর্য্যন্ত প্রাচীন-বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা মীরাবাই, মাধবী দেবী ও রসময়ী দাসীকে কবি বৈষ্ণবী পাইয়াছি। অদ্য আর একজন কবি বৈষ্ণবী পাইলাম। ইঁহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানি কিন্তু তলাইয়া তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করি নাই। আজ এই কবি ও ভক্তরমণীর কাহিনী পীড়া-জর্জ্জরিত হৃদয়ে স্ফুরিত হওয়ায় পরম সুখানুভব করিলাম। এ রমণীরত্নের নাম—রামিণী। ইঁহার আরো দুই নাম—রামমণি ও রামী। রামিণী ধোবা জাতীয়া। রজকী হইলেও রামী শ্রদ্ধেয়া-পূজনীয়া। কারণ—তিনি পরম বৈষ্ণবী। শাস্ত্রবাক্য যথা—

মহাভারতে—চণ্ডালোহপি মুনেশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতা দরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচংবরিষ্ঠম্।
মন্ত্রে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ—
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

পদ্যাবল্যাং—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি
বিষ্ণোর্বাবৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দ সামান্য বুদ্ধি-
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী র্যস্যবা নারকী সঃ।

এ প্রকার প্রমাণ আরও আছে বাহুল্য বোধে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। এখন বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে,—বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিতে নাই। তাহা করিলে নরকগমন ধ্রুব নিশ্চয়।

খুব বড় একটা কথা বলিয়া ফেলিতেছি। তাহা না বলিলে—তাহার বিশেষ আলোচনা না হইলে সে বিবরণ কতদূর সত্য এবং সর্ব্ববাদিসম্মত কি না কেমন করিয়া সাধারণে প্রকাশিত হইবে? তাই বলিতেছি,—যিনি বঙ্গ-ভাষার আদি কবি; যিনি রসিক ভক্ত-কুল-মুকুটমণি, যাঁহার নিত্য মধুবর্ষী পদ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কেবল রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের সহিত নিশীথে নিজভবনে—গম্ভীরায় (কাশীমিশ্রের বাড়ীতে) আস্বাদন করিতেন;—রামী, সেই জগৎপূজিত মহাত্মা চণ্ডীদাস ঠাকুরের ধর্ম্ম-সঙ্গিনী!!! বলিহারি; রামমণি (?) ধন্যাতিধন্যা!! রামী যে কবি ও কৃষ্ণভক্তা—বোধ হইতেছে চণ্ডীদাসের সঙ্গ প্রভাবেই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

সঙ্গগুণে দোষগুণ জন্মে সর্ব্বক্ষণ। যাহার যেমন সঙ্গ সে জন তেমন॥

রামী চণ্ডীদাসের বাসস্থানে থাকিয়া বৈষ্ণবত্ব ও কবিত্বলাভ করিবেন; তাহা বিচিত্র কি? হরিদাস ঠাকুরের কুটীর দ্বারে ত্রিরাত্র বাস করিয়া বেশ্যা বৈষ্ণবী হইয়া গেলেন!! বারমুখী নামা আর একটী বারাঙ্গনা বৈষ্ণব দর্শন করিয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়াছেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণ তুলিয়া দিতেছি—

বেশ্যা এক হয়ে অতি ধনাঢ্য সুন্দরী। পুষ্করিণী বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরী॥
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উত্তরিলা একদিন তার বাগিচাতে॥
জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া। তৃপ্ত হইল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া॥
বারমুখী নিজগৃহ বালাখানা হইতে। ঝরকাতে উঁকি মারি লাগিল দেখিতে॥
অহো! কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা। বৈষ্ণব দর্শনের যে কি তক মহিমা॥
দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেল।
আপনার দোষ যত চিন্তিতে লাগিল॥

* * * * *

গৃহ হৈতে নিকশিয়া যথা সাধুগণ। চলিলেন ধীরে ধীরে মহান্তের স্থান॥

* * * * *

নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদগদ স্বরে।
কহে মো পাপীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে॥ ইত্যাদি
(শ্রীভক্তমাল।)

সজ্জনের কাছে থাকিয়া, নীচ ব্যক্তি উত্তম হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। উদ্ভিদাদির মধ্যেও উত্তম পদার্থের গুণ অন্য খারাপ পদার্থে সংক্রামিত হইয়া সে বস্তুকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে। শুনিয়াছি;—চন্দনতরুর নিকটস্থ শাকট-বৃক্ষ প্রায় চন্দন গাছের তুল্য হইয়া যায়। পরশ-পাথরের সংস্পর্শে লৌহ সোণা হয়। রামীর কবিত্ব শক্তি ও বৈষ্ণবতালাভ,—রামী যে চণ্ডীদাসের সঙ্গিনী, তাহার যুক্তিগত প্রমাণ। বিনা শিক্ষায় বিনা উপদেশে কেহ ভক্ত কি কবি হইতে পারেন না। রামিণীরও একজন শিক্ষক চাই। সেই শিক্ষক অন্য আর কেহ নয়—মহাত্মা চণ্ডীদাস ঠাকুর। সৎসঙ্গ ব্যতীত কে কোথায় মহাপুরুষ হইলেন? সনাতন গোস্বামীর মুখে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তির মূল হয় সাধুসঙ্গ।
(শ্রী চৈঃ চঃ।)

চণ্ডীদাসের সঙ্গগুণেই রামীধোপানী কৃষ্ণভক্ত ও কবি হইয়াছেন। এখন প্রতীত হইল, রামিণী চণ্ডীদাসের ধর্ম্মসঙ্গিনী। অতঃপর রামীর নামের পর "ঠাকুরাণী" লিখিব। চণ্ডীদাসের সঙ্গিনীকে ঠাকুরাণী না বলিব কেন? রামী ঠাকুরাণীর পদ চণ্ডীদাসেরগ্রন্থ হইতে তুলিয়া দিতেছি। ঐ পদ পাঠে তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকা ও কবি বলিয়া পাঠক মহাশয়ের অববোধ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-কাতরা শ্রীরাধিকার বিলাপ রামীঠাকুরাণীর মুখে স্ফুরিত হইতেছে,—শ্রবণ করুন।

কোথা যাও ওহে, প্রাণ বন্ধু মোর দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি।
তোমার এ সারথী, ক্রূর অতিশয় বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধুনীরে, অবলা ভাসাইতে নাই॥
পিরীতি জালিয়া, যদি বা যাইবা, কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ পালন, দাসীরে করহ সাথ॥

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটী সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মনঃ স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার

এই দুটী মাত্র পদে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায় রামীর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে,—জানা যাইতেছে। ২য় পদটী শ্রীদশমস্কন্ধীয় ৩১শ অধ্যায়ের "অটতি যদ্ভবানহ্নি"—শ্লোকের ভাবানুগত। ইহাতে উপলব্ধি হয়, রামী ঠাকুরাণী শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। অথবা ভাগবতের সমস্ত তাৎপর্য্য তাঁহার বিশেষ বুঝা ও জানা। আর এক কথা রামী চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। সুতরাং রামিণী বঙ্গভাষার আদি স্ত্রী কবি। এ নির্দ্ধারণ সকলকেই অবিতর্কে মানিয়া নিতে হইবে। বড় আনন্দের কথা, বাঙ্গালা ভাষার একজন আদি স্ত্রী কবি পাইলাম। তিনি আবার পরম বৈষ্ণবী। উদ্ধৃত পদ ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পল্লিবাসিনী রমণীর রচিত। তৎকালে বঙ্গভাষা অতি শিশু বালিকা—তাহার সম্বন্ধে ষষ্ঠীপূজা হইয়াছে কি না সন্দেহ। এখন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ রামিণীর পদের সমালোচনা করুন। আমরা বলি পদরচনা সুন্দর হইয়াছে।

রামীঠাকুরাণীর আরও পদ আছে। সে গুলি উঠাইয়া প্রবন্ধ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। রামিণী কেবল ভক্ত ও কবি ছিলেন না;—কাজ কর্ম্মে ও লৌকিকতায়ও অতি দক্ষা ছিলেন। নান্নুরবাসী ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর শ্রদ্ধা করিতেন। সর্ব্বজনের ভালবাসার পাত্রী হওয়া সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। লোকোত্তর গুণ না থাকিলে সর্ব্বজনপ্রিয় হওয়া যায় না। রামমণির এ গুণ বর্ণনা কল্পিত বলা যাইতে পারে না। তাহা পদে প্রকাশ আছে—

"রামিণী কামিনী, কাজেতে নিপুণা, সকলের প্রিয়তমা

যিনি শ্রীপত্রিকায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গম্ভীর-গবেষণাপূর্ণ জীবনী বিষয় প্রবন্ধ লিখিয়া বৈষ্ণব সমাজের ও বঙ্গসাহিত্যের অতুলনীয় উপকার করিয়াছেন,—সেই কীর্ত্তিমান ভক্ত ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বলিয়াছেন,—রামা শেষ জীবন শ্রীবৃন্দাবনধামে যাপন করিয়াছেন। আমরা একথা বিশ্বাস করিতে অগ্রসর আছি।

শ্রীরাজীবলোচন দাস।

নীলাচল কাহিনী।

তীর্থভ্রমণে মানবচিত্তে একটি অতুলনীয় আনন্দের সঞ্চার হয় এবং তীর্থস্থানে শ্রীভগবানের বিগ্রহ দর্শনে ও তদীয় অমৃতময়ী লীলার স্মৃতি সকল মানবদিগকে স্বতঃই ভক্তিরাজ্যের দিকে আকর্ষিত করে। সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

নীলাচল (শ্রীপুরুষোত্তমধাম) হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থস্থান। একদিন প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দর এই নীলাচলে বসিয়া সমগ্র জীবকে স্বীয় চরণে আকর্ষণ করিয়া জগতকে প্রেম প্লাবিত করিয়াছিলেন, তাই এই নীলাচল ঐশ্বর্য্যশালী বৈকুণ্ঠ বিশেষ হইলেও বৈষ্ণবদিগের জুড়াইবার স্থান। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিচিহ্ন এখনও যেরূপ জীবন্তভাবে প্রতিভাত এরূপ আর কোথাও নাই। প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিলে প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইতেন তাই তিনি মন্দিরের ঠিক সম্মুখস্থিত গরুড় স্তম্ভের নিকট থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতেন আর সেই মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দে গদ গদ হইয়া পড়িতেন অজস্র নয়নধারায় বিশালবক্ষ প্লাবিত হইয়া গরুড়-স্তম্ভের নিম্ন-খালটি পূর্ণ হইয়া যাইত যথা—

গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে। চৈঃ চঃ

প্রভু আমার গরুড়স্তম্ভে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই চিহ্ন আজও স্তম্ভের উপর স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। আহা সে করুণাময়ের করস্পর্শে যে পাষাণও বিগলিত হইত!! শ্রীমন্দিরের মধ্যে এখনও প্রভুর শ্রীচরণ চিহ্ন রহিয়াছে। প্রভুর ভক্তগণ নয়নজলে সিক্ত হইয়া "গৌরাঙ্গ" বলিয়া সেই

চরণতলে গড়াগড়ি দিয়া আত্মকৃতার্থতালাভ করিতেছেন। প্রভু ভক্তগণকে লইয়া নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করিয়াছেন, নরেন্দ্র অবগাহন করিলেই প্রভুর সেই ক্রীড়াকাহিনী স্মরণ হইয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবলহরী ছুটিতে থাকে। সে আনন্দের কাহিনী ভাষায় প্রকাশ হয় না বলিয়া বুঝান যায় না তাহা উপভোগের দ্রব্য। এখানে প্রভুর চিহ্ন কোথায় নাই? গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করিলে ভক্ত সহ প্রভুর সেই গুণ্ডিচা মার্জ্জন মনে পড়ে। গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকটেই নৃসিংহ মন্দির,—আহা! প্রভু আমার কতদিন সেইখানে আসিয়া নৃসিংহ প্রণাম করিয়াছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরও প্রভুর স্পর্শ সুখে বঞ্চিত হয় নাই। সিদ্ধ বকুল (হরিদাসের ভজনস্থান) এখনও বর্ত্তমান। প্রভু কতদিন প্রিয় ভক্ত হরিদাসকে সম্ভাষণ করিতে এখানে আগমন করিয়াছেন, আহা প্রভুর ক· চরণধূলি এখানে নিহিত আছে। সমুদ্রতীর প্রভুর স্মৃতিচিহ্নেতে পরিপূর্ণ, প্রভু কত দিন এইখানে স্নান করিয়াছেন। এই-স্থানটি বড়ই মনোরম শান্তি প্রদ। একদিন প্রভুর স্পর্শসুখে সিন্ধুবর ধন্য হইয়াছিল। বুঝি আজও সেই সুখের কাহিনী "কলকল" স্বরে প্রভুর ভক্তগণকে উপহার দিয়া তাঁহাদিগের প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবলহরী বহাইতেছেন। সিন্ধুতীরে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শনে সেই কাহিনী স্মরণে কাহার না মর্ম্মালোড়িত হইয়া নয়নধারায় বক্ষঃ প্লাবিত হয়।

কাশীমিশ্রের বাটী শ্রীগৌরভক্তগণের অবশ্যই পরিচিত এইখানে গম্ভীরা। আমাদের দীনের ঠাকুর গৌর কৌপীনধারী শ্রীগৌরসুন্দর অষ্টাদশবর্ষ এই গম্ভীরায় বাস করিয়াছিলেন। প্রভুর কান্থা, করঙ্গ, খড়ম এখানে বিরাজ করিয়া পূজিত হইতেছেন।

গম্ভীরায় কোন প্রকারে একজন শয়ন করিতে পারে। গম্ভীরায় প্রবেশ করিবামাত্রই প্রাণ এক অপূর্ব্ব উচ্ছাসপূর্ণ হইয়া উঠে। প্রভু বল বল একবার বল তুমি কি সত্য সত্যই এইখানে শয়ন করিয়াছিলে? সত্যই কি তুমি অষ্টাদশ বর্ষ এইখানে থাকিয়া নাম প্রেম বিতরণ করিয়া জগতে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছিলে?

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক—গম্ভীরা মধ্যে প্রভুর নিদর্শন দর্শন করিতে অনেক ভক্ত ও সাধারণে আসিয়া থাকেন, দেখিলাম প্রভুর কান্থার একটু টুকরা সংগ্রহের জন্য অনেকেই ব্যগ্র। তাহা হইবারই কথা যে কান্থায় প্রভু অষ্টাদশ বর্ষ শয়ন করিয়াছেন সেই কান্থায় কাহার না লোভ হয়।

অনেকেই গম্ভীরা-রক্ষককে কিছু অর্থ দিয়া সেই কাঁথা সংগ্রহ করেন দেখিলাম। প্রভুর কাঁথা এখন বিক্রয় হইতে বসিয়াছে কিছুদিন, অবশ্য একার্য্য অধ্যক্ষের অগোচরে অতি গোপনে সমাধা হইতেছে বলিয়াই বোধহইল। এরূপে প্রভুর কাঁথা খানি ব্যয় হইলে কয়দিন থাকিবে, আজও কত শত ভক্ত প্রভুর সেই নিদর্শন দর্শনের জন্য শত বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া কতদেশ দেশান্তর হইতে নীলাচলে ছুটিয়া যাইতেছেন। এমতে প্রভুর স্মৃতিচিহ্ন সকলের যাহাতে বিন্দুমাত্র অপচয় না হয় গৌরভক্ত মাত্রেরই তাহা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নীলাচল প্রভুর নিদর্শনে পূর্ণ সেই স্মৃতিচিহ্ন সকল দর্শনে কখনও প্রাণ আনন্দে অধীর হইয়া উঠে কখনও বিরহ বেদনা উদিত হইয়া হৃদয়কে মথিত করিতে থাকে। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

নীলাচলের ঠিক সেই অবস্থা। যখন যেদিকে চাহিয়া দেখিয়াছি তখনই সেই করুণাময় মূর্ত্তি খানি হৃদয়ে জাগরিত হইয়া প্রাণে কত লহরী বহাইয়াছে। বুঝিতে পারি না ইহা যন্ত্রণা কি সুখ ইহারই নাম বুঝি "বিষামৃত একত্রে মিলন।"

নীলাচলের প্রতি রেণু স্পর্শে হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়। কেননা সমগ্র নীলাচলেই প্রভুর পদস্পর্শ হইয়াছে তাই নীলাচলের ধূলীকণা পর্য্যন্ত প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়। যদি কেহ মহাপ্রভুর জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে চাহেন তবে তাঁহাকে নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করি।

সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথ দেবকেই মহাপ্রভু বলিয়া জানে আমাদের দয়ার সাগর প্রেমের দেবতা সেই মহাপ্রভুর কাহিনী তাহারা প্রায়ই অবগত নহে। এমতে মহাপ্রভুর লীলা স্থল সকল দেখিতে হইলে ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ গ্রহণ আবশ্যক অথবা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দৃষ্টে স্থান গুলি মিলাইয়া লইলেও চলিতে পারে। আজ এক মাস অতীত হইল নীলাচল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু মহাপ্রভুর সেই প্রাণস্পর্শী স্মৃতি সকল প্রাণে ওতোপ্রোত হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সবই মধুর তাই তদীয় ভক্ত শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।"

শ্রীগৌরকৃপাকাঙ্ক্ষিণী—শ্রীমতীনগেন্দ্রবালা দাসী। বড়াল-লেন, হুগলী।

———•———

মুকুন্দমালা।

(কুলশেখর-কৃতা।)

(১)

বন্দে মুকুন্দ মরবিন্দ দলায়তাক্ষং কুন্দেন্দু শঙ্খ দশনং শিশুগোপবেশম।
ইন্দ্রাদি দেবগণ বন্দিত পাদপীঠং বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥

অরবিন্দ সম যাঁর আয়ত লোচন। কুন্দ ইন্দু শঙ্খ শুভ্র যাঁহার দশন॥
গোপ বালকের মত বেশভূষা যাঁর। ইন্দ্রাদি চরণ যাঁর পূজে অনিবার॥
বৃন্দাবনধাম যার প্রিয় নিকেতন। ভক্তিভাবে করি তাঁর চরণ বন্দন॥

(২)

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়া পরেতি ভক্তি প্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরুমাং মুকুন্দ॥

হে শ্রীপতি! হে বরদ। ওহে দয়াপর। ওহে ভক্তিপ্রিয়! ভব-লুণ্ঠন তৎপর!
হে নাথ! জগদালয়! অনন্ত শয়ন! এনাম প্রত্যহ যেন করি উচ্চারণ।

(৩)

জয়তু জয়তু দেবো দেবকী নন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ॥

জয় জয় জয় দেব দেবকীনন্দন। জয় জয় যদুকুল উজ্জল ভূষণ॥
জয় জয় কোমলাঙ্গ নীরদবরণ। জয় জয় জয় সেই ভূভার হরণ॥

(৪)

মুকুন্দ মূর্দ্ধা প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্ত মিয়ন্ত মর্থম্।
অবিস্মৃতি স্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ॥

প্রণাম করিয়া আমি, ওহে নারায়ণ। এই ভিক্ষা করিতেছি তোমাবে এখন;
জন্ম জন্ম এই ভাবে জন্ম যদি হয়। তোমারি চরণে যেন মত মোর রয়॥

(৫)

শ্রীগোবিন্দ পদাম্ভোজ মধুনো মহদদ্ভুতম্।
যৎপায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদপায়িনঃ॥

হরির চরণপদ্মে যেই মধুরস। সে এক অপূর্ব্ব বস্তু, জানিও নিশ্চয়॥

সে মধু করিবে পান যেই একবার। ছাড়িয়া দিবার আর শক্তি নাই তার॥
কিন্তু সেই মধুপানে শ্রদ্ধা নাই যার। সেজন ছাড়িয়া দিবে, বিচিত্র কি তার॥

(৬)

নাহং বন্দে তব চরণযোর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

দ্বিধাভাব নাই মোর হেন মনে জানি। তাই নাহি বন্দি তব চরণ দুখানি॥
কুম্ভীপাক নরকের ভীষণ যন্ত্রণা। পরিত্রাণ তরে তব না করি বন্দনা।
সুশ্রী-নারী-তনু-লতা নন্দনকাননে। বিহার কারণ নাহি বন্দি তোমাধনে॥
জন্ম জন্ম যেন রাখি হৃদয় ভবনে। হরি হে! তোমারি চিন্তা করি একমনে॥

(৭)

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

ধর্ম্মকার্য্যে আস্থা নাই, আস্থা নাই ধনে। সম্ভোগেও কিছুমাত্র আস্থা নাই মনে॥
পূর্ব্ব জন্মে যেই কর্ম্ম করেছি যখন। ফলিবে তাহার ফল অবশ্য এখন॥
জন্মে জন্মে ভবে যদি আসিতেও হয়। তব পাদপদ্মে যেন ভক্তি মোর রয়॥

(৮)

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি বিচিন্তয়ামি॥

স্বর্গের ভিতর কিম্বা মর্ত্ত্যের ভিতর। কিম্বা নরকেও যদি থাকি নিরন্তর॥
মৃত্যুকালে যেন ওহে নরক-নাশন! চরণ দুখানি তব করি হে স্মরণ॥
কে বলে পদ্মের শোভা শরৎ সময়। তোমার চরণ সনে তুলনা না হয়॥

(৯)

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে মুরভিদি বা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্॥

শঙ্খ চক্রধর যিনি কমললোচন। মুররিপু পুনঃ যিনি দেব নারায়ণ॥
তাহাতেই রত হয়ে থাক ওরে মন অন্য সুখ নাই বিনা তাঁহারি স্মরণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে। ক্রমশঃ—

নাগর ঈশান দাস।

প্রায় ৬০ কি ৬২ বৎসর পবে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহস্থিত নাগরঈশানকে আমরা পদ্মার পূর্ব্বপার তেওথা এবং তথা হইতে একেবারে শ্রীধাম লাউর আনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা ও অপগণ্ড শিশুত্রয়কে সেই পদ্মার পারে তেওথা বা গানাইল গ্রামে রাখিয়া আসিযাছি। পাঠক চলুন, এই অনাশ্রিত শিশুদিগকে একবার দেখিয়া আসি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের নাগরঈশান সীতামাতার অভিপ্রায় মত এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে গুরুদেবের আসনের কথা স্মরণ হইতে একেবারে শ্রীধাম লাউর উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর এক মাত্র ভজনীয় বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার শিশু সন্তানেরা এখানে সম্ভবতঃ এক জগদানন্দ ও এক মাত্র দুঃখিনী জননী দ্বারা প্রতি-পালিত হইতে লাগিলেন; ইহা ভিন্ন আমরা আর কি বুঝিতে বা বলিতে পারি, কিন্তু একেবারে তাহা নহে। ঈশান নাগর যে কয়েক বৎসর এখানে ছিলেন, ইহারই মধ্যে স্থানীয় অনেক ব্যক্তিই তাঁহার মতে প্রবর্ত্তিত ও পরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, কি কায়স্থাদি ভদ্র বংশীয়গণ অনেক মহাত্মাই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হয়েন, অদ্যাবধি তাঁহাদের বংশধরেরা নাগর শ্রীঈশান দাসের বংশধরগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ তেও-থার বৈদ্যবংশ-সম্ভুত রাজপরিবার এবং তদ্‌গ্রামবাসী বাগ্‌ছি উপাধিধারী দ্বিজোত্তম মহাশয়েরা এই নাগর বংশীয়-শিষ্য। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রদে-শীয় রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং এতদ্দেশবাসী পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণও এখন ইঁহা-দের শিষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছেন।

পাঠক মহাশয়গণ! আমি আর এখন ঈশান দাস নাগর বলিব না, হয় নাগর ঈশান কি ঈশান নাগর অথবা আমার চির ব্যবহৃত "নাগর প্রভু" বলিব কেন না আমি এই নাগর প্রভুর বিশেষ কোন ধার ধারী।

নাগর প্রভুর তিনটী পুত্র সন্তান, জ্যেষ্ঠের নাম পুরুষোত্তম নাগর, দ্বিতীয় হরিবল্লভ, তৃতীয় কৃষ্ণবল্লভ নাগর। (বংশ বিস্তার পত্র দেওয়া হইবে।) শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় ও কতিপয় শিষ্যের প্রযত্নে ভাতৃত্রয় মাতার কোলে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরুষোত্তম নাগর বাল্য-

কাল হইতেই তেজিয়ান, দৃঢ় অধ্যবসায় সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও চতুর, ইহা তাঁহার জীবন কীম্বদন্তী পর্য্যালোচনায় কতক অনুমিত হয়, আর দুই ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বলিয়া উঠিতে পারিব ইহা বিশ্বাস হয় না।

কালক্রমে রায় মহাশয় ও শিষ্যবর্গের যত্নে ভাতৃত্রয় দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পুরুষোত্তম নাগর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। তিনি আশৈশব শিষ্যের ঠাকুর হইয়া ক্রমে গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। জানিনা প্রাণ গৌরের কি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কোন অনমুভবনীয় কৌশল ইহার অন্তর্ভূত হইয়া থাকিবে, এই সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচার আছে বিশেষ আমরা পুজনীয়া খুল্লমাতামহী ঠাকুরাণীর প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছি; তাহা প্রয়োজন বোধ হইলে পরে লিখিত হইবে, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি না বলিয়া আমরা ইহা শ্রীপত্রিকায় বা সাধারণে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত, তবে পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য (ইহাতে অর্থাৎ "পুরুষোত্তম চরিতে" পাথর জলে ভাসা, দ্বিতীয় ঐ পাথর বিভাগ করিতে করাতের আঁচরে রক্তোদ্গাম এবং চৌদ্দমাদল ঘটনা বিশেষ প্রসিদ্ধ) সময় পাইলে বুঝা যাইবে।

এদিগে নাগরপ্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জন্ম স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে একান্ত চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং অবসর কালের মধ্যে পালয়িতা রক্ষয়িতা বিশেষ ভবসাগরের এক মাত্র কাণ্ডারী শ্রীশ্রীমদদ্বৈত প্রভুর লীলামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন। যখন লেখা শেষ হইল, তখন নাগরপ্রভুর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। কেন না গুরুআজ্ঞা প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত শ্রীগুরুর চরিতামৃত আস্বাদ ও প্রকাশ একটী ফল পাইলেন, তাই আহ্লাদে গদগদ হইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশের শেষ অধ্যায়ে লিখিলেন যথা—

"সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্বুদলীলা কৈলা যথাক্রমে॥
সে লীলা অমিয়সিন্ধু দুর্গম্য দুষ্পার। অনন্ত না পায় অন্ত মুঞি কোন ছার॥
আত্ম শোধিবারে এই দুঃসাহস কৈনু। লীলা সিন্ধুর এক বিন্দু ছুইতে নারিনু॥

এই কয়েকটী পুংক্তি লিখিতে লিখিতে আমার নাগরপ্রভুর হৃদয়ে একটী ভাবতরঙ্গের আঘাত হইল, উহা গর্ব্ব, ও পরক্ষণেই তজ্জনিত লজ্জা যুগপৎ হৃদয় নদ আলোড়িত করিয়া তুলিল, অতি কাতরে দীন ভাবে তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মানুসারে আবার লেখনী ধরিলেন, লিখিলেন যথা—

বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি।
কি লিখিতে কি লিখিমু ধরম তার সাখী॥
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্য লীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র।
যে পড়িমু যে শুনিমু কৃষ্ণদাস মুখে। পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে॥
পাপ চক্ষে যে লীলা মুঞি করিমু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিমু গ্রন্থন॥
চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে। লীলা গ্রন্থ সাঙ্গ কৈমু শ্রীলাউর ধামে।"

যদিও নাগর প্রভুর তথা হইতে তেওথা বা ঝাঁকপাল ফিরিয়া আইসার কিম্বদন্তী ব্যতীত বিশেষ কোন প্রমাণ আপাততঃ আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে দিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটী কথা এই যে, তিনি সর্ব্বদা লাউরে থাকিতেন না। অন্ততঃ গ্রন্থ লেখা শেষ হইলে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বোধহয় এই জন্যই লাউরধামে গ্রন্থ শেষ হইল (অর্থাৎ লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈমু শ্রীলাউরধামে।" আপন গ্রন্থে লিখিয়া রাখিলেন।

এই গ্রন্থ লেখা সম্বন্ধে অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অপ্রকট পর্য্যন্ত লীলাবলী শ্রীনাগর প্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর নিকট কোন রূপে লিপিবদ্ধ বা প্রচার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েন. ইহা কেবল আমাদের অনুমান নহে, নাগর প্রভুর নিজ মুখের দুই একটী কথা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। যথা—অদ্বৈত-প্রকাশে শেষ অধ্যায়ে (২৫৬ পৃষ্ঠায়।)

প্রভু কহে তোরা সবে মোর প্রিয়তম। মোর এক বাক্য সত্য করহ পালন॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম্ম। যথাসাধ্য প্রচারিবা এই মোর মর্ম্ম॥

ঐ গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায়—

এক দিন প্রভু মোরে কহে সংগোপনে। গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ আর সহেনা পরাণে॥
ঝাটে মুঞি জীব লোকের হইমু অগোচর।
গৌর নাম গৌর গুণ কহ নিরন্তর॥
আর এক কথা কহি শুন সাবধানে। তুই মোর প্রিয় শিষ্য আত্মজ সমানে॥
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে।
গৌর নাম প্রচারিও মোর জন্ম স্থানে॥
এই মোর আজ্ঞা সত্য করিহ পালন।
এত কহি কৈলা প্রভু মৌনাবলম্বন॥

মুক্তি ভাবে যদি গুরু আজ্ঞা রক্ষা হয়।
তবে মোর জন্ম কর্ম্ম সফল নিশ্চয়।" তথা—২৬০ পৃঃ।
ইহা বহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন। গুরু আজ্ঞা মাত্র মুক্তি করিনু রক্ষণ॥
সূত্র মাত্র লিখিনু মুক্তি ঐছে আজ্ঞা মতে
ইথে কিছু দোষ গুণ নারহু আমাতে॥

আমার নাগর প্রভু এই কথা বলিয়া খোলসা হইলেন।

কাঙ্গাল দাস—শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। পোঃ তেঁতুথা, ঝাঁকপাল

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।

ইঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি অগ্রদ্বীপের নিকটস্থ বৈষ্ণবতলা নামক গ্রামে। ইঁহারা তিন সহোদর যথা—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, এবং বাসুদেব ঘোষ। ইঁহারা উত্তররাঢ়ী কায়স্থবংশীয়, তিন ভাইই উদাসীন এবং শ্রীগৌরাঙ্গানুগত, তিন ভ্রাতাই বঙ্গবিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। যে দিন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলেন সেই দিন অবধি তাঁহারা তিন ভাই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকটেই রহিয়া গেলেন। গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব ঘোষ তিন ভ্রাতাই গৌরাঙ্গদেবের লীলা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর, বাঙ্গালা পদে গৌরলীলা প্রকাশ করেন। নিমাই-সন্ন্যাসী-দিনে গোবিন্দ ঘোষ বাঙ্গালা পদে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্ন লিখিত হইল। যথা—

"তোদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজকোরে।
কে যাচিয়ে দিবে প্রেম দেখিয়ে কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। নয়ন পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। আর না করিব মোরা কীর্ত্তনবিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া। পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচল হইতে গৌড় পথে বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে বহুতর ভক্ত চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীর তীর ধরিয়া চলিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে দেশ ভাঙ্গিয়া লোক চলিল। যে তাঁহার

সঙ্গ লইল সে আর ফিরিল না। এইরূপে যখন তিনি গৌড়ের রাজধানী রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন তখন তাঁহার সহিত লক্ষ লোকেরও অধিক হইল। গৌরাঙ্গের বাহ্য জ্ঞান নাই তিনি ইহার কিছুমাত্র জানেন না যে তাঁহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক চলিতেছে। তিনি রূপ সনাতনকে ঐ সময়ে কৃপা করিলেন, তাঁহাদের পরামর্শানুসারে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গঙ্গাতীর দিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন তখন তাঁহার সহিত অন্যান্য ভক্তের সহ গোবিন্দ ঘোষ ও গমন করিতেছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা করিয়া মুখ শুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন, তখন নিকটে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন। তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন এবং একটী হরীতকী আনয়ন করিয়া প্রভুকে তাহার অর্দ্ধ খণ্ড দিলেন আর অবশিষ্ট অর্দ্ধ খণ্ড বহির্ব্বাসে রাখিয়া দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে গমন করিলেন। আহারান্তে আবার সেইরূপ হস্ত পাতিলেন, তখন গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার বহির্ব্বাসে যে অর্দ্ধ খণ্ড হরীতকী বান্ধা ছিল তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। তখন প্রভু গোবিন্দ প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "কল্য যখন তুমি আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবা মাত্র কিরূপে দিলে" গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, প্রভু কল্য যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার অর্দ্ধ খণ্ড রাখিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত অদ্য এত শীঘ্র দিতে পারিলাম। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "গোবিন্দ! এখনও তোমার সঞ্চয় রাখা সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় নাই, অতএব তুমি আমার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না।" গোবিন্দের মুখ শুখাইয়া গেল, প্রভু বলিতে লাগিলেন গোবিন্দ তুমি দুঃখিত হইওনা তুমি এখানে থাক, তোমা কর্ত্তৃক আমি বিস্তর কার্য্য সাধন করাইব। আমারই ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয়ে বাসনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তোমার হৃদয়ে কোনও বাসনা নাই, তুমি এখানে থাক, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অচিরাৎ আমি নির্দ্দেশ করিয়া দিব। গোবিন্দ হা হা করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া বলিলেন তুমি শান্ত হও আমি আবার তোমার নিকটে আসিব। আর সেইবার তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমা দ্বারায় আমি বহুকার্য্য সাধন করিব এই জন্য তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি স্বইচ্ছায় স্কন্ধে লইলাম তুমি এখানে থাক, আমি সত্বর তোমাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিব।" গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপ রহিয়া গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন আসিয়া আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না এই আশার উপর

নির্ভর করিয়া নিজ মনকে সান্ত্বনা করিলেন। ও গঙ্গাতীরে এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন সাধন করিতে লাগিলেন। এক দিবস গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে এক খানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাহার গাত্রে সংস্পর্শ হইল। তখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। দেখেন যেন একখানি পোড়া কাঠ শ্মশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। একটু পরে দেখিলেন যেন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতেছেন "ওহে গোবিন্দ! আমি আসিতেছি, তুমি যে খানি পোড়া কাঠ ভাবিতেছ উহা যত্নপূর্ব্বক কুটীরে রাখিয়া দেও।" গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে এ আবার কি ব্যাপার, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া কাঠ খানি লইয়া কুটীরে রাখিয়া দিলেন। পরদিবস প্রাতে দেখেন যে সে পোড়া কাঠ নয়, সেই এক খানি কাল প্রস্তর, ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য ভাবিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে না যাইয়া রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবার বৃন্দাবনের ফেরতা এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ দলবলসহ গোবিন্দের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুতর লোক সঙ্গে; সুতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এত লোকের কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে যাহার যাহা ভাল ভাল দ্রব্যাদি ছিল তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভোজন হইল, ভক্তগণসহ গোবিন্দ প্রসাদ পাইল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন ওহে গোবিন্দ প্রস্তর খানি পাইয়াছ? গোবিন্দ করযোড়ে বলিলেন আজ্ঞা হাঁ। প্রভু বলিতেছেন কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া আমি শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব, কিন্তু প্রভুর এই কথা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পরদিবস একজন ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত, প্রভু তাহাকে ঐ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে ব্যক্তি অতি অল্প সময় মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের সেই কুটীরে সেই মূর্ত্তি নিজ হস্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম গোপীনাথ রাখিলেন। এই রূপে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথদেব প্রকাশ হইলেন। ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, ওহে গোবিন্দ! আমি তোমাকে এই ঠাকুর দিলাম, ইহাকে তুমি

সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ পাইবে না। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না এই আমি তোমার কাছেই রহিলাম।

গোবিন্দের মন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি, গোপীনাথের প্রতি নহে। তিনি প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন তখন প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, গোবিন্দ তুমি এখানে থাক, তুমি এই ঠাকুর সেবা কর, এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হও, তোমা দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমা দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এইরূপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ এবং গোপীনাথ ঠাকুর অগ্রদ্বীপেই রহিয়া গেলেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন; কিন্তু মাধব ও বাসুদেব ভ্রাতৃদ্বয় উদাসীন রহিয়া গেলেন, গোবিন্দ এবং তাঁহার স্ত্রী একত্র হইয়া গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন এবং গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া উভয়ে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে গোবিন্দের একটী পুত্র জন্মিল। কিন্তু পুত্রটী রাখিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন গোবিন্দের স্কন্ধে এখন দুইটী বস্তুর সেবার ভার পড়িল, গোপীনাথের সেবা ও তাহার শিশু পুত্রের সেবা। গোবিন্দ ইহাতে কি বিব্রত হইলেন তাহা অনুভব করা যাইতে পারে, কষ্টেশ্রেষ্ঠে দুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে নিজ পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দের নিজের সেবা বাৎসল্য ভাবে তিনি গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিয়া সেবা করেন। পুত্রও পাঁচ বৎসরের হইল।

তাঁহার মন এখন দুই জনকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে মনের মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল, তখন তাহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন এই গোপীনাথ, আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন এই তাঁহার পুত্র; কখনও গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখনও পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দেন, কখনও গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রকে সেবা করেন, কখনও পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন। এই অবস্থাতে আছেন, এমন সময় রসিকশেখর ভগবান গোবিন্দের পুত্রটী হরণ করিয়া লইলেন। তখন গোবিন্দ মর্ম্মাহত হইয়া গোপীনাথকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অনেক দিন স্তম্ভিত থাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে প্রাণত্যাগ করিবেন কিন্তু সামান্যভাবে

প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। প্রকৃত মনের ভাব এই যে তাঁহার গোপীনাথের প্রতি অত্যন্ত রাগ হইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন কি অন্যায়! আমি ঠাকুরের দিবানিশি সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অকৃতজ্ঞ যে সচ্ছন্দে আমার পুত্রটী হরণ করিলেন। গোবিন্দ মনের দুঃখে ঠাকুরের সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। পার্শ্ব পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তন করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোনও সেবা হইল না। সমস্ত দিবস উপবাস থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতে লাগিলেন যেমন আমার বুকে শেল হানিলেন তেমনি সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিলেন, খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি এখন উঁহাকে কে খাইতে দেয়, আমিও তাঁহাকে অপরাধ দিয়া উঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু গোপীনাথ ঠাকুর এমন ভক্তবৎসল যে তিনি গোবিন্দের এ হেন অমানুষিক চরিত্রে রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব এবং গোপীনাথ ভগবান। জীব মাত্রেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া থাকেন, যেমন সন্তান মাতাকে দুঃখ দিয়া থাকেন, মাতা কখনও কখনও ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন কিন্তু ভগবানের ক্রোধ হয় না। তিনি জীবগণের সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। যখন নিশি হইল তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি তোমার দয়া নাই সারাদিন গেল, তুমি জলকণাটুকু আমাকে দিলে না। তখন গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, কি রূপে তোমার সেবা করিব। গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, লোকের যদি একটী ছেলে দৈবে মরে তবে কি তার আর একটী ছেলেকেও সেই সঙ্গে আহার না দিয়া বধ করে, তোমার এক পুত্র দৈবে মরিয়াছে তাহার নিমিত্ত ক্ষোভ কর তাহাতে দুঃখ নাই, আমাকে অনাহারে কেন বধ কর। তখন গোবিন্দ বলিতেছেন ঠাকুর আমার পুত্রটী কাড়িয়া লইলে তোমার একটু দয়া হইল না। তুমি যে আমায় বাপ বাপ কর সে সমুদায় তোমার বাহ্য।

ক্রমশঃ—

শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। পটুয়াখালী।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ।

এই সমাজের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। অনেকের বিশ্বাস যে এ সমাজ আমার উত্তেজনায় হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। দশ জনের উৎসাহে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে আমি একজন মাত্র। গৌরাঙ্গ-সমাজের নাম শুনিয়াই লোকের সহজেই মনে উদিত হইতে পারে যে ইহা ব্রাহ্ম-সমাজের ন্যায় কোন একটী সাম্প্রদায়িক কাণ্ড। অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হয়, উপাসনা হয়, আমাদেরও সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র গৃহে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইবে। কিন্তু গৌরাঙ্গ-সমাজে এ সমুদায় এখন কিছুই নাই। পরিণামে যে গৌরাঙ্গ-সমাজের জন্য বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইবে, আর এ সভা পরিচালন করিবার নিমিত্ত বহুতর লোক নিযুক্ত থাকিবেন, তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হঠাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থে আমাদের ভিক্ষা করিতে হইবে। আমরা যদি এখন ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই তবে সম্ভবতঃ যথেষ্ট মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু সেরূপ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বোধ হয় একপ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা গৌরাঙ্গ-ভক্তগণের উচিত নহে। মহাজনের যে পথ, সাধারণেরও সেই পথ। শ্রীগোবিন্দজীর ভুবনবিজয়ী মন্দির করিতে বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়, কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাহা ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের নিয়মই এই যে, ইহার সভ্য হইতে হইলে কাহাকেও চাঁদা দিতে হইবে না, তবে যিনি কৃপা করিয়া যাহা দেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এইরূপে যখন অর্থ সংগ্রহ হইবে তখন শ্রীমন্দির সমাজ-গৃহ সংস্থাপন ইত্যাদি আপনি হইবে। অতএব অদ্যাপি শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের গৃহ হয় নাই। সভ্যগণ নিয়মিতরূপে মিলিত হয়েন না, সভ্যগণের তালিকাও লওয়া হয় নাই। তবে এখন কেবল সভ্যগণের নাম সংগ্রহ করা হইতেছে ও অল্প অল্প প্রচার কার্য্য চলিতেছে।

এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। বৈষ্ণবধর্ম্ম কবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয় তাহা আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহারা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হয়েন। এই ঠাকুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

এই বৈষ্ণবগণ ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহাঁদের বিরোধী শৈব, শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ ও মায়াবাদীগণ। পরস্পরের ধর্ম্ম সংস্থাপন লইয়া পূর্ব্বে বিস্তর মারামারি কাটাকাটী হইয়া গিয়াছে। তাহার পরে শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইলেন। এ গ্রন্থকে এক প্রকার ঠাকুরের অবতার বলিলেও চলে। অর্থাৎ গ্রন্থচ্ছলে ঠাকুর ভাগবতগ্রন্থরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণু স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করা হইল, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিহস্ত মুরলীধর। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিহস্ত মুরলাধরের উপাসনায় প্রবর্ত্তন করা হইল, তবু জগতে তাহার তাৎপর্য্য কেহ বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং কেহ গ্রহণও করিলেন না। শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণুই থাকিলেন, অর্থাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। শ্রীকৃষ্ণ স্থান পাইলেন না।

তারপরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে কি বিভিন্নতা জীবকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, মাধুর্য্য ভজনে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঠাকুর সেবার বস্তু হইতে পারেন না, যে হেতু শ্রীবিষ্ণু ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঠাকুর, তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম তাহার সাক্ষী। অতএব মহাপ্রভু বুঝাইয়া দিলেন যে মাধুর্য্য-ভজনের ঠাকুর শঙ্খচক্রধারী হইতে পারেন না, তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর। মহাপ্রভু যখন এইরূপ শিক্ষা দেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলে সকলে শ্রীবিষ্ণুকে বুঝিতেন। তখন ভারতবর্ষে সকল ঠাকুর চতুর্ভুজ ছিলেন, কেবল এক ঠাকুর ছিলেন দ্বিভুজ মুরলীধর, তিনি ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন এই দ্বিভুজ মুরলীধর গোপীনাথ দেখিবার ও ভক্তগণকে দেখাইবার নিমিত্ত সাধারণ পথ ছাড়িয়া, যে পথে গোপীনাথ অধিষ্ঠিত, সেই পথ দিয়া গমন করেন।

শ্রীভাগবত গ্রন্থ হইতে মাধবেন্দ্র পুরীর উদয়। তাঁহার ন্যায় ভক্ত জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার পরে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। এই অবতারে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম আরো পরিবর্দ্ধিত হইল, কি এক প্রকার নূতন আকার ধারণ করিল। এমন কি, প্রভুর অবতারে বৈষ্ণবগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, যথা অনান্য বৈষ্ণবগণ ও "গৌড়ীয়" বৈষ্ণবগণ। যদি প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম আর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এক হইবে, তবে মহাপ্রভুর ধরাধামে আসিবার প্রয়োজন ছিল না। শ্রীভগবান মিথ্যা উদ্দেশ্যে ও সামান্য কারণে, মনুষ্য সাধারণের নয়নগোচর হয়েন না।

আবার ভগবানের উদ্যম কখন বিফলে যায় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভু অবশ্য কোন কারণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সে কারণও অবশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছিল। এই বিষয়ে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রভুর অবতারে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম অন্য রূপধারণ করিয়াছেন। যথা—চৈতন্যচন্দ্রামৃতে।—

সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্তিভিঃ
পূর্ব্বং নৈকতরত্র কোঽপি সুদৃঢ়ং বিশ্বস্ত আসীজ্জনঃ।
সংপ্রত্যপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌরাঙ্গচন্দ্রে পুনঃ
শ্রুত্যর্থো হরিভক্তিরেব পরমঃ কৈর্ব্বা ন নির্দ্ধার্য্যতে॥

পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ যুক্তিযুক্ত মত সকল বিস্তারিত করিলেও তন্মতে কেহই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিল না, সম্প্রতি অতুল্য প্রভাবশালী শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র উদিত হইলে বেদপ্রতিপাদ্য যে কেবল শ্রীহরিভক্তি তাহা সকলেই অবধারিত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যত ভক্তিধর্ম্ম আছে, সেই সকলের মধ্যে আমরা আছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই। কারণ অন্যান্য ভক্তিধর্ম্মে যাহা আছে আমাদের ধর্ম্মে তাহাত আছেই, আরো কিছু আছে। অতএব আমরা খ্রীষ্টিয়ান বটে, কিন্তু আরো কিছু; শাক্ত বটে, কিন্তু আরো কিছু। আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু আরো কিছু। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের ধর্ম্মপুস্তক বটে, কিন্তু আমাদের আর এক অতিরিক্ত ধর্ম্মপুস্তক আছে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর লীলা।

যদি বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবের উৎপত্তি হয়, তবে আমরা ঠিক বৈষ্ণব নহি। যে হেতু লক্ষ্মীপতি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ঠাকুর আমাদের ভজনীয় নহেন। একদিন কাল, চক্রে ও ত্রিশূলে এই ভারতবর্ষ রক্তে কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছিল। অতএব বিষ্ণু আমাদের পতি নহেন, আমরা চক্রের ধার ধারি না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমরা বৈষ্ণব নহি।

তবে আমরা এক হিসাবে "কাষ্ণ" বটে, যে হেতু আমরা রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঠিক আমরা কাষ্ণও নহি। গোকুলের গোসাঞিগণ শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করেন, নিম্বার্কসম্প্রদায়ী ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণ উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহারাও "কাষ্ণ" বটেন। কিন্তু আমরা আর গোকুলে বৈষ্ণব এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কি সকলে এক? তাহা ত

হইতে পারে না। তাহা হইতে পারে না, এই নিমিত্ত আমাদিগের সম্প্রদায়কে "গৌড়ীয়" বৈষ্ণব বলে।

অতএব যাঁহারা শুদ্ধ "কাষ্ণ" তাঁহাদের সহিত আমরা সম্পূর্ণরূপে মিশিতে পারি না। আমরা নিম্বার্কসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের মত "কাষ্ণ" বটে, কিন্তু আর কিছু। সে আর কিছু আমাদের শ্রীমহাপ্রভু। আমাদের মধ্যে যাহা আছে, তাহা সমুদায় নিম্বার্কসম্প্রদায়ে আছে, কেবল মহাপ্রভু নাই। অতএব আমরা "কাষ্ণ" নাম লইতে পারি না। যে হেতু তাহা হইলে আমাদের মহাপ্রভুকে উড়াইয়া দিতে হয়।

মহাপ্রভুর রাজ্যস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনরহরি চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ "ভজ গৌরাঙ্গ" "কহ গৌরাঙ্গ" বলিয়া নগরে নগরে বেড়াইয়াছিলেন। শ্রীনরহরি সুরধুনীকে যমুনা, আর শ্রীপ্রভুকে নাগররূপে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা থাকিল না। মহাপ্রভুকে ঢাকিয়া রাখা হইল,—ক্রমে সকলে মহাপ্রভুকে এক প্রকার ভুলিয়া গেলেন। কেবল কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকার নিমিত্ত মহাপ্রভু রহিলেন। অতএব এই যে বৃহৎ কাণ্ড, অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতার, ইহা লোপ পাইবার যো হইল। মহাপ্রভু অবতার কি না, শ্রীভগবানের সহিত জীবের সাক্ষাৎ, পরিচয়, ও কথাবার্ত্তা। যদি বল এরূপ পূর্ব্বেও হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? বৈষ্ণব ব্যতীত কে মানাইবার আর মানিবার উপায় কি যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্! কিন্তু মহাপ্রভুর অবতারে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্যের সহিত কথা কহিয়াছেন! এ ঘটনা লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস কি সৃষ্টি অপেক্ষাও বলবৎ ইহা কি যাইবে? কিন্তু তাহা কি কখন হইতে পারে? শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য কি কখন বিফল হয়? তাই শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়া এখন বহুল চেষ্টা ও —গৌরাঙ্গ-সমাজের সৃষ্টি।

এখন বিচার করুন শ্রীগৌরাঙ্গ কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইলেন। সরূপ গোসাঞি যে কয়েক কারণ দেখাইয়াছেন তাহা আমরা ছুইব না। সে বড় লোকের কথা, বড় লোকের জন্য। আমারা ক্ষুদ্র মনুষ্য আমাদের ক্ষুদ্র কথাই ভাল। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ, কি বৃন্দাবনলীলা কিছুই মানিতে বাধ্য নন। বঙ্কিম বাবুর অবস্থা দেখুন। এইরূপ এখনকার প্রায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবস্থা। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন লীলার সাক্ষ্য দিলেন, আর তখন উহা সত্য হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় না হইলে বৃন্দাবন ভজন, হয় কলুষিত হইত নতুবা উঠিয়া যাইত।

আমি সরলভাবে বলিতেছি, শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস না হইলে আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। এখন যতদূর সাধ্য করি। কেন না শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ে শুদ্ধ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ খানিকে জীবনদান করিয়াছেন। তাহাতে আমরা বৃন্দাবনলীলা, অর্থাৎ ব্রজের নিগূঢ় রস কি, মাধুর্য্য ভজন কাহাকে বলে, ও প্রকৃত ভজন প্রণালী কি তাহা শিখিয়াছি। তত্রৈব।—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ, যাহা পূর্ব্বে কাহারও শ্রবণ-পথে গমন করে নাই, নাম মহিমা যাহা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের পরম মাধুরী, যাহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা শ্রীরাধা, যাহা পূর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল এক চৈতন্যচন্দ্র প্রকটিত হইয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রভুর কৃপায় আমরা জানিয়াছি যে, নামকীর্ত্তন ও রস আস্বাদন এই জীবের প্রধান সাধন। নাম ও রসসুধা পানে জীব নির্ম্মল হয় ও ভগবানের প্রেমরূপ ধন প্রাপ্ত হয়।

আবার প্রভু যেমন বিধি শিক্ষা দিয়াছেন, তেমনি কোন কোন বিষয়ে নিষেধও করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অবতারে আমরা নূতন কি কি জানিয়াছি বলিতেছি। মুরারিকে বলিতেছেন, "মুরারি, অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিও না, তাহা হইলে আমাকে পাইবে না।" আরো শিক্ষা দিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

বেদ প্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর।
হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমতে বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥

অর্থাৎ অধ্যাত্ম চর্চ্চায়, যাগযজ্ঞে, ও মায়াবাদে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যাইবে না। এই বেদান্ত চর্চ্চায় ও অধ্যাত্ম চর্চ্চায় দেশ ছারেখারে যাইতেছিল, এখনও যাইতেছে। যথা—চন্দ্রামৃতে।—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটীরধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ।
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সদ্য রহস্যলাভঃ॥

কোটি সংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুসেবাই করুক বা কোটিগণিত নিগম আগম পুরাণাদিই পাঠ করুক, কিন্তু ক্ষণমাত্রে গূঢ়প্রেম লাভ হইতে শ্রীচৈতন্যকৃপা-দৃষ্টি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরই হয়।

আর মহাপ্রভু নূতন কি শিক্ষা দিলেন তাহা যথাসাধ্য বলিতেছি। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান জানিতেন যে পৃথিবীতে নাস্তিকতা প্রচারিত হইবে। কেহ শ্রীভগবান্‌কে মানিবে না, আর যদি কেহ মুখে তাঁহাকে মানে, তিনি যে "সুন্দর" তাহা ভুলিয়া তাঁহাকে অসুরভাবে পূজা করিবে; অবতার ত মানিবেই না। এমন কি পরকাল যে একটা আছে তাহাও মানিবে না। প্রকৃতপক্ষে এখন দেখিবে যে সমস্ত জগতে কেবল নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। শ্রীভগবান জগতের এই দুরবস্থা হইবে জানিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। কেন? প্রভু এই অবতারে প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীভগবান জীবের নিজজন। তিনি জীবগণকে অভয় দিবার জন্য ও তাহাদিগের সহিত প্রীতিস্থাপন করিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। যে ব্যক্তি অবতারে বিশ্বাস করিতে পারে তাহার ন্যায় সুখী ত্রিজগতে আর নাই। অবতারে বিশ্বাসও যে, "আমি তাঁহার তিনি আমার" এ বিশ্বাসও সে। প্রভু আপনি অবতার হইয়া অবতার-কার্য্যের সাক্ষ্য দিলেন। যীশু অবতার হইয়াছিলেন, কিন্তু অনেক খ্রীষ্টিয়ান গণও তাহা মানেন না, যাঁহারা মানেন তাঁহারাও আধাআধি। কিন্তু গৌরাঙ্গ-অবতারকে সরলচিত্ত ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই মানিতে হইবে। যদি প্রভু অবতীর্ণ না হইতেন, তবে আমি নাস্তিক হইতাম তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই প্রভুর অবতারের দ্বারা নাস্তিকতা যাইয়া এখন জগতে ভক্তি-ধর্ম্ম স্থাপনের উপায় হইয়াছে। অবতার যে সম্ভব তাহা শুধু গীতা পড়িয়া কেহ বিশ্বাস করিত না, প্রভু আপনি অবতীর্ণ হইয়া তাহার সাক্ষ্য দিলেন।

তাহার পরে প্রভু আর একটী শিক্ষা দিলেন। নীলাচলে প্রভু আছেন, আর নিতাই আছেন। নিতাই নীলাচলে থাকেন ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। অতএব

বিরলে নিতাইয়ে পেয়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে,
মধু ভাষে কহে ধীরে ধীরে।
"জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে,

যাও নিতাই সুরধুনী তীরে ॥

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হৈল অন্ধ,

কেহত না পাইল হরিনাম।

এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিব যারে,

কৃপা করে লওয়াইবে নাম ॥

কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,

কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।

সমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন নাহি হয়,

সুখে যেন হরিনাম লয় ॥

কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া, অধমগণ,

জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।

কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,

খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ ॥

জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,

পূর্ণ কর সকলের আশ।"

চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে,

সঙ্গে চলু গদাধর দাস ॥

এখন প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। প্রভুর চরিত্র কি একবার মনে করুন। "উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া "

আবার বাসুঘোষ বলিতেছেন—

"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।

পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥"

প্রভু পতিত দেখিলে দুঃখে অধীর হইতেন, আর সেই পতিত উহা দর্শন করিয়া প্রভুর সঙ্গে রোদন করিত, করিয়া উদ্ধার হইত। যখন প্রভু নিতাইয়ের মান রক্ষার্থ মাধাইকে দণ্ড করিবেন বলিলেন, তখন নিতাই প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গল হইতে অনুবাদ—

"প্রভু তুমি না বার বার বলিয়াছ যে এ অবতারে আর চক্র ধরিবে না? এবার না তুমি আপনি কান্দিয়া জীবকে কান্দাইবা ও নির্ম্মল করিবা, আর কারুণ্য রসে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবা?" প্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তাই বটে।"

নিতাই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিলেন। কিরূপে?

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমান শূন্য সদা নগরে বেড়ায়॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

এখন প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য অনুভব করুন। কবে কে ইহা দেখিয়াছেন যে, একজন একটী পতিত জীবের গলা ধরিয়া রোদন করিয়াছেন? কোন্ অবতারে এরূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন? কোন্ অবতারে দন্তে তৃণ ধরিয়া জীবের দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করিয়াছেন? কোন্ অবতারে কটিতে একখানি কৌপীন পরিয়া দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিয়া বেড়াইয়াছেন? এ সব ত কৃষ্ণ অবতারে ছিল না। এ সমুদায় কার্য্য আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের নিজের, ইহার স্বত্বাধিকারী তিনি একক, আর কাহার ইহাতে অংশ নাই। যথা—চন্দ্রামৃতঃ

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে চরিহরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ॥

বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও আগমাদিতে ভগবানের অসংখ্য অবতার কথিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগৌরহরিতে যে প্রকার অলৌকিক প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে কে সম্ভাবনা করিবে। অপর কি বলিব শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভক্তদিগের সেই অলৌকিক প্রভাব কত শত বার অনুভবের বিষয় হইতে দেখিয়াও যে সকল ব্যক্তির শ্রীগৌরহরিতে পরমেশ্বর বুদ্ধি না হয়, হায়! তাহারা অতিমূঢ়।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে সামান্য এই কয়েকটীর নিম্নে উল্লেখ করিলামঃ—

(১) প্রভু অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবৃন্দাবন স্থাপন করিলেন। যদি বঙ্কিম বাবু মহাপ্রভুর বিষয় জ্ঞাত থাকিতেন তবে তিনি বৃন্দাবন লীলা উড়াইতে পারিতেন না।

(২) মাধুর্য্য ভজন কি, তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে শিখাইলেন। কোন জীবের সাধ্য ছিল না যে, রাধার প্রেম কি তাহা আপনি হৃদয়ে ধরিয়া জীবকে দেখাইয়া দেয়। বেদের মায়াবাদ, বশিষ্ঠের অধ্যাত্ম-চর্চ্চা, তন্ত্রের বিভীষিকা প্রভৃতি নানাবিধ জঞ্জালে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছিল।

এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেও এই মায়াবাদ ও আধ্যাত্ম-চর্চ্চার গন্ধ পাওয়া যায়। প্রভু এ সমুদায় "এবালিস" করিয়া দিলেন। করিয়া কি করিলেন, যথা—

"ব্রজের নিগূঢ় রস বিলাইলা ঘরে ঘরে।"

"গৌর পরশমনির কি দিব তুলনা।

আমার গৌরাঙ্গের গুণে, কলুষিত জীবগণে, নাচিয়া গাইয়া হইল সোণা।"

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, "সাধন-কণ্টক পথে ফুল ছড়াইল।" যথা---চন্দ্রামৃতে

যোমার্গোদূরশূন্যোবত ইহ বলবৎকণ্টকো যোতিদুর্গো
মিথ্যার্থভ্রামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দনিঃস্যন্দকো যঃ।
সদ্যঃ প্রদ্যোতয়ংস্তং প্রকটিতমহিমা স্নেহবান্ হৃদ্গুহায়াঃ
কোঽপ্যন্তর্ধ্বান্তহন্তা স জয়তি নবদ্বীপদীপ্যৎপ্রদীপঃ॥

দূরশূন্য শুষ্ক জ্ঞান ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির আগ্রহ রূপ অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ, মিথ্যা বিষয় ভ্রান্তি জনক যে মার্গ, তাহাকে যিনি রসময় আনন্দনিঃস্যন্দী রূপে উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত, হৃদয়গুহার অন্ধকার নাশক স্নেহপূর্ণ উজ্জ্বল নবদ্বীপদীপস্বরূপ সেই প্রভূত প্রভাবশালী গৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

(৩) অবতার শব্দটার মোটামুটি মানে অনুভব করুন। শ্রীভগবান্ যদি আপনি ধরাধামে নয়নগোচর হয়েন, কি তাঁহার কোন প্রিয় দাসকে এখানে পাঠাইয়া দেন, তবে এরূপ কার্য্য অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। "অবতারী" ও "অবতার" বলিয়া যে শাস্ত্রীয় বিভাগ আছে তাহা আমরা ছাড়িয়া বলিতেছি। শ্রীভগবান যে স্বয়ং জগতে আগমন করিয়া নয়নগোচর হইবেন, কি তাঁহার কোন প্রেরিত ব্যক্তি এরূপ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন ইহা এখন অনেকেই বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা বলেন করেন তাঁহারা মুখে বলেন, মনে করেন না। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন, তাঁহারা অবতার কার্য্যে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাহা করিলে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রাণিবধ করিতে পারিতেন না। গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া অবতার ক্রিয়া যে সত্য তাহা স্থাপিত করিলেন।

(৪) প্রভু আপনি আচরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে জীবে জীবে অতি গাঢ় সম্বন্ধ, আর পতিত জীবকে ভক্তিপথে আনয়ন করা জীবের প্রধান ধর্ম্ম। এই অবতারে জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। কখন কেহ এরূপ জীবে গাঢ় প্রীতি দেখেন নাই।

অতএব আমারা বৈষ্ণব নহি, শাক্ত নহি, সাধু নহি, আমরা গৌরাঙ্গের

দাসানুদাস। জগতে আমাদের এই স্বত্ব স্থির করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে।

অপর, যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিলেন "জিহোবাকে" ভজন কর। মহম্মদ শিক্ষা দিলেন আল্লাকে ভজন কর। খ্রীষ্টের দলস্থগণ তাঁহার নামে আপনাদিগের নাম লইলেন, খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিলেন, দিয়া প্রধান এক সম্প্রদায় হইলেন। মুসলমানগণ ঐরূপ মহাম্মদের নাম লইলেন, লইয়া এক বৃহৎ সম্প্রদায় হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ অবতীর্ণ হইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজন শিক্ষা দিলেন। তাঁহার প্রকটাবস্থাতই কোটি লোককে পদতলে আনিলেন। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায় হইল না। আমরা আমাদের অবতার, নেতা, গুরু, জীবনমরণের গতিকে উপেক্ষা করিলাম, করিয়া তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই রাখিলাম, তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত লইলাম না। দেখুন—বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণব। বুদ্ধ হইতে বৌদ্ধ। খ্রীষ্ট হইতে খ্রীষ্টিয়ান। মহাম্মদ হইতে মুসলমান। নানক হইতে নানকপন্থী। গৌরাঙ্গ হইতে কিছুই নহে। তাই গৌরাঙ্গ-সমাজের সৃষ্টি।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাসস্য।

মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের চিত্রপট।

গত আষাঢ়ের শ্রীপত্রিকায় মহারাজ নন্দকুমারের জীবনী সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভগবানের চিত্রপটের কথা যাহা লিখিয়াছিলেন, শ্রীসমাজ হইতে কলিকাতার জনৈক উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফার দ্বারা তাহার ফটোগ্রাফ আনা হইয়াছে।

ইহাতে দেখিলাম শ্রীনীলাচলে শ্রীগদাধরের আশ্রমে শ্রীগদাধর বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। সম্মুখে মধ্যস্থানে শ্রীমহাপ্রভু বসিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও বামে একটু পশ্চাদ্ভাগে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দের দক্ষিণে শ্রীবাস। শ্রীঅদ্বৈতের ঠিক বাম পাশে শ্রীরঘুনাথ দাস। সম্মুখে রাজা প্রতাপরুদ্র অষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। আরও কয়েক মূর্ত্তি সেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না। পশ্চাতে বৃক্ষোপরি বানরগণ বসিয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে এবং সম্মুখে সরোবরে হংস চরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেরই মুখের ভাব অতি সুন্দর। নন্দকুমারের বংশ পরম্পরায় এরূপ কথিত আছে যে, শ্রীনিবাস

আচার্য্যপ্রভু এই চিত্রপট খানি ভক্ত-চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করান। হইতে পারে যে, সেই চিত্রকর এই সকল শ্রীমূর্ত্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ইহা চিত্রিত করিয়াছেন। নচেৎ এরূপ সুন্দর মুখশ্রী ও ভাব কখনই হইতে পারিত না।

শ্রীসমাজ হইতে এই ফটোগ্রাফখানি বিক্রয় করা হইতেছে। মূল্য বড় আকৃতি ২৷৹ মাঝারি ১৷৷৹ টাকা, ইহা হইতে যে আয় হইবে তাহা প্রচার কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। শ্রীসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেই পাওয়া যাইবে।

অভিনন্দন পত্র।

গোবরহাটী শাখা গৌরাঙ্গ-সমাজের সম্পাদক, সহকারি সম্পাদক ও সভ্য মহোদয়গণ শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিম্ন-লিখিত অভিনন্দনপত্র খানি প্রেরণ করিয়াছেন :—

"আপনাদের শ্রীসমাজ সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান অতিমহৎ। যিনি এই মহদুদ্দেশ্যের বীজ আপনাদের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছেন, তিনিই ইহা ফলচ্ছায়াসমন্বিত বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়া অচিরে ইহার অমৃতময়ফলে ভারতের সর্ব্বত্র পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন;—কোন সময় স্বয়ং, কোন সময় অংশরূপে কোন সময় বা নিজ অঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তি দ্বারা। সম্প্রতি সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের প্রভু আমাদিগকে ভুলেন নাই। একালে তাঁহার অবতারের সময় নয় বলিয়াই যেন আপনাদের হৃদয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উদ্ধারের জন্য, আমাদের দরিদ্রতা দূর করিবার জন্যই এই শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। নইলে একমাত্র শ্রীসমাজের অনুষ্ঠান পত্র প্রচারমাত্রেই এত মহাত্মার সম্মতি এবং সহযোগিতা, এ শক্তি কার? আজ আমরা হতাশ প্রাণে বল পাইলাম, ভগ্নহৃদয়ে সাহস পাইলাম, দুর্ব্বল দেহে শক্তি পাইলাম, আমরা আজ এ ধর্ম্মাধর্ম্ম যুদ্ধে আবার সেনাপতি পাইলাম; অতএব আবার ভারতে গগনভেদী, পাষণ্ড হৃদয় বিদ্রাবক রবে, শ্রীশচীনন্দনের জয় ঘোষিত হউক, ভক্তির স্রোতে প্রেমের তুফান উঠুক, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শক্তিবলে আপনারা ভক্তিহীন ভারতে প্রভুর বিজয়ভেরী বাজাইয়া শ্রীহরিনামের জয়

পতাকা স্থাপন করুন ; ভক্তির জয় হউক, ভক্তের জয় হউক, ভক্তের ভগবানের জয় হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমারা অতি ক্ষুদ্র, অতি দরিদ্র কি দিয়া আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিব, এমন আমাদের কি আছে। যদি দয়া করিয়া গ্রহণ করেন তবে আমাদের এই দিহায়নী শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিধায়িনী সভা "গোবরহাটী শাখা গৌরাঙ্গসমাজ" নাম দিয়া মহাশয়দিগের শ্রীকরকমলে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম, মহাশয়গণ অত্রস্থ বৈষ্ণবগণ সহ এই বৈষ্ণবী সভা সযত্নে প্রতিপালন করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করুন।

শাখা-সমাজ।

গোবরহাটী শাখাসমাজের সভ্যগণের সম্মতিক্রমে নিম্ন-লিখিত নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইল।

১। প্রতি শ্রীএকাদশীবাসরে দিবা ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীসভার অধিবেশন হইবে।

২ কলিযুগপাবন প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের মহিমা এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রচার ও বৈষ্ণবগণের পরস্পর একতাবন্ধন এই সভার উদ্দেশ্য হইবে।

৩। বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতারে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৪। সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছানুসারে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক এবং বৈষ্ণববর শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক মনোনীত করা হইল।

৫। সভার প্রতি অধিবেশনে প্রথমতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র গান, শ্রীভগবদ্গীতা পাঠ, নাম সংকীর্ত্তন, প্রাচীন মহাত্মগণ কৃত প্রার্থনা গান, তদনন্তর বক্তৃতা ও নামসংকীর্ত্তন হইয়া, সভা ভঙ্গ হইবে। সভ্যগণের ইচ্ছানুসারে কোন কোন অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইবে।

৬। সভ্যগণের মধ্যে যিনি সমর্থ হইবেন, তিনি সভায় গান কি বক্তৃতা করিতে পারিবেন।

৭। সভার সভ্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কি ভক্তির অনুকূলে কোন প্রব-

ন্ধাদি লিখিয়া সভায় প্রেরণ করিলে, তাহা অধিবেশন কালে সাদরে পঠিত হইবে এবং শ্রীপত্রিকা ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশ জন্য পাঠান হইবে।

৮। অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসা ব্যতীত সভ্যগণের নিকট অন্য কিছুরই প্রত্যাশা করা হইবে না।

৯। প্রতিবর্ষের উত্থান দ্বাদশী উপলক্ষে সভার বার্ষিক মহোৎসব হইবে।

জয়দেবপুর বলধা হইতে শ্রীযুক্ত হরিভক্ত দে মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আমাদের এই স্থানে একটী হরিসভা আছে, এই সভায় প্রতিদিন শ্রীমহাপ্রভুর লীলাপাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। আজ হইতে এই সভা শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের শাখারূপে পরিণত হইল। আপনারা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিবেন, যেন এই শাখা-সমাজের দিন দিন উন্নতি হয়। আমাদিগের কি কি নিয়ম পালন করিতে হইবে লিখিবেন। আপনারা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাদের অভীষ্ট পূরণ করেন। আপনারা যদি কৃপাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এই অঞ্চলে আসিয়া প্রভুর নাম দিয়া যান, তবে জীবের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়।"

পটুয়াখালি হইতে জনৈক ভক্ত মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবারে স্থানীয় প্রধান মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রযত্নে তাঁহারই ভবনে শাখা গৌরাঙ্গ সমাজের একটী বৃহৎ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাগৃহ ফুল ও পাতা দ্বারা সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বেলা দুইটার সময় সভার কার্য্যাদি আরম্ভ হয়। সভাস্থ সমস্ত লোক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সভাপতি পদে বরণ করিলেন। এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ, মহাশয়দ্বয়কে সহকারী সম্পাদক এবং স্থানীয় সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসু মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হইল। ইহার পর শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত সেরেস্তাদার মহাশয় দাঁড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে পূর্ণ অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে একটী সুললিত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ-দ্বারা প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ কে?" এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়া সকলকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

তৎপর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। সকলের বলা হইলে সময়াভাব বশতঃ সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে অদ্বৈত-প্রভুর কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিলেন এবং আগামী সভায় মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তৎপরে তিন দল কীর্ত্তনীয়া উন্মত্তবৎ অপরাহ্ণ ৫ম ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিয়াছিল এবং সকলেই সেই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন শেষে হরির লুট দেওয়া হইয়া ছিল। সভাস্থলে প্রায় একশত লোক উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ শ্রীশাখা সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, সভাপতি; বৃন্দাবনচন্দ্র বসু কোষাধ্যক্ষ। কালীকমল গুহ উকিল, সম্পাদক। রসিকচন্দ্র ঘোষ ও ললিতমোহন রায় সহকারী সম্পাদক। বরদাকান্ত রায়, বৈকুণ্ঠচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার সেন গুপ্ত, বিহারীলাল লস্কর, চুনীলাল রায়, ললিতকুমার সেন গুপ্ত, বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত সেরেস্তাদার, সীতানাথ লস্কর, শ্রীনাথ গুহ ডাক্তর শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বসন্তকুমার মজুমদার, চণ্ডীচরণ দাস, মতিলাল রায়, মহেন্দ্রনাথ, দত্ত, ললিতমোহন সেন গুপ্ত, বিপিনবিহারী গুহ, ললিতমোহন ঘোষ ক্ষিরোদ চন্দ্র দাস গুপ্ত, রসরঞ্জন সেন গুপ্ত, ললিতনাথ ভট্টাচার্য্য, বসন্তকুমার পতিতুণ্ড, উমাচরণ গুহ, বিহারীলাল রায় চৌধুরী, দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী শশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাকান্ত ঘোষ, মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কৈলাসচন্দ্র দাস, ভরতচন্দ্র দাস, শ্যামাচরণ দে, বসন্তকুমার দাস, কালিকুমার দে, কৃষ্ণমঙ্গল দে, দেবেন্দ্রনাথ রায়, হরিমোহন দাস, দুর্গাচরণ দে, কৃষ্ণকুমার দে, কৈলাশচন্দ্র দে, বসন্তকুমার দে, মহেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রসন্নকুমার দাস, কালীচরণ দে, যোগেন্দ্রচন্দ্র দে, বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস, সাধুচরণ সাহা, রামচন্দ্র বণিক, রাইমোহন কুণ্ড, গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার ও প্রসন্ন কুমার পাল।

চন্দ্রশেখর-পদাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সঙ্কেত কাননে যাই। শেজ বিছায়ল রাই॥
শ্যাম-মনমোহন সাধা। কেশ বনায়ত রাধা॥ ধ্রু॥
চাঁচর চিকুর সওয়ারি। বেণী বনায়ল গোরি।
সীঁথহি সিন্দূর দেল। তিমিরে অরুণ উগি গেল॥
সুললিত উরুযুগমাঝে। মৃগমদ পত্র বিরাজে॥
অঞ্জনে নয়ন উজোর। শ্রুতি মণি কুণ্ডল দোল॥
নাসাশিখরে সুভাতি। কনয়া খচিত গজমোতি॥
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু। ঝলমল আনল ইন্দু॥
বৈঠলি কুঞ্জ আবাসে। জগ-মন-মোহন বেশে॥
চন্দ্রশেখর অনুমান। আজু তু মোহবি কান॥

সঙ্কেতকাননে, শেজ বিছায়া, কিসের লাগিয়া কান্দ।
আমার বচন, শুনি এক ক্ষণ, হৃদয়ে ধৈরজ বান্ধ॥
আসিবার কাল, হইল আসিয়া, এখনি আওব কানু।
শ্রবণ পাতিয়া, বসিয়া থাকহ, এখনি শুনিবা বেণু॥
সুমঙ্গল কাজে, কাকুলী উচিত, এ বুধি বিশেষ কথা।
শেখর চন্দ্রমা, কহে কর ক্ষমা, বদন হইল রাতা॥

সুভগা।

কুসুমিত কাননে শেজ বিছাই। নিজ তনু ছা-হেরি নিরখিত রাই।
নাগর ভরমে আদর বহু করই। না দেখিয়া চকিতনয়নে পুন রহই॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূষণ পরে পুন তেজে। * * * *
চন্দ্রশেখর কহে প্রেম কি রীত। অদরশে দরশ করত পিরীত॥

ভক্তিভিক্ষু শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত মূল্য শোধ করিয়া যাঁহারা উপহার প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন—উপহারের চিত্রপট এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অতি সত্বরেই তাহা তাঁহাদিগের হস্তগত হইবে। প্রকাশক—

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমদাতৃত্ব।

সিন্ধুবিন্দু মহোপ্রযচ্ছতি নহি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সঙ্কল্পেন বিনা দদাতি ন কদাঽপ্যল্পঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
সচ্ছন্দোপি বিধুঃ সুধা বিতরণে রাত্রিন্দিবাপেক্ষতে
দাতা কোপি ন দৃশ্যতে বিনিয়মঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা।

নিকটে গমন না করিলে সমুদ্র কাহাকেও বারিবিন্দু দান করেন না, মেঘগণও স্বাধীন নহে, তাহারা সময় না পাইলে বারিবর্ষণ করিতে পারে না। কল্পবৃক্ষের নিকটে প্রার্থনা না করিলে কিছুই পাওয়া যায় না। চন্দ্র সুধাবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তিনিও রাত্রি ব্যতীত দিবসে কিরণ দিতে অক্ষম, কি আশ্চর্য্য! শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যতীত অনিয়মিত দাতা আর দেখা যায় না, যেহেতু প্রার্থনা না করিলেও তিনি জগৎকে প্রেম দান করিয়া থাকেন।

কোকহ অপরূপ, প্রেমসুধানিধি, কোই কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ, সোই কলপতরু, মঝু মনে হোয়ত সন্দেহ॥
পেখলুঁ গৌরচান্দ অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম॥
যে এক সিন্ধু, বিন্দু নাহি বিতরই, পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি, রহত কলপতরু, কো অছু করুণা অপার॥
যছু চরিতামৃত, শ্রুতিপথে সঞ্চরু, হৃদয়সরোবর পুর।
উমড়ই অধম,- নয়ন-মরুভূমহি, হোয়ত পুলক অঙ্কুর॥
নামহি যাক, তাপ সব মেটই, তাহে কি চাঁদ উপামে।
কহ ঘনশ্যাম,- দাস, নাহি হোয়ত, কোটি কোটি একুঠামে।

উপরি উক্ত শ্লোক ও পদ শ্রীঘনশ্যাম কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত। এই ঘনশ্যাম প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম দিব্য সিংহ। কর্ণানন্দ রসের ষষ্ঠ নির্য্যাসে লিখিত আছে "গোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ। প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-বিহ্বল মত্তভৃঙ্গ॥" কোন একটী পদে ঘনশ্যামের ভণিতা দেখিলেই অনেকে ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি-ঘনশ্যাম রচিত

বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। বলরাম দাস সম্বন্ধেও এইরূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘনশ্যামের ভ্রাতার নামও বলরাম ছিল, তিনি যে পদ প্রণয়ন করেন নাই, ইহা অসম্ভব। পদকল্পতরুর ভূমিকায় লেখা আছে "কবিনৃপ বংশজ, ভুবন-বিদিত যশ, ঘনশ্যাম বলরাম। ঐছন দুহুঁজন, নিরুপম গুণগণ, গৌরপ্রেমময় ধাম॥" সুতরাং বলরামও একজন পদকর্ত্তা। অতএব সাধারণের ভ্রম অপনোদন মানসেই এ স্থানে ঘনশ্যাম দাসের কথা অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল।

—*০:-*-:০*—

গোবিন্দ-কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত গোবিন্দঘোষ-কাহিনীর পর।)

ইহার পরে মাধব শ্রীগোপীনাথকে পুত্র রূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কাল-কবল হইতে কেহই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ নহে, মাধবেরও চরমকাল উপস্থিত হইল, সেসময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না তাই শিষ্যগণ রোদন করিলেন। আর তাঁহার এই গোপীনাথ-পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে গোবিন্দঘোষের অন্তর্দ্ধান সময়ে শ্রীগোপীনাথ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায় রোদন করিয়াছিলেন। তত্রস্থ লোকে তাঁহার পদ্মচক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে দেখিয়াছিল। পিতৃবিয়োগে রোদন করা কর্ত্তব্য, সেই জন্য গোপীনাথ এই কর্ত্তব্যকার্য্যের ক্রটী কেন করিবেন? নূতন সেবাইতকে নিশিযোগে গোপীনাথ ঠাকুর প্রত্যাদেশে বলিতেছেন "গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা, আমি একমাস অশুচ রহিব এবং হবিষ্য করিব। তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সমুচিত বসন পরাইবা।" তখন সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিলেন। পরে সাহসী হইয়া বলিলেন "ঠাকুর! সত্য কি তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ, তবে তোমাকে আমি কিরূপে কাচা পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? অতএব ঠাকুর এই লীলা সম্বরণ করুন।" তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন "আমি আমার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি

শাস্ত্রমতে সর্ব্বসমক্ষে সমুদায় কার্য্য করিব এবং নিজহস্তে পিণ্ডদান করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।" প্রাতে সেবাইত এই কথা সকলের নিকট ব্যক্ত করিল। সকলে ভগবানের করুণায় গদগদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই করা হউক। তখন এই কথা সর্ব্বদেশে প্রচারিত হইল। মধুমাসে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাগম হইল, তখন কাচা গলায় দিয়া শ্রীগোপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হইল। যখন সভার মধ্যে গোপীনাথকে কাচা পরাইয়া আনা হইল, তখন সভাসমেত ভাবে নিমগ্ন হইলেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ ধূলায় গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য ও কেহ ভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন। ভগবানের কারুণ্যে সকলে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যেমনি ভক্ত তেমনি ঠাকুর, যেমনি দাস তেমনি প্রভু, যেমনি পিতা তেমনি পুত্র।

কথিত আছে যে সর্ব্বসমক্ষে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিয়াছেন। এই অপরূপ শ্রীভগবানের লীলা অদ্যাপি অগ্রদ্বীপে বৎসর বৎসর হইতেছে। আর এখনও তিনাস্তভক্তগণ এই অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরসপুত্র বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন, কিন্তু গোপীনাথ এই ৪০০ শত বৎসর গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিতেছেন, এরূপ পুত্র কেবল গোপীনাথ ঠাকুরই হইতে পারেন।

শ্রীগৌরাঙ্গই বলিয়াছিলেন যে হে গোবিন্দ। "তোমাদ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরূপ সৌভাগ্য তুমি পরিত্যাগ করিও না" হায় এ কথা কাহাকে বলিব। শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের এই ৪০০ শত বৎসর শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। যখন জয়দেব গোস্বামী "দেহি পদপল্লব" শ্লোক লেখেন, তখন তিনি ভাবিতেছেন কিরূপে লিখিবেন যে ভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তখন লেখনী রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন, সেই সময় তাঁহার প্রিয় ঠাকুর রাধামাধব লেখনী ধরিয়া তাঁহার দাসী পদ্মাবতীর সমক্ষে ঐ অর্দ্ধশ্লোক লিখিয়া রাখিলেন, জয়দেব স্নান করিয়া আসিয়া পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই শ্লোকের অর্দ্ধেক কে লিখিল? পদ্মাবতী কহিলেন রাধামাধব ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া ঐ শ্লোকার্দ্ধ লিখিলেন। কিন্তু ইহা হইতেও আশ্চর্য্যতর যে, ভগবান গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ

করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন। জীবগণ কি নির্ব্বোধ! কি মূঢ়মতি! এরূপ প্রভু রাখিয়া কনককামিনীর সেবা করিতেছে।

গোবিন্দচক্রবর্ত্তী—ইহার বাড়ী পদ্মাবতী নদীর ধারে বুধুরি ও মঙ্গলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বোরাকুলি গ্রাম। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভবনে রাধা-বিনোদ ঠাকুরের বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন। একদা বিগ্রহ অভিষেক নিমিত্ত শ্রীনিবাসাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা আনাইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বুধরি গ্রাম হইতে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভবনে আসিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আচর্য্য ঠাকুরের একজন পরম ভক্ত শিষ্য। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় অতি নিপুণ ও ভক্তিমূর্ত্তি ছিলেন। আচার্য্যঠাকুর আসিয়া দেখিলেন শিষ্যের ভবন একেবারে বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনিতে নিনাদিত হইয়াছে। তাঁহার ভবন একেবারে মঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুর আগমন করিয়া শ্রীরাধাবিনোদ ঠাকুরকে অভিষেক করাইলেন। সকলেই মনে ভাবিলেন যে শ্রীবিগ্রহকে কোন্ নামে অভিষেক করাইবেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল।—

"রাধাবিনোদ নামে অভিষেক কর।"

রাধাবিনোদকে অভিষেক করাইয়া সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক বিচিত্র বেশ করা-ইলেন। শ্রীরাধাবিনোদের শোভা অত্যন্তচমৎকার হইল দেখিয়া সকলের নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অসংখ্য লোক গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভবনে রাধাবিনোদ বিগ্রহ দেখিতে আসিল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বিগ্রহ দর্শন নিমিত্ত সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। খড়দহ হইতে প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্র নিজগণ সবভিব্যাহারে বোরাকুলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র এবং অম্বিকা কালনা হইতে হৃদয়ানন্দের শিষ্য গোপীচরণ, রমাই ঠাকুর, বলরাম, মহা উন্মাদিত হইয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-তনয় কানাই ঠাকুর, কণ্টকনগরের মহান্ত গদাধর দাসের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন এবং নয়নানন্দ মিশ্র, শ্রীনিবাসের অতি প্রিয় ভক্ত শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, কাঞ্চনগড়িয়ার শ্রীহরিদাস আচার্য্যের দুই পুত্র শ্রীদাস এবং গোকুলানন্দ ইঁহারা মহা হর্ষিত হইয়া বোরাকুলিগ্রামে গোবিন্দের ভবনে আসিয়া উপ-

* শ্রীগোপীনাথ ও মাধব ঘোষ সম্বন্ধে আমাদের মতামত বিগত কার্ত্তিক মাসের শ্রীপত্রিকায় কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে, সময় মত বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। বিঃ সং।

ষ্ঠিত হইলেন। সকলেই শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ দেখিয়া ভক্তিতে গদগদ হই-লেন। তার পরদিন মন্দির সমীপে সংকীর্ত্তন হইল। শ্যামদাস-দেবীদাস মৃদঙ্গ বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোকুল ও নরোত্তম গৌরচন্দ্রের গুণ গান করিয়া ভক্তবৃন্দকে মাতাইলেন। গৌরচন্দ্র অলক্ষিত ভাবে আসিয়া উদয় করিলেন। প্রেমময় শ্রীনিবাস আচার্য্যের অঙ্গে অঙ্গে হেলাইয়া বীরচন্দ্র প্রভু নাচিতে লাগিলেন, আবার অদ্বৈতাচার্য্য তনয় কৃষ্ণমিশ্র অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সমস্ত ভক্তগণ অধৈর্য্য হইয়া উন্মত্তবৎ হরিসংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কানাই ঠাকুর, নয়নানন্দ মিশ্র, রমাই ঠাকুর, যদুনন্দন, গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্র, শ্রীদাস, গোকুলানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মহা ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোবিন্দচক্রবর্ত্তী তাহাতে বিভোর হইয়া একেবারে আত্মহারা হইলেন। সমস্ত ভক্তগণ তাহার প্রেম ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভাবুক চক্রবর্ত্তী নামকরণ করিলেন। কয়েকদিন গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী থাকিয়া সকলে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই নানাপ্রকার—সামগ্রী দিয়াছিলেন। *

গোবিন্দ কবিরাজ—ইহাঁর বাড়ী প্রথম ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কুমার নগরে ছিল। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন ও মাতার নাম সুনন্দা। এই কুমার নগরে অনেক বৈষ্ণবের মনোরম বসতিছিল। গোবিন্দ এখান হইতে তেলিয়া বুধুরি গ্রামে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা দুই ভাই ছিলেন,—রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দ কবিরাজ। চিরঞ্জীবসেন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত দামোদর কবিরাজ চিরঞ্জীব সেনের সহিত তাঁহার পরমারূপবতী কন্যার বিবাহ দিলেন। একদা দামোদর কবিরাজ একজন অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী নাস্তিককে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাভব করায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন যে, তুই অপুত্রক হইবি। কিন্তু দামোদর কবিরাজ এবং তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করাতে অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহাদিগকে এই বর প্রদান করিলেন যে,

* বোরাকুলি গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। এখানে যাইতে হইলে বহরমপুর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে হয়। এবং মহুলিয়া গ্রাম বহরমপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। বুধুরী গ্রাম পদ্মা বা বড় গঙ্গার তীরবর্ত্তী। বিঃ সং

তোমরা অচিরাৎ একটী কন্যা রত্ন লাভ করিবে, সেই পরমারূপবতী কন্যার গর্ভে দুইটী ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিবে, সেই দুই পুত্র উপবাক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দ কবিরাজ। রামচন্দ্র কবিরাজকে প্রসব করিবার সময় তাঁহার জননীর কোনও কষ্ট হয় নাই, কিন্তু গোবিন্দকে প্রসব করিবার সময় তাঁহার মাতা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এমন সময় একজন দাসী তাঁহার পিতা দামোদর কবিরাজের নিকট অবগত করাইলেন। দামোদর কবিরাজ তখন আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজায় নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই কোন° কথা না বলিয়া দাসীকে উক্ত যন্ত্রের চরণামৃত খাওয়াইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন। কিন্তু দাসী তাহা বুঝিতে না পারিয়া যন্ত্র ধৌত করিয়া জল নিয়া খাওয়াইলেই, গোবিন্দ কবিরাজ ভূমিষ্ঠ হইলেন। দামোদর কবিরাজ আদ্যাশক্তির পূজা সমাপন করতঃ নবপ্রসূত দৌহিত্রের বদন কমল দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। চিরঞ্জীবসেন বিবাহের পর হইতেই সপরিবারে শ্বশুরাশ্রমে বাস করিতে ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার বিবাহের পর সস্ত্রীক যাজী গ্রাম দিয়া তেলিয়া বুধুরিগ্রামে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক রামচন্দ্র কবিরাজ এবং তাঁহার স্ত্রী রত্নমালা আকর্ষিত হইলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে আলয়ে আসিয়া সমস্ত রজনী একমনে ভাবিতে লাগিলেন। তারপর উভয়েই আসিয়া শ্রীনিবাসের চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহার শিষ্য হইলেন। গোবিন্দ কবিরাজ সেই সময়ে শক্তির উপাসক ছিলেন। একদা অত্যন্ত গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া দয়াময়ী ঈশ্বরী আদ্যাশক্তিকে ডাকিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরী তাঁহাকে সাক্ষাৎরূপে দেখা না দিয়া অলক্ষিতভাবে গোবিন্দকে বলিলেনঃ—

"গোবিন্দ শরণকর, পরিত্রাণ দাতা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥—প্রেমবিলাস।
"আকাশ বাণীতে দেবী, কহে বার বার।
গোবিন্দ শরণ কর পাইবে নিস্তার॥—ভক্তমাল।
"হেন কালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥—ভক্তিরত্নাকর।

এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ দ্বারা পত্র লেখাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া ভ্রাতার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে সমস্ত

অবগত করাইলেন। প্রভু ভক্তমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ভক্তাধীন শ্রীআচার্য্য প্রভু গোবিন্দকে কৃপা করিবার নিমিত্ত বুধুরি গ্রামে গমন করিলেন।

প্রভুর দর্শন মাত্রেই গোবিন্দ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পশ্চাৎ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরক্ষর মহামন্ত্র গ্রহণ আর শ্রীআচার্য্যের ভুক্তাবিশিষ্ট প্রাসাদান্ন ভোজন করিয়া উৎকট পীড়া হইতে একেবারে মুক্ত হন। তিনি রাজা সন্তোষ দত্তের অনুমত্যনুসারে সঙ্গীত মাধব নাটক বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাতে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সন্তোষ দত্ত তাহা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। রাজা হরিনারায়ণ তাঁহার অভীষ্ট দেবতা শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণন করিতে গোবিন্দকে বলিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামচন্দ্রের গীত বর্ণনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ শ্রীগীতামৃত গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনধামে পাঠাইয়া দেন। শ্রীজীবগোস্বামী এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামী এবং অন্যান্য গোস্বামীরা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে "কবিরাজ" পদবী দেন। এই প্রকারে রামচন্দ্রও বৃন্দাবনধামে "কবিরাজ" উপাধি প্রাপ্ত হন। গোবিন্দ নিজ গুরুদেবের কৃপায় সেই উৎকট গ্রহণী রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া, আরও ৩৬ বৎসর জীবিত থাকিয়া ইহলোকে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রোগ হইতে মুক্ত হন। গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭৬ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৫৩৫ শকে কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদে অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ কখনও কখনও পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের সভায় উপস্থিত হইয়া পদ পদাবলীর রচনা সম্বন্ধে আড়াআড়ি করিতেন। আবার যশোহরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপাদিত্যের সভায় গমন করেন, তাঁহার খুল্লতাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ও আর এক জন ব্রাহ্মণ পদকর্ত্তা বসন্ত রায়ের সহিত পদাবলি রচনায় যুদ্ধ করিতেন। এই উভয়ে শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

গোবিন্দ কবিরাজের স্ত্রী অত্যন্ত সাধ্বী এবং পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার নাম মহামায়া। তিনিও শ্রীনিবাসাচার্য্যের মহামন্ত্রে দীক্ষীত হন। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ইনি পরম ভক্ত এবং বৈষ্ণব শিরোমণি হইয়াছিলেন। একদা প্রভু নিত্যানন্দের পতিব্রতা সাধ্বী রমণী শ্রীজাহ্নবাদেবী গোবিন্দ দাসের সুমধুর পদ পদাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট গোবিন্দ কবিরাজ সহ বৃন্দাবনধামে গমন করিবেন

এই রূপ ইহা প্রকাশ করিলেন। জাহ্নবাদেবী গোবিন্দ সহ বৃন্দাবনধাম যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে কতকগুলি ঘোর পাপাসক্ত পাষণ্ড মনুষ্য জাহ্নবাদেবীকে অত্যন্ত পরিহাস করিতে লাগিল। তাহাতে পতিব্রতা সাধ্বী জাহ্নবা দেবীর মনে গুরুতর আঘাত লাগিল। সাধ্বী রমণীর মনোবেদনায় ভগবতী চণ্ডী অত্যন্ত মনঃকষ্ট প্রাপ্ত হইলেন। এবং রজনীযোগে ভীষণ করাল বদনী ভয়াবহ রূপ ধারণ করতঃ পাপীষ্ঠদিগকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে "রে নির্ব্বোধ পশু, তোরা পতিব্রতা জাহ্নবাদেবীর চরণ কমল ধারণ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি যদি তোদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোদের পরম সৌভাগ্য নচেৎ তোদের আর নিস্তার নাই" ইহা বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে ভীষণ অসি কম্পিত করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডের দল ঐ প্রকার ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইল তার পরদিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া তাহারা জাহ্নবাদেবীর চরণ প্রান্তে পতিত হইল। এবং জাহ্নবাদেবী তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। আবার আর এক দিন পথিমধ্যে এক দল দস্যু শুনিতে পাইল যে শ্রী শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর নিকট বিপুল ধন আছে। ইহা শুনিয়া দস্যুরাজ পরম আহ্লাদিত হইয়া দস্যুদলকে রজনীযোগে আক্রমণ করিতে বলিয়াছিল। দস্যুরাজ সহ দস্যুদল আক্রমণ প্রত্যাশায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল, জাহ্নবাদেবী যে স্থলে ছিলেন সেই স্থান হইতে যবন-দস্যুদের গৃহ অনতিদূরেই ছিল, কিন্তু দয়াময়ী ভগবতী চণ্ডীর কৃপায় দস্যুদল সমস্তরজনী হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্লান্ত হইল, তথাপি জাহ্নবাদেবীর বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। দস্যুদলের হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইল। এবং বুঝিতে পারিল এই নারী সামান্যা নারী নয়। এই প্রকার মনে করিয়া রজনী প্রভাতে, সমস্ত যবন-দস্যু জাহ্নবাদেবীর সমীপে আসিয়া সমস্ত দুরভিপ্রায় জ্ঞাত করাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বলিল "আমরা অধম পাষণ্ড দস্যু, আমাদের উদ্ধার কর, এবং আমাদের আর যেন কুপথে মতি না যায়।"

জাহ্নবাদেবী বলিলেন "তোমরা দুরভিপ্রায় এবং দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হরিনাম গান এবং হরিসংকীর্ত্তন কর তবেই তোমাদের সমস্ত পাপ দূর হইবে এবং কালে উদ্ধার হইতে পারিবে।" আর একদিন যমুনাতীরে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাহাদের একটী মৃত শিশুতনয় ক্রোড়ে ধারণ করতঃ রোদন করিতেছিলেন। জাহ্নবীদেবী তাহাদের রোদন দেখিয়া আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এবং মৃতশিশু-তনয় স্পর্শ করিবেন এই প্রকার

অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পিতা মাতা মৃত শিশু স্পর্শ করিতে নিবারণ করা সত্বেও বলিলেন "তোমরা ব্রজনরনারী তোমাদের তনয় স্পর্শ করিয়া, আমি ধন্য হই।" এই কথা বলিয়া যাই স্পর্শ করিলেন, অমনি মৃততনয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া জাহ্নবাদেবীকে প্রণাম করিল। জনক জননী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম উল্লাসিত হইলেন এবং ঈশ্বরীকে অশেষ ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। জাহ্নবাদেবী বলিলেন "আমার কিছুই সাধ্য নাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাদের সন্তানকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার নাম-গুণ গান এবং নাম কীর্ত্তন করুন।" এই প্রকার সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করিয়া দেবী গোবিন্দ কবিরাজ সহ বৃন্দাবনধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গোবিন্দ কবিরাজের অমৃতময় কাব্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, যথা—শ্রীজীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, ভূগর্ভ, লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি। এবং গোবিন্দ কবিরাজের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে "বৈষ্ণবকে সর্ব্বদা সম্মান করিবা, তোমার ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে ভক্তিরস আস্বাদন করিবা, শ্রীনিবাসকে একবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিতে বলিবা, তোমার গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা এবং তুমি অন্যান্য যাহা কিছু রচনা করিবে তাহাও পাঠাইয়া দিবা, এবং গোপাল বিরুদাবলী পুস্তক খানি নরোত্তম, রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পড়িতে দিবা। শ্রীবাসের ভবনে যে দিন মহাপ্রভুর অভিষেককার্য্য সমাধা হয়, সে দিন মুকুন্দ সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ খোল বাজাইয়া ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী।

শ্রীবৃন্দাবন দাস।

পার্ষদ বৃন্দাবন দাস একজন প্রাচীন কবি। যাঁহার কবিত্ব বিমল শারদ-জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র, কুন্দ কুসুমের ন্যায় পবিত্র, যূথিকার ন্যায় সুরভি, এবং প্রফুল্ল গোলাপ সুন্দরীর ন্যায় রসভারাক্রান্ত, দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই অবগত হওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক পার্ষদের শ্রীহট্টপ্রদেশে * জন্ম হয়। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্ম স্থানও শ্রীহট্ট। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত;
ভবরোগ-নাশবৈদ্য মুরারি নাম যার। শ্রীহট্ট এসব বৈষ্ণবের অবতার॥"

শ্রীবাসাদির বাল্যচরিত অপরিজ্ঞাত। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে যে ষোলবৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীবাসের জীবনে কৃষ্ণ ভক্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। তৎকাল পর্য্যন্ত তিনি সাধারণ লোকের ন্যায়ই ব্যবহারাসক্ত ছিলেন। একদা তিনি স্বপ্নযোগে জ্ঞাত হইলেন যে, বৎসরেক মাত্র তাঁহার পরমায়ু আছে। † এই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতেই তাঁহার জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শ্রীবাস মৃত্যুভয়ে ভীত হইলেন, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই গঙ্গাতীরে—নবদ্বীপে গমন করিলেন। যাঁহার গৃহে অহোরহ বৃন্দাবনের বংশীধ্বনি উত্থিত হইবে, সেই শ্রীবাসের বিনাশ কোথায়? একবৎসর পূর্ণ হইবার দিনে শ্রীবাসের প্রভুই শ্রীবাসকে রক্ষা করিলেন। ‡

কিন্তু শ্রীবাস গঙ্গা ছাড়িয়া আর শ্রীহট্টে প্রত্যাগমন করিলেন না নবদ্বীপেই থাকিয়া গেলেন। পরে কালক্রমে তাঁহার ভ্রাতা ও পত্নী প্রভৃতি পরিজন-বর্গও নবদ্বীপে গমন করিলেন।

---

* "কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ় ওড়দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥—চৈঃ ভা
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীনিধি তার দুই সহোদর।"—চৈঃ চঃ

† যখন [illegible] অবতার। তখন আমায় ছিল বড় দুরাচার॥
এ ষোড়শ [illegible] হৈল ব্যয়। মত্ত হইয়া ভ্রমি আমি চিত্ত স্থির নয়॥
স্বপ্নেহো কভু কৃষ্ণ [illegible] কীর্ত্তন। না করিলু লোকে বলে এ বড় দুর্জ্জন॥
একদিন অচেতন [illegible] নিদ্রা যাই। পূর্ব্ব জন্ম পুণ্য ফল ধরিল তথাই॥
সকরুণ [illegible] মহাপুরুষ আসিয়া। স্বপ্নহেন আমারে কহিল ডাকদিয়া॥
অয়ে অয়ে নিন্দিত ব্রাহ্মণ দুরাচার। কেবা তবে কহে উপদেশ বাক্য সার।
তভু কহি তোরে দেখি সার্দ্র চিত্ত মোর॥ অতঃপর বর্ষ মাত্র পরমায়ু তোর॥
অতঃপর কৃষ্ণ ভজ সাবধান হইয়া। বৃথা আয়ু ক্ষয় না করিহ মদ পাইয়া।
ইত্যাদি, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (বাঙ্গালা)

‡ নবদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে যেরূপে শ্রীবাসের মৃত্যু ভয় দূর হয়, চন্দ্রোদয় নাটকে তাহা বর্ণিত আছে।

এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীকান্তের (শ্রীপতি) একটী কন্যা জন্মে, ইহার নাম নারায়ণী, এই নারায়ণী শ্রীমহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপাত্রী ছিলেন।

যখন প্রভুর প্রথম প্রকাশ হয়, তখন একটী জনশ্রুতি উঠে যে, গৌড়ের বাদসা ভক্তগণকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। এই সংবাদে ভক্তগণ ভীত হন। ভক্তদের ভয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। তিনি ভক্তদিগকে বলেন যে, ভয় নাই, তাহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আসে, তবে ভালই, কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া যাইবে। এই দেখ আমার আজ্ঞায় জ্ঞানহীনা নারায়ণী কি করে? চৈতন্য ভাগবতে ইহা এইরূপ লিখা আছে :—

রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে। সবা কান্দাইমু [illegible] মতে।
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস তুমি মনে। সাক্ষাতেই সদ্য [illegible] তোমারে।
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি। শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা [illegible] নারায়ণী।
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি। চৈতন্যের অবশেষ [illegible] নারায়ণী।
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গচান্দ। আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কান্দ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত। হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত।
অঙ্গবহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।
হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর। এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর।”

বৈষ্ণবগ্রন্থে “নারায়ণী” নামের পূর্ব্বে আলবাটী এই বিশেষণ পদ দেখিতে পাওয়া যায়। আলবাটী শব্দের অর্থ পিকদানী। কথিত আছে, শ্রীমহাপ্রভু ইহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল খাইতে দিতেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

“আপন গলার মালা দিলা সবাকারে। চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সবারে।”
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান।

আমাদের কবি বৃন্দাবন দাস এই ভাগ্যবতী নারায়ণীর একমাত্র পুত্র। যথা তত্রৈব—

“সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ পাত্র নারায়ণীর গর্ভজাত।”

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য-চরিতামৃত।

কথিত আছে যে, নারায়ণী অল্প বয়সেই বিধবা হন, বৈধব্যাবস্থায় তিনি

স্বীয় মাতুলালয় শ্রীহট্টে গমন করেন, তথায়ই * বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন (১৪২৯ শক-বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশী।)

বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি নারায়ণীকে "পুত্রবতী হও" এই আশীর্ব্বাদ করেন। নারায়ণী বিধবা তিনি এই অসম্ভব আশী-র্ব্বাদের পরিণাম জানাইলে, নিত্যানন্দপ্রভু বলেন, "শ্রীমহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূলের প্রভাবে তোমার কবিশ্রেষ্ঠ এক পুত্র নিশ্চয়ই হইবে, এবং সেই পুত্র হইতেই তোমার কলঙ্কক্ষালিত হইবে। "এই ঘটনারপরই নারায়ণী মাতুলালয় শ্রীহট্টে গমন করেন।

কথিত আছে, বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ব্ভে ছিলেন। নারায়ণীর গর্ব্ভ-লক্ষণ প্রকাশ হইলে তদীয় মাতুলের প্রতিবেশীবর্গ, নারায়ণীর নিন্দা করিতে থাকেন; ইহাতে তদীয় মাতুল উত্যক্ত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে পত্রাযোগে একথা জানাইলে, তিনি প্রভুর কৃপাপ্রসঙ্গ স্মরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাবেশে বলিয়া পাঠাইলেন যে, গর্ব্ভস্থ শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে!! এতদনুসারে প্রশ্ন করা গেলে, সমাগত সম্ভ্রান্তবর্গ যেন গর্ব্ভ হইতেই এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, যেন কে বলিতে লাগিলঃ—

"চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের কৃপাবলে করি গর্ব্ভবাস।

এই অদ্ভুত ঘটনায় সকলেই আশ্চার্য্যান্বিত হন, এবং নারায়ণীকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। এই ঘটনা হইতেই বৃন্দাবন দাস শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ বরপুত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বেদব্যা-সাবতার বলিয়া পরিপূজিত কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ—"বেদব্যাসো যএবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।"

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ।"—চৈঃ চঃ

এই বৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেনঃ—

"ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্যের কীর্ত্তিস্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥"

---

* দ্বিতীয় বর্ষের সজ্জনতোষিণী পত্রিকা।—শ্রীশ্রীকেশব ভারতীবংশীয়, দেনুড়বাসী, শ্রীল অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়, ভক্তকবির জন্ম সম্বন্ধে শ্রীহট্টে যে যে অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

স্থলান্তরে বলিয়াছেনঃ—

"জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন। তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন॥

মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥"—চৈঃ ভাঃ

নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশানুসারেই তিনি ভুবনবিখ্যাত "চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থ ১৪৫৭ শকে রচনা করেন। চৈতন্যভাগবতে তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে

স্থলান্তরে ঐ ভাগবতেঃ—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে। সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥"

অন্যত্র যথা তত্রৈবঃ—

তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি। তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥

কেবল আদেশমাত্র নহে, কোন কোন প্রসঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে বলিয়া দিতেন। যথা চৈতন্যভাগবতেঃ—

"হেনমতে মুরারিগুপ্তের অনুভাব। আমি কি বলিব ব্যক্ত তাঁহার প্রস্তাব॥

নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য। কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন, তিনি অধ্যয়নসুখ স্মরণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছেন।—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।

জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥"—চৈঃ ভাঃ

বৃন্দাবনদাস অনেক সময় প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, সেই আনন্দের স্মারক প্রার্থনা এই—

"জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন। তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ। জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ॥

চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের এই একটী খেদসূচক বাক্য পাওয়া যায়। যথা—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রভু প্রভাবে অশোক।

সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক॥

* * * * *

হইল পাপীষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে। হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥"

এই পদ্যে নবদ্বীপের লীলা দর্শন করেন নাই বলিয়াই তিনি খেদ করিয়া-

ছেন। তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পরই শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন; সুতরাং বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপলীলা দর্শন করেন নাই ইহা যথার্থ। অনেকে উক্ত পদ্যের অর্থান্তর ঘটাইয়া বলেন যে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন নাই। শ্রীল অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরভক্তগণ সহ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। * * এই সঙ্গে বৃন্দাবন দাসও গমন করিতেছিলেন এবং নবদ্বীপ হইতে দেলুড়ে আসিয়া স্নান ভোজনাদি সমাপনান্তে নিত্যানন্দ প্রভু মুখশুদ্ধির জন্য কিছু প্রার্থনা করায় বৃন্দাবন ঠাকুর একটী হরীতকী দিয়া কহিয়াছিলেন যে গত কল্যের একটীমাত্র ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু ইহা শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন 'তুমি সঞ্চয়ী, এই গ্রামে থাকিয়া মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রকাশ ও লীলাবর্ণন কর।" বৃন্দাবনদাস সেই হইতেই নাকি দেলুড়বাসী হন। দেলুড়ে বৃন্দাবনদাসের পাটবাটী অদ্যাপি আছে।

চৈতন্যভাগবতের নাম পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল; চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী দুই বাহু তুলিয়া বৃন্দাবনদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যথা—

"ওরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবা সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিবে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥" ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে চৈতভাগবতে যে সকল কথা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহাই চরিতামৃতে, লিখিত হইয়াছে এবং বৃন্দাবনদাস যে সকল অংশ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থ দেখিলেই ইহা প্রতিপন্ন হয়; কৃষ্ণদাসও স্থানে স্থানে এইরূপ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে। বিস্তারি বর্ণিলেন নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে॥"

অতএব বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যমঙ্গলই চৈতন্যভাগবত নামে পরিচিত। চৈতন্যমঙ্গল নামে তাঁহার কোনও "লুপ্ত" "গ্রন্থ নাই; * এবং কৃষ্ণদাস ঐ ভাগবতের কথাই লিখিয়াছেন।

---

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে চৈতন্যভাগবত ব্যতীত চৈতন্যমঙ্গল নামে বৃন্দাবনদাসের কোনও গ্রন্থ থাকিতে পারে।—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রবন্ধ।

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল—সন্দেহ নাই। তবে ঐ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ আছে কি?—আছে।

শ্রীখণ্ডের লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল নামে অন্য একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া চৈতন্যভাগবত হয়। প্রেমবিলাসে, যথা—

"চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"

যখন চৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হয়, তখন লোচনদাসের "মঙ্গল" বৃন্দাবনে যায় নাই; সুতরাং চরিতামৃতে লোচনদাসের গ্রন্থের উল্লেখমাত্রও নাই; এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের নামও ভাগবতে লিখিত হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাস অতঃপর এ ভ্রম শোধন করেন, তাঁহার জীবনের শেষগ্রন্থ ক্ষুদ্র "স্বরূপ বর্ণনে" লিখিয়াছেন—

"নারায়ণী সুত বলি বৃন্দাবন দাস। শ্রীভাগবত কৈল তেঁহ বেদব্যাস॥"

কৃষ্ণলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে; বৃন্দাবন, লোচন ও কৃষ্ণদাস এই তিনজনের কৃত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে গৌর-লীলা তদ্রূপই দৃষ্ট হয় এবং বৃন্দাবনদাস ব্যাসাবতার; এই উভয় সাদৃশ্য হেতুই, তাঁহার "মঙ্গল" পরে বৃন্দাবনে "ভাগবত" আখ্যা প্রাপ্ত হয়, বিবেচনা করা যাইতে পারে। কৃষ্ণদাসও এ সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন যথা—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥"

ফলতঃ ইহাতে উভয়ের গ্রন্থের পার্থক্যই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই নাম পরিবর্ত্তনের কারণান্তরের কথা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। উল্লেখ অসঙ্গত নহে।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত ছিলেন। লোচনদাস তাঁহারই শিষ্য। চৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর মাধুর্য্যলীলা অতি অপরিস্ফুট রূপে লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অবর্ণিত মাধুর্য্য অংশ গুলি বর্ণনের জন্য তিনি শিষ্য লোচনকে আদেশ দেন। সেই আদেশেই চৈতন্য-মঙ্গল গানের সৃষ্টি হয়। যথা—লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে—

"শ্রীনরহরি দাস দয়াময় দেহে। কি দেখিয়া করে মোরে অবাধ সিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচার। অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমার॥
তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে। এই ভরসায় পুঁথি হইল অবাধে॥

বৈষ্ণব প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ। প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস॥
তার পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ। গৌর গুণ কহিবারে করোঁ অভিলাষ॥

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ প্রকাশ হইয়া গেলেই মাধুর্য্য-রসসিক্ত এই নূতন গ্রন্থ খানি রচিত হয়। লোচন স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের এক স্থানে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে। জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে॥"

গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে; অপেক্ষাকৃত সম্মতজনশ্রুতিটী এই।

লোচন দাস বৃন্দাবন দাসকে আপন গ্রন্থখানি প্রদর্শন করিলেন। বৃন্দাবন গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলেন যে ঐ গ্রন্থে প্রভুর সন্ন্যাস-যাত্রার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সম্ভাষণ প্রসঙ্গ বর্ণীত হইয়াছে; বৃন্দাবনদাস এই কথাটী অযুক্ত বোধে অগ্রাহ্য করেন। ঐ সময় নারায়ণী দেবী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন যে, লোচনের বর্ণনা মিথ্যা নহে। সহচরীগণ দেবীকে শয়নগৃহে পাঠাইয়া দিলে, পরে তাঁহাদের সহিত তিনি স্বয়ং বহির্ভাগে থাকিয়া এ বর্ণনার যথার্থ প্রত্যক্ষ করেন। জননীর সাক্ষাৎ বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লোচনকে বিশেষ রূপে আপ্যায়িত করেন। এতদনুসারে বলিতে হইবে যে, লোচন দাস এঘটনার পরই চৈতন্যমঙ্গলের বন্দনায় ভাগবতের উল্লেখ করেন "বৃন্দাবনের মহাগুণে এই সকল বিষয় ইহার পরে জানিতে পারিয়াই, নাম পরিবর্ত্তন ঘটনা অনুমোদন করিয়া থাকিবেন। এই হইতেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রন্থখানি চৈতন্যভাগবত নামেই সাধারণের পরিচিত হইয়া থাকিবে। লোক-নাথ গোস্বামী কৃত সীতাচরিত্র গ্রন্থে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম চৈতন্য-ভাগবতই লিখিত হইয়াছে। যথা :—

"চৈতন্যভাগবতে আছয়ে বর্ণন। বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন॥

অনুরাগ বল্লী গ্রন্থে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল ও চৈতান্যচরিতামৃত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই লিখিত আছে :—

তাঁহার অনন্ত লীলা দাস বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে করিলা বর্ণন॥
ইহাঁর সূত্রধৃত যে রহিল অবশেষ। ঠাকুর লোচন তাহা কহিল বিশেষ॥
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রসময়। সংগীতরূপে ব্যক্তকৈল আপন আশয়॥
এ দোঁহে যে ভাগ যাহা না কৈল বিস্তার। বিশদ করিয়া তাহা করিল প্রচার॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর গ্রন্থ হয়॥
এসব পুস্তক পৃথিবীতে হৈল খ্যাত। মূর্খেও জানিল গূঢ় চৈতন্য সিদ্ধান্ত॥

বৃন্দাবনদাস দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, খেতরীর শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের বিগ্রহ স্থাপনোৎসব পরবর্ত্তী কালের একটী প্রধান ঘটনা, নিত্যানন্দ প্রভুর অপরাপর পার্ষদগণ সহ বৃন্দাবনদাসও ঐ উৎসবে জাহ্নবাদেবীর অনুগমন করিয়া ছিলেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। যথাঃ—

"শ্রীপরমেশ্বরী দাস, বলরাম বিজবর॥
শ্রীমুকুন্দ দাস বৃন্দাবন আদি করি।
এ সবা সহিত সুখে চলয়ে ঈশ্বরী॥ ভক্তি রত্নাকর।

একটী পদে বৃন্দাবন দাস আপন বন্ধুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ—

"রায় রঘুপতি, বল্লভ সঙ্গতি,
বৃন্দাবন দাস ভাবই॥"—পদকল্পতরু।

বৃন্দাবনদাসের আরও তিনজন ভক্তের নাম এই কবিতার্দ্ধে পাওয়া যায় ঃ—

"প্রিয়ভক্ত নরহরি, শচীদেবী আদি করি,
গোপীনাথে ধরি দেন কোল।'

চৈতন্যভাগবত রচনা না করিলেও বৃন্দাবন দাস একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন, তৎকৃত সুমধুর পদাবলীতে তাঁহার অসাধারাণ কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদকল্পতরুতে তাঁহার প্রায় ৩০টী পদ আছে।

বৃন্দাবন দাস ১৪৫৯ শকে নিত্যানন্দের বংশবিস্তার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষা প্রভৃতি সমস্তই চৈতন্যভাগবতের ছাঁচে ঢালা এবং পরবর্ত্তী বিবরণই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টরূপে গণ্য করা হয়, ইহা বড় অসঙ্গত নহে। শুনা যায়, চৈতন্যলীলামৃত নামে বৃন্দাবন দাসের আর একখানি গ্রন্থ আছে। ভক্তিচিন্তামণি নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের কি না, তাহা বিচার সাপেক্ষ। বৃন্দাবনের নামে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, সে সকল আধুনিক এবং অসম্প্রদায়ী লোক কর্ত্তৃক রচিত। গত কার্ত্তিক সংখ্যা শ্রীপত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে বৃন্দাবনদাস একখানি "বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থও রচনা করেন। *

* শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরমহাশয়-কৃত বাঙ্গালা পদ্যে অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব এবং সংস্কৃতে শ্রীনিত্যানন্দের ঐশ্বর্য্যামৃত স্তোত্র গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে ইহাও শুনা যায়। বিঃ সং।

বৃন্দাবনদাস অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দাকরে।

তবে লাথি মারো তার শীরের উপরে।—ভাগবত।

ইত্যাদি বাক্য কি দৃঢ়তা ও তেজোব্যঞ্জক! বৃন্দাবনদাসের একনিষ্ঠ ভক্তির কথা বলিতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র।

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥

ইত্যাদি বাক্য কি সুন্দর—কি সুন্দর!

বৃন্দাবনদাস জাহ্নবা দেবীর সহিত বৃন্দাবন গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা অবগত হওয়া যায় না। বৃন্দাবন ধামেই (১৫১১ শকে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে) দেহত্যাগ করেন।

বৃন্দাবনদাস কৃত নিত্যানন্দাষ্টক হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিলাম। শ্লোক:—

শশিত সুন্দর বদন মণ্ডল বিকচনীরজ নিন্দিতং

রজত কলেবর চারুসুন্দর অখিল লোচন রঞ্জিতং।

এদিন যামিনী আবেশে অবশ পুরব বৈভব চিন্তিতং,

জয়তি জয় যদু-জাহ্নবাপ্রিয় দেহি মে পদপাঙ্কিকং॥

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি। শ্রীহট্ট।

বৈষ্ণব রাজ-পরিবার।

বনয়ারি-আবাদের মহারাজা শ্রীযুক্ত বনয়ারি গোবিন্দদেব দানীশমন্দ বাহাদুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইনি মহারাজ আজ-মোদ্দৌলা আমীরোলমুলক জগদিন্দ্র দানীশমন্দ নিত্যানন্দদেব বাহাদুরের মধ্যম পুত্র। এজন্য ইহাঁকে সকলে মধ্যম হুজুর বলিত। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহারাজা জগদিন্দ্র বনয়ারিলাল দেব বাহাদুর ও কনিষ্ঠের নাম মহারাজা আজমোদ্দৌলা বনয়ারি কিশোর দেব বাহাদুর। ইহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের নাম শ্রীদামদাস এই শ্রীদাম দাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র নিত্যানন্দ দাস ইংরাজী ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সাহা আলম কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হই-য়াছিলেন। রাজধানীতে যে অব্দ প্রচলিত আছে তাহার নাম দানীশাব্দা একণে ইহার সংখ্যা ১৪৮ অতএব ইহাঁরা এই ১৪৮ বৎসর কাল মহারাজোপাধিতে

ভূষিত হইয়াছেন ই ারা বংশ পরম্পরা সকলেই পরম বৈষ্ণব হইলেও মধ্যম হুজুর মহাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় বর্ত্তমান কালে নিশ্চিন্ত মনে ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। এমন কি ইনি রাজা ভরতের ন্যায় রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী উপবনে বাস করিতেন, তখন তিনি কেবল বৈষ্ণববর্গপরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথালাপে কালযাপন করিতেন। এই অলৌকিক কর্ম্ম দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া কিরূপে কৃষ্ণভজন করিতে হয় তাহা তিনি জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

উদাসীন বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিয়া কৃষ্ণকথালাপে পরিতৃপ্ত হইতেন। সাধারণ বৈষ্ণব-বাবাজীগণ তাঁহার নিকটে কোন দ্রব্যাদি লাভের জন্য আবদার করিতেন, কিন্তু কেহই ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিগমন করিতেন না, কেহ লুই (শীতবস্ত্র) কেহ কম্বল কেহবা বাটলুই-লোটা প্রভৃতি লইয়া যাইতেন। কিন্তু মহাপ্রভুর এমন ইচ্ছা নহে যে এমন মহত্ত্বাবাপন্ন ব্যক্তি ভক্তগণের পরমাশ্রয় মহারাজ বনয়ারি গোবিন্দ উদাসীন হইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন।

বিগত বাঙ্গালা ১২৬১ সালে জ্যেষ্ঠ মহারাজ এবং ১২৭০ সালে কনিষ্ঠ মহারাজ মধ্যম মহারাজকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। সুতরাং মধ্যম হুজুরেরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, তিনি শ্রীবনয়ারি জীউর সেবা পরিচালনের জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই রাজ ভবনে শ্রীমূর্ত্তি সেবার বড়ই পারিপাট্য। এক স্থানে এত শ্রীমূর্ত্তিসেবা অন্য কোন রাজধানীতে আছে কিনা তাহা সন্দেহ স্থল, এই জন্য এখানে একটী শ্রীমূর্ত্তির তালিকা প্রদত্ত হইল। এই তালিকা পাঠ করিলেই পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত মহারাজবর্গের বৈষ্ণবতার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পৈতৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি—যাহা দানীশমন্দ বাহাদুরের পিতা-পিতামহ প্রভৃতি দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিলেন।—

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ, শ্রীলাড়লীজীউ, শ্রীলাডলীজীউ, শ্রীবালগোপালজীউ, শ্রীরঘুনাথজীউ-শালগ্রাম, শ্রীরাধাদামোদর-শালগ্রাম, এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শালগ্রাম।

মহারাজ আজমোদ্দৌলা আমীরোলমুলক জগদিন্দ্র দানীশমন্দ শ্রীনিত্যানন্দ দেব বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি।

শ্রীবনয়ারিজীউ ও কিশোরীজীউ। শ্রীগৌরগোপালজীউ, শ্রীললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী ও বলরংজী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শালগ্রাম, শ্রীশ্রীধর শালগ্রাম দুই শ্রীমূর্ত্তি। আরও ইনি ছয় মূর্ত্তি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যথা—শ্রীগোপেশ্বর, শ্রীলম্বোদরেশ্বর, শ্রীওঙ্কারনাথ, শ্রীচক্রেশ্বর, শ্রীকুমুদেশ্বর এবং শ্রীরাজভুবনেশ্বর।

ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ জগদিন্দ্র বনয়াবিলালদেব বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি।

শ্রীজানকীবল্লভ বৈদেহী, শ্রীলালগোপাল, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীদেবপ্রস্থ, শ্রীগিরিলাল, শ্রীগিরিধারী, শ্রীশ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, রক্তক, বসন্তক, মণ্ডলীভদ্র, মধুমঙ্গল, শ্রীগন্ধদেব ও শ্রীকৃষ্ণবলরাম। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শালগ্রাম, শ্রীঅনন্তদেব শালগ্রাম, শ্রীকৃষ্ণক্রমাঙ্ক (শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, ইহা শ্রীব্রজমণ্ডলের চরণ পাহাড়ি হইতে আনীত।) শ্রীবাসুদেবপদাঙ্ক, দ্বিতীয় শ্রীদেবপ্রস্থ। শ্রীশ্রীধর শালগ্রাম, শ্রীনিতাই চৈতন্য। শ্রীগিরিধারী অর্থাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা চতুষ্টয়। দ্বিতীয় শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শালগ্রাম, শ্রীসূর্য্যনারায়ণদেব, শ্রীগণেশদেব, এবং শ্রীরত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ, (এই মূর্ত্তি উদ্ধারণপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন)। প্রতিষ্ঠিত চিত্রপট যথা—শ্রীরাধামাধবজীউ, শ্রীআলবোলিজীউ, শ্রীগন্ধর্ব্বজীউ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। ভক্তবৃন্দ যথা—শ্রীবিষ্বক্সেন, শ্রীনারদ, শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীমণিগ্রীব, শ্রীনলকুবর, শ্রীহেমাঙ্গ, শ্রীখগেশ্বর, শ্রীবিষ্ণুরথ, শ্রীসুপর্ণ, শ্রীবজ্রাঙ্গ, শ্রীমহাবলী এবং শ্রীঋক্ষরাজ।

কনিষ্ঠ মহারাজা আজমোদ্দৌলা শ্রীবনয়ারিকিশোরদেব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকিশোরবনয়ারিজীউ এবং শ্রীব্রজসুন্দরীজীউ। আরও কতক গুলি শ্রীমূর্ত্তি ক্রীত জমীদারী হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তাহার তালিকা—শ্রীগোপীনাথজীউ যুগল মূর্ত্তি, শ্রীশ্যামসুন্দরজীউ যুগল মূর্ত্তি, দ্বিতীয় শ্রীগোপীনাথজীউ যুগল মূর্ত্তি, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ শালগ্রাম, শ্রীশ্রীধরজীউ শালগ্রাম, এবং দ্বিতীয় শ্রীশ্রীধরজীউ শালগ্রাম।

মধ্যম হুজুর বাহাদুর এই সকল পরিবার পালনের এক মাত্র অধিকারী সুতরাং তাঁহার সংসার ত্যাগ করা কঠিন হইল, প্রাচীন নিয়মানুসারে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা কার্য্যেও পরিণত হইল, কিন্তু

গৃহীতদত্তক শ্রীকৃষ্ণসেবার অযোগ্য বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক মধ্যম হুজুরের চরমকাল উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে নিত্যসেবায় নিয়োজিত হইলেন। পরে শ্রীমতী মহারাণী যখন মায়াময় সংসার অসার বলিয়া পরিত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বগৃহীত দত্তক পুত্রের উপযুক্ত পুত্র শ্রীল মহারাজকুমার বনয়ারিমুকুন্দদেব বাহাদুরের হস্তে স্বরাজ্য ন্যস্ত করিলেন।

আমরা এই কুমার বাহাদুরকে দর্শন করিয়াছি এবং ইঁহার সঙ্গে বাক্যালাপও করিয়াছি, ইঁহাকে দর্শন করিলে যেরূপ নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধিত হয়, বাক্যালাপে তাহা অপেক্ষা আরও সুখানুভব হইয়া থাকে। ইঁহার শরীরে তমো বা রজো গুণের লেশ মাত্রও নাই কেবল মাত্র সত্বগুণের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুমার বাহাদুর অতুলধনের অধিপতি হইয়াও সাধারণের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন, শ্রীমূর্ত্তিগণের সেবা এবং অতিথী সেবা প্রভৃতি পরিদর্শন করাই ইঁহার প্রধান রাজকার্য্য। মহারাজকুমারের পাত্রমিত্রগণও তদনুরূপ ভক্তিমান্। এই রাজপরিবারের উচ্চ কর্ম্মচারী হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীমালা-তিলক ধারণ করেন এবং প্রায় সকলেই সংখ্যা পূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজকুমারের বয়ঃক্রম চতুর্বিংশতি বর্ষ মাত্র ইনি এই অল্প বয়সেই যেরূপ পৈতৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ইহাতে বোধহয় ইনি ভবিষ্যতে এক জন পরম বৈষ্ণবরাজ রূপে পরিচিত হইবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে মহারাজকুমারের আমাত্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু বনয়ারি গোপাল মজুমদার মহাশয়ের সদ্ব্যবহারে সকল বৈষ্ণবগণই আপ্যায়িত হইয়া থাকেন, ইঁহার ন্যায় সদাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী কর্ম্মচারিগণই বৈষ্ণব-রাজসংসারের ভূষণ স্বরূপ।

পরিব্রাজকস্য।

গোকুলানন্দের ইতিবৃত্ত।

১। মহাপ্রভু চৈতন্যের সম-সাময়িক অর্থাৎ তাঁহার নীলাচল গমনের পর শান্তিপুরের প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রমে গোকুলানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, উক্ত আচার্য্যের নিকট, অধ্যয়ন ও প্রেম ভক্তি শিক্ষা করেন। তৎকালে আচার্য্য যে সকল শিষ্যমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাহার মধ্যে

৯ জন শিষ্য প্রধান ছিলেন, ঐ ৯জনের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবিত, গোকুলানন্দ এবং আচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ দুইজন। উক্ত ৯জন শিষ্য মন্ত্র-সিদ্ধ ছিলেন, তন্মধ্যে গোকুলানন্দের কতকগুলি অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আচার্য্য বর্ত্তমানে, তাঁহার পুত্র অচ্যুতানন্দের মৃত্যু হওয়ায়, ঐ গোকুলানন্দ তাঁহার পুত্র স্থানীয় হয়েন, পরে আচার্য্যের অপ্রকটের পর তদুত্তরাধিকারীগণ আচার্য্যের শিষ্যবর্গকে বিদায় দেওয়ায় সমস্ত শিষ্যবর্গ যাহার যথায় ইচ্ছা, তিনি তথায় গমন করেন। তন্মধ্যে আমাদের প্রস্তাবিত গোকুলানন্দ ঠাকুর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, অগ্রে বহেরা গ্রামে কয়েকদিন থাকিয় তৎপরে দেবহাট্টার নিম্নে যে ইচ্ছামতী নদী ছিল, (এখন ঃ আছে) যাহার পশ্চিমপারকে যমুনা বলে। ঐ ইচ্ছামতীর পশ্চিম পারে, সামান্য বনমধ্যে এক গোপের বাটী ছিল, সেই গোপের বাটীতে অতীথি হয়েন। তৎকালে দেবহাট্টা বনভূমি ছিল, অবশ্যই ঐ বনভূমির নাম দেবহাট্টা ছিল না, ঐ স্থানের উত্তরাংশকে বাঙ্গালীপুর বলিত, ঐ বাঙ্গালীপুর নাম যে সময় হউক না কেন, ঐ বনভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানে উহার কিছুকাল পরে যে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল, কতকগুলি অবস্থা দ্বারা তাহা প্রমাণ পাওয়া যায়।

২। যে গোপের বাটীতে গোকুলানন্দ অতীথি হয়েন, জনপ্রবাদ এইরূপ আছে যে, সেই গোপ গাঁজার ব্যবসা করিত, ঐ গাঁজা উক্ত গোপের যে ঘরে মজুত ছিল, সেই ঘরে গোকুলানন্দ শয়ন করিয়াছিলেন, রাত্রিকালে তিনি সমস্ত গাঁজা সেবন করায়, ঐ গোপ, অতীথি গোকুলানন্দকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া পীড়ন করে, তাহাতে গোকুলানন্দ যোগবলে উক্ত গাঁজার মূল্যের অতিরিক্ত ধনরাশি গোপকে প্রদান করেন অর্থাৎ গোপ কর্তৃক অপমানিত, উৎপীড়িত এবং বিপন্ন হইয়া যমুনার নিকট অর্থকামনা করায়, তাঁহার যোগবলে ঐ যমুনানদী হইতে একটী ঢেউ উত্থিত হইয়া তৎসহ ধনরাশি উত্থিত হয়, গোকুলানন্দ ঠাকুর ঐ ধনরাশি গোপকে দিয়া, ঐ নদী পদব্রজে পার হয়েন, এবং ইছামতীর পূর্ব্বতীরে (যথায় পরে শ্রীপাট স্থাপিত হয় তথায়, উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার অভীষ্টদেব শালগ্রামশীলা ঐ ইছামতীর তীরস্থ বনভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তথায় ধ্যানযোগে মগ্ন হয়েন। এদিকে পূর্ব্বোক্ত গোপ তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিয়া, অর্থ লওয়ায়, তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহ প্রজ্জলিত হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই অলৌকিক ব্যাপার কিছুকাল পরে নিকটবর্ত্তী জন-

সমাজে প্রকাশিত হওয়ায়, ঐ গোকুলানন্দ ঠাকুরের দেবত্ব আরোপিত হয়।

তৎপরে ঐ বনভূমির দূরবাসী জনগণও ঐ বনভূমিতে তাঁহার অধিষ্ঠান জানিয়া ক্রমে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় গোকুলানন্দের সেবার নিমিত্ত কয়েকটী সন্ন্যাসী চেলা উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করে, ঐ স্থান সিদ্ধ যোগীর আশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়ায় কালক্রমে তাঁহার আশ্রম নির্ম্মিত এবং ঐ আশ্রম একটী মঠে পরিণত হয়। যোগীর মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র ঘোষিত হওয়ায়, ঐ স্থানে বহু লোকের সমাগম হইতে থাকে, এবং ঐ স্থান একটী হাটে পরিণত হওয়ায় ঐ হাট দেবের হাট বলিয়া বিখ্যাত হয় ঐ দেবের হাট হইতে ঐ স্থানটীর নাম দেবহাট' হইয়াছে।

৩। গৌড়ের বাদসাহ সৈয়দ হোসেন সাহার রাজত্বকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে ইংরাজী ১৪৮৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভূমিষ্ঠ হয়েন, এবং ১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসে ইংরাজী ১৫০৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, নীলাচলে গমন করেন, মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর ছিল, তৎপরে আরও ২৪ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়া ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন, মহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্প পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকট হয়, এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে গোকুলানন্দ ঠাকুর সম্ভবতঃ ১৫৪০ খৃঃ (কি দুই এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ) দেবহাটার বনভূমিতে আগমন করিয়া তথায় অবস্থিত হইয়াছিলেন।

৪। গোকুলানন্দের প্রথম অবস্থানের অন্যূন ৬০ বৎসর, পরে ঐ স্থানে দেবের হাট স্থাপিত হয়, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে যে ঐ হাট স্থাপিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি নির্ণয় করিতে পারিনাই। বোধ হয় গোকুলানন্দের সমাধির কিছুকাল পরে ঐ হাট স্থাপিত হয়. সম্ভবত ১৫৮০ খৃঃ নিকটবর্ত্তী কোন সময় গোকুলানন্দের সমাধি হয়, এবং তাঁহার কোন সন্ন্যাসী শিষ্য কর্ত্তৃক মৃত্তিকায় সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাঁহার সমাধির কিছুকাল পরে প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক যে ঐ বনভূমি বাসোপযোগী এবং তথায় ঐ হাট স্থাপিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কতকগুলি অবস্থাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, প্রতাপাদিত্যের সময় ঐ স্থানটী যে তাঁহার কোন আত্মীয়ের অধি-

কার ভুক্ত হয়, এবং সেই সময় গ্রামটী সম্ভবতঃ মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ লোকের আবাস ভূমি হইয়াছিল, দীর্ঘিকার ন্যায় দুইটী পুষ্করিণীই তাহার প্রমাণ। যাহা হউক প্রতাপাদিত্যের ধ্বংশের পর উক্ত দেবহাটে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ যে পুনঃ জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল এবং বর্গীয় হাঙ্গামেরসময় কলিকাতা ও হুগলির নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কি (মহাশয়দিগের জ্ঞাতি) পুরাতন চোধুরী মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের দান প্রাপ্তমতে যে ঐ বনভূমি পরিস্কার করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের এবং গ্রামস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের নামীয় সনন্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়, ঐ সময় উক্ত বনমধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী বাহির হয় ঐ পুষ্করিণী দেবখাত বলিয়া বিখ্যাত, অতএব যেমন গোকুলনন্দের হাট স্থাপিত হওয়ায় ঐ হাটের নাম দেবহাট হয়, সেইরূপ পুষ্করিণী দুইটীও দেবোদ্দেশে খনিত হওয়ায় অথবা বনমধ্যে পুষ্করিণী প্রাপ্ত হওয়া প্রযুক্ত উহা মনুষ্য কৃত নহে, প্রাচীনগণের এইরূপ বিশ্বাস হওয়ায় উহা দেবখাত বলিয়া বিখ্যাত আছে অনুমান হয়।

উক্ত গোকুলানন্দের সমাধির পর তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য যিনি ঐ স্থান অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য উক্ত মঠের অধিকারী হয়েন, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বর্গীয় হাঙ্গামের সময় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি দেবহাট্টা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন বৈষ্ণব (বর্ত্তমান অধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ) ঐ মঠের তৎকালের মহান্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করায় উক্ত মহান্তের তীরোধানের পর সম্ভবতঃ ১৭৬০। ১৭৬৫খৃঃ বর্ত্তমান দীননাথ অধিকারীর প্রমাতামহ মৃত কৃষ্ণকিঙ্কর অধিকারীর পিতামহ উক্ত মঠ প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর বর্ত্তমান মঠা স্বামীর মাতামহ শ্যামচাঁদ অধিকারীর পিতা ছিলেন। সেই হইতে সন্ন্যাসী শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে মঠের অধিকার প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে গৃহীশিষ্য স্থাপিত এবং তাঁহার বংশানুক্রমে ঐ মঠ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ঐ মঠের নামই ৺গোকুলানন্দের শ্রীপাঠ। ঐ শ্রীপাঠস্থ মদন মোহন ঠাকুর উক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর অধিকারীর বা তাঁহার পিতার আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং কৃষ্ণকিঙ্করের সময় উক্ত শ্রীপাটে প্রাসাদ নির্ম্মিত এবং মদনমোহন ঠাকুরের রাসলীলা আরম্ভ হয়, উক্ত প্রাসাদ উনবিংশ শতাব্দির প্রথমে যখন দেবহাট্টা নিমক

মহালের কুটী স্থাপিত হয়, সেই সময় উক্ত কুটীর কোন প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারীর ব্যয়ে উক্ত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা শ্রুত হওয়া যায়, (কিন্তু উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমি অবগত নহি, বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত হইয়া এবং কতকগুলি অবস্থা দৃষ্টি করিয়া ও জন প্রবাদ অবলম্বন করিয়া যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা লিখিলাম, এইরূপ বিশেষ অনুসন্ধানে থাকিলাম যদি উহার বিশেষ বৃত্তান্ত ও ঘটনা-নিচয় অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে পরে বিশদ ভাবে লিখিব)

দেবহাট্টা যে পূর্ব্বে নিবিড় বন ছিল তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই যে আমার একটী পুষ্করিণী যাহা আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ১১৬০। ১১৬১ সালে খনন করিয়াছিলেন, ঐ পুষ্করিণী ১২১১ সালে একবার পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল, ঐ পুষ্করিণী বোদে পূরিয়া ৬।৭ হাত মাত্র গভীরছিল, তাহার নিম্নে ৩। ৪ হাত বোদ জন্মিয়াছিল, গতবৎসর আমি স্বরিকংশ খরিদ করিয়া ঐ পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। ঐ পুষ্করিণীর সমতল ভূমি হইত ১৬ হাত নিম্নে ২।৩ হাত অন্তর প্রায় ৩০। ৩৫ টা বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর গাছের গোড়া (যাহা করাত দিয়া কাটিয়া লইয়াছেন) প্রাপ্ত হওয়ায়—ঐ গোড়া কাটা স্থান হইতে নিম্নে ২ হাত ২॥ হাত বৃহৎ মূল দেখা যাওয়ায় এবং সেই স্থানে কয়েকটী বাঘ মারা লোহার বড় বড় ফালা প্রাপ্ত হওয়ায় বোধহয় অবশ্যই প্রথম পুষ্করিণী খননের সময় বা দ্বিতীয় পঙ্কোদ্ধারের সময় ঐ সুন্দর গাছের গোড়া বাহির হয় নাই। ঐ পুষ্করিণীর পাড়ে কয়েকটী বৃহৎ তাল গাছ ছিল তাহার মূল সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৪ হাত নিম্নে আছে ঐ তাল গাছ অবশ্যই পুষ্করিণী প্রথম খননের সময় রোপিত হয়, যদি তাহাই হয় তবে ১৪০ বৎসরে ৪হাত মাটী পূরিয়াছে যদি ১৪০ বৎসরে ৪ হাত মাটী পূরিয়া থাকে তবে ১৮ হাত মাটী পূরিতে ৬৩০ বৎসর লাগিয়াছে সুতরাং ঐ সুন্দর গাছের মূল ১৮ হাত মাটীর নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া যায় সে মতে ৬০০। ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যে ঐ স্থান নিবিড় সুন্দর বনাচ্ছন্ন ছিল তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল। দেবহাট্টা।

---

* এই প্রবন্ধটী আমরা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীগোকুলানন্দের শ্রীপাট দেবহাট্টা গ্রাম তাঁহারই অধিকারে অবস্থিত। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীঅদ্বৈত

মুকুন্দমালা।

কুলশেখর কৃত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(১০)

মাভৈ র্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রবদন্তি পাপরিপবঃ স্বামী নমু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণম্
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ॥

উপদেশ শুন মোর রে অবোধ মন! যম-যন্ত্রণার চিন্তা দাও বিসর্জ্জন।
বলিতে না চায় কভু পাপ রিপুগণ। অনাথ শরণ সেই দেব নারায়ণ।
সহজে মিলেন যিনি, ভক্তি যদি রয়। আলস্য ত্যজিয়া তাঁর লও রে আশ্রয়॥
পরের বিপদ্ যিনি করেন ভঞ্জন। তিনি কি দাসের প্রতি চুপ্ করে রন্!

(১১)

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্।
বিষমবিষয় তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্॥

সংসার সাগর মাঝে মগ্ন যেই জন। ঘুরায় ফিরায় যারে বিপদ্-পবন॥
স্কন্ধে যার পুত্র কন্যা গৃহিণীর ভার। বিষম বিষয় জল চারিদিকে যার॥
যে জন না জানে পুনঃ কভু সন্তরণ। একমাত্র তরী তার দেব নারায়ণ॥

(১২)

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গগাণাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং কুশলপথনিযুক্ত শ্চক্রপাণি র্নরাণাম্॥

প্রভুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু কার্ত্তিক মাসের শ্রীপত্রিকায় শ্রীগোকুলানন্দের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-নন্দন শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য হওয়াই সম্ভব, তবে আমরা যেরূপ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলাম বর্ত্তমান লেখক মহাশয়ও তেমনি জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন সুতরাং এবিষয়ের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন।

এক্ষণে দেবহাট্টার অধিকারী মহাশয়গণ যদি গোকুলানন্দের শিষ্যানুশিষ্য-ক্রমে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কোন পরিবারের শিষ্য ইহা জানিতে পারিলে সকল সন্দেহই দূর হইয়া যায়।

বি সং।

রজোমধ্যে নিপতিত হয় যেই জন। মোহজালে বদ্ধ আছে সেই সর্ব্বক্ষণ॥
জন্ম মৃত্যু দোলাতেই যাহার দোলন। যেজন কাতর, নাই যাহার শরণ॥
উপায় তাহার এক আছে এই জানি। সুপথদর্শক সেই দেব চক্রপাণি॥

(১৩)

অপরাধসহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

যেজন পতিত ভীমভবার্ণবে হায়। সহস্র সহস্র দোষ ঘেরেছে যাহায়॥
পার হইবার যার গতি নাই আর। যেই জন লইয়াছে শরণ তোমার॥
কৃপাকরি তারে হরি! ওহে কৃপাময়! উদ্ধার করিয়া দাও এহেন সময়!

(১৪)

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টি র্মাচ মে স্যাৎ কদাচিৎ জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্॥

নারী হয়ে জন্মলাভ নাহি যেন করি। মনোমধ্যে দুষ্টভাব নাহি যেন ধরি॥
মূর্খও হইয়া যেন কভু নাহি রই। কুদেশেও জন্ম যেন কভু নাহি লই॥
বৃথা দৃষ্টি কভু যেন না রয় আমার। হরি হে প্রার্থনা এই নিকটে তোমার॥
জন্ম জন্ম এসংসারে জন্ম যদি হয়। তোমাতেই ভক্তি যেন নিরন্তর রয়॥

(১৫)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি॥

কায় মন বাক্যে কিম্বা ইন্দ্রিয় দ্বারায়। অথবা স্বভাবে কিম্বা বুদ্ধিতে আত্মায়॥
যাহা যাহা করিয়াছি পরের কারণ। সমস্তই নারায়ণে করি সমর্পণ॥

(১৬)

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভাক্ ত্বমেব মধুসূদন॥

যা করেছি যা করিব কর্ত্তা তুমি তার। আমি করিয়াছি হরি একথা অসার॥
যা করাও তাই করি যখন তখন। কি দোষ আমার তায় ওহে নারায়ণ॥
তোমার কর্ম্মের ফল তুমিই ভুগিবে। আমারে দোষের ভাগী কেন বা করিবে॥

(১৭)

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং কথমহমিতি চেতো মাস্মগাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তিরেকা নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্॥

অপার অগাধ ঘোর এভব সাগর। কিরূপে হইব পার, ব্যাকুল অন্তর।
এইরূপ চিন্তা করি রে অবোধ মন। মনে মনে ভীত যেন না হও কখন॥
কমল-লোচন যিনি নরক-নাশন। তাঁর পদে ভক্তি তব যদি অনুক্ষণ॥
সংসার সাগর হতে তিনিই তোমায়। পারে লয়ে যাইবেন, ভয় কিবা তায়॥

(১৮)

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূত মোহোর্ম্মিমালে।
দারাবর্ত্তে তনয়সহজ গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ॥
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্।
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবং প্রদেহি॥

সংসার সাগর দেখি পরম ভীষণ। বিষয়-বাসনা-জল মদন-পবন॥
সদাই উঠিছে মোহ-তরঙ্গ সকল। গৃহিণী-আবর্ত্ত রয় পরম প্রবল॥
তনয়-কুম্ভীর যত ভাসিতেছে তায়। সমস্ত ভয়ের বস্তু রহেছে তথায়॥
এহেন সাগরে মগ্ন মোরা দয়াময়। বর দেহ, তব পদে ভক্তি যেন রয়॥

(১৯)

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গোলঘু
স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুৎ তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টা যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদধূলীকণঃ॥

অতি ক্ষুদ্র পৃথ্বীরেণু জলকণা জল। অনল-স্ফুলিঙ্গ লঘু অথবা অনল॥
অতি সূক্ষ্ম বায়ু কিম্বা প্রবাল বাতাস। অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্রদেশ অথবা আকাশ॥
মক্ষিকা পরম ক্ষুদ্র, কিম্বা কীটদল। ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি দেবতা সকল॥
যথায় পড়িয়া রয় সকলেই মিলি। জয় জয় জয় সেই শ্রীপদের ধূলি।

(২০)

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্যন্বহম্
মেদশ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয় সর্ব্বং হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ—
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ॥

বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, অরণ্যে রোদন। প্রতিদিন কষ্ট-সাধ্য ব্রত সমাপন॥
মেদ, ছেদপদ আর খাত জলাশয়। তীর্থস্নান গঙ্গাস্নান যত কিছু রয়॥
সকলি বিফল বিনা যাহার কারণ। জয় জয় জয় সেই দেব নারায়ণ॥

(২১)

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ অহো জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে॥

হে আনন্দ হে গোবিন্দ হে মুকুন্দ রাম। নারায়ণানন্ত নিরাময় অবিরাম॥
উচ্চারণ করিতেও শক্তি রয় যার। ভুলেও না উচ্চারণ করে একবার॥
হায়রে ইহাই এক বিচিত্র ঘটন। মোক্ষহেতু মানবের না রয় যতন॥

(২২)

ক্ষীরসাগর তরঙ্গসীকরা সারতারকিত চারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ॥

ক্ষীরোদ সাগরে রয় তরঙ্গ সকল। তাহাতে উঠিছে জলকণা অবিরল॥
তদ্দ্বারা নিন্দিত যাঁর ভালে তারাগণ। অনন্ত শয্যায় পুনঃ যাঁহার শয়ন॥
যিনি মধুরিপু যিনি দেব লক্ষ্মীপতি। শ্রীচরণে রয় তাঁর আমার প্রণতি!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

মহারাজ নন্দকুমার।

কতক গুলি লোকের ধারণা যে শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণবেরাই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পর-পদপীড়নসহন-পটু, পুরুষার্থ পরিবর্জ্জিত, পরভাগ্যোপজীবী এবং উদ্যম বিহীন সম্প্রদায়। শাক্তেরাই প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়া মুসলমান-দিগের সহিত ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাঁরা রাজনৈতিকক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ-প্রাধান্য লাভ করিয়া বিপুল যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহাঁরাই বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে সামরিক শক্তি অনুপ্রবেশ করাইয়া ইহাদিগকে সমর দুর্জ্জয় করিয়াছিলেন। আমরা শাক্তদিগের শক্তির কথা অপলাপ করি না, কিন্তু ইহার সহিত বৈষ্ণবদিগের বিশেষতঃ আমাদিগের শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর পদাম্বুজীবি বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ঐকান্তিক অধ্যবসায় স্বদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ, স্বসম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের জন্য অভূত-পূর্ব্ব দরিদ্রতাবলম্বন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা উড়ি-ষ্যাধিপতি মহাপ্রভুর চরণসেবী প্রবলপরাক্রান্ত প্রতাপ রুদ্রের পরাক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া আমাদিগের বাক্য সমর্থন করিতে ইচ্ছা করি না, অথবা মহাপ্রভুগত প্রাণ বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গের সভ্য সমাজের আদর্শ স্বরূপ রাজ্য

পরিপালন, যুদ্ধ স্থলে ভৈরব বিক্রম প্রকাশ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার কথা তুলিয়া বৈষ্ণবদিগের সামরিক শক্তি প্রতিপন্ন করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই, কিম্বা যে সকল কেবল মাত্র কৌপিনধারী বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় পতাকা স্কন্ধে লইয়া কতশত নদনদী পাহাড় পর্ব্বত কান্তার বন ও মরুভূমি অতিক্রমণ পূর্ব্বক ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রাণ-মুগ্ধকর অতীত কাহিনী উল্লেখ করিয়া আত্ম ভ্রম আনিতে ইচ্ছা করি না, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এক জন মহাপুরুষ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলাই আমাদিগের উদ্দেশ্য

উপরে যে মহাপুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহারই কথা আমরা বলিব। ইনি কেবল মাত্র বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত নহেন। যিনি ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে অভ্যুত্থানের ইতিহাস পাঠ করেন তিনিই মহারাজার বিষয় অবগত আছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা মহারাজ নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিত্র অত্যন্ত কুৎসিত রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার রাজনৈতিক চরিত্র বিষয়ক কথা বলিবার আমাদের উদ্দেশ্য না থাকিলেও একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, বিদেশীয় লেখকেরা মহারাজার চরিত্র যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার চরিত্র সেরূপ ছিলনা কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। মহারাজ নন্দকুমার বঙ্গের হতভাগ্য শেষ মুসলমান নরপতি সিরাজদ্দৌলার এক জন প্রধান সেনানী এবং নবাব মীরজাফরের প্রধান মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন।

মহারাজার পূর্ব্বপুরুষেরা শাক্ত ছিলেন, ইনি আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের কাছে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মহারাজার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের সহিত তাঁহার পরিবারবর্গও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইতিপূর্ব্বে যে স্থান যজ্ঞীয় পশুর আর্ত্তনাদে আকুলিত ও অজস্র শোনিত প্রবাহে কর্দ্দমিত হইত এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবগণের প্রাণ পর্শী সুমধুর সংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত এবং ভক্তগণের তাণ্ডব নৃত্যে আঙ্গিনা ধূলি ধূষরিত হইয়া উঠিল। মহারাজার বাস ভবন বৈষ্ণবদিগের অভেদ্য দুর্গে পরিণত হইল। মহারাজার নাম লইয়া বৈষ্ণবগণ রাজা মহারাজা জমীদার কাহাকেও পরিগণনা নাকরিয়া সর্ব্বত্রই নির্ভয় চিত্তে পরিভ্রমণ করিতেন, এক সময় পুটিয়ার অধিপতি রবীন্দ্রনারায়ণের সহিত জনৈক বৈষ্ণবের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, ইহাতে বৈষ্ণব "রায়রায়াঁ মহারাজ শ্রীনন্দকুমারের" ভয়ে রবীন্দ্রনারায়ণকে বিভী-

যিকাগ্রস্ত করেন। * মহারাজার গৃহে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরও বিগ্রহ নানাবিধ ভোগরাগের সহিত পূজিত হইতে লাগিলেন। মহারাজ নন্দকুমার বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন মানসে বহুবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থভাণ্ডার অধিকতর পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। মহারাজার গ্রন্থ-ভাণ্ডারে রাসপঞ্চাধ্যায় একটী অপূর্ব্ব সংগ্রহ, সমগ্র রাসপঞ্চধ্যায় একখানি ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। মহারাজা নন্দকুমার আর একটী অপূর্ব্ব পদার্থ সংগ্রহ করেন তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিত্রপট। চিত্রপট সম্বন্ধে এরূপ কথিত হ : যে মহারাজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর মহাপ্রভুর স্বরূপ দেখিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হয়। রাধামোহন ঠাকুর শিষ্যের ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রভুপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত কুলপরম্পরা আগত মহাপ্রভুর চিত্রখানি মহারাজাকে প্রদান করেন সেই অবধি এই চিত্রপট মহারাজার বংশধরদিগের কাছে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার যখন স্বীয় প্রভুর স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য বীরবেশে নিষ্কাসিত অসি হস্তে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতেন তখন, আর যখন পার্থিবচিন্তা সকল পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন তখন, এই দুই অবস্থায় তিনি যেন বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হইতেন। এই দুই বিভিন্ন ভাব মহারাজাতে যে রূপ মধুর রূপে সম্মীলিত হইয়াছিল সেরূপ সাধারণ মনুষ্য মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি অসাধারণত্বকে লাভ করিয়াছেন। †

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব।

ইহা কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তিরসতত্ত্ব, সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব, আত্মারাম শ্লোকার্থতত্ত্ব, দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব, শিক্ষা শ্লোকতত্ত্ব, গৌরাঙ্গাবতার

---

* ভক্তমাল দেখুন।

† পাঠকদিগের মধ্যে যিনি মহারাজ নন্দকুমারের বিস্তৃত জীবনী পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমরা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থ সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটরী ২০ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

বিষয়ে শাস্ত্রীয়তত্ত্ব প্রভৃতির একত্র সামাবেশ গ্রন্থ। স্মার্ত্ত চূড়ামণি শ্রীপ্রসন্ন-কুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত। ১০৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ বেদ প্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। এ পর্য্যন্ত যত অবতারের বিষয় শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা ভুবন-মঙ্গলকর। মানুষের চিত্তবৃত্তির চরমবিকাশ প্রেমে, এই প্রেমের বিশ্বব্যাপী বিশাল ভিত্তিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের মধুময়ী লীলা প্রতিষ্ঠিত। ইহকালের ও পরকালের যত নীতি আছে প্রেম সকলের শ্রেষ্ঠ নীতি। সমস্ত সাধনার একমাত্র সিদ্ধি—প্রেম মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের জন্য শ্রীরাধা প্রেমের অমিয় উৎস উৎসারিত করিলেন সুতরাং শ্রীগৌরের আবির্ভাব জগতের এক অনন্তমঙ্গলের ব্যাপার।

যিনি কৃপা করিয়া শ্রীগৌর মহিমা কীর্ত্তন করেন, তিনি যিনিই হউন না কেন, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ভক্তির পাত্র ও প্রীতির পাত্র। আমরা ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার সেই শ্রীগ্রন্থ মস্তকে ধারণ করি। বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব লিখিয়া আমাদের অনন্ত প্রীতির ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি সকলেই এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করুন। ইহা পাঠে মন পবিত্র হইবে, তাপিত হৃদয়ের তাপ বিদূরিত হইবে, আত্মা মধুময় বৃন্দাবনের সুখ সম্ভোগের জন্য উন্মুখ হইবে।

এখন বিদ্যারত্ন মহাশয়কে দুই একটী কথা বলিবার আছে। তিনি পাঠক মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন স্থলে বলিতেছেন "যাঁহারা চরিতামৃত গ্রন্থ বুঝিতে অপারগ, তাঁহারা এই গৌরাঙ্গতত্ত্ব পড়িয়া, মহাপ্রভুর সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।" ইহা লিখিবার সময় বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব এইরূপ হইয়াছিল যে বাঙ্গালা পয়ারের ব্যাখ্যা সরল ভাষায় লেখা হইল এবং সংস্কৃত শ্লোকগুলিও সরল বাঙ্গলায় অনুদিত হইল সুতরাং চরিতামৃতের ভাষা বা সংস্কৃত যাঁহারা বুঝিতে পারেন না উক্ত গ্রন্থ বুঝিতে তাঁহাদিগের পক্ষে কতকটী সহজ উপায় করা হইল। এইরূপ মনে করাই অন্ততঃ আমরা উচিত বোধ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার লিখিত ভাষা সে ভাবের স্ফুরণ করে না।" মহাপ্রভুর তত্ত্বের জ্ঞান সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন:—

সেই রসলীলা সব আপনি অনন্ত। সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত।
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে। তার এক কণ স্পর্শি আপন শোধিতে।

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে। বুঝিতে প্রবেশ নাই কি পারি বর্ণিতে।
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষীগণ। যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুলীলা নাহি ওর পার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী॥ ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গের সমুদয় তত্ত্ব, বুঝিতে জীবের সাধ্য নাই। বিশেষতঃ গ্রন্থ পড়িয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের পরিজ্ঞান হয় তাহাও আমাদের বিশ্বাস নাই যথা—শ্রীচরিতামৃতেঃ—

নিগূঢ় চৈতন্য লীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি॥

এখন গ্রন্থ গ্রন্থন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছেঃ—

আমাদের বিবেচনায় তত্ত্বগুলির আলোচনায় স্থানে স্থানে অনবধানতা ঘটিয়াছে যথা—ভক্তিরসতত্ত্বে জীবতত্ত্বের "কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।" শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে অথচ জীবতত্ত্বে এই আবশ্যকীয় শ্লোকটী উদ্ধৃত করা উচিত ছিল কিন্তু তাহা একবারেই উদ্ধৃত করা হয় নাই! অন্যান্য তত্ত্বেও এইরূপ অনবধানতা ও অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইল।

আর একটুকু ধর্ত্তব্য বিষয় আছে যথা ২য় পৃষ্ঠায় "ভগবান্,—কৃষ্ণ, গুরু, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ষড়্বিধরূপে বিলাস করেন এ স্থলে "ভগবান্,—কৃষ্ণরূপে বিলাস করেন ইহা শ্রীগৌরভক্তেরা স্বীকার করিবেন না। ভগবানের কৃষ্ণত্ব ইহা বিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্ত্ব সাধ্য। এখানে অনুবাদ ও বিধেয় বিচার দ্বারা তত্ত্বমীমাংসার দোষ ঘটিয়াছে যথা শ্রীচরিতামৃতেঃ—

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।" এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর।

অন্যত্র—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিনি তাঁর রূপ।

এইরূপ অনবধানতাও অন্য সংস্করণে শোধিত করিয়া দিলে এ হেন গ্রন্থ শ্রীগৌরভক্তগণের কর্ণামৃত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে বিদ্যাবত্ন মহাশয় যেরূপ নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রীয় আলোচনা দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণাবতারের প্রমাণ করিয়াছেন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভরসা হইতেছে যে আমাদের

শ্রদ্ধাস্পদ ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিত মহাশয়গণও এই গ্রন্থ দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে বুঝিয়া ভক্তিশাস্ত্রের সমধিক আলোচনায় অধিক-তর আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।

হরিবল মন।

বনয়ারি-আবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল হালদার প্রণীত ইহা একখানি কবিতাগ্রন্থ। ইহাতে বিবেক বৈরাগ্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এখন শ্রীগৌরভক্তি লিখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গোবরহাটী হরিভক্তিবিধায়িনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব।

বিগত ৮।৯। ১০ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রী৺রামরাজরাজেশ্বর প্রভুর মন্দিরে গোবরহাটী শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিধায়িনী সভার দ্বিতীয়বার্ষিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। ৭ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার পর ভক্তবর বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সংকীর্ত্তনের অধিবাস গান করেন, ৮ই অগ্রহায়ণ প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন ও সহস্র নাম পাঠ হয়। অপরাহ্ণ ৩টার সময় হইতে রাত্রি ১২টার পর পর্য্যন্ত বক্তৃতা হয়, সভার আরম্ভে একত্র সম্মিলিত বৈষ্ণবগণ গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন করেন। তারপর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি প্রার্থনা গান করেন, তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ অধিকারী কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ চট্টোরাজ বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঝোকড়িচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়গণের ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা হয়, এবং প্রত্যেক বক্তৃতার বিরামকালে নামসংকীর্ত্তন হয় শেষে উদ্দণ্ড নামসংকীর্ত্তন এবং জয়দেব গান হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। নানাস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হওয়ায় সভার মহতী শোভা হইয়াছিল।

৯ই অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক হইয়া একত্রিত ভক্তগণ কর্তৃক সময়ানুযায়ী হরি সঙ্গীত হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীপ্রভুর পূজা এবং শ্রীশ্রীতুলসী পূজা আরতি নামসংকীর্ত্তন প্রভৃতি হয়; পরে ৯টার পর ভক্তবর বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন

ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীগোষ্ঠলীলা গান করেন। তদনন্তর প্রবোধনী কৃত্য সমধান্তে ১টার পর হইতে গৌরচন্দ্র গান হইয়া প্রথমতঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ চট্টরাজ বেদান্ততীর্থ মহাশয় গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দৌকড়িচন্দ্র ঠাকুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় শিরোমণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ অধিকারী কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ ক্রমিক শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ২১ অধ্যায় হইতে ২৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের বিরাম কালে নামসংকীর্ত্তন হয়। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর পবিত্র মূর্ত্তিতে সভার জন-মনঃপাবনী মহা শোভা হইয়াছিল। স্ত্রী পুরুষে অন্যূন তিনশত নিরম্বুব্রতী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের বহু অনুসন্ধানে দুই জন মাত্র ব্রতী সন্ধ্যায় ফলমূল প্রসাদ অনুকল্প করিয়াছিলেন।

রাত্রি ২॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইয়া, ৩॥টা পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নামসংকীর্ত্তন হয়, শেষ কালে শ্রীমঙ্গল আরতির পর বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কুঞ্জভঙ্গ গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রেমানন্দে বিগলিত করিয়াছিলেন। ১০ই অগ্রহায়ণ মধ্যাহ্নে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা গান করেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ আরতি গান হইয়া, অন্ন মহোৎসব হয়। সন্ধ্যার পর ভক্তগণের নামসংকীর্ত্তন গানে সকলে আনন্দলাভ করেন, পরে শ্রীনগর সংকীর্ত্তন হইয়া উৎসব সমাধা হয়। সম্পাদক বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এবং সহকারী সম্পাদক বাবু রামপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এবং সভ্যগণের যত্নে ও পরিশ্রমে সভার উৎসবকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করুন সভার উন্নতি হউক।

শ্রীরাধামোহন দাস। সাং পাতলী।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ।

প্রস্তাব বাড়িয়া যায় বলিয়া গত বারে সমুদায় কথা লিখিতে পারি নাই। বিশ্বাসের দিন গিয়াছে, বিচারের দিন আসিয়াছে। পূর্ব্বে জীবের বিচার-শূন্য বিশ্বাস ছিল, এখন লোকে বিচার না করিয়া কিছু বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং যে ধর্ম্ম শুদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ সেই নিমিত্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে সাক্ষ্য টিকিল না, কাজেই জগতে খ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যা কমিতে লাগিল, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে গাঢ় বিশ্বাস এখন অতি অল্প লোকের আছে।

আমাদেরও সেই দশা। আমাদের বেদ ঈশ্বর বাক্য। কেন না—আমরা জন্মাবধি তাহাই শুনিতেছি। বেদ যে ঈশ্বরের বাক্য তাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। মনে ভাবুন একজন বিদেশীয় লোককে মানাইতে হইবে যে বেদ ঈশ্বর বাক্য। তাহা মানাইবার আমাদের কোন উপায় নাই। সে ব্যক্তি প্রমাণ চাহিবে কিন্তু আমাদের প্রমাণ নাই। বেদ কেন, আমাদের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রমাণ করিবার যো নাই।

আমরা শ্রীকালী, শ্রীদুর্গা, শ্রীমহাদেব, শ্রীগণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে মানিয়া থাকি। তাহার কারণ মাতৃদুগ্ধের সহিত আমরা দেবগণের প্রতি বিশ্বাস অন্তরস্থ করিয়াছি। কিন্তু কোন বিদেশীয়কে আমরা মানাইতে পারিব না যে, কালী, কি দুর্গা, কি মহাদেব বলিয়া প্রকৃত কোন দেবতা আছেন। তাহারা প্রমাণ চাহিবে, কিন্তু আমাদের প্রমাণ নাই।

এই রূপ শ্রীরাম, কি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার গণকেও জগতে মানাইবার আমাদের উপায় নাই। শ্রীরামের প্রমাণ একখানি গ্রন্থ বই নয়, সে খানি রামায়ণ। কিন্তু কেবল গ্রন্থ প্রমাণ কিছুই নয়, বিশেষতঃ যেখানে গ্রন্থ প্রাচীন। বিদেশীয় লোকে বড় বিশ্বাস করে, তবে বলিবে যে শ্রীরাম বলিয়া এক জন মহাত্মা থাকিতে পারেন, তবে তিনি যে শ্রীভগবান তাহার প্রমাণ নাই। তাহারা বলিবে, অবশ্য বাল্মিকী তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু বড় লোককে ঐ রূপ দুর্ব্বলচেতা লোকে চিরদিন ভগবান বলিয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ রূপ। বিদেশীয় লোকে অনেকে বিশ্বাস করেন যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এক জন মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ভগবান তাহা কেহ

স্বীকার করিবে না। স্থূল কথা, বৃন্দাবন লীলা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু বৃন্দাবন লীলা এ জগতে কেহ বিশ্বাস করিবে না।

অতএব জগতে ধর্ম্ম বলিয়া যে একটী কথা আছে, তাহার কোন ভিত্তি-ভূমি নাই। একজন সুবোধ লোকে অনায়াসে বলিবে যে ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, ধর্ম্ম একটী বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ এ সমুদায়ের প্রমাণ নাই। আর কোন বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকে এ কথা বলিলে আমাদের উত্তর করিবার যো নাই।

অতএব বিচারে জগতে কোন ধর্ম্মই টিকে না, হিন্দু ধর্ম্ম পর্য্যন্ত। এমন কি, বিচারে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সাব্যস্ত করা যায় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যুগে বিচারই মনুষ্যের এক মাত্র নেতা।

জীবের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইলেন, আর জগতের সমুদায় অন্ধকার দূর হইবার উপায় হইল। জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীভগবানচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে উদয় হইলেন, হইয়া তিনি কি করিলেন বলিতেছি। তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে———

(১) আমি শ্রীভগবান।

(২) আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য শিখাইতে ও অভয় দিতে আসিয়াছি।

"আমি শ্রীভগবান" অগ্রে ইহাই প্রমাণ করিয়া, শ্রীগৌরচন্দ্র জীবগণকে কয়েকটী মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। সে এই—

(১) আমি আছি।

(২) পরকাল আছে।

(৩) আমার সহিত চির মিলন জীবের পরম সৌভাগ্য।

(৪) জীবের আমার সহিত মিলনের দুই উপায় আছে, ভক্তি ও প্রেম।

জীবগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, যাঁহারা ধর্ম্ম কিছু কিছু মানেন, দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা কিছুই মানেন না। কিন্তু কার্য্যে দুই সমান। যাহারা কিছু কিছু মানেন, আর যাঁহারা মোটে মানেন না, তাঁহাদের বিভিন্নতা অতি অল্প। যে হেতু ধর্ম্মের যে উদ্দেশ্য, পবিত্রতা ও আনন্দ, ইহা উভয়ে কাহারও নাই।

আমি খুব পূজা করি, কিন্তু পায়ে কাঁটা ফুটিলে বাপরে মারে করিয়া আর্ত্তনাদ করি। আমার পূজার ফল কি? আমাতে ও নাস্তিকে

প্রভেদ কি? আমি পূজা করি অথচ অন্ন দুঃখে কাতর হই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমি যে পূজা করি তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।

ধর্ম্মে বিশ্বাস এক কথা, আর ধর্ম্ম আস্বাদন করা আর এক কথা। শ্রীভগবানে বিশ্বাস এক কথা, শ্রীভগবানকে আস্বাদন করা আর এক কথা। লোকে শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিতে পারে না তাহার কারণ শ্রীভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস নাই। শ্রীভগবানে বিশ্বাস নাই তাহার কারণ শ্রীভগবান বলিয়া যে কোন আমাদের বস্তু আছেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

জগতে সেই প্রমাণ দিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে স্বয়ং শ্রীভগবান উদয় হইলেন!

শ্রীভগবান শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে আটচল্লিশ বর্ষ ধরাধামে, সকলের নয়ন-গোচর থাকিয়া, পরে অদর্শন হইলেন। তাঁহার বপু অদর্শন হইলেন বটে, কিন্তু তবু লীলারূপে তিনি রহিয়া গেলেন, আর চিরকাল থাকিবেন। তাঁহার বপু অদর্শন হইলেন, কিন্তু তাঁহার লীলা জাজ্জ্বল্যরূপে রহিলেন।

তিনি তাঁহার বপু লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার লীলারূপ যে তিনি, তাহা দাসগণের নিকট রহিলেন।

এই যে তাঁহার দাসগণ, এখন তাঁহারা তাঁহার শ্রীলীলা লইয়া কি করিবেন? আপনারা বসিয়া আস্বাদন করিবেন,—না, জগতে আপনাদের অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে দিবেন? আবার এরূপ অমূল্য নিধি, যাহা ব্যয়ে বৃদ্ধি হয়, তাহা জগতে বিস্তার করাই কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সৃষ্টি।

আমাদের জগত নরকভূমি স্বরূপ হইয়াছে। কেন হইয়াছে বলিতেছি। আগুনে কি কেহ কখন ইচ্ছা করিয়া হাত দেয়? যে একবার জানিয়াছে যে আগুনে হাত পুড়ে সে আর আগুনে হাত দিবে না। যে একবার জানিতে পারে যে কুকর্ম্ম আগুনের মত, উহা স্পর্শ করিলে উহাতে অবশ্য যন্ত্রণা পাইতে হইবে, তবে আর সে কুকর্ম্ম করিতে যাইবে না। কুকর্ম্ম করিলে দণ্ড পাইতে হইবে ইহা যদি লোকে জানিত, তবে কেহ কুকর্ম্ম করিত না। অবশ্য লোকে মুখে জানে যে কুকর্ম্মের ফল দণ্ড; কিন্তু সে মুখে, মনে নয়। লোকে যেরূপ জানে যে, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে, সেরূপ যদি জানিত যে কুকর্ম্ম করিলে দণ্ড পাইতে হইবে, তবে তাহারা কুকর্ম্ম করিত না।

অতএব যদি কোন প্রকারে জীবকে প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞাত করা যায় যে,

যেরূপ অগ্নিতে অঙ্গ দগ্ধ করে, ঠিক সেইরূপ কুকর্ম্মে ক্লেশ দিয়া থাকে, তবে জগত হইতে কুকর্ম্ম দূরীভূত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লোকে, পাপের কথাত দূরের কথা,—শ্রীভগবান আছেন, কি পরকাল আছে তাহাই বিশ্বাস করে না; আর যদি কেহ বলে যে করে, তবে সে মুখে বলে মনে নয়। অতএব যদি জীবকে প্রত্যক্ষরূপে প্রতীত করা যায় যে, শ্রীভগবান আছেন, তিনি প্রেমাস্পদ, প্রেমময়, ও প্রেম-কাঙ্গাল, তবে লোকে আর কুকর্ম্ম করিবে কিরূপে, যাহাতে তাঁহার প্রীতির ভাজন হয় শুধু কেবল সে তাহাই করিবে।

এখন শ্রীভগবানে আদৌ বিশ্বাস না থাকায়, কি কেবল অল্প বিশ্বাস থাকায়, জগৎ নরক রূপ ধারণ করিয়াছে। দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন, দ্বেষ, হিংসা, ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ম্মে জীব হাহাকার করিতেছে।

কিন্তু যদি শ্রীভগবানের প্রতি জীবগণের গাঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায়, তবে এই নরকরূপ জগৎ বৃন্দাবনরূপে পরিণত করা যাইবে। যদি জীব প্রত্যক্ষ-রূপে জানিতে পায় যে, জীবে ও শ্রীভগবানে, জীবে ও জীবে গাঢ় প্রীতি সম্বন্ধ, তবে জগতে দিবানিশি কেবল রাসলীলা হইতে থাকিবে।

এতদিন প্রেমময় ভগবান স্থাপিত করিবার কোন উপায় ছিল না। তাহাতে জীবের অধোগতি হইয়াছে।* এখন শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে আর সে বাধা নাই। এখন আমরা অনায়াসে জীবকে প্রত্যক্ষরূপে দেখাইতে পারি যে, জীবে ও ভগবানে, জীবে ও জীবে, চির ও গাঢ় সম্বন্ধ। আমরা ইহা দেখাইয়া এই রক্তময় জগৎকে কুসুমময় বৃন্দাবন করিতে পারি। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সৃষ্টি।

শ্রীভগবান্ যে গৌরচন্দ্র রূপে উদয় হইয়াছেন ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি। ইহাই প্রমাণ করিয়া জগৎকে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করাই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের লক্ষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গদাসের কর্ত্তব্য, এই সংবাদ দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, নগরে নগরে প্রচার করা, যে "শ্রীভগবান গৌরচন্দ্ররূপে উদয় হইয়া জীবকে আশ্বাস ও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন," সেই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সৃষ্টি।

অদ্যাপি সমাজের অধিবেশনের স্থান পর্য্যন্ত হয় নাই, কারণ অদ্যাপি অর্থ হস্তগত হয় নাই। এখন যাহা কিছু ব্যয় হইতেছে তাহা এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। যত শাখা-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করুন, করিয়া কিছু তাঁহাদের ব্যয়ের নিমিত্ত রাখুন, আর কিছু প্রচারকার্য্যে ও মূল সমাজের অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করুন। ভক্তগণ মাত্রেই

[illegible] সাহায্য করুন। প্রতিভা সংগ্রহ [illegible] যথেষ্ট হইবে। অর্থ সংগ্রহ ক[illegible] ভক্তগণ শ্রীধামের কোষাধ্যক্ষ শ্রীল ভক্তবর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের নিকট "বরাহনগর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ [illegible]

গ্রাহকদিগের তালিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র বসু	পটুয়াখালি
ঐ কালী কমল দত্ত	ঐ
ঐ রসিকচন্দ্র ঘোষ	ঐ
ঐ ললিত মোহন রায়	ঐ
ঐ বরদা কান্ত রায়	ঐ
ঐ বৈকুণ্ঠ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ
ঐ বসন্তকুমার সেনগুপ্ত	ঐ
ঐ বিহারিলাল [illegible]	ঐ
ঐ শ্রীনাথ [illegible]	ঐ
ঐ চুনী লাল রায়	ঐ
ঐ ললিত কুমার সেন গুপ্ত	ঐ
ঐ বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত মোক্তার।	ঐ
ঐ সীতানাথ [illegible]	ঐ
ঐ শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
বসন্ত কুমার মজুমদার	ঐ
ঐ চণ্ডীচরণ দাস	ঐ
ঐ মতিলাল শীল	ঐ
ঐ মহেন্দ্র নাথ দত্ত	ঐ
ঐ ললিত মোহন সেন গুপ্ত	ঐ
ঐ বিপিন বিহারী গুহ	ঐ
ঐ ললিত মোহন ঘোষ	ঐ
ঐ [illegible] চন্দ্র দাস গুহ	ঐ

ঐ	রসরঞ্জন সেন গুপ্ত	চোরাপাটিয়াখালি।
ঐ	নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	ঐ
ঐ	বসন্ত কুমার পুতিতুণ্ডি	ঐ
ঐ	উমাচরণ গুহ	ঐ
ঐ	বিহারিলাল রায় চৌধুরী	ঐ
ঐ	দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
ঐ	রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী	ঐ
ঐ	শশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
ঐ	অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
ঐ	বরদাকান্ত ঘোষ	ঐ
ঐ	মকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
ঐ	কৈলাশচন্দ্র দাস	ঐ
ঐ	শ্যামাচরণ দে	ঐ
ঐ	বসন্ত কুমার দাস	ঐ
ঐ	কালীকুমার দে	ঐ
ঐ	কৃষ্ণমঙ্গল দে	,,
,,	দেবেন্দ্রনাথ রায়	,,
,,	হরিমোহন দাস	,,
,,	দুর্গাচরণ দে	,,
,,	কৃষ্ণকুমার দে	,,
,,	কৈলাশচন্দ্র দে	,,
,,	বসন্তকুমার দে	,,
,,	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	,,
,,	প্রসন্নকুমার দাস	,,
,,	কালীচরণ দে	,,
,,	যোগেন্দ্র চন্দ্র দে	,,
,,	বৈকুণ্ঠচন্দ্র দাস	,,
,,	সাধুচরণ সাহা	,,
,,	রামচন্দ্র বণিক	,,
,,	রাইমোহন কুণ্ড	,,

গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার		পটুয়াখালি
প্রাণ কুমার পাল		ঐ
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সবইনস্পেক্টার	কৃষ্ণনগর
অক্ষয় কাশীশ্বরী	ষ্টারথিয়েটার	কলিকাতা
চতুর্ভুজ নারায়ণ মুন্সিজগন্নাথ		মজঃফরপুর
মহেশচন্দ্র সিকদার	মুন্সীপাড়া	দিনাজপুর
বঙ্কবিহারী দাস	কায়েতপাড়া	শ্রীহট্ট
দীননাথ রায়	বাঁকোয়া পোঃ বেনাপুর	মেদিনীপুর
নারায়ণ বক্সিদার	বিজয়পুর	মুগগপুর
কার্ত্তিকচন্দ্র দাস	৭০নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট	কলিকাতা
শ্রীনাথ গোস্বামী	উত্তর নবাবপুর	ঢাকা
হরিমোহন গোস্বামী	বনগ্রাম	,,
পূর্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী	মৈশণ্ডী	,,
কালমোহন শর্ম্মানিধি	মৈশণ্ডী	,,
মেধু সাহা	মৈশণ্ডী	,,
মথুর সাহা	মৈশণ্ডী	,,
শ্যামলাল দত্ত	৯০১ হরিতকী বাগান লেন	কলিকাতা
সুরেন্দ্রনাথ দত্ত একাউণ্টেণ্ট রেলওয়ে অডিট অফিস		চট্টগ্রাম
বিহারিলাল রায়		বরিশাল
রামকৃষ্ণ দাঁ		ভাগলপুর
বঙ্কবিহারী ঘোষ	গোষ্টমাস্টার	বরিশাল
রাধাবল্লভ নাথ		জঙ্গীপুর
হরিনাথ সাহা		,,
গোবিন্দ চন্দ্র পাল		,,
কবিরাজ রাধাচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট,	কলিকাতা
লোকনাথ মেহের	বিনুকা	সম্বলপুর

ক্রমশঃ—

শাখা-সমাজ।

বৰ্দ্ধমান চলদীঘী হইতে শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ মিত্র মহাশয়, লিখিয়াছেন—

অত্র চলদীঘীতে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের একটী শাখা সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। বিগত ৪ঠা পৌষ তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। এই শাখা সমিতির নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। ৪১৩ গৌরাব্দের ৫ম সংখ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় যে গৌরাঙ্গ-সমাজের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে এই সমাজ তাহারই শাখারূপে গণনীয় হইবে। উক্ত সমাজের সভ্যগণের প্রস্তাবিত বিষয় গুলি যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমাজের সভ্য হইলেন :—

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ, শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ মিত্র, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারি বসু।

৩। এই সমাজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মনোনীত হইলেন :—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ মিত্র।

সহকারি সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবিহারী ঘোষ।

৪। এই সমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লিখিত সমাজের সহিত বা অন্যান্য শাখা সমাজের সহিত যে সকল কার্য্যাদি করিতে হইবে তাহা সম্পাদক মহাশয় করিবেন, এবং এই সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থাদি সংগ্রহের ও সম্পাদকের মতানুযায়ী ব্যয়ের ভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় লইবেন।

৫। এই সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ জন্য যথাসাধ্য দান করিতে চেষ্টা করিবেন।

৬। প্রতি রবিবারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ মিত্র মহাশয়ের চলদীঘী রোডস্থ বাটীতে এই সমাজের অধিবেশন হইবে ও নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইবে :—

(ক) বৈষ্ণব মহাজনগণ কৃত পদ গান।

(খ) গোস্বামী এবং প্রভুপাদগণের অনুমোদিত শাস্ত্র ও পুরাণাদি পাঠ এবং তদ্বিষয়ের আলোচনা।

[redacted]

সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। গত অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও শ্রীনামকীর্ত্তন হইয়াছিল। আশা করা যায় উদ্যোক্তাগণের উৎসাহে ও স্থানীয় শ্রীগৌর-ভক্তগণের সমবেত চেষ্টায় শাখা সমাজটীর দিন দিন উন্নতি হইতে থাকিবে। শ্রীগৌরাঙ্গসমাজের সভ্যগণের জীবনের উন্নতিতেই গৌরাঙ্গ সমাজের উন্নতি।"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সিমুলিয়া শাখা হইতে ৩নং মদন মিত্রের লেন ভবনে "চৈতন্য বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে, তথায় বাঙ্গালা ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও নীতি বিষয় প্রতি শনিবার অপরাহ্নে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাদি পাঠ এবং বক্তৃতাদি মধ্যে মধ্যে হয়।

নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ শাখা সমাজের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীমৎ গিরিশচন্দ্র মিত্র অধ্যক্ষ, ফকিরদাস সরকার অলিয়া, অনুকূল চন্দ্র মণ্ডল রসপুর, জটীরাম মজুমদার, নরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মুদিয়ালী, মন্মথ মিত্র মুদিয়ালী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র মদন মিত্রের লেন, হরিদাস বৈরাগী মদন মিত্রের লেন, গোপালচন্দ্র ঘোষ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শরৎচন্দ্র দত্ত কোদালিয়াগ্রাম, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মুদিয়ালী। কৃষ্ণচৈতন্য বিশ্বাস মুঙ্গের। রমাপতি সরকার খিদিরপুর। শঙ্করদাস বাবাজী সেটের বাগান। মহানন্দ চক্রবর্ত্তী মাণিক-তলা। পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী মাণিকতলা। হরিচরণ দাস মাণিকতলা। চন্দ্র কান্ত দাস মাণিকতলা। শশিভূষণ পাড়ই বক্রেশ্বর। যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র ভবকিঙ্কর।

শ্রীযুক্ত কিশোরানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের যত্নে জেলা বর্দ্ধমান—শ্রীখণ্ড গ্রামে একটী শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের শাখা সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার কার্য্য বিবরণ আগামী মাসের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব।

জন্মোৎসব মাত্রই আনন্দের ব্যাপার। গৃহস্থের ঘরে যখন নয়নানন্দ-নন্দনের জন্ম হয়, গৃহস্থের তখন আনন্দের আর সীমা থাকে না। সে আনন্দে ভাবী স্বার্থের কুহকিনী আশার মোহন মদিরার মৃদুতরঙ্গের লীলা-

দিয়া তোমাকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে, এই যে শোক তাপ অহর্নিশি তোমার হৃদয় দগ্ধ করিয়া ছারখার করিতেছে, বল দেখি জীব, এই সংসারে তুমি কোন্ সুখে কাল কাটিতেছ? নিশ্চিত বলিতে পারি, মোহান্ধ জীব, তুমি দিশেহারা, তুমি এখনও সুখের ঠিক অনুসন্ধান করিতে পার নাই। তুমি পুত্র কন্যা লইয়া উৎসব কর, তুমি বন্ধু বান্ধব লইয়া উৎসব কর, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তোমাকে এমন একটী মহোৎসবে যোগদান করিতে হইবে যাহা হইতে তোমার হৃদয় চিরদিনের জন্ত পুণ্য পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, শান্তি সংগ্রহ করিতে পারে এবং শ্রীভগবানের বিশ্ব-সংপ্লাবন প্রেমসাগরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে। সেই উৎসব হইতেছে—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব। দেবক্রিয়া উপলক্ষে তোমার গৃহে অনেক প্রকার উৎসব হয়, তোমার ঘরে দুর্গোৎসব প্রভৃতি কত উৎসব হয়, তার পরে ঝুলন রাস প্রভৃতি অনেকানেক বৈষ্ণবীয় উৎসবও ভাগ্যবান্ গৃহস্থের ঘরে হইতে দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দোল লীলার যে দিন তোমার বা তোমার প্রতিবাসীর ঘরে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে, সে দিন যে তোমাদের আর একটী মহামহোৎসবের দিন, তাহা তোমাদের স্মরণ হয় কি? তাহা তোমাদের বিবেচনার বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় কি? ঠিক সে দিনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু এই বঙ্গদেশে শচীর গৃহে প্রকাশ পাইলেন। গ্রহণচ্ছলে গগনচাঁদকে ঢাকিয়া রাখিয়া শচীর গৃহে গোরাচাঁদের প্রকাশ হইল। আমাদের গোরাশশী এক দিকে যেমন জগৎবাসীর হৃদয়ের আঁধার দূর করিলেন, অপর দিকে প্রেমের আনন্দে জগৎ ভাসাইলেন; জীব নিস্তারের সহজ সরল সুন্দর ও কুসুমিত পথ প্রদর্শন করিবার জন্য যে দিন প্রথমে প্রভু শচীর গৃহ আলোকিত করিলেন, সেদিন কি আনন্দের!!

ভাই, তুমি সহস্র প্রকার উৎসব কর তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, কিন্তু সকাতরে একটী নিবেদন এই যে, এমন সোণার ঠাকুর যে দিন মানুষের পরিত্রাণের জন্ত এই ধরাধামে প্রকাশ পাইলেন, সে দিন একবার জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্বনি করিয়া তাঁহার উৎসবে মাতিও। তাহাতে হৃদয়ে সুখ আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, শান্তি আসিবে এবং প্রেমের উদয় হইবে। এই বৃহৎ ঘটনার তুলনায় দোল প্রভৃতি উৎসব অতি সামান্ত। সেই দোল যদি ভারতের অধিকাংশ স্থলেই জাতীয় উৎসব বলিয়া পরিগণিত হইতে

পারে, তবে আমাদের শ্রীপ্রভুর সেই আবির্ভাব এবং জগতের ইতিহাসে সেই সুপ্রধান ঘটনায়, দিনে নীরব থাকা কি আমাদের পক্ষে মহাঅপরাধের বিষয় নহে? তাই ভ্রাতৃগণ আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, গৌরভক্ত মাত্রেরই এই মহামহোৎসবের দিনে সমগ্র ভারতে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের জয়গান উত্থিত করিতে হইবে। মঙ্গলময় মধুর সংকীর্ত্তনে অধিবাসিদিগের হৃদয়ে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-প্রসাদ ঢালিয়া দিতে হইবে। শ্রীপ্রভুর মঙ্গল গীত গাইতে হইবে, গাওয়াইতে হইবে; নিজে নাচিতে হইবে, অপরকে সেই আনন্দের উন্মাদিনী শক্তিতে নাচাইতে হইবে। এবার শ্রীগৌরভক্ত-সমাজ হইতে কলিকাতাতে এই মহামহোৎসবের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। সকল স্থানের গৌরভক্তগণ এই মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করুন ইহাই আমাদের কৃতাঞ্জলি নিবেদন।

দেবগণ কর্তৃক শ্রীশচীদেবীর গর্ভস্তোত্র।

(মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে উদ্ধৃত)

নমামি ত্বাং সত্যগর্ভাং অদিতীং জননীং হরেঃ।
চতুর্ব্বর্গাদি প্রজ্ঞাগর্ভাং সত্ত্বগর্ভাং শ্রুতিং ক্ষমাং॥
অশেষগর্ভাং সংসিদ্ধিং বেদগর্ভাং জগদ্গুরোঃ।
দেবকীং রোহিণীঞ্চৈব যশোদাং গর্ভরূপা জবাম্॥
ত্বং বৈ বিভর্ষি গর্ভেশ্বরং যো জগৎ প্রপালয়িষ্যতি।
কীর্ত্তনাখ্যং মহাপুণ্যং মহাযজ্ঞে যে প্রপদ্যতে॥
কীর্ত্তনং নৃহরেঃ শ্রুত্বা নির্ব্বিকারেণ বা জপেৎ।
প্রীতিপ্রসাদরূপাং যাতু কোটিকৈবর্ত্তবেদহি॥
অহো মহাপুণ্যবশ অমৃতং হরিণা শ্রুতং।
সমুদ্র মন্থনং কৃত্বা ততঃ কোটিগুণাধিকং॥
ধন্যং নরাণাং এতাদৃশ শুদ্ধ শ্রীহরের্যশঃ॥
মোক্ষকাম্যমৃতং কেতো মহতে কীর্ত্তনাক্ষরঃ॥